MA-09-BENG-3.4

গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়
Gauhati University
দূর এবং মুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
Institute of Distance and Open Learning Learning

বাংলা স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম
M. A. in Bengali

তৃতীয় ষাণ্মাসিক

চতুর্থ পত্র **(Paper : 4)**
আধুনিক সাহিত্য-২

বিষয়সূচী (Contents)

পত্র পরিচিতি (Paper Introduction)

বিভাগ - ১ : অনুপূর্বা — যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (নির্বাচিত কবিতা — ঘুমের ঘোরে, শিবস্তোত্র, দুঃখবাদী, কেতকী, কাচিডাব)

বিভাগ - ২ : রক্তমণির হারে (আপদ, পরিচিতা, মধুবন্তী, উইপোকা, জটায়ু)

বিভাগ - ৩ : তপস্বী ও তরঙ্গিণী— বুদ্ধদেব বসু

বিভাগ - ৪ : আরণ্যক — বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

Contributor :

Dr. Jyotirmai Sengupta (Units: 1, 2, 3, 6 & 7)	Department of Bengali Pragjyotis College, Guwahati
Dr. Sanjay Bhattacharjee & Ranjan Debnath (Units: 4 & 5)	Department of Bengali Guwahati University
Sanjoy Sarkar (Units: 8, 9, 10, 11 & 12)	Department of Bengali Kokrajhar Girls' College

Course Co-ordination :

Prof. Kandarpa Das	Director, GUIDOL
Dr. Amalendu Chakrabarty	HOD, Dept. of Bengali Gauhati University
Dipankar Saikia	Editor Study Material GUIDOL

Content Editing :

Dr. Amalendu Chakrabarty	HOD, Dept. of Bengali Gauhati University

Language Editing :

Sanjoy Chandra Das	Assistant Professor, Department of Bengali Pandu College, Guwahati

Proof Reading :

Sanjoy Chandra Das	Assistant Professor Department of Bengali Pandu College, Guwahati
Swapan Das	Department of Bengali, Pandu College

Format Editing :

Dipankar Saikia	Editor Study Material GUIDOL

Cover Page Design

Bhaskar Jyoti Goswami GUIDOL

ISBN : 978-93-84018-72-6

November, 2014

© Institute of Distance and Open Learning, Gauhati University. All rights reserved. No part of this work may be reproduced in any form, by mimeograph or any other means, without permission in writing from the Institute of Distance and Open Learning, Gauhati University. Further information about the Institute of Distance and Open Learning, Gauhati University courses may be obtained from the University's office at BKB Auditorium (1st floor), Gauhati University, Guwahati-14. Published on behalf of the Institute of Distance and Open Learning, Gauhati University by Prof. Kandarpa Das, Director and printed at Maliyata Offset, Mirza, Copies printed 500.

Acknowledgement

The Institute of Distance and Open Learning, Gauhati University duly acknowledges the financial assistance from the Distance Education Council, IGNOU, New Delhi for preparation of this material.

পত্র পরিচিত

চতুর্থ পত্রে আপনাদের স্বাগত জানাই। এই পত্রে কুড়ি শতকের সাহিত্য স্থান পেয়েছে। এখানে কুড়ি শতকের বিপুল সাহিত্য-সম্ভার থেকে একটি কবিতা গ্রন্থ, একটি গল্প-সংকলন, একটি নাটক এবং একটি উপন্যাস স্থান পেয়েছে। আসুন, কুড়ি শতকে সাহিত্য অধ্যয়ন ও তার পঠন-পাঠনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে নিই।

উনিশ শতকের শেষ দুটি দশকে বাংলার সাহিত্যাকাশে ধীরে ধীরে রবীন্দ্রনাথের পদসঞ্চার ঘটল। আর বিশ শতকে চতুর্থ দশকের প্রারম্ভ পর্যন্ত সাহিত্য সৃষ্টির সূত্রে তিনি এই শতকের একচ্ছত্র অধিনায়ক। সাহিত্যের ক্ষেত্রে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পরিবর্তন-পরিমার্জন ও চিন্তা-ভাবনার কেন্দ্রে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তবু বিশ্বযুদ্ধের পর, বলা যায় দ্বিতীয় দশক থেকে পাশ্চাত্যের আধুনিকতর সাহিত্য-দর্শন-চিন্তার সংস্পর্শে এসে বিশ শতকে বাংলাদেশে ভিন্ন সুরের সাহিত্য সাধনা শুরু হয়েছিল, এমনিতেই সারা বিশ্ব জুড়ে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ঢেউ উঠেছিল। বিজ্ঞানের নবনব আবিষ্কার মানুষের জীবনবোধেও এনে দিয়েছিল ভিন্নতার স্বাদ। এই স্বাদ উনিশ শতকীয় নবচেতনালব্ধ জাগরণের চেয়ে আলাদা। বিশ্বজুড়ে কূটনৈতিক সন্ত্রাস, নারকীয় হত্যালীলা, সমস্ত মানবীয়তার অপমান, মানব সম্পর্কে নানা জটিল আবর্তের সৃষ্টি করেছিল। আধুনিকতার আগ্রাসী সত্তা দখল করে নিচ্ছিল গ্রামীণ শান্ত-নিস্তরঙ্গ জীবনধারাকে। নগর বিস্তৃত হতে হতে একের পর এক গ্রাম দখল করছিল, অন্যদিকে অসহায় মানুষ নিতান্ত প্রাণধারণের জন্য ছুটছিল শহরের পঙ্কিল জীবনযাত্রার দিকে। সাধারণ মানুষ আধুনিকতার প্রচণ্ড অভিঘাতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। নাগরিক মনন রোমান্সের কল্পস্বর্গ থেকে বাস্তবের রুক্ষ মাটিতে আছড়ে পড়ল। তাঁরা দেখলেন এই শতকের মানুষ নানা সামাজিক বৈপরীত্যের মাঝেই জীবননির্বাহ করছেন। যাকে আমরা রবীন্দ্র-পরবর্তী সাহিত্য বলি, সেখানে এইসব পরিবর্তনের নানা ছবি বিধৃত হয়ে আছে। বর্তমান পত্রে নির্দিষ্ট কয়েকটি গ্রন্থে আপনারা সেগুলো সম্বন্ধে অবহিত হবেন।

আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা বর্তমান পত্রের পাঠ্য-গ্রন্থগুলোকে কয়েকটি বিভাগে বিন্যস্ত করে নিয়েছি। আসুন, আমাদের পাঠ্য-বিষয়ের বিভাগগত বিন্যাসটি একবার দেখে নেওয়া যাক —

বিভাগ - ১ : **অনুপূর্বা — যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (নির্বাচিত কবিতা — ঘুমের ঘোরে, শিবস্তোত্র, দুঃখবাদী, কেতকী, কাচিডাব)**

বিভাগ - ২ : **রক্তমণির হারে (আপদ, পরিচিতা, মধুবন্তী, উইপোকা, জটায়ু)**

বিভাগ - ৩ : **তপস্বী ও তরঙ্গিণী— বুদ্ধদেব বসু**

বিভাগ - ৪ : **আরণ্যক — বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়**

যদিও এই পাঠ্য-উপকরণসমূহ অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ শিক্ষকগণ কর্তৃক প্রণীত হয়েছে, তবু সাধারণভাবে এগুলিকে কিছু বিষয়ের সংকলনগ্রন্থ হিসাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে। তাই, আমরা আশা করব আপনাদের জ্ঞানানুসন্ধান এই উপকরণসমূহের বাইরেও বিস্তৃত হবে এবং আপনাদের নিজস্ব এক সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠবে। প্রত্যেক বিভাগেই এই উদ্দেশ্যে প্রাসঙ্গিক গ্রন্থসমূহের বিস্তৃত তালিকা দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে একটি প্রসঙ্গ এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, — মূল গ্রন্থ পাঠের কোনো বিকল্প নেই। তা ছাড়া, মূল গ্রন্থগুলির পাঠ, অধ্যায়ের অন্তর্গত বিষয়বস্তুর আলোচনাসমূহ অনুধাবনে আপনাদের পক্ষে সহায়ক হবে বলেই আমাদের ধারণা।

বার্ষিক পরীক্ষার পূর্বে প্রত্যেক পত্রে আপনাদের ১০ নম্বরের দুটো, মোট ২০ নম্বরের (১০+১০=২০) প্রশ্নের উত্তর বাড়ি থেকে তৈরি করে (Home Assignment) পাঠাতে হবে। এছাড়া, বার্ষিক পরীক্ষায় আপনাদের ১২ নম্বরের ৫ টি প্রশ্ন (১২×৫=৬০) এবং ৫ নম্বরের ৪ টি প্রশ্নের (৫×৪=২০) উত্তর লিখতে হবে। বার্ষিক পরীক্ষার মূল্যমান ৮০ (৬০+২০) ।

সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে এই পাঠ্য-উপকরণসমূহ প্রস্তুত করা হয়েছে বলে অনিচ্ছাকৃত ভুল তথা মুদ্রণ প্রমাদ থেকে যাওয়া অসম্ভব কিছু নয়। তাই সচেতন শিক্ষার্থী এই বিষয়ে চিঠির মাধ্যমে বা সরাসরি অবগত করালে আমরা কৃতার্থ হব এবং পরবর্তী সংস্করণ শুদ্ধ করে নেওয়ার চেষ্টা করব। আশা করি, আমাদের এই আয়োজন ও প্রচেষ্টা আপনাদের কাছে উপযোগী ও উপভোগ্য হয়ে উঠবে।

বিভাগ পরিচিত

তৃতীয় ষাণ্মাসিকের চতুর্থ পত্রে আপনাদের স্বাগত জানাই। এই পত্রে পাঠ্যান্তর্ভুক্ত গ্রন্থগুলি হল— যতীন্দ্র নাথ সেনগুপ্তের 'অনুপূর্বা' কাব্য, দেবেশ রায় সম্পাদিত 'রক্তমণির হারে' গল্প-সংকলন, বুদ্ধদেব বসুর ' তপস্বী ও তরঙ্গিনী' নাটক এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' নাটক। আমরা এই পাঠ্য গ্রন্থগুলির আলোচনাকে মোট দ্বাদশ বিভাগে ভাগ করেছি। আসুন, বিভাগগুলি একবার দেখে নেওয়া যাক —

বিভাগ - ১ : অনুপূর্বা : কবি পরিচিতি ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা-১

বিভাগ - ২ : অনুপূর্বা : প্রাসঙ্গিক আলোচনা-২

বিভাগ - ৩ : অনুপূর্বা : নির্বাচিত কবিতা আলোচনা

'রক্তমণির হারে'-এর আলোচনাকে দুটি ভাগে ভাগ করেছি—

বিভাগ - ৪ : রক্তমণির হারে : প্রসঙ্গ কথা

বিভাগ - ৫ : রক্তমণির হারে : নির্বাচিত গল্প আলোচনা

'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' নাটকের আলোচনাকে ভাগ করেছি দুটি ভাগে —

বিভাগ - ৬ : তপস্বী ও তরঙ্গিণী : সৃষ্টি প্রসঙ্গ, মিথের ভূমিকা ও মূল-নাট্য বিষয়।

বিভাগ - ৭ : তপস্বী ও তরঙ্গিণী : কাহিনিবৃত্ত, চরিত্র- বিচার ও ভাষা- নির্মাণ

'আরণ্যক'- এর আলোচনাকে আমরা ভাগ করেছি মোট পাঁচটি ভাগে—

বিভাগ - ৮ : আরণ্যক : প্রাসঙ্গিক পরিচিত

বিভাগ - ৯ : আরণ্যক : নিসর্গ-প্রকৃতি

বিভাগ - ১০ : আরণ্যক : আঞ্চলিকতা ও লোক-জীবন

বিভাগ - ১১ : আরণ্যক : চরিত্র চিত্রণ

বিভাগ - ১২ : আরণ্যক : শিল্প রীতি

বিভাগ-১

অনুপূর্বা

অনুপূর্বা : কবি পরিচিতি ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা-১

বিষয় বিন্যাস

১.০ ভূমিকা (Introduction)

১.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

১.২ যতীন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত : কবি ও কাব্য পরিচয়

১.৩ প্রকাশভঙ্গি, মানসিকতা ও কাব্যভাষায় যতীন্দ্রনাথের স্টাইল

১.৪ যতীন্দ্র-কবিতার দুঃখবাদ

১.৫ ঈশ্বর-চেতনা ও যতীন্দ্রনাথ

১.৬ 'অনুপূর্বা'-য় কবির 'বন্ধু'

১.৭ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

১.৮ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

১.৯ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

১.১০ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

১.০ ভূমিকা (Introduction)

'কল্লোল' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যের রূপ বদল হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রেম-প্রকৃতি-ভক্তির রসসিক্ত মানসিকতা এবং মার্জিত মধুর শব্দ-ব্যবহার ক্রমেই আধুনিক কবিদের কাছে প্রাসঙ্গিকতা হারাচ্ছিল এবং সমসাময়িক কবিত্রয়ী — মোহিতলাল মজুমদার, কাজী নজরুল ইসলাম ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রবীন্দ্রপন্থা ত্যাগ করে নব্য কাব্যকল্প সৃষ্টির উল্লাসে মেতে উঠেছিলেন। মোহিতলালের দেহভোগী রূপতান্ত্রিক, নজরুলের বিদ্রোহবাণী ও সংগ্রামী আহ্বান এবং যতীন্দ্রনাথের তথাকথিত দুঃখতত্ত্ব ও নৈরাশ্যবাদ রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে বেরিয়ে এসে নতুন জগতে পদার্পণ করল। এঁদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রত্যয় ও প্রকাশভঙ্গিমা আমাদের অভিনিবেশ দাবি করে। গত শতকের তিরিশের দশকে জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে প্রমুখ কবিরা বাংলা কবিতার যে নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিলেন, তার পূর্ব সূচনা হয়েছিল উল্লিখিত কবিত্রয়ীর রচনায়। মোহিতলাল বা নজরুলের মতো যতীন্দ্রনাথও রবীন্দ্রনাথকে ভালবেসে এবং তাঁকে পরিত্যাগ করে ভিন্নতার লক্ষ্যে পৌঁছতে তৃণপ্রান্তরে পদচারণা করলেন — যেখানে ছায়াতরু নেই, নেই মেঘশ্যাম স্নিগ্ধতা, আছে শুধু মরুধূসর তিক্ততা।

কবি যতীন্দ্রনাথ বিষণ্ণতা, দুঃখ ও নৈরাশ্যের বাতায়ন থেকে জীবন ও ঈশ্বরচেতনাকে লক্ষ করেছেন বলে অনেকেই মন্তব্য করেছেন। আমরা তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করব। তবে এটা ঠিক যে, যতীন্দ্রনাথ যথাসম্ভব নির্মোহ ভাবে লক্ষ করেছেন সনাতন মহাপ্রকৃতি মহাদুঃখের আকর। প্রচণ্ড ক্ষমতাধর ব্যক্তির অপর নাম ঈশ্বর — আবার তিনিই জীবের সমস্ত দুঃখের উৎস। তাই ঈশ্বরের সঙ্গে কবির আঘাত-প্রতিঘাতের সম্পর্ক। যতীন্দ্রনাথ অভিযোগকারী, ঈশ্বর অভিযুক্ত। তাই কবির বাচনে আছে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ।

'অনুপূর্বা' যতীন্দ্র-কবিতার সংকলন। এখানে মরীচিকা, মরুশিখা, মরুমায়া, সায়ম্ আর ত্রিযামা — এই পাঁচটি কাব্যগ্রন্থের কবিতা সংকলিত হয়েছে। আর এগুলোতে কবির মনের নানা ভাবনা ও বোধ প্রকাশ পেয়েছে। পরবর্তী আলোচনায় আমরা এই বিভিন্ন ভাবনা ও বোধগুলো নিয়ে আলোচনা করব।

১.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'অনুপূর্বা' আমরা কেন পড়ব? কবিতাপাঠ ও বিশ্লেষণের আগে এই প্রশ্ন প্রত্যেক পাঠক -পাঠিকার মনে জাগতেই পারে। যদিও যতীন্দ্রনাথ আজ শুধু বিদ্যায়তনিক পরিমণ্ডলেই আলোচিত হন — তবু একথা তো সত্যি যে, একটা সময়ে তাঁর কবিতার নানা পঙ্‌ক্তি অনুরাগী পাঠক-পাঠিকার মুখে মুখে ঘুরত। তিনি ছিলেন জনপ্রিয় কবি। আবার বিদ্যায়তনিক আলোচনায় তিনি বিশ শতকের রবীন্দ্র-বিরোধিতায় অগ্রগামী কবি হিসাবে স্বীকৃত। নজরুল ও মোহিতলালের সঙ্গে তাঁর নামটিও উচ্চারিত হয়। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে নিয়ে বা তাঁর কবিসত্তাকে নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে — আর সে-সব আলোচনায় রবীন্দ্র-বিরোধিতার চেয়েও বড় হয়ে উঠেছে তাঁর নিজস্ব কবি-বৈশিষ্ট্য। সাহিত্যের ছাত্র-ছাত্রী হিসাবে আমাদের প্রয়োজন এই কবি-বৈশিষ্ট্যের অধ্যয়ন। বাংলা কবিতা রচনার একটি বিশেষ পর্বে এই ইঞ্জিনিয়ার-কবি যেভাবে নানা কবিতায় তাঁর মনোভাব প্রকাশ করেছেন — সেটা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে জেনে নেওয়াই আমাদের প্রধান কাজ।

১.২ যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত : কবি ও কাব্য পরিচয়

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর আবির্ভাব রবীন্দ্রপ্রতিভার বিশাল ব্যাপ্তির মধ্যে। তাঁর জন্ম হয়েছিল (১৮৮৭ - ১৯৫৪) বর্ধমান জেলার পাতিলপাড়া গ্রামে। যতীন্দ্রনাথের পিতা দ্বারকানাথ এবং মাতা মোহিতকুমারী দেবী। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় গ্রামের বিদ্যালয়ে, সেখান থেকেই বৃত্তি পেয়ে তিনি কলকাতায় পড়াশোনা করতে যান। ওরিয়েন্টাল সেমিনারি থেকে ১৯০৩ সালে এণ্ট্রান্স পাস করে জেনারেল অ্যাসেমব্লিতে ভর্তি হন ও ১৯০৫ সালে সেখান থেকে এম.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হন। ১৯১১ সালে সেখান থেকে পাস করে ১৯১২-তে কর্মজীবন শুরু করেন ই. আই রেলওয়েতে সার্ভেয়ার হিসাবে। পরে ১৯২৩ থেকে ১৯৫০পর্যন্ত দীর্ঘ সময় কাশিমবাজার

রাজ এস্টেটে ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে কাজ করেন।

যতীন্দ্রনাথের কাব্য রচনার শুরু সম্ভবত১৯১০থেকে এবং কবির শেষ কবিতা 'আসছে জন্ম' (রচনাকাল ডিসেম্বর, ১৯৫৩)। অতএব দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর যতীন্দ্রনাথের কবি জীবন বলে মন্তব্য করা যায়। এই সময়ে রচিত কবির কাব্যগ্রন্থাবলি নিম্নরূপ —

(১) মরীচিকা - ১৯২৩ (রচনাকাল - ১৯১০ -১৯২২)

(২) মরুশিখা - ১৯২৭ (রচনাকাল - ১৯২৩ -১৯২৭)

(২) মরুমায়া - ১৯২৯ (রচনাকাল - ১৯২৮ -১৯২৯)

(২) সায়ম্ - ১৯৪০ (রচনাকাল - ১৯৩১ -১৯৪০)

(২) ত্রিযামা - ১৯৪৮ (রচনাকাল - ১৯৪১ -১৯৪৮)

(২) নিশান্তিকা - ১৯৫৭ (রচনাকাল - ১৯৪৭ -১৯৫২)

অন্যান্য গ্রন্থ ও রচনা —

(১) কাব্য-পরিমিতি (১৯৩১)

(২) অনুপূর্বা (১৯৪৬)

(৩) কুমারসম্ভব (অনুবাদ)

(৪) প্রাচীন নেয়ে (Rhime of the Ancient mariner কবি কোলরিজ রচিত এই গ্রন্থের অনুবাদ)

(৫) ম্যাক্‌বেথ (অনুবাদ) (মাসিক বসুমতীতে ধারাবাহিক প্রকাশিত)

(৬) ওথেলো (অনুবাদ) (মাসিক বসুমতীতে ধারাবাহিক প্রকাশিত)

(৭) হ্যাম্‌লেট (অনুবাদ) (মাসিক বসুমতীতে ধারাবাহিক প্রকাশিত)

(৮) গান্ধী-বাণী-কণিকা

(৯) রথী ও সারথি (কিশোরদের উপযোগী গীতার মর্মানুবাদ)

শুধু কবিতারচনা ও অনুবাদই নয়, বহু গদ্য রচনাতেও কবির বলিষ্ঠ জীবন-ভাবনা এবং মৌলিক চিন্তা-চেতনা সার্থক তীক্ষ্ণ আঙ্গিকের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে।

জেনে রাখুন

(নিম্নলিখিত কবিতাগুলো 'অনুপূর্বা'-র অন্তর্গত)

'মরীচিকা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত কবিতা — **'মরুমায়া'** কাব্যের অন্তর্গত কবিতা—

১. ঘুমের ঘোরে ১. নবান্ন

২. ডাক হরকরা	২. শর-শয্যায় ভীষ্ম
৩. নবনিদাঘ	৩. কেতকী
৪. বহ্নিস্তুতি	
৫. শিবের গাজন	
'মরুশিখা' কাব্যের অন্তর্গত কবিতা —	**সায়ম্** কাব্যের অন্তর্গত কবিতা —
১. শিবস্তোত্র	১. কচিডাব
২. অন্ধকার	২. চিরবৈশাখ
৩. লোহার ব্যথা	**ত্রিযামা** কাব্যের অন্তর্গত কবিতা —
৪. দুঃখবাদী	১. সমাধান
৫. রেলঘুম	২.পঁচিশে বৈশাখ
৬. খেজুরবাগান	

যতীন্দ্রনাথের জন্ম ঊনবিংশ শতক শেষ হওয়ার ১৩ বছর আগে এবং তাঁর কাব্য রচনার শুরু বিশ শতকের প্রথম দশকের প্রান্তে। কবি যে জীবন-চেতনাকে আত্মসাৎ করে তাঁর কবিতায় ব্যক্ত করেছেন সেই জীবনচেতনা একদিকে ঊনবিংশ শতককে ছুঁয়ে আছে এবং অন্যদিকে বিশ শতকের নানা দৃষ্টিভঙ্গি ও আন্দোলনকে আত্মসাৎ করেছে। কবির কাব্যরচনার কাল ভারতবর্ষ-সহ সমস্ত পৃথিবীতে এক আলোড়নের কাল। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের কালে বাংলাদেশে আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল, ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধিজির অহিংস আন্দোলনের প্রভাব দৃঢ় ভাবেই দেখা যাচ্ছিল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ,১৯৪২-৪৩-এ বাংলার দুর্ভিক্ষ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ভারতভাগ ইত্যাদির কালে বাঙালিদের অন্তহীন দুর্ভোগের শুরুও এই সময়ে হয়েছিল। ভারতবর্ষের দুর্ভোগের সঙ্গে চলছিল সারা বিশ্বজুড়েই নানা আন্দোলন ও সংক্ষোভের প্রকাশ। যতীন্দ্রনাথের কাব্য এই সময়কালেই জন্ম নিয়েছিল।

আত্মসমীক্ষামূলক প্রশ্ন

কবি যতীন্দ্রনাথের সময়কাল সম্বন্ধে কী জেনেছেন? ন্যূনাধিক ১০০ শব্দের মধ্যে লিখুন।

.....

.....

.....

প্রকৃতপক্ষে কবি যতীন্দ্রনাথের প্রাথমিক যুগের কাব্যচর্চার কোনো ধারাবাহিক ইতিহাস নেই যাতে করে তাঁর কাব্যগুলোর রচনাকালীন ক্রমিক পারম্পর্য লক্ষ করা যেতে পারে। যেসব কাব্যপাঠে কবির মানসিক ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছিল তার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। কলেজে ভর্তি হয়ে যতীন্দ্রনাথ নবীনচন্দ্র সেনের 'কুরুক্ষেত্র', মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ', হেমচন্দ্রের কাব্যের সঙ্গে পরিচিত হন। বিপ্রতীপ গুপ্তর 'স্মৃতিকথা' থেকে জানা যায় (প: ব: রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৮১) ১৯০৫ সালের কাছাকাছি সময়ে যখন যতীন্দ্রনাথ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ছিলেন তখনই রবীন্দ্র-কাব্যের সঙ্গে পরিচিত হন। পরে রবীন্দ্র-কাব্যের একজন অনুরাগী পাঠক হয়ে ওঠেন তিনি।

তবে যতীন্দ্রনাথ কবি-স্বভাবে ছিলেন রবীন্দ্রকাব্যের বিপরীত স্রোতের কাণ্ডারি। রোমাণ্টিকতা তাঁর আদর্শ ছিল না। তাঁর কবি হয়ে ওঠার কাহিনিও বেশ মজাদার। এ-সম্পর্কে কবির নিজের বক্তব্য এ-রকম —

" ... আমার বাল্যকাল থেকে কখনও ভাবিওনি যে আমি কবি হব। কবি হতে চাইওনি। লেখাপড়া শিখলাম, ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করলাম। আমি পাশ করা ইঞ্জিনিয়ার। স্বভাবের মধ্যে একটা দুঃস্বভাব জেগেছিল হঠাৎ। সেটা হচ্ছে কবিদের পিছনে লাগা। তাদের ঠাট্টা করা। কারণও স্পষ্ট। আমি ইঞ্জিনিয়ার। বুঝি বস্তু। ইট-কাঠ, লোহালক্কড়, ঘর-বাড়ি,ব্রিজ-কালভার্ট-রাস্তাঘাট। অর্থাৎ এককথায় বস্তুতান্ত্রিকতা, Materialism. কাজেই এটা তো সোজা কথা — কবিদের ভাবালুতা আমার কাছে হাস্যকর বলে মনে হবেই। অলস মস্তিষ্কে তাদের মতো আকাশ-কুসুম কল্পনা তারই বিরুদ্ধে বিদ্রূপের বাণ ছুঁড়বার ইচ্ছা জাগল আমার মনে। কিন্তু তার আঙ্গিক কি রকম হবে? ভেবে দেখলাম পদ্যবাণ নিক্ষেপই বাঞ্ছনীয়। ওদের অস্ত্র দিয়েই ওদের আঘাত হানতে হবে। তাই লেগে পড়লাম। যাকে বলে উঠে পড়ে লাগা। " (দ্র: 'একটি স্মরণীয় দুপুর' — অজিত দাশ, 'হোমশিখা' ৩য় বর্ষ, ফাল্গুন সংখ্যা)

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, সমকালীন কোনো কোনো কবিদের কল্পনা-বিলাসকে বিদ্রূপ করতে গিয়েই যতীন্দ্রনাথের কাব্যরচনার শুরু। অবশ্য কল্পনা বিলাস তাঁরও ছিল। আমের গায়ে শুকিয়ে যাওয়া কষের দাগ বা খেজুরের রসকে চোখের জল বলে ভাবার মধ্যেই সেই কল্পনা-বিলাস লুকিয়ে আছে। যাইহোক, রবীন্দ্রকবিতার একনিষ্ঠ পাঠক হলেও যতীন্দ্রনাথ যে রবীন্দ্র-আদর্শের বিপরীত স্থানে অবস্থান করছিলেন, সে-কথা আমরা আলোচনা করছিলাম। রবীন্দ্রনাথ যেখানে উপনিষদের ঋষিদের বিশ্বাসকে মেনে নিয়েছেন — বিশ্বসৃষ্টিকে বিধাতার লীলামাত্র মনে করেছেন, সেখানে যতীন্দ্রনাথ রুদ্রের বহ্নিজ্বালার উপাসক। এই বহ্নিকে তিনি বিরাট বিশ্বের সব জায়গায় ছড়িয়ে থাকতে দেখেছেন আর মানবচিত্তে তার অস্তিত্ব অনুভব করেছেন। তাই তাঁর মধ্যে বহ্নিস্তুতির আয়োজন। প্রথাগত ধর্ম-বিশ্বাস তাঁর নেই। যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড় দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য হল, কবিগুরু বিশ্বসৃষ্টির মূলীভূত শক্তিকে চেতন বলে গ্রহণ করেছেন। যতীন্দ্রনাথ বলেছেন ওই শক্তি জড়। যতীন্দ্রকাব্যের মূল সুর — অদৃষ্ট চক্রের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে নিপীড়িত

মানবাত্মার আর্তক্রন্দন। মানুষ নিয়ত দুঃখ পাচ্ছে আর তাকে কাটিয়ে ওঠার ক্ষমতা মানুষের নেই — স্বয়ং ঈশ্বরও এর প্রতিবিধান করতে পারেন না। এই দৃষ্টিভঙ্গির পিছনে কাজ করেছে কবির তথাকথিত দুঃখবাদ। কবির এই মানসিকতার সঙ্গে সাযুজ্য আছে কাব্যের নামকরণে — মরীচিকা, মরুশিখা, মরুমায়া, সায়ম্ ইত্যাদি।

প্রসঙ্গত আর একটি কথাও স্মরণীয়। সমকালে যতীন্দ্রনাথের কবিতা প্রচণ্ড আলোড়ন তুলেছিল। তাঁর কবিতার পঙ্‌ক্তি যেমন মুখে মুখে উচ্চারিত হতো,তেমনি অনেকে তাঁকে অক্ষমভাবে অনুকরণও করতেন। বক্তব্যের সমর্থনে আমরা এখানে দুটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করব। প্রথমটি 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থের লেখক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর এবং দ্বিতীয়টি সজনীকান্ত দাসের।

(১) "মোহিতলালের মত যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তও আমাদের আরাধনীয় ছিলেন — ভাবের আধুনিকতার দিক থেকে যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব অভিজ্ঞতা। আমাদের তদানীন্তন মনোভাবের সঙ্গে চমৎকার মিলে গিয়েছিল। দুঃখের মধ্যে কাব্যের যে বিলাস আছে সেই বিলাসে আমরা মশগুল ছিলাম। তাই নৈরাশ্যের দিনে ক্ষণে ক্ষণে আবৃত্তি করতাম 'মরীচিকা'।" (কল্লোল যুগ)

(২) "বাংলা কাব্যসাহিত্যের উপর তখন যতীন্দ্রনাথের মরীচিকার অত্যন্ত প্রভাব। তরুণেরা এমন কথাও উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন, যতীন্দ্রনাথের 'চেরাপুঞ্জি থেকে একখানি মেঘ ধার দিতে পার গোবিসাহারার বুকে' — এই দুই পঙ্‌ক্তি রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্যসম্পদ অপেক্ষাও মূল্যবান। যতীন্দ্রনাথের অনুকরণে তাঁহারা 'কল্লোল', 'প্রগতি', 'কালিকলমে' এন্তার কবিতা লিখিতে লাগিলেন।" (আত্মস্মৃতি)

জেনে রাখুন

কবি যতীন্দ্রনাথের প্রথম কবিতাগ্রন্থ মরীচিকা প্রকাশিত হবার আগে'যমুনা' পত্রিকায় এক তাৎপর্যপূর্ণ বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল —

" কবিরাজ শ্রী যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মহাশয় কাব্য কালান্তক রস আবিষ্কার করিয়া যমুনায় কিছুকাল আগে এক বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। ইহাতে নতুন কবিতা, পুরাতন কবিতা, ঘুষঘুষে কবিতা, প্রবল কম্প কবিতা, পালাকবিতা, বিষম কবিতা, ধোঁয়া ধোঁয়া কবিতা, ছোঁয়াচে কবিতা, চাকরী চাপা কবিতা প্রভৃতি যেরূপ কবিতারোগই হউক না কেন, নিশ্চয় ফল পাওয়া যাইবে বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন। বুক জ্বালা, মন হু-হু করা, চোখে ঝাপসা দেখা, প্রাণ কেমন করা, রাত্রে নিদ্রা না আসা, পেট ফাঁপা, মাঝে-মাঝে হাত সুড়সুড় করা ইত্যাদি উপসর্গ এক বটিকা সেবনেই উপশমিত হইবে। বিশেষ চেষ্টায় বেতস্ বিছুটি প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত কয়েকটি দেশীয় গাছ-গাছড়ায় এই মহৌষধ প্রস্তুত। পথ্যের কোনো ধরাকাট নাই। কেবল ঔষধ ব্যবহারের সময় ও পরেও একমাস জ্যোৎস্না লাগান, ফুল শোঁকা এবং মাসিকের সম্পাদকের সহিত পত্র বিনিময় নিষিদ্ধ।

যাইহোক, কবি-জীবন শুরু করে যতীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন প্রকৃতি ও জীবনের নানা অসামঞ্জস্যকে। 'মরু' নামধারী তিনটি কাব্যগ্রন্থের নানা কবিতায় সেই অসাম্যকে তুলে ধরেছেন ও নিজের দৃষ্টিভঙ্গিকেও পুষ্ট করেছেন। পরবর্তী তিনটি কাব্যগ্রন্থে কবির পালাবদলের ছবি স্পষ্ট। এখানে পূর্ববর্তী কাব্যের তীব্রজ্বালা অনেকটাই স্তিমিত হয়ে এসেছে।

১.৩ প্রকাশভঙ্গি , মানসিকতা ও কাব্যভাষায় যতীন্দ্রনাথের স্টাইল

মুগ্ধ আত্মতৃপ্তির বিরুদ্ধে স্পষ্ট অভিযান, নিমীলিতনেত্রে সৌন্দর্যারতির বিরুদ্ধে ব্যঙ্গতীক্ষ্ণ আঘাত এবং গণ-জীবনের মর্মমূলে কাব্য-প্রেরণা-সন্ধান আধুনিক বাংলা কাব্যে প্রথম যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর কবিতাতেই দেখা গিয়েছিল। তাঁর কবিতার পাঠক স্পর্ধিত স্বাতন্ত্র্য, তির্যক দৃষ্টিভঙ্গি এবং শাণিত বিদ্রূপের সমারোহে একটি বিশিষ্টতার পরিচয় পেতে পারেন।

আপনারা জেনেছেন, যতীন্দ্রনাথ পেশায় ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার। কাজের জন্য তাঁকে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার অনেক জায়গায়, এমনকি গ্রামে-গঞ্জেও ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। সুতরাং জীবনের দুঃখ, দারিদ্র্য, অসহায়তা আর নানা বৈপরীত্যকে তিনি নিজের চোখেই দেখেছেন। তাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে যে শূন্যতাবোধ দেখা দিয়েছিল, কবির মননে তা স্বীকৃতি পেয়েছিল। এই ভঙ্গিমাই তাঁকে বাংলা কাব্যজগতে স্বাতন্ত্র্য এনে দিয়েছে। যতীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভা সম্পর্কে মোহিতলাল মজুমদার তাঁর 'কাব্যমঞ্জুষা'-তে লিখেছিলেন যে, কবির 'অগ্নিতপ্ত হৃৎপিণ্ড'-এর উপর আঘাত পড়ায় যতীন্দ্র-কবিতায় 'ভাব ও ভাষার জমাট দৃঢ়তা ও সুপরিচ্ছন্ন গঠন' দেখা যায়। শিল্পী যতীন্দ্রনাথের মূর্তিটি এই উল্লেখে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাঁর রচনার ঋজুতা, বলিষ্ঠতা, বর্ণনার স্পষ্টতা ও প্রত্যক্ষ রূপবিভা পাঠক মাত্রকেই চমকিত করে। জগতে ও জীবনে ছড়ানো নানা ঘটনা থেকে অবিচার ও অন্যায়ের এবং সেখান থেকে উৎসারিত বেদনার উপাদান কবি আবিষ্কার করেছিলেন। এই সজাগ কবিদৃষ্টি রোমান্টিক কবিদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলাদা। ফলে প্রত্যক্ষ বাস্তবকে যথারূপ রেখেই তিনি সেখান থেকে কাব্যোপাদান আহরণ করেছেন। আর এখানেই কবি হিসাবে যতীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি তথা প্রকাশভঙ্গির বিশিষ্টতা নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। ফুল এবং কসাইয়ের কাটা মাংসের সহাবস্থান লক্ষ করে তিনি লিখেছেন —

" বৌবাজারের মোড়ে, —
যেখানে ফুলের দোকানের পাশে কসাই-এ মাংস থোড়ে —" (কেতকী, মরুমায়া)

বা কবির 'মন-কবি' কবিতার পঙ্‌ক্তি —

"অভাবের লাখো ফুটো বাক্যের ফাঁস বুনে
মামুলি প্রেমের নেট্-মশারিটা টাঙিয়ে নে।" (মনকবি, মরুমায়া)

অথবা

" বজ্রে যে-জনা মরে,

নব-ঘনশ্যাম শোভার তারিফ সে-বংশে কেবা করে?" (দুঃখবাদী, মরুশিখা)

এ-ধরনের পংক্তিগুলোতে কবির অভিজ্ঞতার বিশিষ্ট প্রকাশ লক্ষ করা যায়। কিন্তু এর বাইরে যে কথাটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তা হল বক্তব্য প্রকাশের সরলতা। কবি যা ভাবছেন সেটাই এক নির্মম ঋজুতায় প্রকাশ করে চলেছেন। আধুনিক কবিতা বাক্‌সংযম এবং গভীর অর্থ-দ্যোতনার বাহক। কিন্তু যতীন্দ্র-কবিতা অনেকটাই খোলামেলা, — সাংকেতিক ব্যঞ্জনায় আচ্ছন্ন নয়। তা সামান্য কাব্যিক আলংকারিতায় পুষ্ট হয়ে পাঠকের ভাষায় সরাসরি পাঠকের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিকে ছুঁয়ে যাচ্ছে। বক্তব্যের অন্তর্গত শ্লেষ বা ব্যঙ্গকে প্রকাশ করতেই বাক্য-গঠনে, শব্দ-চয়নে তির্যক-রীতি কবি ব্যবহার করেছেন। এককথায় তাঁর কবিতা হচ্ছে 'poetry of statement'. সেজন্য প্রকাশভঙ্গিতে বক্তব্যের ঋজুতা ফুটে উঠেছে।

আপনারা আগে আর একটা কথাও যতীন্দ্র-কবিতা সম্বন্ধে জেনেছেন। সেটা হল তাঁর কবিতায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের উপস্থিতি। এ-থেকে তাঁর কাব্য-সমালোচনা বা তাঁর মানসিকতার বিচারে একটা প্রস্থানভূমি নির্মিত হয়ে যায় — তিনি সমাজ ও জীবনকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ দিয়েই বিশ্লেষণ করেছেন। অথচ তাঁর কবিতাই এ-সাক্ষ্যও দেয় যে তিনি নির্বিশেষে ব্যঙ্গ-প্রধান লেখক নন। জগৎ, জীবন, ঈশ্বর এবং মানুষের বিবিধ হৃদয়ানুভব সম্পর্কে তাঁর সুনির্দিষ্ট ধারণা ছিল। তাঁর কাব্যবোধও অতএব সেই ধারণাতেই পরিচালিত হবে — সেটা বলা বাহুল্য। 'দুঃখের পৃথিবী' তিনি দেখেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল, রোমান্টিকতা এখানে অর্থহীন বিলাস মাত্র। বিশিষ্ট এবং প্রগাঢ় এই কাব্য-দর্শনই কবিকে যাবতীয় মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী করে তুলেছিল। তাঁর কবিতার একটি মুখ্য স্বাদ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ — লঘুতায় তাঁর সহজ বিচরণ। অথচ তাঁর কোনো কবিতাই ঠিক ব্যঙ্গ-কবিতা নয় — মূলত বেদনাবোধে তার জন্ম এবং ভাব-গভীরতায় তার চূড়ান্ত আবেদন। আসলে যতীন্দ্রনাথ কবিতা রচনা শুরু করেন বস্তুতান্ত্রিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে, 'কবিদের ভাবালুতাকে' বিদ্রূপবাণে জর্জরিত করার ইচ্ছায় (দ্রষ্টব্য —'একটি স্মরণীয় দুপুর' — অজিত দাশ)। কবির নিজের স্বীকারোক্তিতেই আমরা জানতে পারি যে, কবিরা যে সত্যকে প্রত্যক্ষ করেন বাংলার হাটে-মাঠে, ধানখেতে, গৃহবধূর শান্ত স্নিগ্ধতায়, তাকে 'নজরে পড়ে না' বলে তিনি অকাজের মনে করেছেন। রবীন্দ্রনাথকে ব্যঙ্গ করে 'শরতে বঙ্গ'-এর প্যারডি লেখেন এবং সেখান থেকেই তাঁর কবিজীবনযাত্রার শুরু। সুতরাং তাঁর মানসিকতাটিকে চিনে নিতে আমাদের অসুবিধে হয় না। তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ ও শ্লেষোক্তিতে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিচিন্তা, প্রেম-ধারণা এবং ঈশ্বরতত্ত্বকে বিপর্যস্ত করে তিনি লিখেছেন,—

" চেরাপুঞ্জির থেকে

একখানি মেঘ ধার দিতে পারো গোবি-সাহারার বুকে?"

(ঘুমের ঘোরে, মরীচিকা)

— সমকালীন রবীন্দ্র-ভাবনায় ভাসমান আত্মতৃপ্তির প্রতি এটা তীব্র বিদ্রূপ। কিন্তু এই উক্তিতে চপলতার প্রকাশ কোথাও নেই। রয়েছে সাধারণ মানুষের জন্য বেদনাবোধ। 'কচিডাব' কবিতায় প্যারডির রঙ্গ-রসিকতায় গভীর উপলব্ধির সুর শুনিয়েছেন কবি। পৃথিবীর সমস্ত নিপীড়িত মানুষের প্রতিনিধি শীর্ণ, দরিদ্র ডাবওয়ালাকে সম্বোধন করে চলেছেন,—

" দারুণ শীতের সাঁঝ, হে আমার নটরাজ,

কোনরূপে এসেছিলে দ্বারে?

অশ্রুর সাগর মন্থ, হে আমার নীলকণ্ঠ!

ভাগ্যে ফিরাইনি একেবারে!"

অথবা, মরীচিকা কাব্য গ্রন্থের 'ডাক-হরকরা' কবিতাটির উল্লেখ করতে পারি, যেখানে স্বগতোক্তিতে সে তার জীবনযন্ত্রণাকে পৌঁছে দেয়, —

" পান্থ! তুমি ভাবিতেছ বটচ্ছায়ে বসি' কে ছুটে রে

কী আশার টানে?

আমার সময় নাই ভেবে নিতে — কেন ছুটে যাই,

কিসের সন্ধানে!"

ঈশ্বরকে 'বন্ধু' সম্বোধন করলেও তাঁর অসহায়তার ছবিও কবি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। 'দুঃখবাদী' কবিতায় তিনি মানুষকেই সবার উপরে স্থান দিয়েছেন — 'স্রষ্টা আছে বা নাই'। কারণ স্রষ্টা তাঁর মতে,—

" আনন্দ নহ নহ ; দিচ্ছ দুঃখ — দুঃখেরই ফেরি বহ "। একেই উদ্দেশ্য করে কবির বিদ্রূপপ্রবণ মানসিকতা ফুটেছে 'ঘুমের ঘোরে' কবিতায়, —

"তুমি শালগ্রাম শিলা

শোয়া বসা যার সকলি সমান, তারে নিয়ে রাসলীলা!"

এই মানসিকতারই আর একটি প্রকাশ 'শিবের গাজন' (মরীচিকা) কবিতায়। সেখানে তিনি বলেন,—

"পূজা পেয়ে হেসে আবার ঘুমাও আশুতোষ উদাসীন!"

প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, কবির এই বিশেষ মানস-প্রবণতাটি 'মরীচিকা', 'মরুমায়া', 'মরুশিখা' পর্বেই বেশি করে লক্ষ করা যায়। 'ত্রিযামা' থেকে 'নিশান্তিকা' পর্যন্ত কাব্যধারায় তাঁর মন অনেকটা প্রশমিত এবং সেখানে আগেকার বক্তব্য সমূহের পুনর্বিচার ও কিছু অনুশোচনার ভাব দেখা দিয়েছে।

আত্মসমীক্ষামূলক প্রশ্ন

যতীন্দ্র-কবিতা 'Poetry of statement'- এ-কথার সপক্ষে প্রমাণ দিন ন্যূনতম ১০০ শব্দের মধ্যে।

.....

.....

.....

.....

নঙর্থক-ভাবে যতীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যে যা রোমান্টিক-বিরোধিতা এবং ধর্ম-বিরোধিতা, অস্ত্যর্থকভাবে তা-ই কবির বলিষ্ঠ মানবিকতা। মানুষের উপরে গভীর শ্রদ্ধার আনুষঙ্গিক উপকরণ মানুষের বাস্তব-জীবন সম্বন্ধে শ্রদ্ধা এবং আস্থা। স্বর্গের দেবতাকে কবি তাঁর কাব্যে অস্বীকার করেছেন মর্ত্যের মানুষকে প্রতিষ্ঠা দিতে। মানুষের দুঃখের মধ্যে যে অসহ্য জ্বালা রয়েছে তাকে সহনীয় করে তুলতেই মর্ত্যের পরপারে স্বর্গের কল্পনা। সে-কথা অস্বীকার করে যতীন্দ্রনাথ দুঃখের মহিমাবোধের সাহায্যে দুঃখকে মোহনীয় এবং সহনীয় করে তুলেছেন। আমাদের সাধারণ যে বন্ধন ও মুক্তির আদর্শ রয়েছে সেখানে মর্ত্যজীবনই বন্ধন, — অধ্যাত্মজীবনের মধ্যে আমরা লাভ করতে চাই মুক্তির আনন্দ ও মহিমা। যতীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে অধ্যাত্মজীবনই বন্ধন — স্বাধীন বাস্তব মর্ত্য জীবনের মধ্যে তিনি পেতে চান মুক্তির আনন্দ ও মহিমা। বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে মানুষকেই সর্বাপেক্ষা বড় করে দেখবার সদাজাগ্রত প্রবৃত্তির অনিবার্য আনুষঙ্গিক হিসাবে যতীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যে ঘুরে-ফিরে দেখা দিয়েছে আর একটি প্রতিবাদ ও সমবেদনার সুর — প্রতিবাদ সমস্ত অবিচার ও শোষণের বিরুদ্ধে, সমবেদনা অসহায় লাঞ্ছিত এবং শোষিতের জন্য। এই অবিচার এবং স্বেচ্ছাচারী শোষণ কবি লক্ষ করেছেন সর্বত্র — এমনকি প্রকৃতির মধ্যেও। প্রাকৃতিক বিধানের মধ্যে যে অবিচার এবং শোষণ, তা তো মানুষের কল্পিত বিধাতাপুরুষেরই দান। তাই তিনি বলতে পারেন, —

" দেখিনু তন্দ্রাভরে —

তাঁতীর টাকার বড় দরকার, মাকু ছুটাছুটি করে।" (ঘুমের ঘোরে, মরীচিকা)

সৃষ্টিভরা এই যে একটি নির্দয় সার্বিক শোষণের রূপ তা সুন্দরভাবে ফুটেছে কবির কয়েকটি প্রতীকধর্মী কবিতার মধ্যে — 'মরুশিখা'-র 'খেজুরগান', 'মরুমায়া'-র 'পাষাণপথে', 'কেতকী' প্রভৃতি কবিতা এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। শোষক এবং বঞ্চক মানুষের প্রতি কবির তীব্র ঘৃণা এবং শোষিত, নিপীড়িতদের প্রতি গভীর সহানুভূতি বাংলা কবিতার ইতিহাসে একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছে।

জেনে রাখুন

শশিভূষণ দাশগুপ্ত যতীন্দ্রনাথের রোমান্টিক-বিরোধিতা এবং ধর্ম-বিরোধিতা সম্বন্ধে বলেছেন —

" সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণের একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত আছে — 'ইষুরিব দীর্ঘদীর্ঘীকৃতঃ' — সজোরে বাণ ছুঁড়িলে তাহা যেমন একই গতিবেগে চর্ম ভেদ করিয়া ক্রমগভীরে গিয়া আঘাত হানে, তেমনই যতীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও যে মনোবৃত্তির তীক্ষ্ণতা রোমান্টিকতার পাতলা ঝিল্‌মিল্‌ আবরণ ভেদ করিয়াছে, তাহা তাহার সহজ গতিপথেই ধর্মবোধের গভীর মর্মমূলেও গিয়া অতি স্বাভাবিক ভাবেই আঘাত হানিয়াছে।" (যতীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাঙলা কবিতার প্রথম পর্যায়)

এহেন কবি-মানসিকতার প্রকাশ 'অনুপূর্বা'-তে যে কাব্যভাষাকে আশ্রয় করেছে, তাতেও যতীন্দ্রনাথের প্রতিভার স্ফুরণ বিস্ময়কর। কবির বিশিষ্ট তির্যক-ভঙ্গি-সমন্বিত মানসিকতার উপযুক্ত কাব্যভাষা — শব্দ ও অলংকার প্রয়োগে বিশিষ্টতা অনুধাবনযোগ্য। যে স্পর্ধিত স্বাতন্ত্র্য তাঁর কাব্যদর্শনে ধরা পড়ে, কলাকৃতিতে তা অতি প্রত্যক্ষ। যতীন্দ্র-কাব্যের সুযোগ্য সমালোচক শশিভূষণ দাশগুপ্তকে অনুসরণ করে আপনারাও দেখবেন, — "নূতন ধরনের অন্ত্যানুপ্রাস", সংসারের সাধারণ বস্তু ও জীবনযাত্রার মধ্যে খুঁজে পাওয়া "উপমা এবং সমজাতীয় অলংকারের লাগসই ব্যবহার" "অভিজাত তৎসম শব্দের পাশাপাশি আটপৌরে বাংলা শব্দ ব্যবহারের ফলপ্রসূ দুঃসাহসিকতা" — ইত্যাদি নানা গুণের সমাহার (দ্র: — কবি যতীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাঙলা কবিতার প্রথম পর্যায়, ১ম সংস্করণ, পৃ:১৯৩-১৯৫)। যতীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য, তিনি কখনও অকারণ এবং অবান্তর অলংকরণের কোনো শব্দ বা শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করেননি। চিন্তার বলিষ্ঠতা, নিবিড়তা ও গাঢ়তার টানে শব্দগুলো নিজে থেকেই এসেছে, কোথাও কোনো কৃত্রিমতা নেই। ভাষা সম্পর্কে তিনি কখনও শুচিবায়ুগ্রস্ত ছিলেন না। তাই প্রয়োজনে তিনি তৎসম, তদ্ভব, দেশী, বিদেশী এমনকি প্রায় 'স্ল্যাং' শব্দও ব্যবহার করেছেন। জীবনের অতি সাধারণ বস্তু বা বিষয়ের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতাকে পেয়েছেন বলেই হাট-মাঠ-ঘাটে, খেজুর গাছ, মাছধরার জাল, কসাইয়ের দোকান, চামড়ার কারখানা, লোহালক্কড়, ভাড়াটে বাড়ি, বাস্তু, শহরের পাষাণ-পথ ও নর্দমা (ড্রেন) তাঁর কবিতায় অনায়াসে জায়গা করে নিয়েছে। অতি সাধারণ বস্তুরূপকে ও ভাষার আটপৌরে প্রয়োগে যতীন্দ্রনাথের কাব্যভাষা বিশিষ্টতা পেয়েছে। 'হাটে', 'বোশেখীছড়া','কেতকী', 'পথের চাকরি', 'ঘুমের ঘোরে' প্রভৃতি কবিতা তার পরিচয়স্থল।

'চির বৈশাখ' কবিতায় কবি লিখেছেন, —

" শোনো গো বন্ধু , ঐ পশ্চিমে মামুলি মেঘের ডাক, —

দেহ ভেঙ্গে দিল জোলো দুধ আর এই জোলো বৈশাখ।"

এখানে 'মেঘ', 'দুধ', 'বৈশাখ' প্রভৃতি তৎসম ও তদ্ভব শব্দের পাশে একান্ত

আটপৌরে বা লৌকিক শব্দ 'মামুলি', 'জোলো' বেশ মানিয়ে গিয়েছে। একই কুশলতায় কবি বিভিন্ন কবিতায় 'বছুরে', 'বেভুল', 'থোড়ে','গেঁজে ওঠে', 'জিরেন কাট', 'ঘুমিওপ্যাথি','ভবি ভুলবার নয়' ইত্যাদি নানা লৌকিক শব্দ, ক্রিয়াপদ, সাদৃশ্যমূলক শব্দ, ইডিয়ম প্রভৃতির সহজ ব্যবহার করেছেন। এছাড়া তাজ, ফরমাস, মহল প্রভৃতি বিদেশী শব্দ এবং ঝুমঝুম, খরখর, সাঁইসাঁই, ঠোকাঠুকি, থৈ থৈ, গুনগুন, ববম্‌বম্‌ ইত্যাদি ধ্বন্যাত্মক শব্দও তিনি ব্যবহার করেছেন অনায়াসে।

কবির ছন্দ-প্রতিভা অতুলনীয়। মাত্রাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান ছন্দেই তিনি সবচেয়ে বেশি সাবলীল। তবে অক্ষরবৃত্ত বা তানপ্রধান ছন্দেও কবিতা লিখেছেন। কবির নিজের কথাতেই তাঁর কাব্যরচনার পিছনে শ্রমশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। একটি বিশেষ অভিপ্রায় নিয়েই তিনি যে বাংলা কবিতার জগতে পা রেখেছিলেন সেটা আপনারা আগেই জেনেছেন। এখন শশিভূষণ দাশগুপ্তর বয়ানে কবির কাব্যরচনায় শ্রমশীলতার পরিচয় গ্রহণ করুন, —

" যতীন্দ্রনাথের কাব্য-নির্মিতি সর্বদা এই আত্ম-সচেতনতার নীতিকেই অনুসরণ করিয়াছে। তাই শুনিয়াছি , তিনি পাঁচ-সাত দিন বসিয়াও একটি কবিতা রচনা করিয়াছেন। গল্প শুনিয়াছি হাওড়া স্টেশনে বসিয়া একটি কবিতার যে পংক্তি মনে আসিয়াছে , কালীঘাটের বাড়িতে পৌঁছিয়া তাহার দ্বিতীয় পংক্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার কবিতায় তত্ত্ব এবং তর্কের প্রাধান্য অনেকখানি এই পথেই সম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।" (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ: ১৩৭ , ১ম সুপ্রিম সংস্করণ)

আমরা সাধারণত 'ভাবুক কবি' বলতে যা বুঝি যতীন্দ্রনাথ স্বভাবে সে-ধরনের কবি ছিলেন না। একটা ভাব মনে আসার পর তাকে ছন্দ, অলংকার সহযোগে কবিতায় পরিণত করার আগে অনেক ভাবনা-চিন্তা করতেন। ছন্দ, শব্দ-চয়ন ও শব্দ-রচন, অলংকার প্রয়োগ — কোথাও চিরাচরিতের অনুবর্তন করেননি তিনি। তাঁর বক্তব্যকে তিনি সমস্ত রকম ভাবালুতায় পর্যবসিত হওয়া থেকে রক্ষা করতেন। এবং সেটা করতেন সচেতনভাবে। রসানুভূতি চিত্তের যে অবস্থাতেই সাধিত হোক কাব্যের গঠন-প্রক্রিয়ার মধ্যে কবিকে সর্বদাই সচেতন থাকতে হয়, এটাই যতীন্দ্রনাথের মত। তাই তিনি বলেছেন,—

"কল্পনা-সমুত্থ কাব্যে কবিচিত্ত বুদ্ধিদ্বারা মার্জিত ; বিভাব-অনুভাব-উপভাব সম্বন্ধে জাগ্রত; শব্দচয়ন, ছন্দোবন্ধন, অলংকার নির্বাচন, ব্যচ্যার্থবোধ ও ব্যঞ্জনার প্রয়োজন ইহাদের যথাযথ জ্ঞান তাঁহার আছে। এক কথায় কবিচিত্ত তাহার আদর্শ ও কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ।"

(দ্র: — কাব্যপরিমিতি)

কবি এভাবে সজাগ ছিলেন বলেই কি শব্দ ব্যবহার, কি ছন্দপ্রয়োগে তিনি সমকালে হয়ে উঠেছিলেন বিশিষ্ট। আমরা কয়েকটা উদাহরণ এখানে তুলে ধরব আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে।

'ত্রিযামা' কাব্যের 'বনপ্রস্থ' কবিতায় তিনি লিখেছেন, —

" জল কেন হোথা ছলকায়?

বুঝি বাঘে-বাইসনে জল খায়?

সুদূরে তরুণী গারোণীর ডাকে

পথহারা গাভী হামলায়?"

এ-ধরনের রচনাকে কি কেউ স্বভাবকবিতা বলবেন? বরং অনুপ্রাসের ব্যবহার, অন্তমিল এবং শব্দ-সাজুয্য যে যথেষ্ট গভীর অভিনিবেশের ফল তা এখানে স্পষ্ট। কবিহৃদয়ের প্রকৃতিপ্রীতি এখানে যত্নকৃত কলাকৃতির মাধ্যমে প্রকাশিত। 'মরুশিখা' কাব্যের 'খেজুর বাগান' কবিতাতেও খেজুর গাছের দুর্দশা বর্ণনা করতে গিয়ে কবি অপূর্ব পর্ববিভাগের নমুনা দেখিয়েছেন, —

"কামাইয়া নির্মোক —

কত-না যতনে কাটারির হুলে কেটে আঁকে দুটি চোখ।"

অথবা, জীবন-অভিজ্ঞতার অভূতপূর্ব প্রকাশ, —

"মরণে কে হবে সাথী,

প্রেম ও ধর্ম জাগিতে পারে না বারোটার বেশি রাতি।"

এরকম অজস্র উদাহরণ আপনারা খুঁজে পাবেন যতীন্দ্র-কবিতার অঙ্গে অঙ্গে।

এবার আমরা জেনে নেব কবির অলংকার প্রয়োগে নৈপুণ্যের বিষয়ে। অন্যান্য বিষয়ের মতো যতীন্দ্রনাথ অলংকারের প্রয়োগেও কবিমনের বিশেষ প্রবণতা প্রকাশ করেছেন। অমরেন্দ্র গণাই তাঁর 'যতীন্দ্রনাথের কবিকৃতি' গ্রন্থে এর বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তাঁর নির্দেশিত পথে বিচার-বিশ্লেষণ করলে আপনারা দেখবেন যতীন্দ্রনাথের কবিতায় উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, সমাসোক্তি, বিষম, অপ্রস্তুত, নিদর্শনা, ব্যতিরেক প্রভৃতি বিভিন্ন শব্দ ও অর্থালংকারের সমাবেশ। উপমার অসাধারণ প্রয়োগে তিনি পাঠকমনে একটি অপ্রত্যাশিত আঘাত হানেন এবং তারই সুযোগে পাঠক-হৃদয়ে প্রবেশ করেন। আধুনিক পর্যায়ের অন্যান্য কবিদের থেকে তাঁর স্বাতন্ত্র্য সহজেই লক্ষণীয়।

উদাহরণ হিসাবে নীচে কয়েকটি পঙ্‌ক্তির উল্লেখ করা যায় —

১ বজ্র লুকায়ে রাঙা মেঘ হাসে পশ্চিমে আনমনা

রাঙা সন্ধ্যার বারান্দা ধরে রঙিন বারাঙ্গনা। (দুঃখবাদী)

২. সারা রাত ধরে খেজুর গাছের দুই চোখে ঝরে জল। (খেজুরবাগান)

৩. তপ্ত বোশেখে আকাশে বসে কে আগুন-ফোয়ারা হানে?

অদূর অশথে নবপল্লব মাতে সে অগ্নিস্নানে। (চিরবৈশাখ)

৪. কেন ভাই রবি, বিরক্ত করো? তুমি দেখি সব-ওঁচা,

কিরণ-ঝাঁটার হিরণ-কাঠিতে কেন চোখে মারো খোঁচা। (ঘুমের ঘোরে)

এ-ধরনের প্রয়োগকে লক্ষ করে আমরা অবশ্যই এই ইঞ্জিনিয়ার কবির সুর-স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকৃতি দিতে পারি

আত্মসমীক্ষামূলক প্রশ্ন

যতীন্দ্রনাথের শিল্প-নৈপুণ্য সম্বন্ধে আপনার উপলব্ধি ন্যূনতম ১৫০ শব্দের মধ্যে লিখুন।

.....

.....

.....

১.৪ যতীন্দ্র-কবিতার দুঃখবাদ

কুড়ি শতকের সূচনাতে বাংলা কাব্যজগতে তীব্র রবীন্দ্র প্রভাব থাকলেও দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিকত্ব নিয়ে যে কবিদল কিছুটা স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন তাঁদের কাব্যরচনায়, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত তাঁদের মধ্যে অন্যতম। শুধু ' কবিদের পিছনে লাগার' অভিপ্রায়ে কাব্য জগতে এসেও তিনি হয়ে উঠেছিলেন এক জনপ্রিয় কবি। এ-সব কথা আমরা আগেই জেনেছি। এই জনপ্রিয় কবিকেই বর্তমানকালের অ্যাকাডেমিক পাঠক জানে 'দুঃখবাদী কবি' হিসাবে। 'মরীচিকা', 'মরুমায়া', 'মরুশিখা' — যতীন্দ্রনাথের এই তিন কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলোর জন্যই কবিকে এই নামে চিহ্নিত করা সহজ হয়েছে। কিন্তু যতীন্দ্র-কবিতার সঙ্গে বিস্তৃততর পরিচয় হওয়ার পর এ-ধরনের চিহ্নায়ন সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগে। এই সূত্রটি অবলম্বন করে বর্তমানে আমরা যতীন্দ্রনাথের 'দুঃখবাদ' প্রসঙ্গটি আলোচনা করব।

বিভিন্ন সমালোচক বিভিন্ন সময়ে যতীন্দ্রনাথকে 'দুঃখবাদী কবি' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন এবং তার কারণও খুঁজেছেন বিভিন্ন দিক থেকে। কেউ বলেছেন কবির ব্যক্তিগত জীবনের প্রচুর দুঃখজনক ঘটনা এবং ধারাবাহিক অসুস্থতাই যতীন্দ্রনাথের কবিতায় 'দুঃখবাদ' হয়ে দেখা দিয়েছে। কেউ বলেছেন কবির দুঃখবাদের মূলে আছে জড়বাদ স্বীকৃতি (স্মরণীয় পঙ্‌ক্তি — 'চেতনা আমার জড়ে মিশাইলে সব সমাধান পাই')। আবার কেউ বলেছেন রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রানুরাগী কবিসমাজের আনন্দবাদী জীবন দর্শনের প্রতিবাদ হিসাবে এবং কল্লোলের কবিকুলের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে যে মানসিকতা গড়ে উঠেছিল কবির , তাতেই তিনি দুঃখের পরিচ্ছন্ন তত্ত্বরূপ নির্মাণ করেছেন। এই ভিন্ন-ভিন্ন মতাবলম্বী সমালোচকদের মধ্যে মিল আছে শুধু একটি জায়গায়। সেটা এই যে, এঁরা সবাই যতীন্দ্রনাথের প্রথম তিনটি কাব্যগ্রন্থের মধ্যেই কবির তথাকথিত দুঃখবাদকে খুঁজে পেয়েছেন। আর

পরবর্তী 'সায়ম্' (১৯৪০), 'ত্রিযামা' (১৯৪৮), 'নিশান্তিকায়' (১৯৫৭) কবিকে কোনো কোনো সমালোচক রবীন্দ্রানুসারী কবি-সমাজের একজন বলতেও দ্বিধা করেননি।

এবারে দুঃখবাদী যতীন্দ্রনাথকে পাঠকের কাছে তুলে ধরতে সাধারণত সমালোচকেরা যে-সব কবিতা ও কাব্য পঙ্‌ক্তির উল্লেখ করেছেন সেগুলো উল্লেখ করা যেতে পারে। এঁদের আলোচনায় প্রায়ই যে কবিতাগুলো থেকে উদাহরণ হিসাবে উঠে এসেছে বারবার সেগুলো হল 'ঘুমের ঘোরে', 'ডাক-হরকরা', 'বহ্নিস্তুতি' ('মরীচিকা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত), 'খেজুর বাগান', 'দুঃখবাদী', 'লোহার ব্যথা' ('মরুশিখা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত), 'কেতকী', 'শরশয্যায় ভীষ্ম' ('মরুমায়া' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত) ইত্যাদি। এই কবিতাগুলোর কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উল্লেখ করলে সমালোচকেরা দুঃখবাদের কোন্ ছবিটা দেখতে চাইছেন তার একটা স্পষ্ট ধারণা হতে পারে।

১. বন্ধু প্রণাম হই, —

শীতের বাতাসে জমে যায় দেহ — ছেঁড়া কাঁথাখানা কই? (ঘুমের ঘোরে)

২. ওগো, একদিন কেহ পথপার্শ্বে বাতায়ন হতে

ডেকে কথা কও ;

চির আনাগোনা হতে একদিন কোনো ছলে মোরে

ছিনাইয়া লও।

ক্ষণিক বিশ্রামে মোরে দাও বুঝাইয়ে, কত শ্রান্তি

সঞ্চিয়াছে প্রাণে।

আমারে লওয়াও ছুটি ও অনন্ত ছুটাছুটি হতে

ব্যর্থ শূন্য পানে। (ডাক-হরকরা)

৩. শনির আঁখিতে তোমারি দৃষ্টি নিয়মিত জানিয়েছে শ্লেষ ;

অনাবৃষ্টিতে শুষিয়া জৈষ্ঠ্যে, ভাদ্রে ডুবাও দেশ। (বহ্নিস্তুতি)

৪. কণ্ঠে ঠুকিয়া নলি,

খেজুর পাতায় ফাঁস করে ভাঁড় বেঁধে দিল গলাগলি।

সেদিন হইতে খেজুর বাগানে নীরবে অনর্গল

সারারাত ধরে খেজুর গাছের দুই চোখে ঝরে জল। (খেজুর বাগান)

৫. ফল দেখে যার নাহি কাঁদে প্রাণ ঝরা ফুলদল লাগি,

তারা সভাকবি, আমরা বন্ধু, দুঃখবাদী বৈরাগী। (দুঃখবাদী)

৬. ও ভাই কর্মকার —

আমারে পুড়ায়ে পিটানো ছাড়া কি নাহিক কর্ম আর? (লোহার ব্যথা)

৭. আধঘুমে চাহি দেখিনু চমকি — ঝুলিয়ে সর্বনাশী
নিজ অঙ্গের নীলাম্বরীতে কণ্ঠে লাগায়ে ফাঁসি!
কসিয়া কোমর বাঁধা,
অলকগুচ্ছে আধঢাকা মুখ অস্বাভাবিক সাদা। (কেতকী)

এ-ধরনের আরও কয়েকটি কবিতা থেকে উদাহরণ তুলে ধরা যায়। যেমন 'হাটে', 'ভিখারীদেব', 'শিবস্তোত্র', 'অন্ধকার' ইত্যাদি।

যতীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এ-কথা বলা হয় যে, 'মরু' পর্বের পথ দিয়ে তিনি কাব্যজগতে প্রবেশ করেন, তাঁর নিজস্ব মৌলিক কাব্যচিন্তা প্রতিষ্ঠা করেন এবং সমকালে রবীন্দ্র-স্রোতের বিপুল প্রবাহে ভেসে না গিয়ে বিশিষ্ট ভাব ও বাচ্যের প্রয়োগে নিজস্ব ঘরানা তৈরি করে নেন। প্রসঙ্গত 'মরীচিকা' কাব্যের 'ঘুমের ঘোরে' কবিতার কথা আমাদের মনে পড়তে পারে। সমালোচকদের মতে এখানেই সংসার জুড়ে দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার, অসহায়ের কান্না, বিপর্যস্ত সাধারণ মানুষের দুঃখ স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। কবি মানুষের বেদনার দাহকে এড়িয়ে যেতে পারেননি, শুধু অচেতন ঘুমের মধ্যেই তাঁর নিশ্চিন্তি, মৃত্যুই তাঁর বোধ হরণ করতে পারে। তাই অতি সজাগ মনের কবি ঈশ্বরের কাছে সেই অচেতনতার ঘুমঘোর প্রার্থনা করেছেন।

আবার 'ডাক-হরকরা' কবিতায় ডাক-হরকরার স্বগত চিন্তা চলছে। সে ভাবছে, প্রাণ দিয়েও যে সে সবার বোঝা নিয়ে চলেছে, সেটা কীসের জন্য। অবিশ্রান্ত ও বৈচিত্র্যহীন পথ চলায় সে বড় ক্লান্ত। পেণ্ডুলামের অন্তহীন শূন্যতাসর্বস্ব দোলন থেকে মুক্তির পিপাসায় তার চিত্ত আকুল।

'বহ্নিস্তুতি' কবিতায় চির-অতৃপ্ত আগুন তার দাহিকা শক্তি দিয়ে পৃথিবী ধ্বংস করছে। সে প্রলয়াত্মিকা। জগতের সমস্ত দুঃখের কারণ।

'দুঃখবাদী'-তে কবি এক মানবিক দুঃখে আপ্লুত। প্রকৃতির কাছ থেকে পাওয়া সুখ আসলে অর্থহীন। প্রকৃতির আপাত-রঙিন মুখোশ মানুষকে এতই অভিভূত করে যে সবার মনে হয় ওই মুখোশের আড়ালেই আছে সৌন্দর্য ও সত্যের পরম সত্তা। কিন্তু কবির কাছে তা মোহ-সঞ্চারী মিথ্যা মাত্র।

এইভাবে 'খেজুর বাগান', 'লোহার ব্যথা', 'কেতকী', 'হাটে', 'ভিখারীদেব' ইত্যাদি কবিতায় নানাভাবে কবি সমাজের নানা স্তরের দুঃখকথা জানিয়ে তার সমব্যথী হয়েছেন। সেকালে কবিতার প্রচলিত ভাষ্যপাঠের বদলে যতীন্দ্রনাথের এই আঙ্গিক তাঁকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছিল এবং সমালোচকেরাও তাঁকে 'দুঃখবাদী কবি' তকমা দিয়ে একটি আলাদা গাড়িতে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছিলেন।

ঠিক এ-জায়গাতেই আপনাদের জিজ্ঞাসা হতে পারে — যতীন্দ্রনাথ কি প্রকৃতই

মানসিকতার দিক থেকে 'দুঃখবাদী' ছিলেন? এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, বিশ শতকের সূচনায় শুধু ভারতবর্ষ নয়, সমস্ত বিশ্ব জুড়ে জনজীবনে যে সঙ্কট দেখা দিয়েছিল তাতে অবশ্যই মানুষের সাধারণ দুঃখ-কষ্টের মাত্রা বেড়ে গিয়েছিল এবং কবিরাও শুধু আনন্দের মধ্যেই আর থাকতে পারছিলেন না। জীবনযাত্রা জটিল হয়ে পড়ায় জীবনের ব্যর্থতার দিকগুলো প্রকট হয়ে উঠছিল। সুতরাং জগৎ ও জীবন সম্পর্কে নৈরাশ্যবোধে আক্রান্ত হওয়া কবিদের পক্ষে অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। এবং সেই অবস্থাই তাঁদের 'দুঃখবাদী' করে তুলতে পারে। মস্কোর প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স' প্রকাশিত 'ডিকশনারি অফ ফিলোজফি'-তে বলা হয়েছে যে, — " Pessimission is a depression view that events go inevitably from bad to worse and disability in the triump of good and justice."

কিন্তু যতীন্দ্রনাথের মধ্যে কি আমরা মন্দ থেকে অতি মন্দের দিকে যেতে থাকা কোনো 'ডিপ্রেসিভ' দৃষ্টিভঙ্গিই দেখি? তিনি কি নৈরাশ্য ও ব্যর্থতাকেই সর্বাত্মকভাবে মেনে নিয়েছেন, যা তাঁর মধ্যে একটা 'বাদ' বা 'ইজম্'-এর জন্ম দিয়েছে? পরবর্তী আলোচনায় কবির নিজের বক্তব্য এবং তাঁর সমকালীন ও পরবর্তী কবি-সমালোচকদের মন্তব্য বিশ্লেষণ করে আমরা এই 'বাদ' গড়ে ওঠার ব্যাপারটায় আলোকপাত করতে পারি।

প্রথমে দেখা যাক, নিজের কাব্যরচনা সম্পর্কে যতীন্দ্রনাথ কী কী বলছেন। সাহিত্য সৃষ্টির সঙ্গে কবির পরিবারের লোকজনের কোনো যোগাযোগ ছিল না। অর্থাৎ তাঁর বংশে কেউ কোনোদিন সাহিত্য রচনার পথ মাড়াননি। বাল্যবন্ধু ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠিতে তিনি বলেছেন, —

"আমি লিখতে আরম্ভ করেছি বড় বয়সে। সে-সব নীতি ও

ধর্মমূলক কবিতার ভাষা একান্ত আড়ষ্ট, ভঙ্গি কষ্টকল্পিত।"

অতএব বোঝা যাচ্ছে — একেবারে সূচনায় কবি জগৎ ও জীবন সম্পর্কে বিশেষ কোনো দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কবিতা লেখা শুরু করেননি। যে রবীন্দ্র-বিরোধিতা দিয়ে তাঁর কবিতার 'দুঃখবাদী' ইমেজ গড়ে উঠেছে বলে মনে করা হয়, সেই রবীন্দ্র-কবিতা তিনি পড়া শুরু করেন শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হওয়ার এক বছর পর। অর্থাৎ ১৯০৬ সালে। এর আগে তিনি নবীনচন্দ্র সেনকেই বাংলা কবিতার সর্বোত্তম কবি বলে মনে করতেন। ১৯১১ সালে যতীন্দ্রনাথ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে পাশ করে বেরোন।

জেনে রাখুন

যতীন্দ্রনাথের পাঠ্যাভ্যাস সম্বন্ধে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য —

" বন্ধু মিহিরলালের সঙ্গে যতীনের তর্ক বেধেছে। মিহির বলে রবীন্দ্রনাথের মতো কবি বাংলায় জন্মাননি। যতীন উতপ্ত হয়ে জানায়, নবীন সেনের 'কুরুক্ষেত্র' যে পড়েছে সে ও-কথা বলবে না। কিছুদিন পূর্বে আমরা 'কুরুক্ষেত্র' পড়েছিলাম, মাইকেলের সীতা-সরমা অংশ, হেমচন্দ্রের অশোকতরু প্রভৃতি দশবিশটা কবিতাও পড়া ছিল।

বাল্যকালে পিসিমার কাশীরাম দাসের মহাভারতখানি যতীন দেখে লুকিয়ে কয়েকবার শেষ করেছিল। গ্রামের মুচিপাড়া ও কুলোপাড়ায় বারোয়ারি পূজায় কবির গান ও তর্জার লড়াই আমরা শুনেছি। কিন্তু রবিঠাকুরের কবিতা আমরা তখনও পড়িনি, গান দু'দশটা শুনেছি ... একখানি প্রকাণ্ড রবীন্দ্রকাব্য গ্রন্থাবলী নিয়ে ছুটির সময় হরিপুর এলাম। পড়ে দেখে আমরা তো অবাক। হায় নবীন সেন! এই বিদ্যে নিয়ে মিহিরের সঙ্গে তর্ক করা হচ্ছিল। বয়স তখন উনিশ উত্তীর্ণ প্রায়। যতীন বললে ধরিত্রী দ্বিধা হও।" (*ভূমিকা, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত: গদ্য সংকলন*)

আর তার এক বছর আগে তিনি তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মরীচিকা'-র কবিতাগুলো লেখা শুরু করেন। অন্তবর্তী পাঁচ বছরে কবি 'দুঃখবাদী' ইমেজ গড়ে তোলার রসদ সংগ্রহ করতে পারেন, কিন্তু কোথাও কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ আমরা খুঁজে পাই না। আমরা তো 'হোমশিখা' পত্রিকায় প্রকাশিত অজিত দাশ রচিত 'একটি স্মরণীয় দুপুর' রচনাটির সঙ্গে আগেই পরিচিত হয়েছি। সুতরাং 'বস্তুতান্ত্রিক' (meterialistic) কবির 'বিদ্রূপ' করবার ইচ্ছে থেকেই যে 'মরীচিকা', 'মরুমায়া' ইত্যাদির জন্ম সে-কথা আমাদের মেনে নিতে হয়। কোনো ধরনের নৈরাশ্যবাদী মনোভাবে তিনি আক্রান্ত হননি। 'বিদ্রূপ' করার মানসিকতা থেকে কবিতা লিখে কাব্যজগতে যে মর্যাদা তিনি পেয়েছিলেন তাকে ফিরিয়ে দেওয়া আর সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তাই ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, বিদ্রোহ তাঁর অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। যদিও সেটাই তাঁর আসল পরিচয় ছিল না। তাই প্রথম তিনটি কাব্যগ্রন্থে ভিন্নধর্মী রোমান্টিক ভাবনায় আপ্লুত কবিতাও পাওয়া যায়। যেমন, — 'বউ কথা কও', 'বংশীধারী', 'বেহালা', 'নবান্ন', 'নবনিদাঘ' ইত্যাদি। এমনকি যে কবিতাগুলো যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদী মানসিকতার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হিসাবে আলোচিত হয়, তাতেও রোমান্টিক কবিমনের পরিচয় আছে। আপনারা নীচের উদাহরণগুলো লক্ষ করুন, —

১. শান্ত রাত্রি, জ্যোৎস্না শীতল, বনভূমি নিঝ্‌ঝুম। (ঘুমের ঘোরে, প্রথম ঝোঁক)

২. সুনীল আকাশ, স্নিগ্ধ বাতাস, বিমল নদীর জল
গাছে গাছে ফুল, ফুলে ফুলে অলি, সুন্দর ধরাতল। (দুঃখবাদী)

৩. বজ্র লুকায়ে রাঙামেঘ হাসে পশ্চিমে আনমনা
রাঙা সন্ধ্যায় বারান্দা ধরে রঙিন বারাঙ্গনা। (দুঃখবাদী)

৪. শ্যাম-পাতে ঢাকা শ্বেত কিশলয়, তাহে ঢাকা শীতরেণু
শ্রাবণ-সোহাগে যৌবন জাগে, বাজে গন্ধের বেণু। (কেতকী)

যিনি তাঁর চারপাশের পরিবেশের দুঃখকথা লেখার সঙ্গে-সঙ্গে এ-ধরনের রোমাঞ্চ-কথাও লিখতে পারেন, তাঁর 'দুঃখবোধ'কে আর যাই হোক 'বাদ' বা 'ইজম' বলা যায় না। কারণ জগৎ সম্বন্ধে নৈরাশ্যমূলক মনোভাব কবির মনে গড়ে ওঠেনি। তবে মানুষের সার্বিক দুঃখের দিনে তার মনের ব্যথা প্রকাশের যতীন্দ্রীয় পন্থা তখনকার কবিদের কাছে (যাঁরা

রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থেকে দূরে সরে থাকতে চাইছিলেন) এক অভিনব অভিজ্ঞতা। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বলেছেন, "আমাদের তদানীন্তন মনোভাবের সঙ্গে (যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ) চমৎকার মিলে গিয়েছিল"। সেজন্যই অগ্রজ কবিকে সাদরে তাঁরা আহ্বান জানিয়েছিলেন কল্লোলে।

যতীন্দ্রনাথ যে সচেতন স্বভাবের কবি ছিলেন সে-কথা আমরা শশিভূষণ দাশগুপ্তর আলোচনা থেকে জেনেছি। কবি উপলব্ধি করেছিলেন বিশ্বকর্মার সৃষ্টিলোকে আনন্দ ছাড়াও বৈষম্য রয়েছে। এই বৈষম্য মানুষকে দুঃখ দেয়, তাই সেটাই বেশি করে সচেতন কবির মনে আঘাত করেছে বলে আমাদের বিশ্বাস। আর তাই কবি সেই দুঃখগুলোর কাব্যভাষ্য নির্মাণ করেছেন। উপরন্তু কল্লোলীয়দের সমাদর তাঁকে বেশি করে জগতের দুঃখকে প্রকাশ করার প্রেরণা দিয়েছিল। এই সূত্রেই তিনি তাঁর চারদিকে গড়ে তুলেছিলেন দুঃখবোধের নির্মোক।

যতীন্দ্রনাথের দুঃখবোধের বিচারে এখনও সমালোচকেরা এমন একটি প্রসঙ্গের দিকে নজর দেননি যা এই বোধের স্বরূপ নির্ণায়ক হয়ে উঠতে পারে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তই বলেছিলেন, — "দুঃখের মধ্যে কাব্যের যে বিলাস আছে সেই বিলাসে আমরা মশগুল ছিলাম। তাই নৈরাশ্যের দিনে ক্ষণে ক্ষণে আবৃত্তি করতাম 'মরীচিকা'।" পরবর্তী সময়ে জীবেন্দ্র সিংহ রায়ও বলেছেন, — " যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কিছুকাল আগে থেকে দুঃখবিলাসের মহড়া দিচ্ছিলেন।" দুটি মন্তব্যেই , আপনারা লক্ষ করুন, 'দুঃখবিলাস'-এর উল্লেখ রয়েছে। আমাদের প্রশ্ন, 'বিলাস' কি কখনও 'বাদ' হিসাবে পরিচিত হতে পারে? তা-তো সবসময়েই একটা বিশেষ ইচ্ছার বশবর্তী (যাকে বলা চলে হুজুগ)। যতীন্দ্রনাথের কবিতায় দুঃখবোধ কবিমনের 'বিলাস' বলেই তা আর 'দুঃখবাদ' নয়। সেটা তাঁর কাব্যচেতনার অঙ্গ এবং এই চেতনার প্রতি আস্থা ছিল বলেই ধারাবাহিকভাবে প্রথম তিনটি কাব্যগ্রন্থে ওই বোধযুক্ত কবিতা লিখে গিয়েছেন তিনি।

শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের প্রতি সহমর্মিতায় যতীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'লোহার ব্যথা' কবিতাটি। সেখানে লোহা যেন কর্মকারকে বলছে (বা ধরা যায় মানুষ বলছে স্রষ্টা ভগবানকে) —

" কহ গো বন্ধু কহ মানে মানে, আপনার প্রাণে বুঝি,
আমি না থাকিলে মারা যেত নাকি তোমার দিনের রুজি?"

এই যে লোহার মানবায়ন ঘটিয়ে কল্পনায় গড়ে তোলা কথোপকথন তার জন্ম রোমান্টিক দুঃখবিলাসে। লোহাকে পিটিয়েই কর্মকারকে নানা জিনিস তৈরি করতে হয়, সমাজের মঙ্গলামঙ্গলের সঙ্গে যার যোগ নিবিড়। একে স্বীকার করেও তো লোহা (পক্ষান্তরে মানুষ) নিজের নব নব রূপে প্রকাশকে সার্থক বলে মনে করতে পারে। তাছাড়া লোহা ও কর্মকারের পারস্পরিক সম্পর্ক স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং সেখানে কোনো এক পক্ষের 'দুঃখ' খোঁজা অপ্রয়োজনীয়। এভাবে পক্ষ-প্রতিপক্ষ সৃষ্টি করে 'দুঃখবোধ' বিচারকেই আমরা 'কাব্যবিলাস' বলতে চাই। ঠিক এ-ভাবেই 'খেজুরগাছ', 'কচিডাব', 'ডাক-হরকরা', 'হাটে',

'ভিখারীদেব' প্রভৃতি কবিতায় কবি সাধারণের দুঃখকে উপলব্ধি করেছেন এবং সেটা পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। আমরা এখানে কয়েকটি উদাহরণ দিতে পারি,—

১. রসালের গালে গড়ালো অশ্রু
আজও দাগ দেখা যায়।
কঠিন বেদানা বুকে টোল খেলো
না-জানি কি বেদনায়! (হাটে)

২. কণ্ঠে ঠুকিয়া নলি,
খেজুর পাতায় ফাঁস করে ভাঁড় বেঁধে দিল গলাগলি
সেদিন হইতে খেজুর বাগানে নীরবে অনর্গল
সারারাত ধরে খেজুর গাছের দুই চোখে ঝরে জল। (খেজুর বাগান)

৩. ফল দেখে যার নাহি কাঁদে প্রাণ ঝরা ফুলদল লাগি,
তারা সভাকবি, আমরা বন্ধু, দুঃখবাদী বৈরাগী। (দুঃখবাদী)

আমের শরীর বেয়ে রস পড়ে যে দাগ তৈরি হয় তা যদি শুকিয়ে যাওয়া চোখের জল বলে কল্পনা করি, খেজুরের রসকে যদি তার চোখের জল বলে ভাবি বা ফুল ঝরে গিয়ে যে ফলের সৃষ্টি তাতে ফুলটার জন্য যদি ভীষণ কষ্ট অনুভব করি তাহলে সেই দুঃখবোধকে অস্বীকার করতেই হয় — কারণ তা একান্তই রোমান্টিক, বাস্তব নয়। সেটা তাহলে যথার্থই 'দুঃখবিলাস'। যথার্থ দুঃখবাদী হলে আরও গভীরতর দুঃখময় জীবনবোধ শুধু প্রথম তিনটি কাব্যগ্রন্থেই নয়, কবির শেষ পর্যায়ের কাব্যেও থাকত। ভাবনার পরিবর্তন হলেও পূর্ববর্তী ধারণার ন্যূনতম চিহ্ন তো থাকতই। অতএব আমরা তথাকথিত যতীন্দ্রনাথের 'দুঃখবাদী' চিন্তাধারাকে অবলম্বন করে আর তাঁকে যথার্থ দুঃখবাদী বলতে পারছি না। বরং ড° অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যই আমাদের অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে হচ্ছে। তিনি বলেছিলেন, —

"অনেক সময় নিছক দুঃখবাদ তাঁর সমগ্র সত্তার
সঙ্গে মিলিয়ে যায়নি ... কবিও দুঃখবাদের
মুখোশের দ্বারা নিজ স্বভাবসিদ্ধ কবিধর্মকে
পুরোপুরি আড়াল করতে পারেননি ... । অতএব
যতীন্দ্রনাথকে বিশুদ্ধ দুঃখবাদী বলা যায় না।"

কবিরা মাঝে-মাঝে সমালোচকদের অভিনব চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিজেদের সম্পর্কে কিছু অদ্ভুত কথা স্বীকার করে নেন। কিন্তু সে-কথা সর্বদা ও সর্বথা সত্য নয়। যতীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও একই কথা খাটে। তিনি নিজেই নিজেকে দুঃখবাদী বলে স্বীকার করেছেন। লক্ষ করুন এই মন্তব্যগুলো —

১. আমার কাব্যের দুঃখবাদ পারিবারিক জীবনের দুঃখ হইতে উদ্ভুত নহে।

২. বাল্যের ম্যালেরিয়াই কুইনাইন দ্বারা অবদমিত হয়ে পরিণত বয়সে কাব্যরূপ গ্রহণ করেছে।

তবু আমরা দেখি যতীন্দ্রনাথের কাব্যের সর্বত্র প্রবল জীবনাকাঙ্ক্ষা, জীবনরস, সৌন্দর্যচেতনা, মানবপ্রেম ও আশাবাদ ধ্বনিত। যতীন্দ্র-কাব্যের গভীরে প্রবেশ করলে এ-সত্য স্বতঃস্বীকার্য হয়ে পড়ে।

আত্মসমীক্ষামূলক প্রশ্ন

যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদের স্বরূপ সম্বন্ধে মূল কথাগুলো লিপিবদ্ধ করুন ন্যূনতম ১০০ শব্দের মধ্যে।

.....

.....

.....

.....

১.৫ ঈশ্বর-চেতনা ও যতীন্দ্রনাথ

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মরীচিকা'র প্রথম কবিতা 'বহ্নিস্তুতি'। এই কবিতাতেই কবি-চিন্তার নিজস্ব দেব-প্রতিষ্ঠা , —

" মিলন বিরহ ভাব ও অভাব যোগ-বিয়োগের কাজ
থেমে গিয়ে যবে এ বিশ্ব হবে ভস্মের মহাতাজ,
বিভূতিভূষণ শঙ্কর একা রহিবেন সেই কালে।"

দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'মরুশিখা'র প্রথম কবিতা 'শিবস্তোত্র'। সেখানে তিনি লেখেন,—

" সুখের দেবতা মরে যুগে যুগে তুমি চির দুঃখময়
সুখ বাঁচে মরে দুঃখে অমর,— তুমি মৃত্যুঞ্জয়।"

এছাড়া প্রায় সর্বত্রই যতীন্দ্রনাথের কবিতায় আরাধ্য দেবতা শঙ্করের উল্লেখ।

কবির দেবদর্শন এবং কাব্যদর্শন মূলত একই মনোভূমি থেকে উৎসারিত। বস্তু-পৃথিবী, মানব-জীবন, হৃদয়ানুভূতি সম্পর্কে কবি যেমন কঠিন নিরলঙ্কৃত সত্য ধারণাকে কবিতার অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেছেন, দেবতাকেও তেমনি প্রচলিত আনন্দস্বরূপ স্রষ্টার আসন থেকে নামিয়ে সাধারণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কাব্যের জগতে সুন্দর এবং মধুরের একাধিপত্য কবি স্বীকার করেননি। দেব-কল্পনাতে স্বয়ং রবীন্দ্রভাবনা

স্বীকৃত নটরাজের নৃত্য-ছন্দ কবিকে মুগ্ধ করেনি। তাঁর দেবতা রুদ্ররসে প্রলয়ংকর। অথবা কখনও তিনি গ্রাম্য-শিবের মনুষ্য-মূর্তি এঁকে গাজনের গান গেয়ে উঠেছেন। সরাসরি সুখ ও অমৃতময় অমর্ত্য-লোক থেকে দেবতা দুঃখময় কঠিন মর্ত্যলোকে নেমে এসেছেন, অনন্ত সৌন্দর্য-ভাবনার একেবারে বিপরীত কোটিতে।

যতীন্দ্রনাথ কাব্যজীবনের সূচনা থেকেই রুদ্রের উপাসক। রুদ্রের বহ্নিজ্বালাকে দেখেছেন বলেই 'বহ্নিস্তুতি' দিয়েই কাব্যজীবনের শুভ-সূচনা হয়েছে , —

" শিখায় শিখায় হেরি তব রূপ, রূপে রূপে তব শিখা,

তৃষিত মরুর নীরস অধরে তুমি ধরো মরীচিকা।"

কবি যতীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল, দুঃখের বহ্নিজ্বালাই সমস্ত সত্তার আদি সূত্র। তিনি নটরাজ শিবের 'দক্ষিণ মুখটি' কখনই দেখতে পাননি। নটরাজকে দেখেছেন শীতের সন্ধ্যায় কলকাতার কোনো অখ্যাত গলিতে এক অশ্রুসজল, অস্থিচর্মসার, দরিদ্র বৃদ্ধ ডাবওয়ালার চেহারায়। অঘ্রাণের শীতের সন্ধ্যায় কচি ডাব মাথায় নিয়ে অস্থিচর্মসার এই বুড়ো লোকটি এসে দাঁড়িয়েছিল কবির দরজায়,যাকে দেখে কবির মনে হয়েছিল হাড়ের মালা পরা ভিখারি শিব। তার কপালের ঘামবিন্দুতে ছিল গঙ্গার প্রবাহ, তার রুক্ষ ধূসর দেহে ছিল বিভূতির ভূষণ ; মানুষের মধ্যে এই যে ক্ষুধাক্লিষ্ট, দুঃখজর্জর অথচ অভিজাত ভিখারি — এই-ই তো দুঃখের রাজা — এই-ইতো নটরাজ শঙ্কর। তার বর্ণনা কবির ভাষায়, —

"শীতাতপে দিগম্বর , দিশাহীন পথচর,

দেহ টলে ক্ষুধার নেশায় ;

অন্তর-শ্মশানে চিতা সারি সারি নির্বাপিতা,

তাহারই বিভূতি ফুটে গায়।

সর্বাঙ্গে হাড়ের মালা, শিরায় ফণীর জ্বালা,

গণ্ডে ঝরে জাহ্নবী উতলা।

কৃষ্ণা চতুর্দশী শেষে তোমারি ললাটে এসে

অস্ত গেছে শেষ শশিকলা।" (কচিডাব, সায়ম্)

শঙ্করের রূপ বর্ণনায় যতীন্দ্রনাথ একেবারে নিজস্ব চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন। শ্মশানচারী ভিখারি শীর্ণ বৃদ্ধ এই শিব। 'কচিডাবে' যাঁকে পাওয়া গেল। বৈদিক শিবের অবিনাশী শক্তিধর মহাদেবের সঙ্গে এঁর পার্থক্য অনেক। সত্যম-শিবম্-সুন্দরম মন্ত্রে শিবের সঙ্গে যে কল্যাণবোধ অচ্ছেদ্য, তার সঙ্গেও এঁর মিল নেই। কবি তাত্ত্বিকতা ও দর্শনের বিরোধিতা করে নিজস্ব দেব-ভাবনাকে কাব্যে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

মনে-প্রাণে যতীন্দ্রনাথ পীড়িত অসহায় মানুষের দুঃখে সমব্যথী মানুষ ছিলেন।

ঈশ্বরের কৃপায় হঠাৎ সংসার সুখ-সাগরে পরিণত হবে একথা তিনি বিশ্বাস করতেন না। জোর দিয়ে তাঁর এই বক্তব্যকে প্রকাশ করার জন্যই কবি বলেছেন দেবতাও অসহায়। মানব-দরদী অসহায় এই দেবতাই শিব। বরং মধ্যযুগের বাঙালি-কাব্য-কল্পনার শিব কবিকে আকর্ষণ করেছে। যে শিব দরিদ্র এবং রোজ পারিবারিক কলহে বিব্রত তাঁকেই কবি পৃথিবীর দেবতা রূপে আহ্বান করেছেন। তিনি বসুন্ধরাকে উর্বর করে তুলবেন, ক্ষুধার্ত মানুষের অন্ন-সংস্থান হবে, —

" হাতের ত্রিশূল হাঁটুতে ভাঙিয়া
প্রলয়শালায় পিটিয়া রাঙিয়া
গড়ে নাও ফাল হয়েছে সকাল
ধরো লাঙলের মুঠ।"

মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের দেবখণ্ডের শিব সাধারণ গৃহস্থ মানুষ। এমনকি চারিত্রিক দুর্বলতার স্পর্শেও তিনি জীবন্ত। এই মানুষ-শিবের অসহায়ত্ব কবির কাব্যে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

যতীন্দ্রনাথ কখনও তীব্র আঘাতে সীমাবদ্ধ দেবশক্তিকে আহত করেছেন। আবার কখনও বিদ্রূপের কশাঘাতে দেবতার প্রচলিত মাহাত্ম্যকে ধূলিস্যাৎ করে দিয়েছেন। কিন্তু এত বেশি অবিশ্বাস মনের মধ্যে রেখেও যতীন্দ্রনাথ বারবারই শিবের নাম নিয়েছেন। ডেকেছেন 'বন্ধু' বলে। সত্যের মর্যাদায় যথার্থ শক্তির পরিচয়ে এই বন্ধুকে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন। তাঁর দেবতা শঙ্কর কখনও নিষ্ঠুর বেশে রুদ্র এবং কখনও বা সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি — ভিখারি বৃদ্ধের মূর্তিতে উপস্থিত । 'বহ্নিস্তুতি', 'শিবস্তোত্র', 'কচিডাব', 'ঘুমের ঘোরে' প্রভৃতি বহু উল্লেখযোগ্য কবিতায় দেবতা শঙ্করকে কবি নিজস্ব ধারণায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অন্য কবিতায় অসম্বদ্ধ ভাবে যে দুঃখের বাণী কবির লেখায় অনবরত ফুটে উঠেছে সত্যদর্শন ও বাস্তববোধের চিহ্ন হিসাবে — ঠিক তারই অন্য রূপ অত্যন্ত সুসম্বদ্ধ চিন্তায় সুস্পষ্ট চেহারায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর দেব-কল্পনায়।

কবি আরও পরিণত বয়সে পরশুরামের কুঠারাঘাতে অবাস্তবের জীর্ণ দেহ ছিন্ন করে যেন কিছুটা শান্ত। কোমল মধুরকে তার বহু কবিতায় তখন আহ্বান জানিয়েছেন। দেবতার অসহায়তা নিয়ে তীব্র বিদ্রূপের দিন শেষ হয়েছে। তাই 'সায়ম্', 'ত্রিযামা', 'নিশান্তিকা' কাব্যগ্রন্থগুলোতে ঈশ্বরবোধে মৌলিক পরিবর্তন এসেছে। এখানে কবি মধুর বেদনায় নতুন করে বন্ধুকে চিনে নিতে চেয়েছেন। মৃত্যুর সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে এই দেবতার চরম আগমন কবিকে চিন্তার জড়ত্ব থেকে মুক্তি দেবার জন্য। আসন্ন প্রায় জড়ত্বে শেষ চেতনা সঞ্চার করার জন্য, সারা জীবনের 'ঘুমিওপ্যাথী' থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য কবির চিত্তে পদসঞ্চার সেই দেবতার। অন্তিম উপলব্ধিতে কবি নিজেকে লক্ষ্য করে বলছেন, —

" যে বোঝা বহনাতীত সেই বোঝা মাথে তার
তোরই জ্বালা সহিতে তোরই বোঝা বহিতে

এতদিনে অবসর পেল সে।" (ভোর হয়ে এল, নিশান্তিকা)

এই ঈশ্বর-চেতনা কোনো নৈরাশ্যবাদীর নয়। এটা রোমান্টিক কবির ঈশ্বর-চেতনা।

জেনে রাখুন

রবীন্দ্রনাথের নটরাজ রুদ্র দেবতার রূপান্তর নয়, তাঁর স্বকীয় ভাবভাবনার প্রতিরূপ। নিসর্গ সৌন্দর্যের গভীরতম অনুভূতিই রবীন্দ্রনাথকে অরূপের উপলব্ধিতে সাহায্য করেছিল। এই অরূপচেতনাই তাঁর নটরাজ-ভাবনার জনক। অখণ্ড উপলব্ধির ক্ষেত্রে শান্তম্, শিবম্, অদ্বৈতম্‌কে তিনি বারবার স্মরণ করেছেন। রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে শিব সামগ্রিক জীবনদৃষ্টির ব্যঞ্জনাবাহী। তিনি নটরাজের নৃত্যলীলায় সৃষ্টি রহস্য আবিষ্কার করেছেন — সেই নৃত্যের তালে তালে দেখেছেন জন্ম মৃত্যু। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের রুদ্র শুধুমাত্র মানুষ নন — বিশ্বজীবনের মূল রহস্যের আধার। সেইসঙ্গে আছে বাস্তব যুগচেতনা—

"রুদ্র তোমার দারুণ দীপ্তি
এসেছে দুয়ার ভেদিয়া ;
বক্ষে বেজেছে বিদ্যুৎ বাণ
স্বপ্নের জাল ছেদিয়া।" (সুপ্রভাত)

যতীন্দ্র-কাব্যে সৌন্দর্য-মুগ্ধতার মধ্য দিয়ে শঙ্কর আসেননি এবং রবীন্দ্রনাথের মুক্তিতত্ত্বও তাঁর কাব্যে নেই।

১.৬ 'অনুপূর্বা'-য় কবির বন্ধু

প্রকাশিত ছয়টি কাব্যগ্রন্থের অনেকগুলো কবিতাতেই যতীন্দ্রনাথ বন্ধু সম্বোধন করেছেন। এর মধ্যে 'অনুপূর্বা'-য় যে কবিতাগুলো সংকলিত হয়েছে তার একটা তালিকা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই কবিতাগুলো হল 'ঘুমের ঘোরে', 'নবান্ন', 'দুঃখবাদী', 'ভক্তির ভারে', 'লোহার ব্যথা', 'মন্ত্রহীন', 'চিরবৈশাখ', 'মুক্তিঘুম', 'কেতকী', 'ছাতার কথা' , 'নবপন্থা', 'ভাড়াটিয়া বাড়ি', 'কবির কাব্য', '২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮' ইত্যাদি। আগের প্রসঙ্গে যতীন্দ্রনাথের ঐশ্বরিক ভাবনা-চিন্তা সম্বন্ধে যে আলোচনা আমরা করেছি, তারই অন্তরঙ্গ উপস্থাপনা এই 'বন্ধু' ডাকে। তবে বন্ধু সম্বোধন যুক্ত সব কবিতাই ঈশ্বর কেন্দ্রিক নয়। 'ঘুমের ঘোরে', 'নবান্ন', 'ভক্তির ভারে', 'কেতকী' ইত্যাদি কবিতায় কখনও স্পষ্ট আবার কখনও পরোক্ষে কবির লক্ষ্য ঈশ্বর। কিছু কবিতায় প্রকৃতি, কয়েকটিতে নিজের দ্বিতীয় সত্তা আর কয়েকটি কবিতায় বন্ধু ডাকের লক্ষ্য রবীন্দ্রনাথ।

প্রসঙ্গত বলা যায়, যতীন্দ্রনাথের 'বন্ধু' ডাকের মধ্যে যে আকুলতা, অন্তরঙ্গতা, আত্মীয়তা, নিজেকে নিঃশেষ সমর্পণের যে ব্যঞ্জনা রয়েছে তা এসেছে প্রাথমিকভাবে রবীন্দ্র-কবিতাকে অনুসরণ করে। যতীন্দ্রনাথের 'বন্ধু'র সাক্ষাৎ প্রথম পাওয়া যায় 'ঘুমের ঘোরে' কবিতায়। তার আগেই রচিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের উৎসর্গ কাব্যের ৩১ নং

কবিতাটি। সেটাকেই সমালোচক যতীন্দ্রনাথের 'বন্ধু' ডাকের প্রথম অনুপ্রেরণা বলেছেন (দ্র: — কবি যতীন্দ্রনাথ : কবিমানস ও কবিতা— বারীন্দ্র বসু পৃ: ৫৬)। রবীন্দ্রনাথের কবিতার পঙ্‌ক্তি লক্ষ করুন —

" আজিকে আমরা কাঁদিয়া শুধাই সঘনে, ওগো,

আমরা খাঁচার পাখি —

হৃদয় বন্ধু , শুন গো বন্ধু মোর

আজি কি আসিল প্রলয় রাত্রি ঘোর।"

রবীন্দ্রনাথকে আমরা দেখেছি 'গীতাঞ্জলি' পর্বে তাঁর প্রভুকে 'বন্ধু' সম্বোধন করতে। নীচের উদাহরণগুলো লক্ষ করুন , —

১. দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু
পরকে করিলে ভাই। (৩ নং কবিতা)

২. আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণ সখা বন্ধু হে আমার। (২০ নং কবিতা)

৩. হে বন্ধু মোর, হে অন্তরতম। (৭৯ নং কবিতা)

যতীন্দ্রনাথও এভাবে 'ঘুমের ঘোরে', 'নবান্ন', 'ভক্তির ভারে' প্রভৃতি কবিতায় তাঁর দেবতাকে সম্বোধন করেছেন , —

১. তোমাতে আমাতে বহুদিন হতে হয়নিকো কোনো কথা
ইদানি, বন্ধু, পাঁজরে একটা ধরেছে নূতন ব্যথা! ('ঘুমের ঘোরে', পঞ্চম ঝোঁক)

২. বন্ধু, বহুকাল পরে এসেছি দুয়ারে পরমভক্তবৎ,
ত্রিসন্ধ্যা জপি গায়ত্রী আর নাকে কানে দিই খৎ (ভক্তির ভারে)

'ভাড়াটিয়া বাড়ি' কবিতায় বাড়িটিকেই কবি 'বন্ধু' সম্বোধন করেছেন, 'লোহার ব্যথা' কবিতায় লোহাকে দিয়ে কর্মকারকে 'বন্ধু' সম্বোধন করিয়েছেন, আবার 'কেতকী' কবিতায় যতীন্দ্রমোহন বাগচী (কেয়াফুল কবিতার রচনাকার) হয়েছেন কবির বন্ধু। 'কবির কাব্য' কবিতায় যতীন্দ্রনাথ নিজের দ্বিতীয় সত্তাকে বন্ধু সম্বোধন করেছেন , —

" সন্দেহ হয় পেয়েছ বন্ধু , কবির কু-অভ্যাস , —
যত দুঃখ পাও মিঠে সুরে গাও দুঃখেরই ইতিহাস ;
কবির সে দুখগান,
শুনি দুটি কানে যিনি প্রাণে প্রাণে যত বেশি সুখ পান
তিনি তত অনুরক্ত রসিক ভক্ত সমজ্‌দার।"

'নবপন্থা' কবিতাটিও এভাবে নিজের সামনে নিজেকে দাঁড় করিয়েই লেখা। অবশ্য

এখানে এমন পঙ্‌ক্তিও আছে যা পড়ে মনে হয় এই 'বন্ধু' স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। আপনারা পঙ্‌ক্তির কথাগুলো লক্ষ করুন , —

" পথটা হচ্ছে এই ;

গলা ছেড়ে শুধু তোমারে বন্ধু বেপরোয়া গালি দেই।

অল্পদিনের পরীক্ষা হতে লভেছি এমনই ফল,

এই পন্থায় জন্মেছে মোর আস্থা অচঞ্চল !

বন্ধু গো তব হেন সুশাসন, যখনই তোমায় দূষি,

জিভ কেটে কানে হাত দেয় বটে, মনে মনে সব খুশি !"

রবীন্দ্রনাথকে প্রত্যক্ষভাবে 'বন্ধু' সম্বোধন যতীন্দ্রনাথের অন্য কবিতায় অবশ্য দেখা যায়। যেমন 'বাইশে শ্রাবণ, ১৩৪৮ ' কবিতাটি। এখানে অনন্ত পথযাত্রী রবীন্দ্রনাথকে কবি নিজের শেষ শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করছেন , —

" আমি বলতে এসেছিলাম , —

হৃদয়বন্ধু , শোনো গো বন্ধু মোর —

কিন্তু তুমি তখন আমার কথার বাইরে চলে গেছ।"

আত্মসমীক্ষামূলক প্রশ্ন

'বন্ধু' সম্বোধনকে কেন্দ্র করে ন্যূনতম ১০০ শব্দে রবীন্দ্রনাথ ও যতীন্দ্রনাথের সম্পর্কটি স্পষ্ট করুন।

.....

.....

.....

যাইহোক, আমরা জেনেছি 'ঘুমের ঘোরে' যতীন্দ্রনাথের রচিত প্রথম কবিতা যেখানে তিনি 'বন্ধু' সম্বোধন করছেন। এখানে ঈশ্বর তাঁর এমনই একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু যাঁর কর্তব্যের ত্রুটি এবং সৃষ্টির স্খলন তিনি সোজাসুজি বলতে পারেন। এখানেই সেই বন্ধুকে তীব্র বিদ্রূপ করে কবি বলছেন, বন্ধু আমাদের প্রাণের দুঃখ দূর করতে না পারলেও, দুঃখের প্রাণের মৃত্যু পথযাত্রাকে তিনি অবাধ করে দিতে পারেন ,—

" ঘুমের আড়ালে এলে তুমি ধীরে কহিলে হরিয়া জ্ঞান

প্রাণের দুঃখ না যাক, কিন্তু যাবে দুঃখের প্রাণ।"

কবির এই ঈশ্বর এমনই এক স্রষ্টা, যিনি এই জগৎকে কোনোভাবে নিয়ন্ত্রিত

করতে পারেন না। সৃষ্টির পর নিষ্ক্রিয় দ্রষ্টা হয়ে থাকেন তিনি , —

"থাক বা না থাক স্রষ্টা —

নিখিল বিশ্ব ঘুরে ঘুরে মরে, তুমি তার চির দ্রষ্টা।"

শুধু 'বন্ধু' বলে ডেকেই কবির তৃপ্তি হয় না। যখন তিনি শুধুমাত্র বন্ধুত্বের স্তর থেকে আরও গভীর অনুভূতির দিকে চলে যান তখনই যেন তাঁর পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটে, —

" 'বন্ধু' , আমার হৃদয়বন্ধু , তবু তোমা ভালবাসি ;

স্বপ্নবিহীন ঘুমের আড়ালে তুমি দেখা দাও আসি।' (প্রথম ঝোঁক)

'অনুপূর্বা'-র অন্তর্গত 'মরুশিখা'র কবিতাগুলোতে বন্ধুর কাছে কবির অভিযোগ অনেক বেশি তীব্র এবং অকপট। এখন শুধু প্রিয়জনের অভিযোগ বা অভিমান নয় প্রকৃত প্রতিবাদীর অভিযোগই ধ্বনিত হয়েছে কবিতাগুলোয়। 'ভক্তির ভারে' কবিতার প্রথম দুই স্তবকে ঈশ্বরকেই 'বন্ধু' নামে নামে অভিহিত করে কবি সুতীব্র দোষারোপ করেছেন। প্রকৃত সত্যকে কপটতার আবরণে ঢেকে যে ওই বন্ধুর মিথ্যা তোষামোদকারী না হতে পারে তার উপরই বন্ধুর যত পীড়ন , —

"কণ্ঠ চাপিয়া ক্ষুদ্রের 'পরে হানিছ রুদ্ররোষ,

ঘাড়ে ধরে মোরে প্রেমিক করেছ , এতবড় আক্রোশ !"

বর্তমান পৃথিবীতে বৈষম্য এতটাই বেশি যে ঈশ্বর প্রেমের অন্য নাম ঈশ্বরের বশ্যতা স্বীকার , —

"প্রেম-মন্দিরে তাহারই বিপদ যে জন দাঁড়াবে সোজা,

শিরদাঁড়া ভাঙা যত কোল কুঁজো ঘাড়গুঁজোদেরই মজা।"

সমালোচক বলেছেন, এই পঙ্‌ক্তির লক্ষ্য হচ্ছেন রাষ্ট্রনায়কেরা। সেটা না হলেও, ঈশ্বরের প্রতি এখানে শ্লেষ, বিদ্রূপ যে চূড়ান্ত তা স্পষ্ট। পরবর্তী 'দুঃখবাদী', 'নবপন্থা', 'কবির-কাব্য' ইত্যাদি কবিতাতেও বারবার বন্ধুর উল্লেখ কখনও সম্বোধনে, কখনও বর্ণনায়। এই যে অভিযোগ, বিদ্রূপ, শ্লেষ 'অনুপূর্বা'-র বিভিন্ন কবিতায় ছড়িয়ে আছে সেটা দেখে আমাদের মনে একটি বিশেষ উপলব্ধির জন্ম হয়। সেটা এই যে, কবির হৃদয়ে মানুষের আকাঙ্ক্ষিত মঙ্গলময় ঈশ্বর-বন্ধুর সম্পর্কে এক সুগভীর প্রত্যয় রয়েছে। রয়েছে বলেই এত প্রতিবাদ, এত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের আধিক্য। বিশেষ করে যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক চেতনাসম্পন্ন ইঞ্জিনিয়ার কবির পক্ষে এই ঈশ্বরচেতনা অন্তরে লালন করা অসম্ভব — ঈশ্বরের উপস্থিতিই তো আধুনিকেরা স্বীকার করেন না। তাঁকেই আবার 'বন্ধু' সম্বোধনে অন্তরের ক্ষোভ উজাড় করে দেওয়া — এটা কবির নৈরাশ্যচেতনার বিপরীত ছবিই প্রকাশ করে। সুতরাং ঈশ্বর সম্বন্ধে গভীর প্রত্যয় কবির ছিল। তাই অনুপূর্বার অন্তর্গত পরবর্তী 'সায়ম', 'নিশান্তিকা' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থের কবিতায় বন্ধুকে প্রিয়তম রূপে অনুভব করার সুগভীর আকূতি ফুটে উঠতে দেখা যায়। 'ত্রিযামা'-র 'নির্বাসন' কবিতাটা লক্ষ করুন —

"মিলন-মলিন ধূলিতলহীন
ক্লান্ত এ ভালবাসায়, বন্ধু,
বাঁচাও নিবিড় সজল-মেদুর
নববিরহের আশায়, বন্ধু!"

বা 'চিরবৈশাখ' (অনুপূর্বা, সায়ম্) কবিতার এই পঙ্‌ক্তিগুলো, —

"বন্ধু , হাসিছ তুমি , —
ভালোবাসা যদি ফিরে দেয় তবে কিসের সে মরুভূমি?
খুব খাঁটি কথা, গাহি তবে আমি — আনন্দ, কি আনন্দ,"

যাইহোক, এই বন্ধু ডাকের মধ্যে শেষপর্যন্ত কবির মানবিকতা, জীবনার্তি ও রোমান্টিক প্রেমচেতনাই প্রধান হয়ে উঠেছে। 'বন্ধু' সম্বোধনকে কবি সামগ্রিকভাবে একটি কাব্যশৈলীতে পরিণত করেছেন। বন্ধু হিসাবে ডেকেই তিনি জগতের সমস্ত বৈষম্য, প্রবঞ্চনা, বৈপরীত্যের কথা জগৎ-স্রষ্টাকে জানিয়েছেন।

১.৭. আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর 'অনুপূর্বা' কাব্যসংকলনের আলোচনা করতে গিয়ে আমরা বর্তমান বিভাগে বিশেষ কয়েকটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছি। আমরা দেখেছি যতীন্দ্রনাথকে নিয়ে সমালোচকেরা দ্বিধাবিভক্ত। কেউ কেউ বলেছিলেন, কবি জড়বাদী, নৈরাশ্যবাদী — বিষণ্ণতার বাতায়ন থেকে জীবন ও ঈশ্বরচেতনাকে লক্ষ করেছেন। আবার অনেকেই বলেছেন, এটা তাঁর নির্মোক মাত্র। সমকালীন রোমান্টিক কবিদের ভাবালুতাকে বিদ্রূপ করতেই তাঁর কবিতারচনা শুরু, তিনি 'রোমান্টিক বিলাসে' আচ্ছন্ন হয়েই এ-কাজ করেছেন। আসল প্রত্যয় তাঁর রোমান্টিকতাতেই। তাঁর শেষ দিকের কাব্যই তার সাক্ষ্য-প্রমাণ দেয়। তবুও তাঁর দুঃখবাদ, প্রতিবাদ, বিদ্রূপ-প্রবণতা ইত্যাদি বিষয়গুলো আমরা এখানে বিশ্লেষণ করেছি প্রচলিত ধারণাকে সামনে রেখেই। সেইসঙ্গে এই বিভাগে কবির ভাষাবোধ, শৈলী, শব্দপ্রয়োগ, ছন্দ ইত্যাদি বিষয়ও আলোচিত হয়েছে।

১.৮. প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

১. দুঃখবাদ বা Pessimism : Standard Dictionary (Funk and Wagnalls)-তে বলা হয়েছে, —

" A theory of cosmology that regards the cosmos, or the world and life, or some main constituent thereof, as essentially evil or (in its extreme form) as the worst possible world."

Dictionary of Philosophy (progressive Publishers, Moscow) -তে বলা হয়েছে,—

" Pessimism is a depresive view that events go inevitably from bad to worse, and disbelief in the triumph of good and justice. Pessimism was posited by the German irrationalist philosophers Schopenhauer and E. Hartmann."

Oxford Dictionary -তে বলা হয়েছে, — " looking on the black side, expecting the worse, lack of hope, cynicism, doubt, dejection, despair etc."

২. হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭/ ৪/১৮৮৩ - ২৪/৫/১৯০৩) **:** হুগলির গুলিটা গ্রামে জন্ম। খ্যাতনামা কবি। তাঁর সর্বাধিক প্রসিদ্ধ রচনা 'বৃত্রসংহার কাব্য' (১৮৭৫ - ৭৫, দুই খণ্ড)। এই কাব্যগ্রন্থে তিনি পৌরাণিক কাহিনির সাহায্যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসের 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকায় তাঁর 'ভারতসঙ্গীত' কবিতাটি প্রকাশিত হলে সরকারের রোষানলে পড়েন। 'ভারতবিলাপ', 'কালচক্র', 'বীরবাহুকাব্য', 'রিপন উৎসব', 'ভারতের নিদ্রাভঙ্গ' প্রভৃতি রচনাতেও তিনি স্বদেশ প্রেমের কথা লিখেছেন। তাঁর 'কুলীন মহিলা বিলাপ' কবিতাটি বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহরোধ আন্দোলনের সহায়ক হয়েছিল। 'চিন্তাতরঙ্গিনী', 'আশাকানন', 'হাস্যময়ী', 'দশমহাবিদ্যা' ইত্যাদি তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনা।

৩. নবীনচন্দ্র সেন (১০/২/১৮৪৭ - ২৩/১/১৯০৯) **:** চট্টগ্রামের নোয়াপাড়া গ্রামে জন্ম। দেশপ্রেমিক কবি হিসাবেই তিনি বাংলাদেশে খ্যাত। ছাত্রাবস্থা থেকেই 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকায় তিনি কবিতা লিখতেন। দেশপ্রেম ও আত্মচিন্তামূলক কবিতা-সংকলন 'অবকাশরঞ্জিনী' (১ম ভাগ, ১৮৭১) তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। ১৮৭৫-এ বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'পলাশীর যুদ্ধ' প্রকাশিত হওয়ার পর ইংরেজ সরকারের বিরাগভাজন হন। 'রৈবতক' (১৮৮৭), 'কুরুক্ষেত্র' (১৮৯৩), 'প্রভাস' (১৮৯৬) কাব্যত্রয়ীতে তিনি মহাভারত-বর্ণিত ঘটনার মৌলিক ব্যাখ্যা করেন। 'আমার জীবন' তাঁর আত্মজীবনীর নাম। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে বর্তমান রূপ দানে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য।

৪. মোহিতলাল মজুমদার (২৬/১০/১৮৮৮ - ২৬/৭/১৯৫১) **:** হুগলির বলাগড়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৪ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত ছিলেন। কবি, সাহিত্য-সমালোচক ও প্রবন্ধকার রূপে তিনি বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় তৃতীয় পর্যায়ের প্রকাশ ও সম্পাদনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। মাঝে-মাঝে কৃত্তিবাস ওঝা, চামার খায়-আম, সব্যসাচী, সত্যসুন্দর দাস ইত্যাদি ছদ্মনামে লিখতেন। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই এই বিতর্কিত সাহিত্য-প্রতিভার কাব্য আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ — 'বিস্মরণী', 'স্বপন পসারী', 'দেবেন্দ্র-মঙ্গল', 'কাব্যমঞ্জুষা', 'স্মরগরল'। উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থের মধ্যে আছে , — 'সাহিত্যবিতান', 'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র', 'রবি-প্রদক্ষিণ', 'বাংলার নবযুগ', 'কবি শ্রীমধুসূদন' ইত্যাদি।

১.৯ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

১. পাঠ্য কবিতা বিশ্লেষণ করে কবি যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদের পরিচয় দিন।

২. 'অনুপূর্বা'-য় যতীন্দ্রনাথের ঈশ্বরচেতনার স্বরূপ আলোচনা করুন।

৩. যতীন্দ্র-কবিতায় 'বন্ধু' সম্বোধনের উৎস কোথায়? 'বন্ধু'র কাছে কবি কী মনোভাব প্রকাশ করেছেন, পাঠ্য কবিতা অবলম্বনে আলোচনা করুন।

৪. 'অনুপূর্বা'-য় আলোচনা সূত্রে যতীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের মূল্যায়ন করুন।

৫. 'যতীন্দ্র-কবিতার স্টাইল তাঁর নিজস্ব' — মন্তব্যের আলোকে যতীন্দ্রনাথের কবিতাশৈলীর আলোচনা করুন।

১.১০ প্রসঙ্গ- পুস্তক (References/Suggested Readings)

১. কবি যতীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম পর্যায় — শশিভূষণ দাশগুপ্ত (প্রথম সুপ্রিম সংস্করণ, ১৩৯৭)

২. যতীন্দ্রনাথের কবিকৃতি — অমরেন্দ্র গণাই (১৩৮৩)

৩. আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ — আবু সয়ীদ আইয়ুব (মার্চ, ১৯৭১)

৪. আধুনিক কবিতার দিগ্বলয় — অশ্রুকুমার সিকদার

৫. কল্লোলযুগ — অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

৬. কালের পুতুল — বুদ্ধদেব বসু।

৭. সাহিত্য-বিতান — মোহিতলাল মজুমদার

৮. যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত : গদ্য সংকলন — (ভূমিকা) অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৯. কবি যতীন্দ্রনাথ : কবিমানস ও কবিতা — বারীন্দ্র বসু

১০. যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত : কবিমন ও কাব্য— জ্যোৎস্না গুপ্ত

১১. যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতা সংকলন (১৩৭৩) — পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

১২. অনুপূর্বা — যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৩৭১) — মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স

১৩. কাব্য পরিমিতি — যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

১৪. রবীন্দ্র-কবিতার বিপরীত স্রোত : যতীন্দ্রনাথ মোহিতলাল — কাননবিহারী ঘোষ (১৯৯৮,পুনশ্চ সং)

১৫. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, (৫ম খণ্ড) — সুকুমার সেন

* * *

বিভাগ-২
অনুপূর্বা
অনুপূর্বা : প্রাসঙ্গিক আলোচনা-২

বিষয় বিন্যাস

২.০ ভূমিকা (Introduction)
২.১ উদ্দেশ্য (Objectives)
২.২ কবিতায় যতীন্দ্রীয় রীতি
২.৩ দুঃখবাদ ও ঈশ্বর-চেতনা চিহ্নিত কবিতা
২.৪ মৃত্যু-চেতনার কবিতা
২.৫ যতীন্দ্র-কবিতায় মানুষ
২.৬ উদ্ধৃতি সংকলন
২.৭ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ
২.৮ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)
২.৯ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)
২.১০ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

২.০ ভূমিকা (Introduction)

যে কোনো কবিকে জানার প্রাথমিক এবং প্রধান উপায় তাঁর কবিতা। যতীন্দ্রনাথ এর ব্যতিক্রম হতে পারেন না। তদুপরি যাঁর কাব্যধারা বাংলা সাহিত্যে নিজস্ব স্থান করে নিয়েছিল তাঁকে চিনতে হলে তো কবিতায় পরিচয় গ্রহণ একটা আবশ্যিক শর্ত। বর্তমান বিভাগে আমরা সেই শর্ত মেনে কবির কয়েকটি কবিতার বিশ্লেষণ করব। মনে রাখতে হবে, যতীন্দ্রনাথ ছিলেন সচেতন মানসিকতার কবি। যা-ই লিখেছেন সেটাই যথেষ্ট সচেতন হয়েই লিখেছেন। সুতরাং তাঁর কাব্যভাষা, শব্দপ্রয়োগ, ছন্দরচনা, এক কথায়, স্টাইল বা শৈলী অবশ্য লক্ষণীয়। আমরা এ-বিষয়ে সামগ্রিক আলোচনা করেছি। এবার কবিতা বিশ্লেষণ করে আমরা একটু গভীরে মনোনিবেশ করব। দুঃখবাদ সম্বন্ধেও বিস্তৃত আলোচনা করেছি, এবারে তার কাব্যরূপ দর্শনের পালা। এমনিভাবে আরও কয়েকটি বিষয়কে কেন্দ্র করে যে কবিতাগুলো যতীন্দ্রনাথ লিখেছেন তার কয়েকটি নিয়ে আমরা বিষয়গুলোর স্বরূপ নির্ণয়ে চেষ্টা করব। প্রসঙ্গত, একটি কথা মনে রাখবেন। কল্লোলের সঙ্গে সম্পর্ক থাকলেও যতীন্দ্রনাথ কবিদের মধ্যে বিশেষ কোনো গোষ্ঠী অবলম্বন করেননি। একক এবং নিঃসঙ্গ কবি নিজের কাব্যজগৎকে প্রতিষ্ঠা দিতে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন এবং সফলও হয়েছিলেন। তাই তাঁর কবিতার বিশ্লষণে সেই বিশেষ কাব্যজগতের কথাই আমাদের জানতে হবে।

২.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'অনুপূর্বা'-র কবিতা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে পূর্ববর্তী বিভাগে আমরা কয়েকটি বিষয়কে আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি। সেগুলো ছিল সামগ্রিক বিচার। বর্তমান বিভাগে আলোচিতব্য বিষয়গুলোর লক্ষ্য আগের আলোচনার প্রেক্ষাপটে কবিতা বিশ্লেষণ। কবিতা আলোচনার মাধ্যমেই আমরা কয়েকটি অনালোচিত বিষয়কেও ছুঁয়ে যাব।

২.২ কবিতায় যতীন্দ্রীয় রীতি

কবি যতীন্দ্রনাথের কাব্যভাষা অনুপম। বাংলাদেশের সমাজ-জীবনের সঙ্গে কবির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য ও অন্তরঙ্গ পরিচয়, লৌকিক ভাষার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ইত্যাদি গুণাবলি কবির মধ্যে থাকায় তার ভাষাসিদ্ধি ঘটেছে বলা যায়। চলিত, সাধু, সংস্কৃত, ভদ্র, অভদ্র, ইত্যাদি নানা শব্দের অনায়াস প্রয়োগ তিনি করেছেন। তাঁর কবিভাষাকে সূত্রাকারে নির্দেশ করা যেতে পারে, — শব্দের নতুন ব্যঞ্জনা সৃষ্টি, অচলিত শব্দের প্রয়োগে কাব্যের অধিকার বিস্তার, তৎসম-তদ্ভব-দেশীয় শব্দের সুষম গ্রন্থন, ভাষার গতিশীলতার জন্য কাব্যবুলির আশ্রয়, বাগ্‌বিধির ব্যবহার ইত্যাদি।

যতীন্দ্রনাথের কাব্যভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ব্রাত্যশব্দের ব্যবহার। ব্রাত্যশব্দ মানে ব্রতভ্রষ্ট, বর্ণোচিত সংস্কারহীন পতিত শব্দ। যে সমস্ত শব্দ লৌকিক জীবনে কথাবার্তায় ব্যবহৃত হয় কিংবা একমাত্র উপভাষায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে, তাকেই ব্রাত্যশব্দ বলে। যতীন্দ্রনাথ জানতেন এই ধরনের শব্দ বা দৈনন্দিন কথনের লৌকিক শব্দকে কীভাবে সাহিত্যে প্রয়োগ করতে হয়। কবিচিত্তের রসসঞ্জাত হওয়ায় কখনই এই প্রয়োগকে কৃত্রিম বা আরোপিত বলে মনে হয়নি। তাঁর অন্তরের ভাষা, প্রাণের ভাষা সহজ সাবলীলতায় কবিতায় উঠে এসেছে। তার সঙ্গে সেই ভাষার লৌকিক অনুষঙ্গগুলোও কাব্যদেহে স্থান করে নিয়েছে। সেজন্যই এই কাব্যভাষা এতটা আবেগিক, এতটা প্রাণচঞ্চল। ড° সুকুমার সেন বলেছেন, "যতীন্দ্রনাথের কাব্যশিল্প সহজ ও স্পষ্ট, কারুকার্যহীন"। 'কারুকার্য' সেই অর্থে হয়ত যতীন্দ্র-কবিতায় নেই — অর্থাৎ অলংকারবাহুল্য, গভীর ব্যঞ্জনা, শব্দের ঝংকার হয়ত নেই। কিন্তু যা আছে তাকে একেবারে 'কারুকার্যহীন' বলা যায় না। শব্দপ্রয়োগে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তৎসম শব্দের সঙ্গে লৌকিক শব্দের অনায়াস ব্যবহারেই তিনি ধ্বনিঝংকার তুলেছেন। যথার্থই 'শবদে শবদে বিয়া' দিয়েছেন। এটাই তাঁর কাব্যভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আমরা কবিতার পঙ্‌ক্তি উল্লেখ করে এই শব্দবন্ধনের বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করব। তার আগে বিভিন্ন কবিতায় ব্রাত্য বা লৌকিক ক্রিয়া, বিশেষ্য, বিশেষণ, অব্যয় ইত্যাদির স্বতোৎসারিত ব্যবহার রয়েছে তা দেখানোর চেষ্টা করছি, —

১. বাছুরে, গাজুনে (শিবের গাজন / মরীচিকা-অনুপূর্বা)

২. গোঁজামিল, খামখেয়ালি, ঠ্যাং, ওঁচা, চিতেন, কেতেন, ফুলকো, মাকু ইত্যাদি (ঘুমের ঘোরে/ওই)

৩. ঝাঁট, দোচালা , পরখ (হাট / ওই)

৪. পিটানো, ঠকা ঠাঁই ঠাঁই, শাঁড়াশি, শানি, পান, পোড় (লোহার ব্যথা / মরুশিখা)

৫. থ্যাঁতলানো, সুড়সুড়ি, কোলকুঁজো (ভক্তির ভারে / ওই)

৬. টোপ, খাসা, খোসা, চোষে, গিলিতে, ভবি, হাবুডুবু, কুঁড়ে, ফাজিল (দুঃখবাদী / মরুশিখা-অনুপূর্বা)

৭. চুনকাম, ঝাড়পোঁচ, ঘষামাজা, চাড়ে চাড়ে, ফাট, রংতালি, ঘুণ ইত্যাদি (ভাড়াটিয়া বাড়ি / ওই)

৮. টং টং, ঘ্যেস্ ঘ্যেস্ , ঠাঁই, হুটোহুটি, হাতছান, আস্তবাড়ি, বকাবকি, তেপান্তর, ফমৎকার, রোশনাই (রেলঘুম / ওই)

৯. চারা, মুড়ায়ে, পরিপাটি, বাড়া, বাখ্রায়, থরে থরে, মেড়ে, জিরেন কাট, নলিনগুড়, (খেজুরবাগান / ওই)

১০. লেপিয়া, আলপনা, মরাই , দাওয়া, খুঁটি, ঠেস্, বোশেখ, জ্যষ্টি, ভাদ্দর, অঘ্রান, নাবী, কাঁকাল, আঁচল, (নবান্ন /মরুমায়া- অনুপূর্বা)

১১. মাগে, মিটালেন, দিনু, বুনে, (শর-শয্যায়-ভীষ্ম / ওই)

১২. আব্ছা, পশলা, সাঁঝে, খাসা, থোড়ে, ইতিউতি, এনু, ফোঁসে, লঙ্কাবাঁটা, আদল ইত্যাদি (কেতকী / ওই)

১৩. মুদে, চুকাইয়ে, পালম্-আঁটি, লাউ-ডগা, মট্কিয়ে, গেরুয়া, ছাঁচিকুমড়ো, বোঁটা, টোল্ খেলো, মেছোহাট, পাত্ (হাটে / ওই)

১৪. বোশেখ, আন্চান্, আইটাই, স্যাঁতানো, জোলো, ঝাপ্টা, খাঁটি ইত্যাদি (চিরবৈশাখ / সায়ম্-অনুপূর্বা)

১৫. ঝাঁকা, ফুঁকে, মাজা, নুয়ে, বিকিকিনি, তেঁতুল-গোলা, টলে, চাকি, টাটে ইত্যাদি (কচিডাব / ওই)

১৬. ঝাঁজ, ঝারি, ছাই , চাঁচরে, উড়ানি, আউল-বাউল, জীয়াতে ইত্যাদি (সমাধান / ত্রিযামা-অনুপূর্বা)

এ তো গেল শব্দ-প্রয়োগের কথা। আমরা এমন প্রয়োগও দেখেছি যেখানে সংস্কৃত শ্লোককে ভেঙে তিনি বাংলা করছেন এবং সংস্কৃত ক্রিয়াপদের বাংলা রূপান্তর করে অভিনবত্বের সৃষ্টি করছেন। এই উদাহরণটা লক্ষ করুন, —

" লক্ষ্মী বোধহয় বাণিজ্য ত্যজি' এবার নিবসে চাষে" (নবান্ন) 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী'-র ব্যবহার এখানে লক্ষণীয় — লক্ষণীয় 'নিবাস' বিশেষ্য পদটিকে সংস্কৃত 'বসতে' ক্রিয়াপদের সঙ্গে সাদৃশ্য করে নবরূপে ব্যবহারটিও।

অনায়াসে ইংরেজি শব্দ ব্যবহারটাও লক্ষ করুন —

"শয়নঘরের হুকে

ছিন্নবৃন্ত বনের কেতকী দুলিল মনের সুখে।"

শব্দপ্রয়োগে সমস্তরকম শুচিবায়ু বাদ দিয়ে একটি ইংরেজি শব্দের (hook) পাশে 'ছিন্নবৃন্তে'র মতো আপাদ-তৎসম শব্দ বসানোর পিছনে যে অধ্যবসায় তাকে কি 'কারুকার্যহীন' বলে এড়িয়ে যাওয়া যায়? বরং আগেকার সমস্ত রীতিকে ভেঙ্গে দিয়ে আধুনিক কবিতায় এক নতুন পথ নির্মাণের চিত্র কি এখানে পাওয়া যাচ্ছে না? যতীন্দ্রনাথের শিল্পনৈপুণ্যের আর দুটি উদাহরণ দিয়ে এ-প্রসঙ্গের ইতি টানব। লক্ষ করুন (এবং এরকম অনেক উদাহরণ আপনারা খুঁজে পাবেন) —

১. গোড়া হতে আগাতক্ (হিন্দি ভাষারীতির প্রয়োগ)

" বিষম রুক্ষ শুষ্ক কঠিন খেজুর গাছের ত্বক।" (খেজুরবাগান)

২. (একই সঙ্গে ইংরেজি, সংস্কৃত, বাংলা তদ্ভব ও হিন্দি শব্দের প্রয়োগ)

"ছুটি নাই, ছুটে তবু এ 'বাইসিকল'!

শুকায় সরিৎ কূপ,

ছুটে ঘাম ফুটে ধূপ" (পথের চাকরি)

যতীন্দ্রনাথ শুধু শব্দের ব্যবহারেই থেমে থাকেননি। উপযুক্ত বাগ্‌ধারা প্রবাদ-প্রবচনকেও কবিতায় তুলে এনেছেন। ফলে তাঁর কবিতা অনেক সময়ই হয়ে উঠেছে প্রাণবন্ত। এমনকি তাঁর নিজস্ব কথ্যরীতির ব্যবহার তাঁর রচিত পঙ্‌ক্তিকেও কখনও প্রবাদের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে। এ-রকম কয়েকটি উদাহরণ এবারে আমরা লক্ষ করব। —

১. ক্ষুধা দিয়ে দেওয়া অন্ন

গোরু মেরে জুতা দান অপেক্ষা নহে বেশি পুণ্য! (ঘুমের ঘোরে, প্রথম ঝোঁক)

২. মরণে কে হবে সাথী,

প্রেম ও ধর্ম জাগিতে পারে না বারোটার বেশি রাতি! (ঘুমের ঘোরে, প্রথম ঝোঁক)

৩. এ ধরা গোরস্থান, —

মরণের ভিতে স্মরণের ঢিপি দু'দিনে ভূ মি সমান! (ঘুমের ঘোরে, প্রথম ঝোঁক)

৪. নাকের বদলে নরুন যে পায় — ব্যবসায় সে-ই জেতে (ঘুমের ঘোরে, দ্বিতীয় ঝোঁক)

৫. শুনহ মানুষ ভাই!

সবার উপরে মানুষ শ্রেষ্ঠ , স্রষ্টা আছে বা নাই! (দুঃখবাদী)

৬. বামে মাথা ঠুকে চলিতে সমুখে,

চোখে পড়ে মেছোহাটা। (হাটে)

৭. দিগন্ত হারা অন্তর মম বালুর শয্যা পাতি। (চিরবৈশাখ)

৮. এ ভালে তেঁতুল-গোলা — অতিবৃদ্ধ ডাবও'লা

তাও নহে বৈশাখী দু'পরে ; (কচিডাব)

এবার আমি যতীন্দ্র-কবিতার ছন্দোরীতির প্রসঙ্গে আলোচনা করব। একটা কথা এখানে অবশ্য স্বীকার্য যে কবিতার বক্তব্য যা-ই হোক, তাঁর সমস্ত কবিতার ছন্দ অপূর্ব সাবলীলতায় বহমান। যে-কোনো শব্দকে কবি অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যে অক্ষরবৃত্ত (তানপ্রধান), মাত্রাবৃত্ত (ধ্বনিপ্রধান), দলবৃত্ত (শ্বাসাঘাতপ্রধান বা ছড়ার ছন্দ) ছন্দের প্রবাহে ভাসিয়ে দিতে পেরেছেন। কখনও প্রচলিত ছন্দকে আশ্রয় করেও তাকে ভাঙার চেষ্টা করেছেন। বুদ্ধদেব বসু এক্ষেত্রে তাঁর সম্বন্ধে কী বলেছেন, সেটা জেনে নেওয়া যাক। তিনি বলছেন, —

"যতীন্দ্রনাথের কাছে কী পেয়েছিলাম আমরা?
পেয়েছিলাম এই আশ্বাস যে আবেগের রুদ্ধশ্বাস
জগৎ থেকে সাংসারিক সমতলে নেমে এসেও
কবিতা বেঁচে থাকতে পারে। পেয়েছিলাম একটি
উদাহরণ যে, পরিশীলিত ভাষা ও সুবিন্যস্ত
ছন্দের বাইরে চলে এলেও কবিতার জাত যায়
না। 'মরীচিকা'য় তিনি তিন মাত্রার ছন্দকে
অনেকটা গদ্যের ভঙ্গিতে বন্ধুরভাবে ব্যবহার
করেছিলেন ...।"

(কবিতা পত্রিকা, আশ্বিন - ১৩৬ সূত্র : 'কবিতার বিচিত্র কথা' — হরপ্রসাদ মিত্র, পৃ: — ১৮৯, ১৯৬৪)

'সুবিন্যস্ত ছন্দের বাইরে চলে' আসাটাকে আমরা পরে প্রত্যক্ষ করব। তার আগে এটা জেনে নেওয়া প্রয়োজন যে, যতীন্দ্রনাথের ছন্দপ্রতিভা মাত্রাবৃত্ত ছন্দেই সবচেয়ে বেশি স্বচ্ছন্দ। তাঁর অধিকাংশ কবিতাই এই ছন্দে রচিত। আমরা কয়েকটা উদাহরণ

আত্মসমীক্ষামূলক প্রশ্ন

যতীন্দ্রনাথের শব্দ-ব্যবহারের কুশলতা বিষয়ে ন্যূনতম ১০০ শব্দের মধ্যে নিবন্ধ লিখুন।

.....

.....

.....

এখানে দেখে নিতে পারি , —

১. বন্ধু গো, আমি/ জানি হেথা চির/ভোটহীন অধী/নতা // ৬+৬+৬+২

নিরুপায় হয়ে/ কেহ বলে তোমা/পিতা, কেহ বলে/ মাতা// ৬+৬+৬+২

(ঘুমের ঘোরে)

২. পূজা পেয়ে হেসে/ আবার ঘুমাও/ আশুতোষ উদা/সীন// ৬+৬+৬+২

তোমার ব্যথার/ম্লান সায়াহ্নে / মিলায় দীনের /দিন// ৬+৬+৬+২

(শিবস্তোত্র)

৩. ফাঁস-করা রসি/ বাখ্‌রায় কসি /কটিতে কাটারি /গুঁজে//৬+৬+৬+২

বড় স্নেহে চাষা/ খেজুর-বৃক্ষ / জড়াইল দুই / ভুজে// ৬+৬+৬+২

(খেজুর বাগান)

৪. আধঘুমে চাহি / দেখিনু চমকি/ — ঝুলিছে সর্বনাশী// ৬+৬+৬+২

নিজ অঙ্গের/নীলাম্বরীতে/ কণ্ঠে লাগায়ে / ফাঁসি// ৬+৬+৬+২

(কেতকী)

৫. একদা তুমি / অঙ্গ ধরি / ফিরিতে গোপ গো/কুলে// ৫+৫+৬+৩

দেবেরো দু/র্লভ্য দেব/তা// ৫+৫+১ (দুর্লভ্য = দুর্ +লভ্য)

যখন খুশি /দেখিত যে-সে / মাঠে বাটে /নদী/কূলে// ৫+৫+৬+২

শিহরে দেহ / স্মরিয়া সে ক/থা// ৫+৫+১

(বৃন্দাবনে)

মনে রাখবেন, উদাহরণে উল্লিখিত কবিতাগুলোর সম্পূর্ণ কবিতাই এই ছন্দে রচিত। অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত কিছু কবিতাও রয়েছে। যেমন , —

শুনিয়াছি জগতের / সব চেয়ে তীব্র প্রয়োজন// ৮+১০

আছে এরি মাঝে ; // ৬

ত্রস্তে পথ ছাড়ে সবে/ ডেকে কথা শুনায় না কেহ // ৮+১০

দেরি হয় পাছে!// ৬

(ডাক-হরকরা)

হাঁকে বৃদ্ধ-ডাব, কচিডাব?// ১০

পাগল! আজি এ সাঁঝে/ সঙ্কীর্ণ গলির মাঝে // ৮+৮

উদরে-উদরে অন্নভাব; ১০

(কচিডাব)

এছাড়া ছড়ার ছন্দের কবিতা আর গদ্য কবিতাও যতীন্দ্রনাথ লিখেছেন। পঙ্‌ক্তি

সজ্জায় ছন্দ অনুযায়ী নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। যতীন্দ্রনাথের আর একটি গুণ তিনি অনেক সময় বক্তব্য বিষয়কে ছন্দের চলনের মধ্যে সুন্দরভাবে ধরে দেন। আমরা 'রেলঘুম', 'পথের চাকরী', 'শাওন রাতি', 'পারুলের আহ্বান' ইত্যাদি কবিতার উল্লেখ করতে পারি।

আমরা যতীন্দ্র-কাব্যের শিল্পরীতির আলোচনা শেষ করতে পারি এই মন্তব্যে যে পুচ্ছানুগ্রাহিতা ও প্রথানুগত্যকে যতীন্দ্রনাথ সযত্নে দূরে সরিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। আর সেজন্যই কল্লোলপন্থীদের কাছের জন হয়ে উঠেছিলেন।

আত্মসমীক্ষামূলক প্রশ্ন

ব্রাত্য শব্দ ব্যবহারে যতীন্দ্রনাথের কুশলতার পরিচয় দিন, ন্যূনতম ১০০ শব্দের মধ্যে।

.....

.....

.....

.....

২.৩ দুঃখবাদ ও ঈশ্বরচেতনা চিহ্নিত কবিতা

যে কবিতায় যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদী দর্শন সবচেয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ে, জীবনচেতনার বাস্তবতায় সেটা '**ঘুমের ঘোরে**' কবিতা। এই কবিতায় যতীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ বিপুল প্রকৃতি জগতের যান্ত্রিক নিয়মতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে, ব্যক্তিগত সুখ উপভোগের জন্য ব্যক্তিমানুষের লোভ ও হিংস্রতার বিরুদ্ধে, সামাজিক গোষ্ঠীতান্ত্রিক নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে এবং রাষ্ট্রীয় শক্তির কূট কৌশলজাত সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে। কবিতাটিকে তিনি সাতটি ঝোঁকে ভাগ করেছেন।

প্রথম ঝোঁকে কবির বক্তব্য, এই প্রকৃতি বা ঈশ্বরের রাজত্বে মানুষেরা যে নিয়মশৃঙ্খলা এবং ন্যায়ানুগত্য ধারণা করি, তা এই জগতের কোনো অন্তর্লীন বৈশিষ্ট্য নয়। সেটা শুধুমাত্র মানুষেরই আরোপিত কল্পনা। এই জগতের তথাকথিত ঈশ্বরভক্তেরা মঙ্গলময়ের দয়ায় অভিভূত। কিন্তু এই ভক্তি তাঁদেরই মনোজাত। ঈশ্বর নির্বিকার দর্শক মাত্র। সেই সুযোগে রাষ্ট্রশক্তি বা অত্যাচারী মানুষ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে। শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, নিমাই, যীশু, কনফুসিয়াস, মহম্মদ প্রভৃতি অনেক অবতার পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলেও আদিকাল থেকে মানুষের দুঃখের কোনো হেরফের হয়নি। তাই কবির উপলব্ধি এ-জগতে মানুষ অর্থাৎ আমাদের পাওনা শুধু 'ভোটহীন অধীনতা', যারা আপাদ পঙ্কে মজে আছে তারাই সুখী, মানুষের সুখ-দুঃখে যমের হিসেব-নিকেশ মিথ্যা। সুতরাং ভগবানকে কবির পরামর্শ,—

"... কিনে কুলো

পিঠে বেঁধে, দাও গভীর নিদ্রা দু'কানে গুঁজিয়া তুলো।"

কবির মতে এই ঈশ্বরের শোওয়া-বসা সকলি সমান, মানুষের সুখ, প্রেম, মৃত্যু কোনো কিছুতেই তাঁর কোনো হাত নেই। সুতরাং ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁর নিশ্চিত ধারণা —

" থাক বা না থাক স্রষ্টা,

নিখিল বিশ্ব ঘুরে ঘুরে মরে তুমি তার চিরদ্রষ্টা।"

স্রষ্টার মহিমান্বিত আসন থেকে সরিয়ে অসহায় 'স্রষ্টা"র রূপে দেখেছেন তিনি।

'দেবতা' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের 'অনন্ত' বোধ ও আনন্দবাদের ধারণার প্রতি তীব্র বিক্ষোভ প্রদর্শন রয়েছে 'ঘুমের ঘোরে' কবিতায়। এখানে রবীন্দ্রনাথকেও সরাসরি আক্রমণ করা হয়েছে , —

" কেন ভাই রবি, বিরক্ত কর ? তুমি দেখি সব — ওঁচা,

কিরণ ঝাঁটার হিরণ-কাঠিতে কেন চোখে মারো খোঁচা।

জানি তুমি ভাল ছেলে,

ঘড়িটি তোমার কাঁটায় কাঁটায় ঠিক যায় বিনা তেলে

তব জয় জয় চারিদিকে হয় , আলোক পাইল লোক,

শুধাই তোমায় — কি আলো পেয়েছ জন্মান্ধের চোখ?"

গতানুগতিকতাকে শিরোধার্য করে নেওয়া অথবা আস্থাহীনভাবে ভিন্নমতকে মেনে নেওয়া যতীন্দ্রনাথের কবি-ধর্ম নয়। এই কবিতার ছত্রে-ছত্রে দেবতা এবং রবীন্দ্রনাথকে অ্যান্টি-রোমান্টিকতার খোলা আঙিনায় নিয়ে এসে কবি নিজের মনের কথা শুনিয়েছেন। তিনি দেখেছেন, সংসার জুড়ে দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার, অসহায়ের ক্রন্দন, বিপর্যস্ত সাধারণ মানুষের দুঃখ তাঁর কাব্যগগনকে আচ্ছন্নকরে রেখেছে। তিনি সেই বেদনার দাহকে এড়িয়ে যেতে পারেননি, শুধু অচেতন ঘুমের মধ্যেই তাঁর নিশ্চিন্ততা, মৃত্যুই তাঁর বোধ হরণ করতে পারে। তাই অতি সজাগ মনের কবি ঈশ্বরের কাছে সেই অচেতনতার 'ঘুমঘোর' প্রার্থনা করেছেন।

আমরা আগে দেখেছি ঈশ্বরের অবতারদের প্রতি যতীন্দ্রনাথের অনাস্থাকে। তবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে কবির কোনো দ্বিধা নেই , যদিও এই ঈশ্বরচিন্তা সম্পূর্ণ মৌলিক। ঈশ্বরের প্রতি অশ্রদ্ধা থেকে নয়, সত্যচারিতায় বিশ্বাসই তাঁর দেবোপাসনা। ভক্তির যে অংশে ভাবালুতার ভার বেশি, কবি অনায়াসে তাকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। আমরা আগেই জেনেছি, আধ্যাত্মিক লীলামাহাত্ম্য খণ্ডন করতে 'দারু-মূরতি জগন্নাথ' এবং 'শালগ্রাম শিলা'র অসহায়তার কৌতুককর ব্যাখ্যা করেছেন। কবিতার প্রথম ঝোঁকেই যতীন্দ্রনাথ অ্যান্টি-রোমান্টিক মেজাজ নিয়ে বলেছেন, —

" প্রেম ও ধর্ম জাগিতে পারে না বারোটার বেশি রাতি।"

এই সূত্রেই তিনি পৌঁছে গেছেন ঈশ্বর দর্শনে। অনন্ত মুক্তি, আনন্দবাদ অথবা নটরাজের নৃত্যছন্দ কোনো কিছুই তিনি দেবভাবনার ওপর আরোপ করতে পারেননি। তাছাড়া সংসারব্যাপী যে দুঃখের ঝড় তিনি বয়ে যেতে দেখেছেন তার নিরসনে ঈশ্বর নয়, অন্ধ ভক্তিবাদ নয় — 'ঘুমিওপ্যাথি'কে একমাত্র আশ্রয় বলে ভেবেছেন। ব্যক্তিগত জীবনের সুখদুঃখকে ভেদ করে কবির প্রতিবাদী মন বৃহত্তর সত্যের খোঁজ করে। সেখানে বাড়তি কোনো আশার আলো নেই। রয়েছে মৃত্যুর কঠিন বাস্তবতা, জীবনের নিশ্চিত পরিণাম। 'ঘুমের ঘোরে' কবিতার তৃতীয় ঝোঁকের কয়েকটি লাইনের গভীর তাৎপর্য লক্ষ করুন,—

" সহে না এ বেঁচে থাকা —

বাপ পিতাম'র মামুলি ধরনে প্রতিদিন মরে রাখা,

মরণও, সে যদি এরূপই হয় তিলে তিলে বেঁচে যাওয়া,

অন্ত কোথায় ভেবে হাসি পায়, — এল কি ঘুমের হাওয়া?"

এই কারণেই যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে সমালোচকেরা দুঃখবাদী কবি বলেছেন।

দুঃখের পৃথিবীতে সত্যের নগ্নরূপ বড় ভয়ংকর। দুঃখের নয়, সেই ভয়ংকর সত্যের সন্ধান করেছেন 'ঘুমের ঘোরে' কবিতার চতুর্থ ঝোঁকে। পঞ্চম ঝোঁকে মুক্তিতত্ত্বকে করেছেন তীব্র বিদ্রূপ , —

"হেরিলাম কাল নির্জীব আমি পড়ে আছি এক ধারে,

চারিপাশে ঘেরা অসীমের বেড়া নীলের প্রাচীর খাড়া

আলো আঁধারের গরাদে বসান অপার বিশ্বকারা।"

জগৎ-সংসারটাই নিপীড়িত সাধারণ মানুষের কাছে কারাগার-সমান। এই অনন্ত কারাগারের মধ্যে চিরবন্দী মানুষের কাছে মুক্তির বাণী মিথ্যাচার মাত্র , —

" এক বড় খাঁচা-মুক্তির ধাচা-বিদ্রূপ কোরো নাকো। ...

এ ব্যঙ্গ কিসে সহি

কয়েদ যখন ব্যবস্থা কর — কয়েদীরই মতো রহি।"

প্রতিপক্ষ রূপে উপনিষদের বাণী এবং রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তিতত্ত্ব'কে প্রচণ্ড আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করে যতীন্দ্রনাথ তাঁর যন্ত্রণার জ্বালা প্রশমিত করেছেন।

সপ্তম ঝোঁকে এই ক্রোধবহ্নির উত্তাপ খানিকটা কমে গেছে । তবে দুঃখের বোধ কবিচিত্তকে বেদনাতুর করেছে নিবিড়ভাবে। আনন্দ নয়, — কবি যতীন্দ্রনাথের 'বন্ধু' দেবতা তাঁর দুয়ারে 'দুঃখের ফেরি' বহন করে এনেছেন।

'মরীচিকা' কাব্যগ্রন্থেই কবি মেনে নিয়েছেন তাঁর উপাস্য নিজেই চিরদুঃখী। সেই দুঃখের ভার হাল্‌কা করে দেবার মতো শক্তি কবির আরাধ্য দেবতার নেই। স্রষ্টা নয়, এই

দেবতা দ্রষ্টা হয়ে জগতের অনিয়মগুলো দেখে চলেছেন — অথচ প্রতিকারের কোনো সম্ভাবনা নেই। তাই দেবতা শেষ পর্যন্ত সমস্ত শক্তি থাকা সত্ত্বেও জড়। আর কবিও আরাধ্য দেবতার অনুসরণে 'ঘুমিওপ্যাথি'র শরণাপন্ন। সাতটি ঝোঁকের প্রতিটি পর্বে কবি তাঁর কাব্য-সরণি নির্দেশ করেছেন। ঈশ্বর, সৃষ্টিতত্ত্ব, উপনিষদের বাণী, রবীন্দ্রকাব্যের রোমান্টিকতা প্রভৃতি প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ এবং জাগতিক দুঃখের প্রতি সচেতন ভাবনায় সত্যদর্শন ও সমাজমনস্কতাকে অবলম্বন বলে গ্রহণ করেছেন। যতীন্দ্রনাথের অ্যান্টি-রোমান্টিক বস্তুবাদী কবিতা তথা রবীন্দ্র-বিরোধিতারও জন্মলগ্ন এই কবিতা।

ইংরেজ কবি ডানের সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের মিলের কথা অনেক সমালোচক বলে থাকেন। বিশেষ করে ডানের Satire I থেকে Satire VII -এর বিদ্রূপাত্মক মনোভাবের সঙ্গে বর্তমান কবিতার সাতটি ঝোঁকের সাদৃশ্য পাঠকের চোখ এড়িয়ে যায় না। আবার টমাস হার্ডির জীবনবোধের সঙ্গেও কিছু মিল আছে। তাঁর 'Hardy God Forgotton' কবিতায় কবি জানিয়েছেন, সৃষ্টির প্রতি স্রষ্টার কোনো মমত্ব নেই , —

" It lost my interest from the first.
Oh , childish thought ...yet often it comes
to me when troubles hover nigh."

এর সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের এই পঙ্‌ক্তিগুলোর মিল আছে , —

" ইসা, মুসা আর বুদ্ধ
কনফুসিয়াস মহম্মদ বা কৃষ্ণ নিমাই সুদ্ধ
সবাই বলেছে , পাঠালেন মোরে নিজে তিনি ভগবান,
তোমাদের তরে প্রাণ কাঁদে তাঁর — তোমাদেরি তিনি চান ... "

তবে পাশ্চাত্য কবিদের সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের এই যোগাযোগ খুবই বিক্ষিপ্ত।

জেনে রাখুন

যতীন্দ্রনাথ দুঃখবোধ থেকে পরিত্রাণের জন্য 'ঘুমিওপ্যাথি'র কথা বলেছিলেন। তারই অনুরূপ মন্তব্য কবি ডানের কবিতায় আছে , —

"Sleep, next society and true friendship,
Man's best contentment , doth securely slip
His passions, and the world's troubles ; rock me,
O sleep, wean'd from my dear friend's company,
In a candle free from dreams or thoughts ....."

(To Sr. Nicholas Smyth, Satire VII)

" Soe, if Dreame, I have you, I have you.

For all our joyes are but fantasticall ;

And soe I'scape the paine, for paine is true ;

And sleepe, which locks upp sense, doth lock out all.

(Elegies, XI, The Dream)

'মরুশিখা'র 'লোহার ব্যথা' ভাবনাশ্রয়ী। এখানেও যতীন্দ্রনাথ মানুষ ও দেবতার সম্পর্ক নির্ধারণে আগ্রহী। শক্তিমানের শোষণ-পীড়নে বিক্ষত মানুষের প্রতিবাদের একটি অতিরিক্ত মাত্রা এখানে আছে। রূপকের চেহারায় কবির বক্তব্য অতি পরিচ্ছন্ন। সমকালের কাব্য-চিন্তায় এটা অভিনব ও। কবির দেবতা নিপীড়িত দুঃখী মানুষকে সত্যের আগুনে জ্বালিয়ে কঠিন বস্তুবাদী এবং সংগ্রামী করে তোলে। কর্মকাররূপে কবির দেবতা উপস্থিত হয়েছেন বর্তমান কবিতায়। পরে 'কচিডাব' কবিতাতেও বৃদ্ধ ডাবওয়ালার বেশে তাঁর আবির্ভাব। শুধু রোমান্টিক কল্পনায় নয়, সরাসরি বাস্তব চিত্রাঙ্কণে কবি দেবতাকে শ্রমজীবী মানুষের পরিচয়ে হাজির করেছেন। শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের প্রতি কবির সহমর্মিতাই এইভাবে বারংবার তাঁর ধর্মচর্চা হয়ে উঠেছে। তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন এই দেবতা সর্বশক্তিমান নন, দুঃখী নিপীড়িত মানুষের মতোই দেবতার শক্তিতে সীমাবদ্ধ। শুধু বর্তমান কবিতাই নয়, অন্যান্য কবিতাতেও বারবার এ-কথাই বলতে চেয়েছেন কবি।

কবির ঈশ্বর মানুষের সঙ্গে সম্পর্কে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, —

" কহ গো বন্ধু কহ কানে কানে , আপনার প্রাণে বুঝি,

আমি না থাকিলে মারা যেত কি না তোমার দিনের রুজি?"

রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলিতেও অনেকটা এই অনুভব আমরা খুঁজে পেতে পারি , —

" আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হতো যে মিছে।"

তবে এই একটি উদাহরণ দিয়ে বলা যাবে না যে যতীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরবোধ অভিন্ন। ঈশ্বরতত্ত্ব যতীন্দ্রনাথের কাছে কোনো আলাদা মহিমা পায়নি। মানুষের দুঃখের মধ্য দিয়ে দেবতার পরিচয়। শোষিত মানুষ কখনই দেবত্বের স্বপ্ন দেখে না, —

" কি কহিছ ভাই , আমি হব তুমি এই প্রেম সহি যদি?

পিটনের গুণে লোহা কবে হায় পায় কামারের গদি!"

কবিতাটিতে একটা সচল জীবন্ত কামারশালার ছবি ফুটে উঠেছে। ভোর থেকে রাত পর্যন্ত সেখানে লোহা পেটানোর কাজ চলেছে হাতুড়ি, নেহাই, হাপর, সাঁড়াসিতে। আগুনের তাতে যন্ত্রের আওয়াজে মুখর কর্মকাণ্ডের মধ্যে কাজ করে চলেছে শ্রমজীবী

কর্মকার। রূপকের বাইরেও আস্বাদ্য একটি কবিতার মেজাজ এখানে গড়ে উঠেছে। বাস্তব এবং কর্মমুখর কামারশালার ছবি এঁকে যতীন্দ্রনাথ বাংলাকাব্যে একটা নতুন মাত্রা এনে দিলেন। ঈশ্বরতত্ত্ব, শোষিত মানুষের জন্য কবির দুঃখবোধ একটি অভিনব উপায়ে পরিবেশিত হল।

'দুঃখবাদী' একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা। জীবনে, কাব্যে, প্রকৃতিতে কবি রূঢ় বাস্তবকে দেখেছেন। নিপীড়িত শোষিত মানুষের পৃথিবীতে দুঃখ সত্য। সুখের ছবি রয়েছে শুধু ভাবুকের কল্পনায়। এই সুখ কল্পনাই যতীন্দ্রনাথকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। সমকালের কবিতায়, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে রোমান্টিকতার জোয়ার বয়ে চলেছিল। বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের বিবল আকুতি বাংলা কবিতার একমাত্র বিষয় হয়ে উঠেছিল। বস্তু-সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে কল্প-জগৎবিহারই কাব্য-সাধনা বলে মনে করা হতো। 'দুঃখবাদী' কবিতায় এর বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে।

যতীন্দ্রনাথ এখানে নগ্ন কঠিন দুঃখের বর্ণনা করেছেন। সমাজ-মনস্ক কবি তীক্ষ্ণ আঘাতে তথাকথিত বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের ভাববিলাসকে আহত করেছেন। অন্যদিকে দুঃখের নিষ্ঠুর অথচ বাস্তব সত্যকেও কবি প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন, —

"ছবি ও ছন্দে তোমারি দালালি করিছে স্বভাবকবি,
সমসুন্দর দেখে তারা গিরি সিন্ধু সাহারা গোবি।
তেলে সিন্দুরে এ সৌন্দর্যে 'ভবি' ভুলবার নয়।
সুখ-দুন্দুভি ছাপায়ে বন্ধু উঠে দুঃখেরি জয়।
অতল দুঃখ-সিন্ধু
হাল্কা সুখের তরঙ্গ তাহে নাচিয়া ভাঙিছে ইন্দু।"

প্রকৃতি প্রেমের ফাঁদ পেতে দুঃখী মানুষকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা করে। তাকে ব্যর্থ করতে গিয়ে কবি বারংবার সত্যের ছবি তুলে ধরেছেন। এই চিত্রগুলো ব্যঙ্গে-বিদ্রূপে শাণিত। ভাবে-ভাষায়-অলংকরণে কৌতুকের কাপের মধ্যে তাঁর শাণিত তরবারিটিকে চিনতে অসুবিধে হয় না , —

" এ ব্রহ্মাণ্ড ঝুলে প্রকাণ্ড রঙিন মাকাল ফল।"

কবিতায় ধীরে ধীরে কৌতুকের মুখোশ খুলে গেছে। সমস্ত ছিদ্র দিয়ে দুঃখের সুর বেজে উঠেছে , —

"বজ্রে যে জনা মরে,
নবঘনশ্যাম শোভার তারিফ্ সে বংশে কেবা করে?"

তাই 'ঝরা ফুলের' দলের সঙ্গী কবি নিজেকে দুঃখবাদী 'বৈরাগী' নামে চিহ্নিত করে নিলেন। তাঁর সমগ্র কাব্য-জীবন ধরে সেই দুঃখভোগের সাধনা চলেছে।

কিন্তু এই দুঃখবাদ হতাশাকে নির্দেশ করে না। সত্য এবং বস্তুর সন্ধানে কবি দুঃখের পথ দিয়ে এগিয়েছেন। তাঁর আরাধ্য হয়েছে দুঃখী মানুষ , —

" শুনহ মানুষ ভাই!

সবার উপরে মানুষ শ্রেষ্ঠ, স্রষ্টা আছে বা নাই।"

এইভাবে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করাতে 'দুঃখবাদী' কবিতার তাৎপর্য আরও গভীরে পৌঁছে গেছে। স্রষ্টার অস্তিত্বে কবির সংশয়, কিন্তু মানবিকতায় আছে পূর্ণ বিশ্বাস। তাই এখানে দুঃখবাদীর নেতিবাচক খোলস ভেঙে কবি দৃপ্ত সত্যের স্বরূপে প্রকাশিত হলেন। বিশেষ করে এই কবিতাতেই তিনি প্রকৃতি-প্রেমিক কবিদের সুখ-ভাবনাকে শুধু যে নস্যাৎ করে দিলেন তাই নয়, মানুষের সত্যের প্রতিষ্ঠাও করলেন, —

" কবি-আরাধ্য প্রকৃতির মাঝে কোথা আছে এর নুড়ি?

অবিচারে মেঘ পালে জল, তাও সমুদ্র হতে চুরি!

সৃষ্টির সুখে মহাখুশি যারা, তারা নর নহে, জড় ;

যারা চিরদিন কেঁদে কাটালি তারাই শ্রেষ্ঠতর।"

বর্তমান কবিতাটি বক্তব্য-প্রধান, কিন্তু কবিতা হিসাবেও সার্থক। লেখক বক্তব্যকে টেনে নিয়ে দু-এক লাইনের রসঘন চিত্র এঁকেছেন , —

"বজ্র লুকায়ে রাঙা মেঘ হাসে পশ্চিমে আনমনা —

রাঙা সন্ধ্যার বারান্দা ধরে রঙিন বারাঙ্গনা!"

প্রকৃতির সৌন্দর্যকে মিথ্যার ফাঁদ মনে করে কবির কল্পনা বিচিত্র তির্যক পথে এগিয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে কবি যে উপমা উল্লেখ করেছেন সেটি নিজেই একটি সাংঘাতিক সমাজ-সমালোচনা। বেদনার সুগভীর ভাবনাকে শাণিত অথচ রঙিন করে তোলা হয়েছে কবির বর্ণনায়। তাছাড়া বিচিত্র ও পরিচিত শব্দব্যবহারে কবি বিদ্রোহী মনোভাবের ওপর হালকা কৌতুকের আবরণ পরিয়েছেন।

আত্মসমীক্ষামূলক প্রশ্ন

ঈশ্বর ও মানুষের সম্পর্ক বিষয়ে যতীন্দ্রনাথের বোধের স্বরূপ উল্লেখ করুন, ন্যূনতম ১৫০ শব্দের মধ্যে। কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে বোঝান।

.....

.....

.....

.....

.....

২.৪ মৃত্যু-চেতনার কবিতা

'মৃত্যুর আলোকে রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধটিতে মোহিতলাল মজুমদার লিখেছিলেন, — " আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবন সাধনায় মৃত্যুকে কখনও ভোলেন নাই ; বরং জীবন ও মৃত্যুর যে দ্বন্দ্ব সেই দ্বন্দ্ব উত্তীর্ণ হইবার সাধনাই তাঁহার কাব্য-জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা।" কিন্তু যতীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে মৃত্যুকে বহুবার উপস্থিত করেছেন এবং কখনই জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করার চেষ্টা করেননি। জীবন তার সহস্র জটিলতা, দুঃখ-বেদনা নিয়ে কবিকে ভাবিয়েছে এবং মৃত্যু তার যথার্থ স্বরূপে, অতি বাস্তব পরিচয় সহকারে উপস্থিত থেকেছে।

প্রথম পর্বের তিনটি কাব্যগ্রন্থের (বা 'অনুপূর্বার') বিভিন্ন কবিতাতেই যতীন্দ্রনাথ তাঁর মৃত্যু সম্পর্কিত ধারণা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। জীবনবোধে যেমন তির্যক, মৃত্যুতত্ত্বেও (অবশ্য যদি একে তত্ত্ব হিসাবে দেখতে চাই, তবেই। নচেৎ 'মৃত্যু সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি' বলা যায়) তেমনই বস্তুবাদী ছিলেন কবি। 'জীবন ও মৃত্যু' কবিতায় মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বা বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে এ- ভাবে , —

" জীবনতত্ত্ব যত ভাবি মোরা নহে তত বেশি কূট.
জীবনের মানে, — মরণ তাড়নে উঠে পড়ে শুধু ছুট্
মৃত্যু ভয়ের কারণ সূত্রে জীবনের মালা গাঁথা।"

মৃত্যুর আতঙ্ক একটা ভয়াবহ তাড়নায় জীবনকে প্রতিনিয়ত নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে,—

"যত খুলে যায় পাক
মরণেরই দমে জীবনের ঘড়ি টিক্‌টাক্ ঠিক্‌ঠাক্।'

কাজেই জীবন ও মৃত্যু নিয়ে কাল্পনিক কোনো ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে, জীবন ও মৃত্যুর মৈত্রীবোধে বিহ্বল হবার ব্যাপারে কবির-প্রচণ্ড আপত্তি। 'মরণাতঙ্ক রোগ' নিরাময়ের জন্য একদিকে ' ওঁ হ্রীং ফবট্' মন্ত্রে ঝাড়ফুঁক-মুষ্টিযোগ, অন্যদিকে রোমান্টিক কবিদের মৃত্যু সম্বন্ধীয় ভাব-বিলাস (যেমন রবীন্দ্রনাথের 'মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম-সমান') কবি মোটেও পছন্দ করেননি। যতীন্দ্রনাথ এই কবিতার শেষে দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন , —

" নিজেরে ছলিতে বাহাদুরি জিতে মিথ্যে বোলো না ভাই,
মরণের আগে মরণের ভয় কারো কভু কাটে নাই।"

'ঘুমের ঘোরে' কবিতায় যতীন্দ্রনাথ হৃদয়-বন্ধু ঈশ্বরের সঙ্গে একান্ত আলাপে কখনও অভিযোগে, কখনও কৈফিয়তে কিংবা অন্তরের বাণী উন্মোচনের মাধ্যমে নিজের কাব্য-ভাবনা এবং জীবনবোধ ব্যক্ত করেছেন। বেঁচে থাকার জন্যই এ পৃথিবীর সাধারণ মানুষকে এত বেশি লড়াই করতে হয় যে মৃত্যু-বিলাস তার কাছে একান্ত অবান্তর , —

" প্রাণের দুঃখ না যাক কিন্তু যাবে দুঃখের প্রাণ।
বন্ধু , প্রণাম হই, —
শীতের বাতাসে জমে যায় দেহ — ছেঁড়া কাথাখানা কই?

যতীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে কেন্দ্র করে কোনো মোহময় দর্শন তৈরি করতে চাননি। তিনি যুক্তিবাদী এবং বস্তুবাদী। তাঁর কাব্যপ্রাণকে ঘিরে রেখেছিল একটা ব্যঙ্গের — বিদ্রূপের মনোভাব। প্রেম, ভালবাসা, সৌন্দর্য, অধ্যাত্মবাদ কাব্যসৃষ্টির মূলে — এই পুরনো ধারণাকে মিথ্যাচার বলে তিনি অস্বীকার করেছেন। তাই তাঁর মনে হয়েছে, —

"এ ধরা গোরস্থান, —

মরণের ভিতে স্মরণের ঢিপি দুদিনে ভুমি সমান।"

'অন্ধকার' কবিতাটি মূলত রূপকাশ্রয়ী। তাঁর কাছে অন্ধকারের অন্য নামই মৃত্যু। কবি তাকে আহ্বান জানিয়েছেন , —

"আলোরূপী শিবে করি শব চরণে চাপিয়া

কালরূপী মহাকালী নৃত্যপরা নিখিল ব্যাপিয়া।"

সেই অন্ধকারের দেবতার কাছে কবির প্রার্থনা, —

" দাও টানি দৃপ্ত যবনিকা

লভুক নির্বাণ সেথা শেষ রশ্মিশিখা।

দাও সমাপণ-শান্তি, দাও সুপ্তি মহাসান্ত্বনার।"

অন্ধকার ও ঘুম — এই দুটিই যতীন্দ্রনাথের মৃত্যুভাবনার প্রধান প্রতীক। পৃথিবীর যাতীয় বঞ্চনা, শোষণ-পীড়ন থেকে মুক্তি পেতে এই মরণ-ঘুমই তাঁর একমাত্র আশ্রয়।

'২২ শে শ্রাবণ ১৩৪৮' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু-দিবসের শব-যাত্রার দর্শক যতীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট মৃত্যু দর্শন। কবি কিছু কিছু রবীন্দ্র-উদ্ধৃতি, রবীন্দ্র-ভাবনার পরিচয়-সহ বিশ্বকবির 'মরণজয়ী' মৃত্যুদর্শনকে বিদ্রূপ করেছেন এখানে , —

" কলুটোলা স্ট্রীট, কলেজ স্ট্রীট,

কর্নওয়ালিস স্ট্রীট হয়ে পথিক যাবে।

তারই একটা মোড়ে —

সহস্র নিরুপায়ের ভিড়ে দাঁড়িয়ে ভিজছি।

দূর হতে কানে আসছে —

বিপুল পরাজয়ের তুমুল জয়ধ্বনি!

সহসা দেখা গেল —

মরণের কুসুমকেতন জয়রথ!

মনে হ'ল —

কি বিচিত্র তোমার —

কি বিচিত্র সাজ।"

নীলকমলের পাপড়ি নিষ্ঠুর, প্রত্যক্ষ বাস্তবে টুকরো-টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে কলেজ স্ট্রিট কলুটোলার পথে। মৃত্যু একান্ত রূঢ় সত্য। তাকে বিজয়মাল্যে যতই ভূষিত করা হোক না, বাস্তবে জীবনের সমাপ্তিই এর সত্য পরিচয়।

যতীন্দ্রনাথের মৃত্যুভাবনায় মনে হয়েছে সুখের দেবতা বেঁচে থাকেন না। তিনি যে দেবতাকে জানেন আশুতোষ হিসাবে সেই দেবতা মানুষের পূজা পেয়ে ঘুমিয়ে পড়েন, মানুষের সুখ সম্বন্ধে তিনি উদাসীন , —

"সুখের দেবতা মরে যুগে যুগে, তুমি চির দুঃখময়,

সুখ বাঁচে মরে, দুঃখ অমর — তুমি মৃত্যুঞ্জয়!" (শিবস্তোত্র)

সৃষ্টির পর থেকে মৃত্যুপথযাত্রী মানুষকে তিনি দেখেন এভাবে, —

" যদিও তোমারে ঘেরিয়া রয়েছে মৃত্যুর মহারাত্রি,

সৃষ্টির মাঝে তুমিই সৃষ্টি-ছাড়া দুখ-পথ-যাত্রী!" (দুঃখবাদী)

অথবা, '**রেলঘুম**' কবিতায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ছলে, রেলের চলার ছন্দে কলকাতাবাসীর জীবনযাত্রার কথা বলেন, —

"ঢক্কোর ঢক্কোর ঘটা ঘটা ঢক্কোর,
চোখ বুঁজে পথ খুঁজে কত খাই টক্কোর।
ধিকি ধিক্ ধিকি ধিক্ এই পথ ঠিক্ ঠিক্।
ধুকু ধুক্ ধুকু ধুক্ কত ভুল কত চুক্।
ধুক্ ধুকু ধুক্ ধুকু পারিনে এ পথটুকু।
ধুকু ধুকু ধক্কাৎ থামলাম নির্ঘাত

মৃত্যুর সাক্ষাৎ।

যমরাজ, খোল খাতা , —

একি, এ যে কোলকাতা!"

আপনারা অবশ্যই এই প্রসঙ্গে 'কেতকী', 'মুক্তিঘুম' ইত্যাদি কবিতাও পড়বেন। তবে মনে রাখবেন যতীন্দ্রনাথের মৃত্যুচিন্তা বাস্তব যুক্তিবোধের সরল পথে এসেছে। কাব্য-পর্যায়ের নতুন লগ্নে, অর্থাৎ 'ত্রিযামা' থেকে মৃত্যু-চিন্তা ও জীবনভাবনায় কবি নতুন বোধে পৌঁছেছেন।

আত্মসমীক্ষাত্মক প্রশ্ন

যতীন্দ্র-কাব্যে 'ঘুম-ভাবনা' কী দ্যোতনা নিয়ে আসে তা ১০০ শব্দের মধ্যে লিখুন।

.....

.....

.....

.....

.....

২.৫ যতীন্দ্র কবিতায় মানুষ

কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর কাব্যের লক্ষ্য নিঃসন্দেহে বস্তুমুখী জীবনবোধ। মানুষের প্রতি সচেতন ভালবাসায়, জাগতিক সত্যে তার প্রতিষ্ঠা । সুনির্দিষ্টভাবে তিনি শোষিত সাধারণ মানুষের প্রতি সহৃদয়তা প্রকাশ করেছেন। সতর্ক প্রহরীর মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মানুষের চারপাশে যত ভ্রান্তির মোহজাল দেখেছেন — তাদের কখনও রূপকের আড়ালে বা সরাসরি আঘাত করেছেন। সাধারণ মানুষের প্রতি আন্তরিক প্রীতিই তাঁকে সত্যানুসন্ধানী করেছে।

আমরা জানি যতীন্দ্রনাথের কাব্য রচনার দুটি পর্ব আছে আর অনুপূর্বাতে সেই দুটি পর্ব থেকেই কবিতা সংকলিত হয়েছে। প্রথম পর্বের কবিতায় (অর্থাৎ 'মরু' চিহ্নিত তিনটি কাব্যগ্রন্থের কবিতায়) কবি নিষ্ঠুর কঠোরতার আঘাতে মানুষের চারপাশের যাবতীয় মোহজাল ছিন্ন করতে চেয়েছেন। বিশুদ্ধ প্রেম, বিহ্বল ভক্তিরস এবং প্রকৃতির পবিত্র সৌন্দর্যবোধের ধারণা আধুনিক পৃথিবীর পক্ষে একান্ত মিথ্যাচার — এই সত্য কবি প্রথমেই উপলব্ধি করেছেন। সুতরাং এই পর্বের কবিতায় তিনি মিথ্যাচারের অন্ধরাজ্য থেকে মানুষকে উদ্ধার করতে চাইছেন। প্রথম পর্বে লেখা 'দুঃখবাদী' কবিতায় কবি বলেছেন, —

" শুনহ মানুষ ভাই!
সবার উপরে মানুষ শ্রেষ্ঠ, স্রষ্টা আছে বা নাই !"

এখানে তিনি মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করছেন — যার দ্বারা পরবর্তী আধুনিক কবিরা আকৃষ্ট হয়েছিলেন। প্রকৃতি প্রেমের ফাঁদ পেতে দুঃখী মানুষকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা করে। তাকে ব্যর্থ করতে কবি বারবার সত্যের ছবি তুলে ধরেন , —

" সৃষ্টির সুখে মহাখুশি যারা, তারা নর নহে , জড় ;
যারা চিরদিন কেঁদে কাটাইল তারাই শ্রেষ্ঠতর।"

আবার 'ঘুমের ঘোরে' কবিতায় সুন্দরভাবে মানুষের বাস্তব জীবনকে বর্ণনা করেন, —

" আমারি মতন এসেছে হেসেছে কেঁদেছে কত না প্রাণী,

আজ তাহাদের একটিরও কেহ সন্ধান নাহি জানি।

আমারও দুঃখ সুখ

ধূলা হয়ে যাবে — চাহি বা না চাহি তোমার পাষাণ মুখ।"

'লোহার ব্যথা' কবিতায় শোষিত মানুষের কথা রূপকের আড়ালে। শোষণ পীড়নের ছবি এবং সেইসঙ্গে শোষক-শোষিতের সম্পর্ক কামারশালার প্রেক্ষাপটে কবি ফুটিয়ে তুলেছেন। শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের প্রতি সহমর্মিতায় তাদের জীবনের দুঃখকে কবি তুলে ধরেন এইভাবে , —

" ঘন ঘন ঘন পরিবর্তনে আপনা চিনিতে নারি,

স্থির হয়ে যাই ভাবিবারে চাই, পড়ে হাতুড়ির বাড়ি।"

অবশ্য শাসক বা শোষকের বিরুদ্ধে এই শ্রমজীবী মানুষের প্রতিবাদকেও দেখাতে ভোলেননি কবি , —

" আগুনের তাপে শাঁড়াসির চাপে আমি চির-নিরুপায়,

তবু সগর্বে ভুলিনি ফিরাতে প্রতি হাতুড়ির ঘায়।

যাহা অন্যায়, হোক্ না প্রবল, করিয়াছি প্রতিবাদ ;

আমার বুকের কোমল অংশ, কে বলিল তারে খাদ!"

'খেজুরবাগান' কবিতায় যদিও চাষার কথা আছে তবুও সেই চাষার স্বরূপ কিন্তু খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষ নয় — এখানে সে শোষক, প্রকৃতি হন্তাকারী। খেজুরগাছ এখানে শোষিত মানুষের রূপক। বিষয়টি আমরা দুটি পঙ্‌ক্তির উল্লেখেই বুঝতে পারব,—

" চোখের অভাবে জমাট অশ্রু বুকে বেঁধেছিল বাসা,

সে চক্ষুদান করিয়া বৃক্ষে বড়লোক হলো চাষা।"

কাব্যরচনার দ্বিতীয় পর্বে যতীন্দ্রনাথ মানুষের প্রশস্তি করেছেন। তখন বারবার অতীতের কাব্য-রচনার তিক্ততাগুলোর কথা মনে পড়েছে। কিন্তু মানবিকতার জয় ঘোষণা করেছেন। 'কচিডাব' কবিতায় আরাধ্য দেবতাকে তিনি মানুষের মূর্তিতে এঁকেছেন। শঙ্কর এক শীর্ণ বৃদ্ধ ডাবওয়ালা হয়ে কবির দরজায় এসেছেন, —

"দারুণ শীতের সাঁঝ হে আমার নটরাজ

কোন্ রূপে এসেছিলে দ্বারে?

অশ্রুর সাগরমন্থ হে আমার নীলকণ্ঠ

ভাগ্যে ফিরাইনি একেবারে!"

ব্যক্তিগত জীবনে কবি ছিলেন চাকরিজীবী মধ্যবিত্ত। সুতরাং মধ্যবিত্তের সমস্যা তাঁর জানা ছিল। মধ্যবিত্ত মানুষের দোটানা মনোবৃত্তির কথাও তাঁর জানা। নাগরিক শোষণ

ক্রিয়ার মধ্যে নিজস্ব শ্রেণির অবস্থানকে উপলব্ধি করা তাই তাঁর পক্ষে সহজ হয়েছে। আর তাই লেখনীকে সচল করেছেন তাঁর উপলব্ধিকে নাগরিক মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে। একই আন্তরিকতায় নিজের শ্রেণিগত সীমাবদ্ধতাকে ডিঙিয়ে বাংলা গ্রাম-সমাজের নিপীড়িত মানুষের বেদনাকে প্রকাশ করেছেন। আপনারা এ-বিষয়ে যতীন্দ্রনাথের 'পথের চাকরি', 'ফেমিন লিরিফ', 'দেশোদ্ধার', 'শরতে বঙ্গভূমি', 'কেতকী' প্রভৃতি কবিতাগুলো পড়তে পারেন।

২.৬ উদ্ধৃতি সংকলন

এখানে আমরা যতীন্দ্রনাথের কবিতা ও ভাবনা-চিন্তা সম্পর্কিত কিছু মন্তব্য তুলে ধরছি।

১. " আমরা 'কল্লোলের' অর্বাচীনেরা যখন বিস্মিত হয়ে শুনছি 'বিস্মরণী'র বড়ো-বড়ো তাল, ঢেউয়ের মতো গড়িয়ে চলা কল্লোল, সেই সময়েই যতীন্দ্রনাথ আমাদের অভিনিবেশ দাবি করলেন প্রায় উল্টো রকমের সুর শুনিয়ে — সহজ, টাটকা, আটপৌরে, এবড়ো-খেবড়ো মাঠের উপর দিয়ে চৈত্র মাসের শুকনো হাওয়ার মধ্যে খুব কষে গরুর গাড়ি চালিয়ে নেবার মতো সুর।" — বুদ্ধদেব বসু

('কবিতা' আশ্বিন, **১৩৬১**/ কালের পুতুল - **১৯৫৪**, পৃ: **১৩৩-৩৪-৩৫**)

২. " সমসাময়িক বাংলা কাব্যের উপরে যতীন্দ্রনাথের প্রভাব পড়েছে রূপের দিক থেকে, ভাবের দিক থেকে নয়।" — বুদ্ধদেব বসু (ওই)

৩. " কঠোরতার তিক্ত চৈতন্যেই তিনি (যতীন্দ্রনাথ) প্রগল্‌ভ। তাঁর ব্যবহৃত প্রসঙ্গে, শব্দে, বিদ্রূপে সর্বত্র দেখা যায় পরিশীলিত তিক্ততা।" — হরপ্রসাদ মিত্র (কবিতার বিচিত্র কথা — 'স্রষ্টার সংশয়', নভেম্বর - **১৯৬৪**, পৃ: **১৯০**)

৪. " স্বভাব কবির অথবা অনুকরণসর্বস্ব কবির 'টোপ' গিলতে চাননি যতীন্দ্রনাথ। প্রধানত এইটেই তাঁর বিশেষত্ব, — তাঁর স্বভাব। 'কল্লোল' গোষ্ঠী এই কারণেই তাঁর ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন।" — হরপ্রসাদ মিত্র (ওই)

৫. " যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের বিদ্রোহ মুগ্ধ আত্মতৃপ্তির বিরুদ্ধে, নিমীলিত নেত্রে সৌন্দর্যারতি বাঙলা কবিতাকে পঙ্কবদ্ধ করল — তার বিরুদ্ধে, রোমান্টিক স্বপ্নবিলাসের বিরুদ্ধে। নিশ্চিন্ত রোমান্টিক সৌন্দর্যধ্যান, অন্ধ রবীন্দ্রানুগত্য, মঞ্জুল-বাক্‌সর্বস্বতার বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ বিদ্রূপে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো ... যতীন্দ্রনাথ এতাবৎকাল-প্রচলিত ভাবের-ঘরে-চুরি ধরে ফেলেই ক্ষান্ত হননি, তাকে ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণ শায়কে জর্জরিত করেছিলেন।" — অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

(আধুনিক কবিতার ইতিহাস — সম্পা: অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত এবং দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। জুন,**১৯৬৫**, 'রবীন্দ্রমুহূর্ত'। পৃ: **৭৮**)

৬. " তাঁর (যতীন্দ্রনাথের) কবিতার ছত্রে-ছত্রে রূপায়িত হয় বাস্তবিক আর আপাতিকের বিরোধ। পাশাপাশি শব্দকে বা উপমাকে তাই বৈপরীত্যময় সংঘাতে বাজিয়ে তুলে জীবনের সেই অন্তর্নিহিত বিরোধকে মূর্ত করেন এই কবি, আর সেইভাবে পরিস্ফুট হয় তাঁর কবিদৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য।" — অশ্রুকুমার সিকদার (হাজার বছরের বাংলা কবিতা। পৃ: ১২৫)

৭. " জীবন সম্বন্ধে আবেগময় সমালোচনার তাড়নাই , মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী মনোভাব যতীন্দ্রনাথকে কবি করেছিল।" — অশ্রুকুমার সিকদার (ওই)

৮. " কবিরা সাধারণত সুন্দরের এবং মধুরের উপাসক — কিন্তু কবি যতীন্দ্রনাথ প্রথমাবধিই রুদ্রের উপাসক।" — শশিভূষণ দাশগুপ্ত (কবি যতীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাঙলা কবিতার প্রথম পর্যায় - পৃ: ৩)

৯. " একদিকে অন্তবিহীন জীবনজিজ্ঞাসার উদগ্নতা — অন্যদিকে সত্যকার সমাধান লাভের ব্যর্থতা এবং তাহারই সঙ্গে চারিদিক হইতে শুধু সত্য, শিব ও সুন্দরের নামে আত্মপ্রবঞ্চনার আয়োজন ও প্রলোভন যৌবনেই কবিকে ক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছিল।" — শশিভূষণ দাশগুপ্ত (ওই, পৃ: ৮)

১০. " কবির কবিতাগুলি সমগ্রভাবে বিচার করিলে দেখিতে পাইব, তিনি অপরাজেয় মানবতাবাদী ; এই অপরাজেয় মানবতাবাদ আসিয়াছে বিশ্বাতীত দৈবের বিরুদ্ধে — এই বিদ্রোহই চারিদিকে জ্বালাইয়া রাখিতে চায় অনির্বাণ জ্বালা।" — শশিভূষণ দাশগুপ্ত (ওই, পৃ:২৪)

১১. "রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রধর্মী অন্যান্য কবিগণের সহিত যতীন্দ্রনাথের যে তফাৎ তাহা মানসিক গঠনের একটা মৌলিক তফাৎ।" — শশিভূষণ দাশগুপ্ত (ওই, পৃ: ৫৭)

১২. " ক্রমঘনীভূত মনুষ্য-প্রীতির ফলে বর্তমান যুগের কবির মনে এই কৃত্রিম শ্রেণী বৈষম্য এবং তজ্জনিত অবিচার এবং বেদনা গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করিবেই — যতীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও আমরা তাহাই দেখিতে পাইয়াছি।" — শশিভূষণ দাশগুপ্ত (ওই, - পৃ: ৭৮)

১৩. " কবিতার নির্মিতির মধ্যে যতীন্দ্রনাথ যে বলিষ্ঠ সরসতা সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন তাহার মূল কারণ ভাষার সঙ্কেতশক্তি সম্বন্ধে কবির একটা সতর্ক সচেতনতা।" — শশিভূষণ দাশগুপ্ত (ওই, পৃ: ১২৬)

১৪. ভাবের আধুনিকতার দিক থেকে যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব অভিজ্ঞতা। আমাদের তদানীন্তন মনোভাবের সঙ্গে চমৎকার মিলে গিয়েছিল। দুঃখের মধ্যে কাব্যের যে বিলাস আছে সেই বিলাসে আমরা মশগুল ছিলাম।" — অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (কল্লোলযুগ, ১৩৫৮, পৃ: ১৩৯-৪০)

১৫. "কবি যতীন্দ্রনাথ কবিতার চিত্রকর — তিনি যথার্থ শিল্পী। যতীন্দ্রনাথ কেবল

চিত্র আঁকেননি তিনি সার্থক চিত্রকল্প সৃষ্টি করেছেন। " — কাননবিহারী ঘোষ (রবীন্দ্র-কবিতার বিপরীত স্রোত : যতীন্দ্রনাথ ও মোহিতলাল - পৃ: ৮২ : জানুয়ারি, ১৯৯৮)

জেনে রাখুন

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর 'কাব্য-পরিমিতি' গ্রন্থের ভূমিকায় কালিদাস রায় লিখেছেন,—

" কিছুদিন পরে কবিগুরু কবিবর যতীন্দ্রমোহন বাগচীর গৃহে আমন্ত্রিত হইয়া আসিলে যতীন্দ্রমোহন কবিগুরুর সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের পরিচয় সাধন করিলেন। কবিগুরু বলিলেন, — 'কালিদাস আমাকে তোমার কাব্য-পরিমিতি একখানা পাঠিয়েছিলেন। খুব Interesting. তুমিই সেই যতীন্দ্রনাথ?"

কিন্তু কবিপুত্র সুনীলকান্তি সেন এই তথ্যকে স্বীকার করেন না। তাঁর মতে যতীন্দ্রনাথ কোনোদিনই রবীন্দ্র-সান্নিধ্যে আসেননি। যদিও বিশিষ্ট যতীন্দ্র কাব্য-আলোচক শশিভূষণ দাশগুপ্ত যতীন্দ্রনাথকে রবীন্দ্র-কাব্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হিসাবে দেখেছেন। (দ্র: — কবি যতীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম পর্যায়)

১৬. " 'কচিডাব' শুধু যতীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতা নয় — সমস্ত বাংলা সাহিত্যের একটি অনন্য সৃষ্টি। যতীন্দ্রনাথের কাব্যদর্শন এই কবিতাতেই সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত। পীড়িত, লাঞ্ছিত মানুষের প্রতি নিবিড়তম বেদনাবোধ, দুঃখহত জীবনের প্রতি আত্মীয়তার অনুভবে বিশ্বব্যাপী দীনদরিদ্রের স্বপক্ষে এইটিই তাঁর বলিষ্ঠতম ঘোষণা।" — নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (কথাসাহিত্য, পৌষ)

১৭. " যিনি দরিদ্র, যিনি ভিখারি, সংসারের সমস্ত কালকূট সেবনে যিনি নীলকণ্ঠ — যতীন্দ্রনাথের কাব্যে তিনি ইষ্টদেবতা। ... যতীন্দ্রনাথের শঙ্কর লোকায়ত, তিনি মন্ত্রহীন ব্রাত্যদের দেবতা।" — নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (ওই)

১৮. " যতীন্দ্রনাথ নিজেকে দুঃখবাদী বৈরাগী বলে পরিচয় দিতে চেয়েছেন। আপাতদৃষ্টিতে তাঁর কাব্যে কিছুটা দুঃখবাদ আছে তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই দুঃখবাদের অর্থ পরাজয়বাদ নয়। 'শোপেনহাওয়ারি' শূন্যতার মন্ত্রে তিনি দীক্ষা নেননি। তাঁর শ্লেষের আঘাত আত্ম-ধ্বংসমূলক নয় — তা আত্মসমীক্ষামূলক। ভণ্ডামি, মূঢ়তা, বঞ্চনা আর বাষ্পাবিলতার বিরুদ্ধে তাঁর খরধার আক্রমণ।" — নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (ওই)

১৯. " যতীন্দ্রনাথের কাব্যশিল্প সহজ ও স্পষ্ট, কারুকার্যহীন, হয়ত খানিকটা শ্লথ। তবে কবির অনুভব ও আবেগ খাঁটি, উজ্জ্বল ও সংযত।" — সুকুমার সেন (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ৫ম খণ্ড, পৃ: - ২৯৭)

১.৭. আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

'অনুপূর্বা' সম্বন্ধে নানা আলোচনা আমরা এখানে শেষ করলাম। বর্তমান বিভাগের

শুরুতে আমরা বলেছিলাম যে, যতীন্দ্রনাথের মানস-বৈশিষ্ট্যটিকে বিভিন্ন কবিতার আলোচনা দিয়ে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করব। যতীন্দ্রনাথের শব্দ-প্রয়োগ, ছন্দ-ভাবনা, বাক্‌রীতি ইত্যাদির নানা উদাহরণ দিয়ে আমরা শৈলীবিচার করেছি। 'দুঃখবাদ' চিহ্নিত বা সম্পর্কিত কয়েকটি কবিতার বিশ্লেষণ করে এই দুঃখবাদের ভাষা ও বক্তব্যকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। এইভাবে ঈশ্বর বা শিবচেতনার স্বরূপ, মানুষ ইত্যাদি নানা বিষয়েও পাঠ্য কবিতা অবলম্বনে আলোচনা করা হয়েছে। সেইসঙ্গে যতীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভা সম্বন্ধে নানা জনের নানা মতামতও এখানে সন্নিবিষ্ট হয়েছে , যেগুলো কবিকে বুঝতে সাহায্য করবে। যতীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ; কিন্তু আলাদা করে এ-বিষয়ে আলোচনা করা হয়নি পুনরুক্তির আশঙ্কায়। প্রায় প্রতিটি বিষয়ের আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। সুতরাং মনোনিবেশ করলে আপনারা এ-বিষয়টি নিয়ে লিখতে পারবেন। সাহায্য অবশ্যই নেবেন 'প্রসঙ্গ-পুস্তক' থেকে।

২.৮. প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

কল্লোল গোষ্ঠী : ১৩৩০-র পয়লা বৈশাখ কল্লোল পত্রিকা প্রকাশিত হয়। দীনেশরঞ্জন দাস, গোকুলচন্দ্র নাগ প্রমুখ কয়েকজনের প্রয়াসে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে একটি কবিগোষ্ঠী — এটাই কল্লোলগোষ্ঠী নামে পরিচিত। এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত কবিরা হলেন , — প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, মণীন্দ্রলাল বসু, বিনয় চক্রবর্তী, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, নারায়ণ ভট্টাচার্য, বুদ্ধদেব বসু এবং এরকম আরো অনেকে। প্রত্যক্ষ না হলেও সেদিন পরোক্ষভাবে যোগাযোগ ঘটেছিল জীবনানন্দ দাশেরও।

জন ডান : প্রথম সার্থক ইংরেজ স্যাটায়ারিস্ট কবি (**১৫৭৩ - ১৬৩৯**) । এই কবি এলিজাবেথীয় যুগের হয়েও, প্রেমের অকুণ্ঠ প্রকাশ এবং গোঁড়ামিশূন্যতার দিক থেকে এই যুগের সঙ্গে তাঁর মনের মিল থাকলেও, সে যুগের কাব্যের সঙ্গে তাঁর কাব্যের মিল নেই। অধ্যাত্মবাদী বা 'মেটাকিজিকাল' কবি হিসাবে যাঁরা পরিচিত, ডান তাঁদের পথপ্রদর্শক। 'দ্য স্টর্ম' এবং 'দ্য কাম' তাঁর দুটি শ্রেষ্ঠ কবিতা। শেষ- জীবনে তিনি যাজকের ব্রত গ্রহণ করেছিলেন।

টমাস হার্ডি : ভিক্টোরীয় যুগ ও পরবর্তী যুগ — এই দুই যুগ ব্যাপ্ত করে হার্ডির জীবনকাল (**১০৪৮ - ১৯২৮**)। এই কবির দৃষ্টিভঙ্গি বৈজ্ঞানিক, কেন-না তিনি উপলব্ধি করেছেন, মানুষ স্বাধীন নয়। তাঁর লেখাতে ফুটে উঠেছে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ নয়, মনোরম কবি-কল্পনা। তিনি মূলত ঔপন্যাসিক, তবে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য কবিতাও রচনা করেছেন। 'আন্ডার দি গ্রীণউড ট্রি', 'ওয়েসেক্স টেলস্', 'দ্য ট্রাম্পেট মেজর', 'ওয়েসেক্স পোয়েমস্', 'ডাইনাস্টস্' ইত্যাদি তাঁর কিছু উল্লেখযোগ্য রচনা।

মণীন্দ্রলাল বসু : (১৮৯৭ - ১৯৮৬) কবির আদি নিবাস চব্বিশ পরগণার চাংড়িপোতায়। তিনি বিশিষ্ট রোমান্টিক উপন্যাস 'রমলা'র লেখক। পেশায় ছিলেন ব্যারিস্টার। সাহিত্যরচনার শুরু ছোটোগল্প দিয়ে। একাধিকবার 'প্রবাসী' পত্রিকার গল্প প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেয়েছেন। শিশুদের জন্য বেশ কিছু বইও তিনি লেখেন। 'পরিকল্পনা' নামে একটি অর্থনীতি বিষয়ক পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন।

শোপেনহাওয়ার: আর্থার শোপেনহাওয়ার (Arthur Schopenhauer) (১৭৮৮ - ১৮৬০) একজন বিশিষ্ট জার্মান দার্শনিক। তিনি আধুনিক সমাজের কাছে বিশেষ-ভাবে পরিচিত তাঁর দুঃখবাদী বা শূন্যবাদী দর্শনের জন্য। তাঁর দর্শনচিন্তা প্রকাশ পেয়েছে 'দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাজ উইল অ্যান্ড আইডিয়া' (১৮১৯) বইতে। শোপেনহাওয়ারের মতে মানুষের জীবনে ট্র্যাজেডির উদ্ভব তার ইচ্ছাশক্তির (Will) চরিত্র অনুযায়ী, যে ক্রমাগত মানুষকে তার সন্তোষ উৎপাদক লক্ষ্যগুলোর দিকে ঠেলে নিয়ে যায় — অথচ ওই লক্ষ্যগুলোর একটাও তাকে পূর্ণ সন্তুষ্টি দিতে পারে না। ফলে ওই ইচ্ছাশক্তি বা 'Will' মানুষকে অপ্রাপ্তিজনিত দুঃখবোধের দিকে নিয়ে যায়।

২.৯ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

১. 'ঘুমের ঘোরে' কবিতা অবলম্বনে যতীন্দ্রনাথের শব্দ ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করুন।

২. পাঠ্য কবিতা অবলম্বনে যতীন্দ্রনাথের কাব্যশৈলী বিশ্লেষণ করুন।

৩. 'দুঃখবাদী', ও 'কেতকী' কবিতা অবলম্বনে যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদের স্বরূপ বিশ্লেষণ করুন।

৪. 'ঘুমের ঘোরে' কবিতাটি কোন্ কোন্ দিক থেকে বিশিষ্ট তা আলোচনা করুন।

৫. পাঠ্য কবিতা অবলম্বনে যতীন্দ্রনাথের ঈশ্বর-ভাবনার স্বরূপ ব্যাখ্যা করুন।

৬. যতীন্দ্র-কাব্যে মানুষের স্থান কোথায়? পাঠ্য কবিতা অবলম্বনে বিষয়টি বুঝিয়ে লিখুন।

৭. যতীন্দ্র-কাব্যে মৃত্যুচেতনার স্বরূপ আলোচনা করুন।

৮. ঈশ্বর ভাবনার ক্ষেত্রে যতীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের একটি তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৯. 'কচিডাব' কবিতাটিতে কবির মনোভাব বিশ্লেষণ করুন।

১০. 'শিবস্তোত্র' এবং 'কেতকী' কবিতার ভাব ও বিষয়বস্তু আলোচনা করুন।

১১. 'যতীন্দ্রনাথের শঙ্কর লোকায়ত, তিনি মন্ত্রহীন ব্রাত্যদের দেবতা।' — পাঠ্য কবিতা অবলম্বনে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

১২. 'ভাষার সঙ্কেতশক্তি' কীভাবে যতীন্দ্রকাব্যে ফুটে উঠেছে তা উদাহরণ-সহ আলোচনা করুন।

২.১০ প্রসঙ্গ- পুস্তক (References/Suggested Readings)

১. অনুপূর্বা — যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (মিত্র ও ঘোষ , শ্রাবণ ১৩৭১)
২. কবি যতীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাঙলা কবিতার প্রথম পর্যায় — শশিভূষণ দাশগুপ্ত (সুপ্রিম পাবলিশার্স, আষাঢ়১৩৯৭)
৩. যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত : কবিমন ও কাব্য — জ্যোৎস্না গুপ্ত (১৯৮৮)
৪. কবি যতীন্দ্রনাথ : কবিমানস ও কবিতা — বারীন্দ্র বসু , (পুস্তক বিপণি ,১৯৮৯)
৫. কবিতার বিচিত্র কথা — হরপ্রসাদ মিত্র (রবীন্দ্র লাইব্রেরি , ১৯৬৪)
৬. আধুনিক কবিতার ইতিহাস — সম্পা, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (বাক্‌সাহিত্য , ১৯৬৫)
৭. হাজার বছরের বাংলা কবিতা — অশ্রুকুমার সিকদার (পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৯)
৮. রবীন্দ্র-কবিতার বিপরীত স্রোত : যতীন্দ্রনাথ মোহিতলাল — কাননবিহারী ঘোষ (পুনশ্চ, ১৯৯৮)
৯. কল্লোল যুগ — অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (এম. সি. ১৩৫৭)
১০. প্রসঙ্গ : হাজার বছরের বাংলা কবিতা — সম্পা, ছন্দা রায় ও তরুণ মুখোপাধ্যায় (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১)
১১. কথাসাহিত্য — নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (প্রবন্ধ)
১২. কালের পুতুল — বুদ্ধদেব বসু (১৯৫৯)
১৩. বাংলা কবিতার কালান্তর — সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৪. কালের পুতুল — বুদ্ধদেব বসু (৩য় সং. ১৯৯৭ , নিউ এজ)

* * *

বিভাগ-৩

অনুপূর্বা

অনুপূর্বা : নির্বাচিত কবিতা আলোচনা

বিষয় বিন্যাস

৩.০ ভূমিকা (Introduction)

৩.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

৩.২ অনুপূর্বা : নির্বাচিত কবিতা আলোচনা

- ৩.২.১ ঘুমের ঘোরে
- ৩.২.২ শিবস্তোত্র
- ৩.২.৩ দুঃখবাদী
- ৩.২.৪ কেতকী
- ৩.২.৫ কচিডাব

৩.৩ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

৩.৪ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

৩.৫ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

৩.০ ভূমিকা (Introduction)

'কল্লোল' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যের রূপ বদল হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রেম-প্রকৃতি-ভক্তির রসসিক্ত মানসিকতা এবং মার্জিত মধুর শব্দ-ব্যবহার ক্রমেই আধুনিক কবিদের কাছে প্রাসঙ্গিকতা হারাচ্ছিল। সেই আধুনিক কবিদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত অন্যতম। যতীন্দ্রনাথের তথাকথিত দুঃখতত্ত্ব ও নৈরাশ্যবাদ রবীন্দ্র-প্রভাব থেকে বের হয়ে এসে নতুন জগতে পদার্পণ করে। এই বিভাগে 'অনুপূর্বা'-এর নির্বাচিত কবিতা আলোচনায় তার-ই নিদর্শন বর্তমান।

৩.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

আলোচ্য বিভাগ থেকে আপনারা জানতে পারবেন — 'অনুপূর্বা'-এর নির্বাচিত কবিতাবলি 'ঘুমের ঘোরে', 'শিবস্তোত্র', 'দুঃখবাদী', 'কেতকী' ও 'কচিডাব' প্রভৃতির মূলভাব ও বিষয়বস্তু।

৩.২ অনুপূর্বা : নির্বাচিত কবিতা আলোচনা

এবার আমরা 'অনুপূর্বা'-এর নির্বাচিত কবিতা — 'ঘোমের ঘোরে', 'শিবস্তোত্র', 'দুঃখবাদী', 'কেতকী', 'কচিডাব' প্রভৃতি কবিতা আলোচনায় অগ্রসর হব।

৩.২.১ ঘুমের ঘোরে

" 'মরীচিকা' কাব্যগ্রন্থের যে কবিতায় কবির দুঃখবাদী দর্শন সর্বাপেক্ষ দৃঢ় প্রত্যয়ে, জীবনচেতনার বাস্তবতায় এবং নিবিড় তাত্ত্বিক উপলব্ধিতে প্রতাশিত সেটি তাঁর 'ঘুমের ঘোরে' কবিতা। কবির দুঃখবাদের সামগ্রিক জীবনদর্শন এই কবিতাটিতে ব্যক্ত। প্রকৃতিতে, একক মানুষের জীবনে, সমাজ জীবনে, এবং রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটে, যেখানে প্রবলের প্রতাপ এবং অত্যাচার কবিকে বিচলিত করেছে সেখানেই কবির তীব্র বেদনার উপলব্ধি, প্রতিবাদ এবং কখনও তীব্র ব্যঙ্গ কটাক্ষে তাকে বিদ্ধ করা। কখনও বা সরস রসিকতায় তাকে কৌতুকময় করে তোলা, কিন্তু প্রকৃত দুঃখবাদীর মতো বিষাদ-সর্বস্ব অনুভূতিতে নিজের মনকে ঢেকে দিয়ে তাকে পাশ কাটিয়ে চলা নয়। এই কবিতায় তাঁর তীব্র প্রতিবাদ বিপুল প্রকৃতি জগতের যান্ত্রিক নিয়মতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে, ব্যক্তিগত সুখ উপভোগের জন্য ব্যক্তি মানুষের লোভ ও হিংস্রতার বিরুদ্ধে, সামাজিক গোষ্ঠীতান্ত্রিক নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে এবং রাষ্ট্রীয় শক্তির কূটকৌশলজাত সর্বগ্রাসী (Totalitarian) রাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে।...

আলোচ্য কবিতায় প্রথম ঝোঁকে কবির চরমতম অনুভূতি, ঈশ্বরকে আমরা যে প্রেমময় বলে মনে করি একথা অসত্য। চেতনার সর্বোচ্চ রূপায়ণ প্রেমশক্তিতে, কিন্তু অন্তিম অনুভূতিতে কবি উপলব্ধি করেছেন, ঈশ্বরের বা প্রকৃতির অভ্যন্তরে যদি কোনো চেতনাশক্তি থাকে, তবে তা কেবলমাত্র ঘুমের ভিতরে স্বপ্নের মতোই। এই জগৎ বিশাল শক্তির আধার, কিন্তু সমস্ত শক্তি তার শক্তি-রূপ পরিহার করে চেতনাহীন জড়ে পরিণত হতে চাইছে। জড়ত্বের মধ্যে জীব যেন 'স্বপ্নের ফেনা', এবং এই জগতে প্রেম বলে কিছু নেই। যত দুঃখ, যত কষ্ট, যত বেদনা সবকিছু থেকেই আমরা মুক্তি পেতে পারি, যদি আমরা আমাদের চেতনাকে জড়ত্বে পরিণত করতে পারি। বিজ্ঞানে বা দর্শনে যাকে আমরা বিশ্বগত শৃঙ্খলা বলে মনে করি তা আসলে স্বপ্নের মতো উপরে উপরে শুধু গোঁজামিলের ভুল অংক, — ...

'জগতের শৃঙ্খলা,—
স্বপ্নেরি মতো উপরে উপরে গোঁজামিল দিয়ে মেলা।
বিচারে যখন ভিতরে ভিতরে ধরা পড়ে লাখো ফাঁকি,
তোমার সে ত্রুটি নিরূপায় হয়ে প্রেমের আড়ালে ঢাকি।
প্রেম ব'লে কিছু নাই —
চেতনা আমার জড়ে মিশাইলে সব সমাধান পাই।'

কবির সামগ্রিক জীবন উপলব্ধির যে প্রাথমিক পর্যায় তাঁর মরীচিকা 'মরুশিখা' ও 'মরুমায়ার' মধ্যে প্রকাশিত, তার বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক অভিব্যক্তি 'ঘুমের ঘোরে' কবিতার প্রথম ঝোঁকে। কবিতাটি মুখ্যত দীপ্তিপ্রধান এবং আমাদের জ্ঞানগত উপলব্ধির সামগ্রী, যদিও মাঝে মাঝে কাব্যসৌন্দর্যে নিষিক্ত কিছু সুন্দর দ্রুতি পরিচায়ত্মক পংক্তিও আছে। কবিতাটির ভঙ্গি কিছুটা ব্যঙ্গাত্মক। ঐ-ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে কবি তাঁর প্রকৃতি-চেতনা, ঈশ্বরচেতনা এবং জীবন-অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করেছেন। কবির মূল বক্তব্য,— চেতনা দুঃখের কারণ। তাকে ঘুম পাড়ালেই শান্তি। এ জগৎ বাহ্যত যতই নিয়মাধীন মনে হোক না কেন, আসলে তা নিয়মহীন এবং বিশৃঙ্খল। ...

এই ঝোঁকের কিছু কিছু পংক্তি অপূর্ব কাব্যরসাত্মক এবং গভীর ভাবদ্যোতক। কখনও তার সঙ্গে তীব্র ব্যঙ্গ মিশ্রিত হয়ে বক্তব্যকে সুগভীর উপলব্ধির বিষয় করে তুলছে। ঈশ্বরভক্ত আমাদের প্রবোধ দেন, ঈশ্বর মঙ্গলময়, তিনি আমাদের সকল দুঃখ দূর করবেন। কিন্তু যখন তাঁর প্রবোধ মিথ্যা প্রমাণিত হয় তখন তাঁর যে কুযুক্তি, তাকেই কবি তীব্র ব্যঙ্গে বিদ্ধ করেছেন— 'বন্ধু প্রণাম হই, —/ শীতের বাতাসে জ'মে যায় দেহ — ছেঁড়া কাঁথাখানা কই?' কিছু কিছু গভীর ভাবোদ্যোতক কাব্যিক পংক্তিও আমরা প্রথম ঝোঁকে পাচ্ছি। কখনও সেগুলি একাধিক তাৎপর্যবহ হওয়ার ফলে তাদের ব্যঞ্জনা অধিকতর ব্যাপ্ত হয়েছে।

(১) তব জয় জয় চারিদিকে হয়, আলোক পাইল লোক,
শুধাই তোমায় — কী আলো পেয়েছে জন্মান্ধের চোখ?
চেরাপুঞ্জির থেকে
একখানি মেঘ ধার দিতে পারো গোবি-সাহারার বুকে?...

(২) মরণে কে হবে সাথী
প্রেম ও ধর্ম জাগিতে পারে না বারোটার বেশী রাতি!
প্রেম ও ধর্মে নাহি প্রয়োজন-বলিনে আমি এ কথা,
মিথ্যামাত্র বৃথা নহে যদি ঘুচে তাহে কারো ব্যথা। ...

প্রথম ঝোঁক সম্পর্কে আরো দু'একটি কথা বলবার আছে। এখানে কবির যে 'ঘুমিওপ্যাথি' তত্ত্ব বা চেতনাকে-ঘুম পাড়িয়ে-রাখার-তত্ত্ব দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য, তার অনুরূপ উক্তি পাই ফরাসী কবি বোদলেয়ারের 'Le Gout du Neant' বা 'লুপ্তির আকাঙ্ক্ষায়'। সেখানে কবি বলছেন —

'হৃদয়, তবে নে মেনে তুই পশুর মতো ঘুমের ঘোর।

* * *

প্রতিক্ষণে আমায় টানে অতল খাদে অসীম কাল,
যেন বিশাল তুষারপাতে লুপ্ত এক কঠিন শব,

সুগোল এই ভুগোল জুড়ে দেখিছে অস্তিত্ব সব,

খুঁজি না আর কোথাও বাসা, ক্ষুদ্র কোনো অন্তরাল।

নে, তবে নে আমায় টেনে, আভালাঁশের* ধ্বংস-তাল। (বুদ্ধদেব বসুকৃত অনুবাদ)

আধুনিক কবি জীবনানন্দ দাশের মধ্যেও অনুরূপ উপলব্ধি। চেতনাই বেদনার কারণ, জেগে থাকাতেই গাঢ় যন্ত্রণা। মৃত্যুতেই চেতনার অবলুপ্তি। তাই কবির এক নায়ক আত্মহত্যা করে শান্তি পেতে চেয়েছিল—

"অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়—

আরো এক বিপন্ন বিস্ময়

আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে

খোলা করে;

আমাদের ক্লান্ত করে

ক্লান্ত— ক্লান্ত করে;

লাসকাটা ঘরে

সেই ক্লান্তি নাই;" ('আটবছর আগে একদিন')

আলোচ্য কবিতায় কবি ঈশ্বরকে, বা যাঁকে তাঁর বক্তব্য শোনাতে চান, বা যাঁকে উদ্দেশ্য করে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত করতে চান তাঁকে বারবার 'বন্ধু' বা 'হৃদয় বন্ধু' বলে ডেকেছেন। এটি তাঁর বক্তব্য উপস্থাপনের একটি বিশেষ শৈলী, এবং সম্ভবত এর শুরু 'ঘুমের ঘোরে' কবিতা থেকে। এই বিশেষ পদ্ধতিটির জন্য তিনি রবীন্দ্রনাথের দ্বারা অনুপ্রাণিত। ...

দ্বিতীয় ঝোঁকের বক্তব্যে প্রথম ঝোঁকেরই অনুবৃত্তি। একই 'ঘুমিওপ্যাথি'র কথা এখানেও। দুঃখ থেকে পরিত্রাণ চেতনার অবলুপ্তিতে, আফিং খেয়ে গভীর তন্দ্রাভিভূত হওয়াতেই— ...

ঈশ্বরের নির্মমতা ও মানুষের দুঃখবেদনা সম্পর্কে তাঁর উদাসীনতার পরিচয় পুর্বোক্ত প্রথম ঝোঁকের মত এখানেও রয়েছে— ...

'যাহার পাঁঠা সে যেদিকে কাটুত, তা'তে অপরের কি?

ছোলা কলা খেয়ে সন্ধিক্ষণে এককোপে বলিদান—

পাঁঠার মধ্যে সে পাঁঠাটি— আহা কত না ভাগ্যবান।

পাঁঠার দুঃখ সুখ—

মার পায়ে দিতে নূতন সরায় রক্তে জমায়ে থুক।'

ঈশ্বর বা বিধাতার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক যে প্রভু ভৃত্যের মাত্র, পিতা ও সন্তানের

নয়, উপরিউক্ত উক্তিতে তারই পরিচয়। বক্তব্যের ভাষা অত্যন্ত বলিষ্ঠ এবং সুনির্দিষ্ট। মানবজীবনের পরিণতি অর্থহীন, বাহ্যত যতই শক্তি বিত্ত ক্ষমতা বা প্রতিপত্তির অধিকারী হোক না কেন, মানুষ অতি তুচ্ছ, মানুষের সকল প্রচেষ্টা ও সাধনা শেষ পর্যন্ত নিরর্থক অবান্তর ক্রিয়ামাত্র, সে যে প্রকৃতির পোষা বলির পাঁঠা মাত্র, সরায় জমানো তারই রক্তে প্রকৃতি চণ্ডীর তর্পণ, এই বক্তব্যের সুতীব্র প্রকাশ উপরের পংক্তি কয়টিতে।

আলোচ্য ঝোঁকে দুই একটি নতুন ও মৌলিক চিত্রকল্প আছে। যথা—

১. 'সব হয়ে যায় বৃথা,

আসে, হাসে, কাঁদে, চ'লে যায় ঘুরে বায়োস্কোপের ফিতা।'

২. 'এ ধরা গোরস্তান;

মরণের ভিতে স্মরণের ঢিপি দু'দিনে ভূমি-সমান।' ...

আলোচ্য ঝোঁকে কবির দৃষ্টি প্রকৃতির প্রেক্ষাপট থেকে সরে এসে সমাজ জীবনের প্রেক্ষাপটে পতিত হয়েছে। দুর্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার, ব্যক্তি মানুষের নিজের সুখ ও স্বার্থ রক্ষার জন্য অসংখ্য দীন ও দুর্বলের রক্ত শোষণ, দরিদ্রের অস্থি ও মাংস স্তূপের মূল্যে ধনীর সম্পদ রচনা, বহুর শ্রমের বিনিময়ে একক শক্তিমানের প্রাসাদ রচনা করে তোলা, আলোচ্য ঝোঁকে কবির অঙ্গুলিনির্দেশ সেই দিকেই। ...

একজনের মিলন-আনন্দের সজ্জা রচনায় অপর কতজনের জীবন দিতে হয় অসংখ্যের দুঃখ ও যন্ত্রণার মূল্যে প্রবলের রোমান্টিক কণ্ঠমালা রচিত হয় তার প্রিয়তমের সঙ্গে মিলন-উদ্‌যাপনের পরিচায়ক রূপে, তীব্র বিদগ্ধ ও অত্যন্ত দীপ্ত আঙ্গিকে তারই পরিচয়—

'ভরেছ আতর-দানি,

কত প্রভাতের আধফোটা ফুল-মম নিঙাড়ি ছানি?

কণ্ঠে দুলালে মিলন-মালিকা নব সুগন্ধ ঢালা—

সদ্য ছিন্ন শিশু-কুসুমের কচি মুণ্ডের মালা।'

উপরের পংক্তিটি বাংলা সাহিত্যে প্রবাদ বাক্যের মতো রক্ষিত হবার যোগ্য। তাঁত যন্ত্রে মাকু ছোটাছুটি করে মাকুর নিজের কোনো প্রয়োজনে নয়, তাঁতীর সম্পদ বাড়ানোর জন্য, সাট্‌ল্‌কক্‌কে পিটিয়ে খেলোয়াড়রা নেটের এদিক থেকে ওদিক পাঠায় তাদের নিজের আনন্দের জন্য, সাট্‌লকক্‌ -এর কোনো লাভ নেই শুধু ক্ষতিই আছে— 'দেখিনু তন্দ্রাভরে—/তাঁতীর টাকার বড় দরকার মাকু ছুটাছুটি করে।'

চতুর্থ ঝোঁকে রবীন্দ্র-অনুসারী রোমান্টিক কবিদের ব্যঙ্গ। যে ব্যঙ্গের অনুরূপতা আমরা আবার পাবো 'মরুশিখা' কাব্যের 'দুঃখবাদী' কবিতায়। রোমান্টিক কবিদের কাল্পনিক সৌন্দর্যের চিত্র-অংকন, কোন অলক্ষ্যে লক্ষ্মী বিরাজ করেছেন, কল্পনায় তাঁর প্রসাদ পাওয়ার জন্য স্তুতি-রচনা, কাব্যিক উপলব্ধির মধ্য দিয়ে অজানাকে-জানবার প্রচেষ্টা,

অসীমকে সীমার বন্ধনে বাঁধবার আকাঙ্ক্ষা, আপাত দুঃখকে অস্বীকার করে কাল্পনিক সুখের অন্বেষণ, এসবই অর্থহীন মিথ্যাচার মাত্র। ওসব কিছুই জীবনে পাওয়া যাবে না, জীবনের সব প্রচেষ্টা, সাধনা, অন্বেষণ মৃত্যুতেই সমাপ্ত হবে,—

'হায় রে ভ্রান্ত কবি।

নয়নের আলো ম্লান হয়ে এল আঁকিতে মিছার ছবি। ...

কবি যতীন্দ্রনাথ এমন কবিকে চাইছেন, যিনি সাদা চোখে জগতের যথাযথ রূপকে অবলোকন করবেন এবং তারই প্রকৃত ছবিকে চিত্রিত করবেন তাঁর কবিতায়। ক্রিম্ মাখানো টয়লেট-করা সুগন্ধী পাউডারের গুড়ো দিয়ে ঢেকে দেবেন না মনের যত ক্লেদ ও গ্লানি। সত্যকে নিষ্ঠুরের মতো তিনি প্রকাশ করে দেবেন, শবকে সুন্দর করে দেখাবেন না শব-প্রাবরণী দিয়ে ঢেকে। ঢেঁকি স্বর্গে-গেলেও, ধান ভানাই তার ভাগ্যলিপি এই অকপট সত্যকে তিনি অসংকোচ ব্যক্ত করবেন। তাই কবির দীপ্ত আহ্বান—

'কে গাবে নতুন গীতা—

কে ঘুচাবে এই সুখ-সন্ন্যাস-গেরুয়ার বিলাসিতা?

কোথা সে অগ্নিবাণী— ...'

'ঘুমের ঘোরে' কবিতার পঞ্চম ঝোঁকে কিছু বিশেষত্ব আছে। এই কবিতার প্রথম ও পঞ্চম ঝোঁক সর্বপেক্ষা তাৎপর্যবহ এবং কবির মৌলিক দৃষ্টর পরিচয়বাহী। পঞ্চম ঝোঁকে কবি যে বিশিষ্ট কথাগুলি বলেছেন তারা যথাক্রমে—

১. কবির দুঃখবাদী চেতনা সারা বিশ্বব্যাপ্ত। যে দুঃখচেতনা সমাজ, পৃথিবী এবং ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে এতক্ষণ আবর্তিত হয়েছে, তাকে তিনি এই কাব্যাংশে বিশ্বব্যাপ্ত প্রেক্ষাপটে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন।

২. আলোচ্য ঝোঁকে কবির আরও একটি বৈশিষ্ট্যর আত্মপ্রকাশ। কবি আধা-খেচড়া সুখ বা দুঃখ চান না, চান না অর্ধমুক্তি বা অর্ধবন্দিত্ব। যদি স্বৈরেচ্ছালিত পূর্ণ স্বাধীনতা পান তাহলে সেটাই কবির কাম্য; যদি তা না পান তাহলে পূর্ণ বন্দিত্ব বরণ করতেও তাঁর আপত্তি নেই। আধা ইচ্ছাবাহী আধা শৃঙ্খলিত জীবন তাঁর কাছে সব থেকে অসহ্য।

৩. কবি বিশ্ব জাগতিক বীক্ষণাগারে (Laboratory) নিরীক্ষাধীন কোনো নমুনা-গিনিপিগ-এ নিজেকে পরিণত করতে রাজী নন। বিশ্বজগৎ নানা পরীক্ষার মধ্যদিয়ে, Trail and Error পদ্ধতির প্রয়োগ এই জগতের যে ---- বা রূপ-পরিকল্পনা তৈরী করতে করতে চলেছে, তিনি নিজেকে তার অন্যতম পরীক্ষেয় একক (Unit) -এর অন্তর্ভুক্ত করতে চান না; এবং

৪. কবির ঈশ্বরচেতনাও এখানে কিছুটা নতুন এবং সদর্থক মাত্রা পেয়েছে। কবির ঈশ্বর চেতনার মধ্যে যে বিবর্তন আছে, (পরবর্তী আলোচনা প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য কবির ঈশ্বরচেতনা বোধক কবিতাবলী আলোচনায়) তার প্রাথমিক ভুমিকা, যাকে বলা যেতে পারে নাটকীয় --, তার শুরু এই পঞ্চম ঝোঁকেই।

এই চারটি নতুন ধারণা পঞ্চম ঝোঁকের মধ্যে সঞ্চারিত।

প্রথমত এই কবিতায় কবির দুঃখবাদী চেতনার বিশ্বব্যাপ্ত আবেদন। রবীন্দ্রনাথ-সহ রবীন্দ্র অনুসারী যে সমস্ত কবিরা এই বিশ্বের বিশাল এবং অসীম বিস্তারের মধ্যে নিজেদের একাত্ম করতে চেয়েছেন, অনুভব করতে চেয়েছেন অনন্তের অন্তহীন ব্যাপ্তি, কবি সেই অনন্ত বা অসীমতাকে শৃঙ্খলিত কারাগারেরই অন্যতম রূপায়ণ বলে মনে করেছেন।

'চারিপাশে ঘেরা অসীমের বেড়া নীলের প্রাচীর খাড়া,

আলো-আঁধারের-গরাদে বসানো অপার বিশ্ব কারা!' ...

সীমা নাই যার, নাহিকো দুয়ার, না বন্ধ নহে খোলা,

গাছে গাছে দাঁড় হাজার হাজার, দাঁড়ে দাঁড়ে দেওয়া ছোলা।

এ ব্যঙ্গ কিসে সহি?

কয়েদে যখন-ব্যবস্থা করো-কয়েদীরই মতো রহি।' ...

কবির আসল সাধু, — পূর্ণ মুক্তি, সম্পূর্ণ স্বৈরেচ্ছাচালিতা নিজের জীবন ধারা। হয় পুরোক্ত পুর্ণ কয়েদ, নতুবা পরিপূর্ণ মুক্তি—

'নচেৎ মুক্তি দাও

চারিদিকে এই অসীমের সীমা একেবারে খুলে নাও।' ...

তৃতীয়ত কবির বক্তব্য, বিশ্বের যদি কোনো বিধাতা থাকেন তিনি সম্ভবত কোনো পূর্ব পরিকল্পনা নিয়ে এই জগৎ সৃষ্টি করেননি। তিনি ভাঙা গড়ার মধ্য দিয়ে, পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে, Trial এবং Error (পরখ এবং সংশোধন) পদ্ধতিতে নতুন সামগ্রী সৃষ্টি করতে করতে এই বিশ্বের রূপায়ণ করতে চাইছেন। তাঁর পরীক্ষাগারে রয়েছে নানা পরীক্ষের নমুনা। আমরা সকলেই সেই পরীক্ষেয় নমুনার অন্তর্গত। আমাদের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের কোনো মূল্যই বিধাতার কাছে নেই। ...

প্রসঙ্গ এখানে একটি কথা বলে রাখি যতীন্দ্রনাথ তাঁর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'মরুশিখা'তে 'লোহার ব্যথা' নামে একটি কবিতা রচনা করেন। সেই কবিতাতেও প্রকৃতি বা ঈশ্বরের হাতে অসহায় মানুষে জীবন-ধারা। ... লোহার প্রতিনিধি রূপ কবি সেখানে বিশ্বকর্মকার বা পার্থিব কর্মকারকে লক্ষ্য করে বলছেন—

'ও ভাই কর্মকার,—

আমারে পুড়িয়ে পিটানো ছাড়া কি নাইক কর্ম আর?' ...

চতুর্থত, — এই পঞ্চম ঝোঁকে কবির ঈশ্বরচেতনায় নতুন মাত্রা সঞ্চারিত। ... এখানে কবি অনুভব করেছেন ঈশ্বরই আমাদের সর্বাত্মক অনুভূতিতে ব্যাপ্ত, এবং আমাদের আদ্যন্ত চেতনায় তাঁরই প্রতিষ্ঠা। ঈশ্বরের কাছেই একমাত্র ব্যক্ত করা যায় নিজের প্রাণের

কথা। জীবনের সুগভীর মূলে কিংবা জীবনের অভিব্যক্ত পুষ্পে আমরা যে রহস্যই কল্পনা করি-না-কেন আসলে তার সঙ্গে যুক্ত থাকে আমাদের ঈশ্বর-চেতনা। কবির ক্রমপদচারণা যে ঈশ্বর-উপলব্ধির দিকে, তার প্রাথমিক শুরু আলোচ্য কবিতাংশে—

'প্রাণের কথা যে কয়ে যাই নিজে-বাজে কি তোমার প্রাণে?

প্রাণের কথার অর্থ খুঁজিলে মিলে তব অভিধানে?

জানি জানি সব ফাঁকি।

তবুও খোঁচাই; তোমা ছেড়ে মোর থাকে না কিছুই বাকি।' ...

পূর্ববর্তী বক্তব্যেরই প্রায় অনুবৃত্তি এখানে চললেও কিছু নতুন উপলব্ধির কথাও এখানে আছে। আগে কবি বলেছিলেন, দুঃখের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় চেতনার অবলোপ, 'ঘুমিওপ্যাথি'র আশ্রয়। কিন্তু এখানে কবির নবীন উপলব্ধি চেতনা নির্বাপিত করাতে দুঃখের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় বটে, কিন্তু চেতনাকে বিদায় দেওয়ার ক্ষমতাও মানুষের নিজের হাতে নেই। যান্ত্রিক প্রকৃতি যেদিন তাকে নির্বাপিত করে সেইদিনই তা সম্ভব—

'ঘুমের শরণ নিয়েছিনু, আগে, সেটাও দেখি যে ফাঁকি,

ঘুম আসা আর না আসা-সেখানে আমারি বা হাতটা কি?' ...

পঞ্চম ঝোঁকে কবির ঈশ্বর চেতনায় যে নতুন অনুভবের কথা বলেছি তারই আরো একটি বিশিষ্ট রূপায়ণ 'ঘুমের ঘোরে'র সপ্তম ঝোঁকে। ...

কবির শেষ বক্তব্য, ঈশ্বরের আনন্দময় স্বরূপ কল্পনা করে বেদ-বেদান্ত উপনিষদ এবং নানা শাস্ত্র যে মতবাদ প্রচার করেছে তা সবই আফিং বা গাঁজাখোরের কল্পনার মতো সত্য বিরহিত অলীক। এই জগতের এবং জগতের প্রাণীকুলের বাহ্যত-প্রকাশিত যে আপাত রূপ, কিছু সুখ আর বাকীটা আঁখি ভরা জল, ঈশ্বরেরও তাই-ই। যান্ত্রিক নিয়মবন্ধতা থেকে উত্থিত ঈশ্বরও এই দুঃখেরই ক্রীতদাস, তাই তাঁকে অভিযোগ করে অত্যাচারী বা নির্দয় বলা অর্থহীন। শেষ পর্যন্ত ঈশ্বর তাই কবির প্রতিস্পর্ধী নন, একই বেদনায় আর্ত বন্ধু তাঁরা।

' হে বিরাট! আজি হেরি যেন তব দুঃখের নাহি ওর;

চিরবর্ষণে ফুরায় তা তবু অফুরান আঁখিলোর!

ও গো অক্ষয় বট।

যত বেড়ে যাও আপনি ছড়াও শত দুঃখের জট।' "

৩.২.২ শিবস্তোত্র

" ('মরুশিখা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত, ১৩৩০-৩৪-এর মধ্যে রচিত)। কবির ঈশ্বর-চেতনা সম্পর্কিত কবিতাগুলো আমরা আলোচনা করছি তা যেন কবির একটি চিন্তার বিবর্তনকে অনুসরণ করেছে। ... কবির ঈশ্বরচেতনা ক্রমশ বেদনার্ত মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিফলন দর্শন করেছে। নিজের সৃষ্টির বেদনায় তিনি আতুর। সেই বেদনার্ত শিবের পরিচয় 'শিবস্তোত্র' কবিতায়। আর তৃতীয় কবিতা 'কচিডাব' কবির শিব শুধু মানুষের বেদনায় আতুর নন, তিনি নিজেই হয়ে গিয়েছেন অতি দীন দুঃখী মানুষ। তিনি দুঃখী মানুষের প্রতিনিধি। ভরতমুনি যেমন প্রিয়তম হরিণ শাবকের কথা চিন্তা করতে করতে মৃত্যুর পরে হরিণশিশুরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কবির শিবও যেন তেমনি তাঁর সৃষ্টির দুঃখে বেদনা-বিদীর্ণ হয়ে দীন মানুষে বিবর্তিত হয়ে গিয়েছেন। 'শিবস্তোত্র' কবিতাটি 'শিবের গাজন' থেকে 'কচিডাব' কবিতায় বিবর্তনের একটি যোগসূত্র (connecting link)।

'শিব স্তোত্র' কবিতাটির শুরু হয়েছে পুরাতন একটি শিব স্তোত্রকে উল্লেখ করে। ঐ শ্লোকটি সর্বমঙ্গলময় শুভঙ্কর আনন্দসর্বস্ব সৌন্দর্যসর্বাতিশয় ব্যথা-হরণকারী জগৎ-কাণ্ডারী মৃত্যুঞ্জয় শিবের জয় স্তোত্র। এটি একটি প্রাচীন শিবস্তোত্র। স্তোত্রটি হল —

'জয় শিব, জয় শঙ্কর, জয় স্বর্গ-মোক্ষ-দাতা,

জয় কৃপাময়, মৃত্যুঞ্জয়, সর্বদুঃখ ত্রাতা,

চির-সুন্দর, হে শুভঙ্কর, জয় হর ব্যথাহারী,

চন্দ্রশেখর, পাপ-তাপহর, জয় ভবকাণ্ডারী।'

উপরি উক্ত স্তোত্রে শিবের বিশেষণরূপে আমরা পাচ্ছি শঙ্কর (যিনি শম বা শান্তি সম্পাদন করেন), স্বর্গ-মোক্ষদাতা, কৃপাময়, মৃত্যুঞ্জয় (যিনি মৃত্যুকে জয় করেছেন), সর্বদুঃখ-ত্রাতা (সমস্ত দুঃখ থেকে যিনি পরিত্রাণ করেন), চির-সুন্দর, শুভঙ্কর (যিনি সর্বশুভ সম্পাদন করেন), চন্দ্রশেখর (যাঁর ললাটে সৌন্দর্যরূপী শশীকলার চির অবস্থান), পাপ-তাপহর (যিনি পাপের তাপকে দূর করেন) এবং ভবকাণ্ডারী (যিনি এই জগৎ সংসারের খেয়া নৌকোর মাঝি, প্রাণীকে মৃত্যুর কূল থেকে অমৃতের কূলে পার করে দেওয়াই যাঁর কাজ)।

পূর্বের শিবভক্তগণ শিবের উপরি-উক্ত গুণ বা বিশিষ্টতা উল্লেখ করে তাঁর জয় উচ্চারণ করতেন। কিন্তু কবি যতীন্দ্রনাথের কাছে এইসব বিশেষণগুলি অর্থহীন কপট এবং হাস্যকর বলে মনে হয়েছে। জগতের চারিদিকে যে বেদনার কলরোল, অশ্রুর প্রবাহ, ব্যথার আর্ততা এবং দুঃখের বিপুলতা, তা দেখে কি বলা যায় এই জগৎবিধাতা শিব উপরি-উক্ত বিশিষ্টতাগুলি ধারণ করেন। তাই শিবকে যখন উপরি-উক্ত মন্ত্রে আরাধনা করা হয় তখন এই মন্ত্র কবির হৃদয় স্পর্শ করে না। বরঞ্চ স্তোত্রটিকে কৌতুকজনক বলেই মনে হয়। কবি যতীন্দ্রনাথ তাঁর সকল জাগতিক অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর ঈশ্বর বা বিধাতা শিবের যে রূপ অনুভব করেছেন, তাকে তিনি বর্ণনা করেছেন এই কবিতার দুটি দীর্ঘ স্তবকের মধ্য দিয়ে।

কবির ঈশ্বর ব্যথাহীন নন, তিনি সর্ব দুঃখ থেকে তাঁর সৃষ্ট জীবকে পরিত্রাণ করতে

পারেন না। বরঞ্চ তার চারিপাশে যে বিপুল বেদনাপ্রবাহ চলেছে তাই-ই তাঁর সর্বাঙ্গে মুদ্রিত। শিবকে বলা হয় চন্দ্রশেখর, তাঁর কপালে নাকি অমৃত বর্ষী চন্দ্রের স্নিগ্ধ দুঃখ-অপনোদনকারী তিলকচিহ্ন। ... কিন্তু কবির অনুভূতিতে এই পবিত্রসলিলা জাহ্নবীর সাক্ষাৎ মেলে না। কবি অনুভব করেন শিবের মাথায় রয়েছে যে বিপুল জটা, তা সুগভীর দুঃখে ভারাক্রান্ত, এবং সেই জাটায় পথ হারিয়েছে চির ক্রন্দনময়ী গঙ্গা। গঙ্গার কল্লোল সুখের প্রতিধ্বনি নয়, এই কল্লোল ব্যক্ত হচ্ছে আর্ত জগতের চিরন্তন বেদনা।

কবি তাঁর ঈশ্বরের কাছে জানতে চেয়েছেন তাঁর গোপন বেদনার ইতিহাস। শিবের চিত্তের গভীরে এই জগতের দুঃখ এত তীব্রতায় অনুভূত যে শিব তাঁর নবীন-নিন্দিত সুন্দর তনুর জন্য লজ্জিত। তাই তা তিনি চিতার ছাই দিয়ে ঢেকে দিয়েছেন। সেই তনুমোহে প্রলোভিত হয়েছিলেন একদা কামনার দেবতা অতনু, শিবের ধ্যান ভঙ্গ করে শিবকে পার্বতীর সঙ্গে মিলিত করবার জন্য তাই কামদেব নিক্ষেপ করেছিলেন তাঁর ফুলশর, এবং তার ফলে শিবের তৃতীয় নয়নের রোষ-অগ্নিতে তিনি ভষ্মীভূত হয়েছিলেন। ... সেই অতনুরও কাম্য স্বীয় সুন্দর তনু শিব ছাই দিয়ে ঢেকে দিয়েছেন। কারণ, জগতের বেদনা দূর করতে না পাবার লজ্জা এবং বেদনায় তিনি সঙ্কুচিত। জগতের কত অর্থহীন দুঃখময় মৃত্যুর পরিচয় বহন করছে তাঁর কণ্ঠের হাড়ের মালা। সভ্যতা বহু অগ্রসর হওয়ার পরে কত মানুষ এখনও বুভুক্ষুর বিবসন। তাই কি তাদের বেদনায় আকুল শিব নিজের কাপড় খুলে ফেলে নগ্ন হয়ে রয়েছেন? তাই কি তিনি আনন্দময় বসন্ত রাত্রে ধুতরার বিষ ফুলে নিজেকে সজ্জিত করে ভূত এবৎ সাপকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। পৌরাণিক বিশ্বাস, শিবের কণ্ঠই সকল সুরের জন্মদাতা। অভিজাত বীণাও বেণু (বাঁশী) সহযোগ তিনি রাগ-রাগিনী ও সুর সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু সেই শিব আজ কেন অভিজাত বাদ্যযন্ত্র ত্যাগ করে দীনতম মানুষের বাদ্যযন্ত্র শিঙা আর ডুগডুগি বাজিয়ে অতি দীনবেশে বনে পাহাড়ে সাপ এবং প্রেত দলের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বেড়ান। সর্বজ্ঞানের আকার শিব, তিনি নিজের চেতনাকে করেছেন ভাঙের নেশার আচ্ছন্ন এবং ভিক্ষাকে করছেন পেশা। কবি তাঁর এই ঈশ্বরের কাছে অনুনয় করেছেন, কেন তাঁর এই দুঃখী ভিখারী উলঙ্গ চেহারা। কত পূজার অর্ঘ্যই তাঁর কাছে নিবেদিত হয়, তাতে আপাত চাপা পড়ে বেদনা-বিদীর্ণ তাঁর বহিরঙ্গের দীনতা। কিন্তু অভ্যন্তরে তিনি যে গোপন ব্যথা বহন করে চলেছেন তারই তীব্রতায় তিনি এমন সর্বস্বহারা পথের ভিক্ষুক। — এটাই কবির শেষ উপলব্ধি।

কবির আপাত মতে, সুখ ক্ষণস্থায়ী। বা যাকে সুখ বলে মনে করি তা আসলে সুখের মুখোস পরা দুঃখেরই মূর্তি। তাই সুখ চিরন্তন নয় স্থায়ী নয়। একমাত্র স্থায়ী, দুঃখ, তাই দুঃখকে বলা যেতে পারে এ জগতের অনশ্বর সত্য। যদি কল্পনা করা যায় আমাদের সকল মানসিক অনুভূতি এক একটি দেবতার ভাব-অভিব্যক্তি তাহলে স্বীকার করতে হয় সেই অনুভূতির অবসান ঐ বিশেষ দেবতারই মৃত্যু সূচনা করে। যেহেতু সুখ নশ্বর তাই সুখের দেবতাও মৃত্যুময়। একমাত্র দুঃখের দেবতা শিবই মৃত্যুঞ্জয়। কারণ তিনি সেই দুঃখের দেবতা, যে দুঃখ এই জগতের চিরন্তন সত্য রূপে কবির মানস-কল্পনায় প্রতিভাত। মৃত্যুঞ্জয় শিব, তিনি দুঃখের দেবতা এবং জগতের সকল দুঃখকে তিনি বহন করে চলেছেন। কিন্তু তাঁর নিজের সৃষ্ট দুঃখের বাঁধনে বাঁধা এই দেবতার কাছে এই জগতের যন্ত্রণা সু-দুঃসহ।

নিরুপায়ের মতো তিনি এই বিশ্বের ব্যথা বহন করে চললেও মাঝে মাঝে বিপুল বিদ্রোহ সবকিছু ভেঙে চুরে শেষ করে দিতে চান বিশ্বকে দুঃখ থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য। কিন্তু এই দীনের দেবতা অন্তর্লীন উদাসীনতার জন্যই আবার ঘুমিয়ে পড়েন ভক্তের পূজো পেয়ে। যে দীনতম মানুষের বেদনায় তিনি বিদ্রোহের বিস্ফোরণ ঘটাতে চান তাঁর তাণ্ডব নৃত্যের মধ্য দিয়ে, তার কথা ভুলে গিয়ে আবার তিনি হয়ে যান নিদ্রানিমগ্ন। আর তার ফলে দীনদুঃখীর বেদনা যন্ত্রণার আর অবসান হয় না। তাদের ব্যথায় দিনের আলো সায়াহ্নের ম্লান জ্যোতিহীনতায় মিলিয়ে যায়।

'সুখের দেবতা মরে যুগে যুগে, তুমি চির দুঃখময়,
সুখ বাঁচে মরে, দুঃখ অমর— তুমি মৃত্যুঞ্জয়।
বিরাট বক্ষে চিরনিরুপায় বিশ্বের ব্যথা বহি',
মাঝে মাঝে বুঝি ববম্ ববম্ জেগে ওঠে বিদ্রোহী।
পূজা পেয়ে হেসে আবার ঘুমাও আশুতোষ উদাসীন।
তোমার ব্যথার ম্লান সায়াহ্নে মিলায় দীনের দিন।' ...

কবির এই দুঃখদেবতা জগতের সকল দুঃখকে আত্মীকরণ করে নিলে কবির নিজের আর কোনো দুঃখ ব্যথাবোধ আশানৈরাশ্য কিছুই থাকবে না। সেদিন কবি তাঁর ঈশ্বরের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে একই ভয়ঙ্কর দুঃখ ও বিষাদে তপস্যামগ্ন হয়ে রইবেন। সেই দিনের আশায় কবি প্রমত্ত উল্লাসে ব্যাকুল হয়ে উঠতে চাইছেন,—

'তবু শেষ হবে খেলা,
— এই চির অবহেলা-
প্রলয়— সান্ধ্যাবেলা' ...

আলোচ্য কবিতায় কবির ঈশ্বর যদিও এখানে ঈশ্বরই রয়েছেন, তবুও তিনি মানুষের অনেক কাছে নেমে এসেছেন। তিনি সকল জ্ঞানের আকর, সকল সুখের জন্মদাতা ভগবান বটে, কিন্তু মানুষের বেদনায় তিনি আকুল। মানুষের দুঃখে তাঁর মস্তকের কেশজাল জটায় পরিণত এবং এই জগতের ক্রন্দনের কল্লোল সেই জটার মধ্য দিয়ে ধ্বনিত। মানুষের দুঃখ করতে না পারার বেদনায় এবং লজ্জায় তিনি তাঁর নবনীনিন্দিত তনুকে চিতাভস্মে লিপ্ত করেছেন। জগতের যন্ত্রণা ভুলবার জন্যে ধরেছেন ভাঙের নেশা, আর দুঃখী মানুষের সমান হওয়ার জন্যে নিজের স্ত্রীর কাছে ভিক্ষুকরূপে এসে দাঁড়িয়েছেন। প্রথম কবিতা 'শিবের গাজনে'র ঐশ্বরিকতা 'শিবস্তোত্র' কবিতায় মানবিকতায় পরিণত। কিন্তু তবুও এই মানবিকতা পরিপূর্ণ ঐশ্বরিকতা-বিবিক্ত নয়। শিবের উপরি-উক্ত মানবিকতার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে রয়েছে তাঁর মৃত্যুঞ্জয় সত্তা এবং প্রলয়ঙ্কর বিশিষ্টতা। প্রলয়-সন্ধ্যা ঘনিয়ে তোলার জন্য এই মৃত্যুঞ্জয় শিব যে তাণ্ডবে রত হবেন, তাও ঐ বিশাল বিশ্বব্যাপ্ত মহাকালের পক্ষেই উপযুক্ত। সুতরাং এখানে কবির ঈশ্বর মানুষের কাছে এসেছেন, মানবিকতায় উত্তীর্ণ হয়েছেন, কিন্তু এখনও মানুষের নাগালের বহির্ভূত ঐশ্বরিক দীপ্তিতে তিনি দেদীপ্য।

পরবর্তী কবিতা 'কচিডাব'-এ আমরা দেখব সেখানে কবির ঈশ্বর শিব শুধু মানবিক নন, তিনি সম্পূর্ণ দীন মানুষের পরিণত। মানুষের দুঃখ অনুভব করতে করতে তিনি দুঃখী মানুষই হয়ে গেছেন। পুর্বেও ভক্ত কবি আলোচ্য কবিতায় হয়েছেন প্রেমিক কবি, কারুণ্যে দ্রবীভূত কবি।"

৩.২.৩ দুঃখবাদী

"দুঃখবাদী কবিতাটি কবির 'মরুশিখা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। কবিতাটির রচনাকাল ১৩৩০-১৩৩৪ বঙ্গাব্দ (খ্রীস্টীয় ১৯২৩-২৭)-এর মধ্যে। এটিও কবির দুঃখবাদী চেতনাত্মক কবিতা। অবশ্য পূর্বোক্তি কবিতার মতই এই কবিতার অন্তরালে রয়েছে সুগভীর মানবিকতা। কবিতাটির নামটি শুনলেই বোঝা যায়, সচেতন ভাবেই আলোচ্য কবিতায় কবি তাঁর দুঃখবাদী জীবনদর্শনকে উপস্থাপিত করেছেন।

এই কবিতার শুরু পূর্বোক্ত 'ঘুমের ঘোরে' কবিতার মতই রবীন্দ্র-অনুসারী আনন্দের চর্বিতচর্বনকারী রোমান্টিক কবিদের প্রতিক্রিয়ায়। কবির তীব্র বিদ্বেষ ও ক্রোধ সেই সব লেখকদের বিরুদ্ধে, যাঁরা প্রকৃতির বা ঈশ্বরের কপট স্তুতি রচনা করে জগৎ সভায় কবির সম্মান লাভ করেছেন। যাঁরা খোলা চোখে বাস্তব জগতের যথার্থ সত্য অনুধাবন করে তাকে কবিতায় চিত্রিত করেছেন, সমকালীন জগতের জ্ঞানী ও রসিকদের সভায় তাঁরা তাঁদের এই সত্য অনুভবের যথাযথ স্বীকৃতি (appreciation) পান না। উক্ত বিষয়ে ব্যঙ্গবিদ্ধ বর্ণনার মধ্য দিয়ে কবিতাটির শুরু—

'তারই' পরে তব কোপ গো বন্ধু, তারই পরে' তব কোপ,
যেজন কিছুতে গিলিতে চায় না এই প্রকৃতির টোপ্।
সুনীল আকাশ, স্নিগ্ধ বাতাস, বিমল নদীর জল,
গাছে গাছে ফুল, ফুলে ফুলে অলি, সুন্দর ধরাতল।
ছবি ও ছন্দে তোমারি দালালি করিছে স্বভাবকবি,
সমসুন্দর দেখে তারা গিরি সিন্ধু সাহারা গোবি।
তেলে সিন্ধুরে এ সৌন্দর্যে 'ভবি' ভুলিবার নয়;
সুখ-দুন্দুভি ছাপায়ে বন্ধু ওঠে দুঃখেরই জয়।'

আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় এই জগতের চারিদিকে কত সৌন্দর্য, আনন্দ ও সুখের লীলাখেলা। এক এক ঋতুতে প্রকৃতির বিচিত্র রূপসজ্জার আয়োজন। বাইরের এই আপাত আনন্দঅভিব্যক্তি দেখে বোঝা যায় না, তার সৌন্দর্যময় মুখোসের অন্তরালে কত বেদনা, কত যন্ত্রণা, কত দগ্ধ জীবন পরিচয়কে সে আবৃত করে রেখেছে। কখনও বা সুখের অগ্রপথিকের পিছনে পিছনে আসে বেদনার অন্তহীন মিছিল। ...

জ্যোৎস্না রাত্রিতে সীমাহীন সমুদ্রের তরঙ্গ ভঙ্গে ভাঙ্গা ভাঙ্গা চাঁদের প্রতিবিম্বে

অপূর্ব সৌন্দর্য লীলা। কিন্তু এই আপাত সৌন্দর্যের তলদেশে থাকে মৃত্যু। সুন্দর তরঙ্গের আঘাতে কত মানুষের প্রাণান্ত ও কত জাহাজ ডুবি। বর্ষার কৃষ্ণকাজল মেঘ দেখে কবিরা মেঘের সৌন্দর্যময় বাণীচিত্র রচনা করেন। কিন্তু ঐ মেঘই ধারণ করে রাখে মৃত্যুবর্ষী বজ্র। শরতাগমে বৃক্ষে কিশলয়ের শোভা দর্শনে কবিরা আত্মহারা। তাই নিয়ে কত কাব্য রচনা, কিন্তু শীতে পত্রহীন বৃক্ষের দুঃখার্ত কঙ্কালসার চেহারা। তাই এই প্রকৃতির সুন্দর চিত্ররচনা করা প্রকৃতির স্তাবকতা করা মাত্র, 'এই ব্রহ্মাণ্ড ঝুলে প্রকাণ্ড রঙীন মাকাল ফল', যার ভিতরে বিষাক্ত শাঁস। ...

আধুনিক পাশ্চাত্য ইউরোপীয় কবিদের মত (বোদলেয়ার থেকে যার শুরু) যতীন্দ্রনাথের ধারণা প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াতে মানুষের যথার্থ সত্তার সার্থক আবির্ভাব। মানুষ নিজের বুদ্ধি এবং চিন্তার দ্বারা যা আয়ত্ত করতে পারে তা প্রকৃতির স্বাভাবিক সৃষ্টি অপেক্ষা অনেক উন্নত এবং বিবর্তিত। অতএব প্রকৃতির কাছে তার শিখবার কিছুই নেই। তীব্র বিতৃষ্ণায় তাই তিনি বলে ওঠেন—

'বাহিরের এই প্রকৃতির কাছে মানুষ শিখিবে কিবা?

মায়াবিনী নরে বিপথযাত্রী করিছে রাত্রি দিবা।

চটক বা চখা কি জানে প্রেমের? বকে কি শিখাবে ধর্ম?

সহজ-স্বাধীন হিংস্র স্বাপদ বুঝবে জীবন মর্ম।

অরণ্যতরু জপিছে অন্ধ ঠেলাঠেলি অবিরাম,

কুসুম অলির অবাধ প্রণয়, উভয়তঃ কি আরাম।'

প্রকৃতির আপাত রঙীন মুখোস কখনও আমাদের এতই অভিভূত করে যে, যেন মনে হয় ঐ মুখোসের অন্তরালে রয়েছে সৌন্দর্য ও সত্যের পরম সত্তা। কিন্তু আসলে তা মোহ সঞ্চারী মিথ্যা মাত্র। কবির তাই সুগভীর উপলব্ধি, এই প্রকৃতির কাছে মানুষের কিছুই চাইবার বা শিখবার নেই। ...

কবি বলেছেন, পশ্চিম আকাশে সুন্দর মেঘের সঞ্চার আমাদের সৌন্দর্যে ও আনন্দে আপ্লুত করে। কিন্তু আমরা ভুলে যাই ঐ অপূর্ব 'রঙীন সুন্দর মেঘ বজ্রগর্ভ'। কখন ঐ সৌন্দর্যের অন্তরাল থেকে নেমে আসবে কার বজ্রপাতজনিত মৃত্যু একথা কেউ বলতে পারে না। বারাঙ্গনা পাড়ায় অপূর্ব সুন্দরী বারাঙ্গনা যখন তার রঙীন ব্যালকনি ধরে দাঁড়িয়ে থেকে পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তখন অনেক মূঢ়ই তর অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণের কাছে আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু এই সুন্দরী নারী তার শরীরে যে মৃত্যুবীজ বহন করে চলে, সেই মৃত্যুবীজ যখন ঐ মোহ মুগ্ধ পুরুষের দেহে সংক্রামিত হয়ে তাকে রোগজর্জর করে, তখনই বোঝা যায় সুন্দরের মুখোস কোন ভয়ঙ্কর মৃত্যু দ্বারাই-না ঐ পথিক প্রলুব্ধ হয়েছিল। প্রকৃতির মৃত্যুগর্ভ সৌন্দর্যমুখ প্রসঙ্গে কবি উপরিউক্ত চেতনা থেকে জাত আশ্চর্য ভাবগর্ভ চিত্রকল্পটি আমাদের উপহার দিয়েছেন—

'বজ্র লুকায়ে রাঙা মেঘ হাসে পশ্চিমে আনমনা—

রাঙা সন্ধ্যার বারান্দা ধরে রঙিন বারাঙ্গনা।'

মানুষকে কবি প্রকৃতি-উত্থিত একটি প্রাণীর প্রজাতি (spcies) বলে মনে করেন নি। তিনি মনে করেছেন প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক খাদ্য ও খাদকের। এবং প্রকৃতির মধ্যে যে ষড় ঋতুর আবির্ভাব কবিরা ঈশ্বরের আনন্দময় লীলা রূপে অনুভব করেন ও চিত্রিত করেন, কবির দৃষ্টিতে তা ষড়রিপুর বিড়ম্বনাময় উদাহরণ। এই প্রকৃতি যদি ঈশ্বরের ছায়া হয় তাহলে ঈশ্বরের প্রকৃত কায়া যে কত ভয়ঙ্কর, তা কল্পনা করাও সম্ভব নয় —

'খাদ্যে খাদকে বাদ্যে বাদকে প্রকৃতির ঐশ্বর্য,

ষড়ঋতু-ছলে ষড়রিপু খেলে কাম হ'তে মাৎসর্য।

ছলে বলে কলে দুর্বলে হেথা প্রবল অত্যাচার;

এ যদি বন্ধু হয় তব ছায়া, কায়া তো চমৎকার'

কবি তাই শেষ পর্যন্ত মানুষকেই শ্রেষ্ঠ বলেছেন। প্রকৃতি বা ঈশ্বর মানুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে পারে না। মানুষই সাধনার মধ্য দিয়ে জীবনকে পুর্ণ করে তোলে, অপরের দুঃখ দূর করে। অপরের দুঃখ দূর করবার জন্য রাজার সন্তানও সর্বস্বত্যাগী হয়, প্রকৃতির সৌন্দর্য অপেক্ষা মানুষের দুঃখ সহস্রগুণ সত্য. কবি এই মানবিক দুঃখে আপ্লুত। প্রকৃতির কাছ থেকে পাওয়া সুখের ছলনা তাঁর কাছে অর্থহীন, কবির এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রকৃতপক্ষে দুঃখবাদ নয়, মানবতাবাদ—

'শুনহ মানুষ ভাই।

সবার উপরে মানুষ শ্রেষ্ঠ, স্রষ্টা আছে বা নাই।

যদিও তোমারে ঘেরিয়া রয়েছে মৃত্যুর মহারাত্রি,

সৃষ্টির মাঝে তুমিই সৃষ্টি-ছাড়া দুখ পথ-যাত্রী

তোমাদেরি মাঝে আসে মাঝে মাঝে রাজার দুলাল ছেলে,

পরের দুঃখে কেঁদে কেঁদে যায় শত সুখ পায়ে ঠেলে।'

যতীন্দ্রনাথের উপরি-উক্ত উদ্ধৃতি প্রসঙ্গে আমাদের প্রথমেই মনে পড়ে কবি চণ্ডীদাসের কথা, যিনি বলেছিলেন 'শুনহ মানুষ ভাই/সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' আর মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের কথা। 'বলাকা' কাব্য গ্রন্থের 'দেনা-পাওনা' কবিতায় কবির সুগভীর অনুভব প্রকৃতির বিবর্তনধারা পথে মানুষই বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। যতীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের চিন্তার প্রাথমিক পার্থক্য, যতীন্দ্রনাথ মনে করেন প্রকৃতি ও মানুষ দুটি ভিন্ন সত্তা এবং এই দুই-এর মধ্যে মানুষই শ্রেয়। আর রবীন্দ্রনাথের কাছে মানুষ একই বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্গত। ...

কিন্তু বিজ্ঞান সচেতন কবি যতীন্দ্রনাথের কিছু ভ্রান্তি এ কবিতাটিতে দেখা দিয়েছে। কবি কখনো কখনো নিজের দুঃখবাদ-দর্শনের যাথার্থ্য প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে বিজ্ঞান

জগৎ বা প্রকৃতি জগৎ থেকে এমন কিছু নমুনা উপস্থাপিত করেন, যা বৈজ্ঞানিক তাৎপর্যে কবির বক্তব্যের সঙ্গে খাপ খায় না। এই কবিতায় কবি বলেছেন— 'ফাল্গুনে হেরি নবকিশলয় যারা আনন্দে ভাসে/শীতে শীতে ঝরা জীর্ণ পাতার কাহিনী নাম মনে আসে/ফলে দেখে যার নাহি কাঁদে প্রাণ ঝরা ফুল দল লাগি, ...।' এই পংক্তিগুলির কাব্যিক সৌন্দর্য অতুলনীয়, কিন্তু বৈজ্ঞানিক বক্তব্যে যথার্থ নয়। পত্রমোচী বৃক্ষের পাতা ঝরে পড়া যতীন্দ্রনাথের কাছে বা তাঁর সমধর্মী কবিদের কাছে হয়তো দুঃখের, কিন্তু গাছের স্বার্থ এবং জীবন রক্ষার জন্য এটি প্রকৃতির অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পদ্ধতি।"

৩.২.৪ কেতকী

"তথাকথিত দুঃখবাদ-চিহ্নিত এই কবিতাটির মধ্য দিয়ে স্বভাব এবং স্বাভাবিক পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন সৌন্দর্যসত্তা কীভাবে মনুষ্য রচিত কৃত্রিম পরিবেশে তার সৌন্দর্য, জীবনীশক্তি, জীবনলীলা, সবকিছু হারিয়ে ফেলে অর্থহীন, মূল্যহীন, জীবনরসহীন শুষ্ক নিরক্ত যন্ত্রণাদগ্ধ তুচ্ছতায় পর্যবসিত হয়, তারই ব্যঞ্জনা ব্যক্ত। এখানে সুগন্ধী ও শুভ্র কেতকী পুষ্পের মধ্য দিয়ে প্রতীকায়িত হয়েছে সৌন্দর্যময়ী জীবনসচেতন নারী সত্তা। এই সত্তাকে তার স্বকীয়, স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক জন্মভুমি থেকে উৎপাটিত করে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে আধুনিক নাগরিক জীবনের কপটতায়, কৃত্রিমতায়, ভোগ-সর্বস্বতায় ও বিকৃতিতে। অপূর্ব চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে তারই পরিণতি কবিতাটিতে প্রকাশিত প্রসঙ্গত কবি সভ্যতা-উত্থিত আধুনিক নাগরিক জীবনের তির্যক ব্যঙ্গবিদ্ধ পরিচয়ও কবিতাটিতে রেখেছেন। কবিতাটিতে দুঃখবাদ আছে বটে, কিন্তু তার মধ্যদিয়ে মানবিকতারই একটি বিশেষ মাত্রা ব্যক্ত।

বনের কেতকী কেমন ক'রে তার স্বাভাবিক পরিবেশ-ক্ষেত্র থেকে উৎপাদিত হয়ে নাগরীর বিকারগ্রস্ত ভোগশালার কসাইখানায় এসে পৌঁছিয়েছে, যতীন্দ্রনাথ তাঁর হৃদয় বন্ধুর কাছে প্রথমে সেই কথা জানিয়েছেন। কবির হৃদয়-বন্ধু যিনি হয়তো কবির প্রতীকী দেবতা, কিংবা কোনো সহানুভূতিসম্পন্ন মানব-বন্ধু, তাঁর কাছে কবি কেতকীর বেদনায় বেদনার্ত নিজের সুগভীর দুঃখানুভবের কথা শোনাচ্ছেন। সেদিন সঘন বাদলের নিশীথ রাত্রি, হঠাৎ কবির শয়নঘরে কবির নিদ্রাহীন হৃদয়-বন্ধুর আগমন। কবির নিজের চোখেও ঘুম নেই, নিদ্রাহীন বন্ধুকে মধ্যরাত্রে বিনিদ্র কবি তাঁর হৃদয়জ্বালা শোনাতে বসেছেন। শোনাচ্ছেন তাঁর জেগে থাকার কাহিনী। সেই কাহিনীর মূল নায়িকা এক ছিন্নবৃন্ত কেতকী, যাকে কবি বউবাজারের মোড় থেকে কিনে নিয়ে এসেছেন।

সেদিন হঠাৎ কোলকাতা শহরে সন্ধাবেলা বিশাল বৃষ্টির পসরা নেমে এসেছিল। দেখতে দেখতে চারিপাশের রাজপথে জল জমে একাকার। আর সেই চৌরাস্তার চৌমাথা জ্যাম-জটে জটিল হয়ে গেল এবং সেই জ্যাম-জটে দিশেহারা কবির হৃদয়ে তীক্ষ্ণ বেদনার মতো এক সুতীব্র অনুভূতি অনুরণিত হতে থাকলো। কবির যেন মনে হল তাঁর নিজের বুক থেকে উত্থিত হচ্ছে সুচিবিদ্ধ এই যন্ত্রণাময় অনুভব। কবি হঠাৎ তাকিয়ে দেখলেন—

‘বৌবাজারের মোড়ে

যেখানে ফুলের দোকানের পাশে কসাই-এ মাংস থোড়ে,

ইতি উতি চাহি পড়িল নয়নে, ঝুড়ির উপর উচ্চ

মালীর মাথার কুড়ি দুই দেড় কেয়া-কুসুমের গুচ্ছ।’

এতক্ষণ ধরে কবি যাকে নিজের বুকের সুতীব্র ব্যথা বলে অনুভব করছিলেন এখন বুঝলেন—

‘আমার বুকের ব্যথা নহে, এ তো বন-কেতকীর গন্ধ’

কবি দেখলেন কি সুগভীর বৈপরীত্য। অপূর্ব গন্ধবহ শুভ্র সুন্দর কেতকী স্থান নিতে বাধ্য হয়েছে কাঁচা মাংসের দোকানের পাশে এক মালীর মাথায়। একদিকে মানুষের ক্ষুধা, কিংবা ক্ষুধা ছাড়িয়েও তার ঔদরিকতা, এবং তারই প্রস্তুতির হিংস্র পদ্ধতি— যেখানে জীবন স্পন্দন উল্লসিত অজ-প্রাণকে হত্যা করে লোভমত্ত পেটুকের খাদ্যসম্ভাররূপে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। তারই পাশে স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে উৎপাটিত সুন্দরী কেতকী-সত্তার মুমূর্ষু অবস্থান। শহরের মালী এগুলি সংগ্রহ করেছে পল্লীর অরণ্য থেকে। কবি সেই কেয়াফুল থেকে কিছু কেয়াফুল কিনে নিয়ে এসে তাঁর শয়নঘরের হুকে টাঙিয়ে রাখলেন। নগর জীবনের প্রাথমিক সুখ-সুবিধা এবং বিলাস ব্যসনগুলি যখন মানুষ পেতে শুরু করে, তখন সে যেমন তার পুরাতন উৎস-ভূমির কথা ভুলে গিয়ে নাগরিকতার মোহে উল্লসিত হয়ে ওঠে, হয়তো তেমন উল্লাস স্পর্শ করেছিল বনের কেতকীকে। কিংবা হয়তো কবিরই মনে হল, কবি দেখলেন, তাঁর শয়নঘরের হুকে ছিন্নবৃন্ত কেতকী সুখে দোদুল্যমান—

‘শয়নঘরের হুকে

ছিন্নবৃন্ত বনের কেতকী দুলিল মনের সুখে।’

কিন্তু রাত্রে শয়নশয্যায় কবির তন্দ্রাতুর অবচেতন মনে সত্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বাইরে বর্ষা ঝরছে। কবির শয়নশিয়রে কেয়ার গন্ধ, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ পূর্ণিমার চাঁদকে ঢেকে ফেলেছে। আর কবি নিজের কল্পনায় অনুভব করছেন, স্বীয় পরিবেশ-বিচ্ছিন্ন কেতকীফুলের শহরে আসবার পশ্চাৎ ভূমিকা—

‘কে জানে সে কোন্ বনে,

কাঁটার আড়ালে উঠেছিল ফুটে আঁধারে সংগোপনে। ...

উড়ায়ে ভ্রমর মারি’ বিষধর শহরের পাকা মালী

বৌবাজারের মোড়ে বিকাইতে কেয়ার ভরিল ডালি।’

কোন পল্লীর অরণ্যে কাঁটার আড়ালে সংগোপন ফুটে উঠেছিল এই ফুল। বনের পুষ্প, তার হলুদ রঙের রেণু, এবং দীঘাকৃতি ফুলকে ঢেকে রেখেছিল শ্যামপল্লব (spathe)। বর্ষার ফুল, তার স্বাভাবিক আরণ্য পরিবেশে গন্ধ বিকীর্ণ করে। এবং তার স্বাভাবিক

আরণ্য সঙ্গী গন্ধমত্ত ভ্রমর ও বিষভুজঙ্গ তাকে ঘিরে আনন্দের পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে। কিন্তু শহরের অর্থলুব্ধ মালী, শহুরে দালাল খুজেঁ খুজেঁ তার গন্ধের পথ ধরে তাকে উৎপাটিত করে নিয়ে এলো তার স্বাভাবিক পরিবেশ থেকে, ব্যবসা করবার জন্য। মালী ব্যবসায়ী, স্বাভাবিক আনন্দ-পরিবেশ থেকে কেয়াকে বিচ্ছিন্ন করে শহুরে মানুষের ভোগাকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য, তার বিলাস কক্ষ সাজানোর জন্য। তাকে শহরে বাজারের পণ্য ক'রে নিয়ে আসবার জন্য তার মনের তাগিদ।

হঠাৎ কবির ঘুম ভেঙ্গে গেল। কবির আধ তন্দ্রাতুর চোখে এক আশ্চর্য ছবি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। হুকের গায়ে ঝোলানো সুন্দর কেয়াফুল সুন্দরী নীলাম্বর পরিহিত নারীর প্রতীকের সঙ্গে মিলে-মিশে হয়ে গেল একাকার। সে যেন অঙ্গের নীলাম্বরীর আঁচলে গলায় ফাঁসি লাগিয়ে দেওয়ালের হুকে ঝুলে পড়ে আত্মহত্যা করেছে। কবি চারটি মাত্র পংক্তিতে এর যে আশ্চর্য স্বাভাবিক ছবি এসেছেন তা তুলনারহিত,

'আধঘুমে চাহি' দেখিনু চমকি— ঝুলিছে সর্বনাশী

নিজ অঙ্গের নীলাম্বরীতে কণ্ঠে লাগায়ে ফাঁসি।

কসিয়া কোমর বাঁধা

অলক গুচ্ছে আধঢাকা মুখ অস্বাভাবিক সাদা।'

কবি ফাঁসি থেকে তাকে বাঁচাতে গিয়ে যেমনি হুক থেকে তাকে সরাতে গিয়েছেন, অমনি কেয়ার শুষ্ক পরাগ কবির হাতে গেলে ঝরঝর করে ঝরে পড়লো। আর কেয়ার কাঁটা কবির হাতে বিদ্ধ হওয়াতে কবি অনুভব করলেন, যাকে তিনি তন্দ্রাঘোরে ভেবেছিলেন আত্মহত্যাকারী সুন্দরী নারী, তা আসলে দু'পয়সার কেয়াফুল। একদা সৌন্দর্যময় প্রাণসত্তা এখন অতি স্বল্পমূল্যের পণ্যে পরিণত। ...

এবার কবিতাটিতে প্রকাশিত মূল তাৎপর্যটি অনুধাবন করা যাক। বর্তমানে মানুষের দুঃখবাদ বা বিষাদচেতনার যে প্রধান কারণগুলি, তার মধ্যে প্রধানতম, স্বাভাবিক জীবন প্রাঙ্গণ থেকে তার বিচ্ছিন্নতা, যাকে বলা হয় aleination। আমাদের প্রাচীন পল্লীজীবন, আমাদের পল্লীস্থ সকলকে এমন এক আত্মীয়তার বন্ধনে বেঁধে রেখেছিল, যেখানে প্রতিদিন আমরা উদ্বোধিত প্রাণের আনন্দ অনুভব করেছি। আমাদের সর্বাপেক্ষা সার্থকতা স্বভাবের সঙ্গে আমাদের সামঞ্জস্যে। কিন্তু আধুনি শহর স্বাভাবিকতাকে সম্পূর্ণ পরিহার করতে চেয়েছে এবং আত্মার যে বন্ধন পরস্পরকে আত্মীয়তায় প্রতিষ্ঠিত করে তাও হয়েছে ছিন্নগ্রন্থি। আলোচ্য কবিতায় কবি এই তাৎপর্যই আমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন অতি সুন্দর কাব্যিক চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে।

'কেতকী' এখানে প্রকৃতি-বিচ্ছিন্ন, স্বাভাবিক পরিবেশ থেকে উৎপাটিত শহরে প্রক্ষিপ্ত জীবনের প্রতীক— ক্রমশঃ alienated, শুষ্ক, নিঃশেষিতরস। প্রথমে যখন মানুষ নাগরিক পরিবেশে প্রচুর উপকরণ ও বিলাসের ক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হয়, তখন সে বুঝতে পারে না, কি বিশাল জীবনানুভূতি হারিয়ে যে বীভৎসতার সাক্ষী হতে বাধ্য হলো। কসাই যেখানে প্রাণী হত্যা করে তার মৃতদেহ থুড়ে থুড়ে রাখছে, তার পাশেই স্থান নিতে

বাধ্য হয় প্রকৃতজাত স্বাভাবিক সৌন্দর্য সত্তা। জীবনহীন, অনুভূতিহীন, রক্তহীন, হৃদয়হীন, স্নায়ুহীন মাংসপিণ্ড হয় এই প্রাণপূর্ণ সৌন্দর্যসত্তার সঙ্গী। ...

যতীন্দ্রনাথের 'কেতকী' কবিতার সমতুল্য কাব্যিক চেতনা প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য বহু কবির মধ্যেই দেখা যায়। নাগরিক কৃত্রিমতা, ভোগসর্বস্বতা এবং ব্যবসায়িক মানসিকতা কিভাবে ফূর্ত প্রাণের জীবনরস কেড়ে নেয় তার পরিচয় রয়েছে রবীন্দ্রনাথের মানসী কাব্যের 'বধূ' কবিতায়। ...

যতীন্দ্রনাথের 'মরীচিকা' ও 'মরুমায়া' কাব্যগ্রন্থে আরও তিনটি কবিতা আছে যাদের মধ্যে আপন স্বভাব-ক্ষেত্র থেকে উৎপাটিত প্রাণসত্তার মুমূর্ষু বেদনার প্রকাশ। কবিতাদ্বয় যথাক্রমে 'হাট' ও 'হাটে' এবং 'পাষাণ পথে'। ...

কবি বন্ধু যতীন্দ্র মোহন বাগচী 'কেয়াফুল' ('নাগকেশর' কাব্যস্থ) নামে একটি কবিতা রচনা করেছিলেন। সেই কবিতার বৈশিষ্ট্য, কেয়ার স্বাভাবিক জীবনপ্রাঙ্গণের সঙ্গে মিলিয়ে তার সৌন্দর্য অনুভব, আবার তার সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া পুষ্প পসারিণী নারীর স্নিগ্ধ জীবনলীলা। নারী পুষ্প এবং তাদের স্বাভাবিক জীবনপ্রাঙ্গণ সম্মিলিত হয়ে কবি যতীন্দ্র বাগচীর কাছে যে সার্থক এবং পূর্ণ জীবনলীলার উপলব্ধি পৌঁছিয়ে দিয়েছিল তারই আনন্দ-প্লাবিত অনুভূতিতে কবি সারারাত বিনিদ্র ছিলেন। যতীন্দ্রনাথের কবিতায় যতীন্দ্র বাগচীর কবিতার প্রতিক্রিয়া রয়েছে বলে মনে হয়। 'কেতকী' কবিতাতেও কবি বিনিদ্র রজনী যাপন করছেন, কিন্তু তার কারণ বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা, মুমূর্ষু কেতকীর জন্যে কবির বেদনা, আর যতীন্দ্রমোহন বাগচীতে ঠিক তার বিপরীত। ...

আলোচ্য কবিতার কাব্যিক ও সৌন্দর্যমূল্যও তুলনাহীন। পংক্তির পর পংক্তির মধ্য দিয়ে কবি কেতকী ফুলের স্বাভাবিক পরিবেশ, নগরীতে তার অবস্থানের মধ্যে তার স্বাভাবিক জীবনানুভবের বৈপরীত্য, তার মধ্য দিয়ে সৌন্দর্যময় নারীসত্তার প্রতীক রচনা। কবির ঈশ্বর চেতনাও এখানে প্রকাশিত। কবির ঈশ্বর তার নিজেরই সৃষ্টির বেদনায় আর্ত। কেতকী ফুলের মৃত্যু বা আত্মহত্যা কবি ও কবির ঈশ্বর, দুজনকেই পীড়িত করেছে। বেদনাপীড়িত ঈশ্বরকে কবি উপহার দিয়েছেন ঈশ্বরের সৃষ্টির বেদনায় আতুর কবির কাব্যিক অনুভূতি। ...

আরও একটি কাব্যিক বৈশিষ্ট্যের দিকে আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এক ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিকে অপর ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিগম্য করে চিত্রিত করা ঊনবিংশ শতক থেকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কবিদের এক উল্লেখযোগ্য বিশিষ্টতা। একে বলা হয় অনুভূতির ইন্দ্রিয়ান্তরকরণ (Synesthesia)। কেতকী কাব্যে এর একটি উদাহরণ আছে। কবি কেতকীর স্বাভাবিক পরিবেশ-প্রেরণার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—

শ্রাবণ-সোহাগে যৌবন জাগে, বাজে গন্ধের রেণু। গন্ধে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের অনুভূতিগম্য ব্যাপার কিন্তু কবি এখানে তাকে শ্রবণগম্য অনুভূতির ব্যাপারে পরিণত করে বললেন, 'বাজে গন্ধের বেণু' অর্থাৎ গন্ধকে তিনি বাজিয়ে তুললেন। কেতকী কাব্যের এই কাব্যিক বিশিষ্টতাটুকুও আমরা মনে রাখব।"

৩.২.৫ কচিডাব

" 'কচিডাব' কবিতাটি কবির একটি বিখ্যাত কবিতা। কবির দুঃখবাদী চেতনা, মানবিক চেতনা এবং ঈশ্বর-চেতনার এমন সার্থক সম্মিলন তাঁর আর অন্য কোনো কবিতায় হয়েছে কিনা সন্দেহ।

'কচিডাব' কবিতাটি কবির 'সায়ম্' কাব্যের অন্তর্গত এবং এর রচনাকাল ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাস (খ্রিস্টীয় ১৯৩৯ -এর নভেম্বর)।

কবিতাটি শুরু হয়েছে একটি সাধারণ কাহিনী-বর্ণনার মধ্য দিয়ে, কিন্তু ক্রমে ক্রমে তা এমন সুগভীর অনুভূতির স্তরে বক্তব্যকে পৌঁছিয়ে দিয়েছে যে আমাদের বিশেষ ভাবে বিস্মিত হয়ে যেতে হয়। বাস্তবতা এবং অনুভবের গভীরতা দুই -এর সার্থক সমন্বয়ে ঘটেছে এই কবিতায়। অগ্রহায়ণ মাসে রচিত এই কবিতার প্রথমেই রয়েছে এক অগ্রাহায়ণ মাসের মৃদু শীতার্ত শহুরে শ্বাসরোধী ধোঁয়াশা-পরিব্যাপ্ত শীতসন্ধ্যার পরিচয়। হাঁপের টানের মতো উত্তরী বাতাস মাঝে মাঝে শীর্ণ গলির ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে। এই গলিতেই কবির বাস। অনভিজাত দারিদ্র্য পরিকীর্ণ অন্নাভাবগ্রস্ত এই সব অধিবাসীদের নিয়ে গলির জীবনযাত্রা। এই গলিতে ঐ ধোঁয়াশাপরিব্যাপ্ত শীত সন্ধ্যায় হঠাৎ এক বৃদ্ধ কণ্ঠের হাঁক শোনা গেল, 'ডাব চাই, ডাব, কচি ডাব'?

কবি এই বৃদ্ধ ডাবওয়ালাকে সংকীর্ণ গলির মধ্যে দেখতে পেয়ে ঘরের ভিতর থেকে বলে উঠলেন, এই শীতের সন্ধ্যায় এই দরিদ্র গলিতে তোমার ডাব কিনবার মতো অধিবাসী কোথায়? প্রত্যুত্তরে—

"কাঁদিয়া কহিলা বুড়া তুমি মোর বাপ খুড়া,

ঝাঁকাটায় হাত যদি দাও,

বারেক নামায়ে বোঝা, মাজাটা কবির সোজা,

ডাব তুমি নাও বা না নাও।'

কবি দ্বার খুলে বাইরে বেরিয়ে এসে দুহাত দিয়ে ঝাঁকা ধরে তার ঝাঁকা নামিয়ে দিলেন। কিন্তু অতিরিক্ত কষ্টে বৃদ্ধ ডাবওয়ালার শরীর তখন কম্পমান, এবং শীতার্ত সন্ধ্যাতেও তার উর্ধাঙ্গ আবরণহীন আর তার নগ্ন বুকে ঘাড় নুয়ে পড়েছে। ক্ষণিক বিশ্রাম করে বৃদ্ধ ডাবওয়ালা কবির দিকে তাকিয়ে বিদায় চাইল। কিন্তু এখন কবির চিত্তে সুগভীর আলোড়ন। কবি নিজেও ধনী নন। শীতের সন্ধ্যায় তাঁর ডাবের প্রয়োজনও নেই। তথাপি দুঃখী ডাবওয়ালার দুঃখে সহানুভূতিতে কবি তার ডাবগুলি ঝাঁকা থেকে নামিয়ে নিয়ে তাকে ন্যায্য মূল্য দিলেন। কবির সহৃদয়তায় বৃদ্ধ ডাবওয়ালা বিহ্বল—

'গণ্ড ভরি' আঁখি নীরে খালি ঝাঁকা তুলি শিরে

গলি বেয়ে চলি গেল বুড়া—'

এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে এর পরে কবির মনে চলেছে নানা ভাবের উত্থান-

পতন। কবি যতীন্দ্রনাথ অনুভব করছেন, তাঁর সঙ্গে সমকালীন অন্যান্য কবিদের কতই না তফাৎ। আর সকল সমকালীন কবিদের ভাগ্যে দেখা দেয় রোমান্টিকতার সৌন্দর্য-সঞ্চারী বিভাব ও অনুভাব। পসারিণী রূপে আসে শ্রাবণের সন্ধ্যাবেলা সুন্দরী তরুণী, আর তাঁর কপালে একি বৈপরীত্য। শেষকালে কিনা শীতের রাত্রে এক অতি বৃদ্ধ ডাবওয়ালা। কবি নিজের ঘরে দ্বার রুদ্ধ করে তানপুরা নিয়ে তাঁর মনের এই বেদনাকে কাব্য-রূপ দিচ্ছেন। কবি গাইছেন—

‘সে-সব কবির বেলা,— শ্রাবণের সন্ধ্যাবেলা,
দুয়ারে তরুণী পশারিণী,
তনুদেহে সিক্ত বাস নয়নে মিনতি-ফাঁস,
ফুল নিয়ে করে বিকিকিনি।
আরো ভাগ্যবান যিনি আসে তাঁর পশারিণী
কোমল করুণ ক্লান্তকায়,
শয্যা শুভ্রফেননিভ স্বহস্তে পাতিয়া দিব’—
সাধে কবি সমবেদনায়।
এ ভালে তেঁতুল গোলা অতি বৃদ্ধ ডাবওলা।
তাও নহে বৈশাখী দু’পরে;
মিটাতে প্রাক্তন দেনা শীতরাত্রে ডাব কেনা।
তাও কি কাটারি আছে ঘরে!’

কিন্তু হঠাৎ কবির উপলব্ধিতে ভাস্বর হয়ে ওঠে এক পরমসত্য। কবি অনুভব করেন, এতদিন ধরে তাঁর যে প্রিয়তম দেবতাকে দূর থেকে তিনি অনুভব করেছেন আজ সেই দেবতাই দীনতম মানুষে পরিণত। কবির ঈশ্বর শিব তাঁর ঈশ্বরত্ব পরিহার করে নিঃস্ব দীন ডাবওয়ালায় পরিণত হয়ে কবির গৃহে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কবির সৌভাগ্য, সমকালীন রোমান্টিকতা বিলাসী কবিদের মতো কোনো মায়াবিনীর বিভ্রম-চঞ্চল হয়ে তিনি তাঁর প্রিয়তম দেবতাকে প্রত্যাখ্যান করেননি। মানুষের অশ্রুসাগর মন্থন করে যে দুঃখের বিষ উত্থিত হয়েছে তাকে পান করে যতীন্দ্রনাথের প্রিয়তম দেবতা শিব নিজেই দীনতম মানুষের পরিণত হয়ে গিয়েছেন। দিগম্বর, দিগ্‌ভ্রান্ত ক্ষুধায় টলমল বহু শোকদগ্ধ, অস্থিসর্বস্ব মানুষ বস্তুতঃ কবির প্রিয়তম দেবতারই রূপান্তর। কবির সৌভাগ্য যে তিনি সেই দেবতাকে বিমুখ করেননি। কবি অনুভব করেছেন তিনিও ঐ সকল বঞ্চিত, রিক্ত সর্বহারা মানুষদেরই অন্যতম। সুতরাং কবির দেবতা দরিদ্র দুঃখার্ত কবিরই অন্যতম সত্তা। কবির চারিপাশে নানারূপে নানা ছলে দুঃখার্ত মানুষের আবির্ভাব। কবি নিজেও দুঃখী বলে তারা কবিকে ভালোবাসে এবং কবিও তাদের বেদনায় বেদনার্ত। তারা বস্তুত কবির দেবতারই নবনব রূপায়ণ। কবিসহ চারিপাশের এই দুঃখার্ত মানুষ দুঃখী শঙ্করের এক এক ফোটা চোখের

জল। এই শঙ্কর মানুষের বেদনাকে আত্মস্থ করে নিয়ে মানুষে পরিণত, এবং মানুষেরই মত বেদনায় অশ্রুময়— ...

সুর ও অসুর, দেবতা ও দানবেরা সমুদ্র-মন্থন করেছিল; সমুদ্র থেকে অমৃত উঠলে নারায়ণ মোহিনীরূপ ধারণ করে সকলকে অমৃত পরিবেশনের দায়িত্ব নেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল দানবদের বঞ্চিত করে শুধু দেবতাদের অমৃত দেওয়া, যাতে দেবতারাই কেবলমাত্র অমর হতে পারে। অমৃত পান করলে অমর হওয়া সম্ভব। বস্তুত মোহিনী রূপী নারায়ণ অমৃত-বন্টনের সময় অসুরদের বঞ্চনা করেছিলেন। নারায়ণের এই অমৃত-বন্টন চিরকাল চলেছে, এখনও চলছে। বন্টনের নামে একদল চির বঞ্চিত, অপরদল প্রসাদ প্রাপ্ত। কবি যতীন্দ্রনাথ বঞ্চিতদের অন্যতম। দানবেরা অমৃত না পেয়ে আবার সমুদ্র-মন্থন করে। অতিমন্থনের ফলে সমুদ্র থেকে কালকুট উঠলে তার প্লাবনে জগৎ ধ্বংস-উন্মুখ করে। তখন শিব সেই কালকুট বিষ কণ্ঠে ধারণ করে জগৎ রক্ষা করেন। এই শিবই তাই কবির প্রিয় দেবতা। এখনও মানুষের অশ্রু-সাগর মন্থন করে যে হলাহল উঠেছে কবির দেবতা শিব তাকে কণ্ঠে ধারণ করে 'নীলকণ্ঠ' নামের যাথার্থ্য রক্ষা করছেন।...

সমকালীন রবীন্দ্রনাথ-সহ রবীন্দ্র-অনুসারী যে সকল রোমান্টিক কবিদের প্রতি যতীন্দ্রনাথ তীব্র তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গবাণ বর্ষণ করে কাব্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তার সব থেকে স্পষ্ট পরিচয় 'কচিডাব' কবিতায়। 'কচিডাব' কবিতায় সমকালীন বহু কবির প্রতি ইঙ্গিতে বিদ্রূপবাণ বর্ষিত হয়েছে। কিন্তু সবথেকে স্পষ্ট দুটি কবিতা। যে কবিতাদ্বয় কবি যতীন্দ্রনাথের বিদ্রূপের প্রত্যক্ষ লক্ষ্য তার একটি যতীন্দ্রনাথের বন্ধু, যতীন্দ্রমোহন বাগচীর 'নাগকেশর' কাব্যগ্রন্থের 'কেয়াফুল' কবিতা, এবং অপরটি রবীন্দ্রনাথের কল্পনা কাব্যের 'পসারিনী' কবিতা। কবিতা দুটি উল্লেখ করে তার সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের 'কচিডাব' কবিতাটি তুলনা করলে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হবে। ...

রবীন্দ্রনাথ এবং যতীন্দ্রমোহন বাগচীর কবিতা দুটিতে আমরা পাচ্ছি স্নিগ্ধ বঙ্গদেশের করুণ সৌন্দর্যের স্পর্শ, দুটি নারীরূপকে কেন্দ্র করে সুক্ষ্ম সুকুমার রোমান্টিক নারীপ্রেমের ইঙ্গিত এবং কবিতা দুটির সর্বাঙ্গ ব্যাপ্ত করে একটি মোহ-মুগ্ধতার স্বপ্নময় অনুভূতি। রবীন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, এবং যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, এই তিন কবির আলোচ্য তিনটি কবিতায় তিনজন বিক্রয়পসারী আছে। রবীন্দ্রনাথ ও যতীন্দ্রমোহন বাগচীর পসারী অল্প বয়স্ক তরুণী। রবীন্দ্রনাথের পসারিণীর করুণ কোমল ক্লান্তকায়, এবং তার রক্তাভ চরণের নীচে পথের তপ্ত বালু অগ্নিবাণ হানছে। কবি তার এই ক্লান্তি থেকে তাকে মুক্তি দেওয়ার জন্য পথ থেকে কাছে ডেকেছেন।...

বাগচী কবির কবিতাতে স্নিগ্ধ কামিনী কণ্ঠে ডাক উঠছে 'ফুল চাই—চাই কেয়াফুল' এই পসারিণীও এসেছে সন্ধ্যা বেলাতেই পসরা করতে, কিন্তু এ শীতের সন্ধ্যা নয়, এ ঝরঝর-শ্রাবণ সন্ধ্যা। শ্রাবণের মেঘ তখনও রিক্ত-বর্ষণ হয়নি মাঝে মাঝে আকাশে বিদ্যুতের ঝলক আর মেঘের মাদল। চারিপাশ ঘিরে এক অপূর্ব সুন্দর সুকুমার স্নিগ্ধ রোমান্টিক প্রকৃতির আবেষ্টন আর অতি সুক্ষ্ম প্রেমানুভুতির ইঙ্গিত।

উপরি-উক্ত দুই কবির কবিতার মূল বৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্রে রেখে যতীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতার কেন্দ্রীয় চরিত্র পরিবেশ এবং সময়কালকে পালটিয়ে দিয়ে কবিতার রোমান্টিক কেন্দ্রীয় বীজকে চূর্ণ করে পুর্বোক্ত কবিদের 'নিমীলিত নেত্র সৌন্দর্য' আরতির বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ-তীক্ষ্ণ আঘাত করেছেন।' যতীন্দ্রনাথের কবিতাটি হয়ে উঠেছে সমকালীন জীবনের ভগ্ন-স্বপ্ন বাস্তবতার পরিচয়বাহী।

এই সঙ্গে সমকালীন জীবনের দুঃখ ও দারিদ্র্য-চিহ্নিত কাব্যিক পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি যেমন কবিতাটিতে অতি প্রত্যক্ষভাবে রোমান্টিক কবিদের আক্রমণ করেছেন তেমনি আবার দুঃখীমানুষের জন্যে তাঁর হৃদয়-আর্তিকেও স্পষ্ট করে তুলেছেন। ...

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যতীন্দ্রনাথের 'কচি ডাব' সম্পর্কে কিছু অপূর্ব সানুভব উক্তি আমাদের উপহার দিয়েছেন। এখানে সেই উক্তি উল্লেখ করে আমাদের বক্তব্য শেষ করি।

১. 'কচিডাব' শুধু যতীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতা নয়— সমস্ত বাংলাসাহিত্যেরই একটি অনন্য সৃষ্টি। যতীন্দ্রনাথের কাব্যদর্শন এই কবিতাতেই সবচেয়ে উচ্চারিত। পীড়িত, লাঞ্ছিত মানুষের প্রতি নিবিড়িতম বেদনাবোধ, দুঃখহত জীবনের প্রতি আত্মীয়তার অনুভবে বিশ্বব্যাপী দীনদরিদ্রের স্বপক্ষে এইটিই তাঁর বলিষ্ঠতম ঘোষণা।'

২. 'দীন-দরিদ্ররূপী শঙ্কর আজ পথে পথে দিগ্‌বাস হয়ে ঘুরছেন, ক্ষুধার অন্নের বিনিময়ে কখনো পান ভাং ধুতরো, কখনো শ্মশানের ছাই, কখনো বা পৃথিবীর যা কিছু উদ্‌গীর্ণ গরল। হাতের করোটি পাত্রে নিজের অশ্রুই তাঁর একমাত্র পানীয়। স্বার্থপর লোভীমানুষের পুঞ্জ পুঞ্জ উপেক্ষা আর অপমান বর্ষিত হচ্ছে তাঁরই উদ্দেশ্য। বৈশাখের খররৌদ্রের মতো তাঁরই কণ্ঠের বিষ জ্বালায় দিগ-দিগন্ত আজ জর্জরিত।'

৩. 'যিনি দরিদ্র, যিনি ভিখারী, সংসারের সমস্ত কালকূট সেবনে যিনি নীলকণ্ঠ— যতীন্দ্রনাথের কাব্যে তিনি ইষ্টদেবতা। যতীন্দ্রনাথ শৈব। কিন্তু তাঁর শিব যোগারূঢ় যতীন্দ্র নন— ত্রিলোক বন্দিত আগম-নিগম-পুরাণের প্রবক্তা পঞ্চানন মহেশ্বরও নন। যতীন্দ্রনাথের শঙ্কর লোকায়ত তিনি মন্ত্রহীন ব্রাত্যদের দেবতা। তাঁর বক্ষে নিখিল বিশ্বের বেদনা— দুঃখদুর্গত মানুষের প্রতিনিধি।'

৪. 'যতীন্দ্রনাথ নিজেকে দুঃখবাদী বৈরাগী বলে পরিচয় দিতে চেয়েছেন। আপাত দৃষ্টিতে তাঁর কাব্যে কিছুটা দুঃখবাদ আছে তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই দুঃখবাদের অর্থ পরাজয়বাদ নয়। 'শোপেনহাওয়ারী' শূন্যতার মন্ত্রে তিনি দীক্ষা নেননি। তাঁর শ্লেষের আঘাত আত্ম-ধ্বংসমূলক নয়— তা আত্মসমীক্ষামুলক। ভণ্ডামি, মুঢ়তা, বঞ্চনা আর বাষ্পবিলতার বিরুদ্ধে তাঁর খরধার আক্রমণ।' "

৩.৩ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

আলোচ্য বিভাগে আমরা প্রথমে 'ঘুমের ঘোরে' কবিতাটি আলোচনা করেছি। এই কবিতা দুঃখবাদী দর্শন সর্বাপেক্ষা দৃঢ় প্রত্যয়ে, জীবনচেতনার বাস্তবতায় এবং নিবিড় তাত্ত্বিক উপলব্ধিতে প্রকাশিত হয়েছে।

যতীন্দ্রনাথের ঈশ্বর-চেতনামূলক কবিতাগুলির মধ্যে 'শিবস্তোত্র' কবিতাটি অন্যতম। এই কবিতায় কবি ঈশ্বর-চেতনার মধ্য দিয়ে ক্রমশ বেদনার্ত মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিফলন দর্শন করেছেন।

কবির দুঃখবাদী চেতনাত্মক অন্য একটি কবিতা হল 'দুঃখবাদী'। অবশ্য এই কবিতায় সুগভীর মানবিকতাবোধ কাজ করেছে।

'কেতকী' কবিতাটির মধ্য দিয়ে স্বভাব এবং স্বাভাবিক পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন সৌন্দর্যসত্তা কীভাবে মানুষ্য রচিত কৃত্রিম পরিবেশে তার সৌন্দর্য, জীবনীশক্তি, জীবনলীলা সবকিছু হারিয়ে ফেলে অর্থহীন, মূল্যহীন, জীবনরসহীন শুষ্ক নিরক্ত যন্ত্রণাদগ্ধ তুচ্ছতায় পর্যবসিত হয়, তারই ব্যঞ্জনা ব্যক্ত হয়েছে।

কবির দুঃখবাদী চেতনা, মানবিক চেতনা ও ঈশ্বর চেতনার সার্থক সম্মিলন ঘটেছে 'কচিডাব' কবিতায়।

৩.৪ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

দ্বিতীয় বিভাগের শেষে সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি দ্রষ্টব্য।

৩.৫ প্রসঙ্গ- পুস্তক (References/Suggested Readings)

বি: দ্র: এই বিভাগের নির্বাচিত কবিতাগুলির আলোচনা বারীন্দ্র বসুর 'কবি যতীন্দ্রনাথ : কবিমানস ও কবিতা' গ্রন্থ থেকে হুবহু পুনর্লিখিত হয়েছে। কৃতজ্ঞ-চিত্তে আমরা লেখকের এই গ্রন্থঋণ স্বীকার করছি।

* * *

বিভাগ-৪

রক্তমণির হারে

রক্তমণির হারে : প্রসঙ্গ-কথা

বিষয় বিন্যাস

৪.০ ভূমিকা (Introduction)

৪.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

৪.২ রক্তমণির হারে : প্রসঙ্গ-কথা

৪.২.১ দেশভাগ : ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে

৪.৩ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

৪.৪ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

৪.৫ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

৪.০ ভূমিকা (Introduction)

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে ঔপনিবেশিক বৃটিশের কাল থেকে। দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট এই সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। কারণ ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে তিনিখণ্ড হয়ে। পশ্চিমে পাঞ্জাব ও পূর্ব বঙ্গদেশ অংশ পাকিস্তান এবং অবশিষ্ট অংশ ভারতবর্ষ নামে পরিচিত হয়। পরবর্তীকালে পাকিস্তান আবার দ্বিখণ্ডি হয় ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে। পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন দেশ রূপে জন্মগ্রহণ করে বাংলাদেশ নামে।

১৯৪৭-এর ভারত ভাগ বিশেষ দুটো অঞ্চলের জীবনযাত্রা প্রণালীর চপর বহুকৌণিক আঘাত হেনেছিল। পাঞ্জাব ও বাংলায় লক্ষ লক্ষ লোক হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায় নির্বিশেষে গৃহহীন হয়ে অজস্র লোকের মৃত্যু হয়েছিল পারস্পারিক অবিশ্বাসের ফলে জন্ম নেওয়া দাঙ্গায়। শরণার্থী ও উদ্বাস্তুর ঢল নেমে এসেছিল। কিন্তু এই পারস্পরিক বিশ্বাস একদিনে সৃষ্টি হয়নি। এবং ব্যক্তিগত আক্রোশ থেকেও এর জন্ম নয়। খুব কৌশল করে এই আক্রোশ জাগিয়েছিল তৎকালীন ইংরেজ সরকার। এই অধ্যায়ে আমরা সেই বিভেদের সৃষ্টি কীভাবে হল সেটা জেনে নেবার চেষ্টা করব।

৪.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই অধ্যায়ে পাঠ করে আমরা জানতে পারব যে কীভাবে হিন্দু ও মুসলমানে মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাসের সৃষ্টি হল। কোন সম্প্রদায়ের কী কী ভূমিকা ছিল কিংবা

কোন কোন নেতা এই বিভেদ সৃষ্টিতে ইন্ধন জুগিয়েছিল। ঐতিহাসিক দিক থেকে যথাসম্ভব নিরপেক্ষ আলোচনা করে হিন্দু-মুসলমান নেতা নির্বিশেষে কীভাবে এঁরা আসলে ইংরেজদের পাতা ফাঁদে পা দিয়েছিলেন সেই প্রসঙ্গই আলোচিত হইছে এই বিভাগে। পরবর্তীকালে যে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগ সংঘটিত হয়েছিল তার স্বরূপাটিকে বুঝে নেওয়াই হবে এই বিভাগে আমাদের উদ্দেশ্য।

৪.২ রক্তমণির হারে : প্রসঙ্গ-কথা

'রক্তমণির হারে' গ্রন্থের নির্বাচিত গল্প-গুলি আলোচনার পূর্বে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে শে ভাগ সম্পর্কে সবিশেষ জেনে নেওয়া প্রয়োজন। এই বিভাগে উল্লিখিত বিষয়ের উপর আমরা আলোকপাত করব।

৪.২.১ দেশভাগ : ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ১৪ই আগস্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষের বিভাজন সুনিশ্চিত হয়ে যায়। পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান এবং ভারতবর্ষ নামে তিন টুকুরো হয়ে যায় মূল দেশটি। পরবর্তীকালে ভাষা নিয়ে আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে পৃথক রাষ্ট্রের জন্ম দেয়, নাম হয় বাংলাদেশ। আসলে ভারত বিভাজনতো মূলত দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে হলেও এর কোপ পড়েছিল প্রধানত দুটো প্রদেশের ওপর। পশ্চিম ভারতের পাঞ্জাব-প্রদেশ ও পূর্বের বঙ্গদেশই অঙ্গচ্ছেদের শিকার হয়।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সঙ্গে দেশ বিভাগের অঙ্গাঙ্গীর সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পাকিস্তানের জন্ম একটি জাতির বহুদিনের সঞ্চিত আকাঙ্ক্ষা ও দীর্ঘপ্রয়াসের ফলশ্রুতি ভাবলে ভুল হবে না। আসলে পাকিস্তানের উৎপত্তি ভারতবর্ষের মূল সাধনার ঠিক বিপরীতে, যে সাধনার মূল কথাই হচ্ছে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। আসলে ভারতবর্ষে যারাই এসেছে তারাই স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে মিশে পরবর্তীকালে এক বৃহৎ ভারতীয় সমাজের অংশ হয়ে গেছে। একমাত্র ব্যতিক্রম ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা। মুসলমানেরা ভারতবর্ষে আসার পর কখনোই হিন্দুদের সঙ্গে এক হয়ে মিশতে পারেনি। ভারতবর্ষ যে কিছু এবং মুসলমান উভয়েরই দেশ এই কথা জনসমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা যায়নি। অনেকেই অবশ্য এই বোধ প্রতিষ্ঠার আন্তরিক চেষ্টা করেছেন। মোগল সম্রাট আকবর, দারা শুকো প্রভৃতিরা আন্তরিকভাবেই হিন্দু মুসলমান মিলনের রূপরেখা তৈরির প্রয়াস করেছিলেন। কিন্তু এই প্রয়াস সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই ভারতবর্ষ ব্রিটিশের অধিকারে চলে যায়। বৃটিশেরা শাসকদের মানসিকতা নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের মধ্যে যে সামান্য ফাটল ছিল তাতে অবিশ্বাসের দেয়াল নির্মাণ করে। এই অবিশ্বাস পরিবর্তীকালে দেশ বিভাগের মূল কারণ হয়ে ওঠে। ফলে দেশ বিভাগ আসলে শুধু একটু ভূখণ্ডের বিভাজন নয়, মূলত এটি বৃহৎ ভারতীয় জনমানসে বিভদ সৃষ্টির করুণতর গাথা।

মধ্যযুগের বিখ্যাত বিদেশি পর্যটক ইবন বতুতার ভ্রমণ কাহিনি থেকে জানা যায় যে ওই সময়ও হিন্দু মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্ক খুব সৌহার্দপূর্ণ ছিল না। হিন্দুরা মুসলমানদের অস্পৃশ্য মনে করত, আর মুসলমানরাও হিন্দুদের বিধর্মী কাফের বলে দূরেই থাকত। বস্তুত এই ভেদভাব ছিল বলেই সেই সময়ে কবীর, দাদু, রজ্জর প্রভৃতি সাধকেরা মিলনের বাণী প্রচার করেছিলেন। পরবর্তীকালেও বহু সাধকেরা এই দুই ভিন্ন জন-সম্প্রাদায়কে পাশাপাশি নিয়ে আসার জন্য নানাভাবে আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু ইংরেজরা এই ভেদাভেদকে কাজে লাগিয়ে তাদের শাসনকার্য আরও শক্ত করার প্রয়াস চালিয়েছিল। তাদের এই ভেদনীতির ফলেই দেশবিভাগ সংঘটিত হয়েছিল।

যদিও ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগ হয়, কিন্তু ইংরেজ শাসকেরা ভারত শাসন করতে গিয়ে এই বিভেদ নীতি অনুসরণের কথা অনেক আগে থেকেই ভারতে শুরু করেছিলেন। ঘটনাচক্রে ভারতবর্ষের উভয় সম্প্রদায়েরই বেশকিছু নেতা ইংরেজদের পাতা যাঁদে পা দিয়েছিলেন। এদের মধ্যে সকলেই যে ভিলেন ছিলেন তেমন নয়। আপাত ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির লোভে অথবা নিজস্ব সম্প্রাদয়ের সাময়িক কল্যাণের আশায় তাঁরা ইংরেজদের বিভেদ-নীতির সমর্থন করেছিলেন। এর ভবিষ্যত পরিণাম সম্পর্কে কারোরই সম্ভবত স্পষ্ট ধারণা ছিল না। এটা যে পরবর্তীকালে দেশভাগের মতো একটা চিরস্থায়ী ক্ষত সৃষ্টি করবে এ বিষয়ে তাঁরা ভাবতেই পারেননি।

ইংরেজ শাসকের এই বিভেদনীতির কথা একেবারে গোড়ার দিক থেকেই ভাবতে শুরু করে দিয়েছিল। ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনকালের শুরুর দিকে বোম্বাই-এর গভর্নর এলফিনস্টোনের মত ছিল যে রোমান শাসকদের মতো ইংরেজদেরও ভারতবর্ষে শাসন পরিচালনার জন্য বিভেদনীতি আশ্রয় করা উচিত। এই সময় সিপাহী বিদ্রোহ ঘটে গিয়েছিল। সিপাহী বিদ্রোহ সফল হয়নি। এই ব্যর্থতার ফলে ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজের বৃহৎ অংশ নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে এবং ইংরেজদের সঙ্গে আগত পাশ্চাত্য শিক্ষা, সংস্কৃতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। কিন্তু এর ফলে যে নিজেদের সমাজেরই ক্ষতি একথা মুসলমানদের কিছু কিছু নেতা বুঝতে পেরেছিলেন। স্যার ফৈয়দ আহমেদ ছিলেন এমনই একজন যিনি ব্রিটিশ শাসনের বিরোধীতা না করে, মুসলমানদের এর উপযোগিতা বোঝাবার প্রয়াস করেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি ইংরেজদের সহায়তা করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে আলিগড়ে অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। গুরুত্বপূর্ণ কথা হল যে এই সময় তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, এই কলেজের মূল উদ্দেশ্য হল ইংরেজ রাজত্বের উপযুক্ত প্রজা হিসাবে মুসলমানদের গড়ে তোলা। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর সৈয়দ আহমেদ মুসলমানদের কংগ্রেস থেকে দূরে থাকতে পরামর্শ দেন। অবশ্য কংগ্রেস একটি হিন্দু প্রতিষ্ঠান — এরকম ধারণা তাঁর ছিল না। তবে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে কংগ্রেস ভবিষ্যতে আক্রমণাত্মক সংগঠনে পরিণত হবে। যে সমাজকে তিনি ব্রিটিশদের অনুগত প্রজারূপে দেখতে চান। তারা যাতে শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে না যায়, এটাই ছিল তাঁর প্রচেষ্টা এবং এইজন্যই তিনি মুসলমান কংগ্রেস থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

সৈয়দ আহমেদ কিন্তু একজন উদার ও অসম্প্রদায়িক ব্যক্তি বলেই খ্যাত ছিলেন। জওহরলাল নেহেরু তাঁর গ্রন্থ 'Discovery of India' তে লিখেছেন যে, ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে সৈয়দ আহমেদ একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন—

"আমি আন্তরিকভাবে আমার দেশ এবং জাতির সেবা করতে চাই। জাতি কথাটি দিয়ে আমি হিন্দু এবং মুসলমান উভয়কেই বোঝাতে চাইছি। কেন-না আমার জাতি কথাটির এইটিই একমাত্র অর্থ।"

কিন্তু তা সত্বেও হিন্দু-মুসলমান বিভেদের বীজ বপনকারীর অন্যতম হিসাবে তাঁকে আমরা দেখতে পাই যখন তিনি বলেন যে, — "যখন আমাদের হিন্দু ভাইরা অথবা বাঙালী বন্ধুরা এখন কিছু করতে চান যাতে আমাদের ক্ষতি হবে এবং আমাদের জাতির অপমান হবে তখন আমরা তাদের প্রতি বন্দুভাবাপন্ন থাকতে পারি না। এবং তখন আমাদের অবশ্যই কর্তব্য হবে হিন্দু এবং বাঙালীদের আক্রমণ থেকে আমাদের জাতিকে রক্ষা করা — এই আক্রমণ যে আমাদের জাতির ক্ষতি করবে সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত।"

এরকম হওয়া খুব সম্ভব যে, সৈয়দ আহমেদ ইংরেজদের গুণমুগ্ধ হয়ে ক্রমে ক্রমে ইংরেজদের বিভেদনীতির শিকার হয়ে পড়েছিলেন। কেননা তিনিই প্রথম ভারতবর্ষে মুসলমানদের একটি জাতি বলে সম্বোধন করেছিলেন। জাতি ও ধর্মকে এইভাবে জুড়ে দেওয়া যে কতবড় ক্ষতিকারক হয়েছিল, দেশভাগকালে ভয়ঙ্কর দাঙায় লক্ষ লক্ষ লোকের সর্বনাশ তার জ্বলন্ত সাক্ষ্য বহন করে।

মনে করা যেতে পারে যে কংগ্রেসের নীতির বিরোধীতা করেই সৈয়দ আহমেদ উক্ত কথাগুলো বলেছিলেন। কেননা এই কথাগুলেরে প্রায় দু-বছর পর ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি আবারও বলেছিলেন—

"কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলি যে দেশে দুইটি স্বতন্ত্র জাতি বাস করে সেই দেশের পক্ষে নিতান্তই অযৌক্তিক। ধনের নেওয়া গেল সব ইংরেজ ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে গেল। ... তখন কারা ভারতবর্ষ শাসন করবে? এটি কি সম্ভব যে এই রকম অবস্থায় হিন্দু এবং মুসলমান দুটি জাতি একই সিংহাসনে অধিরূঢ় হবে এবং ক্ষমতার ক্ষেত্রে উভয়েই হবে সমান? তা কখনই হতে পারে না। যা হবে তা হল একটি অপরকে পরাভূত করবে এবং নিপীড়িত করবে। দুটিতে সমান হয়ে থাকবে এমন আশা করা হল অসম্ভব এবং অভাবনীয়কে প্রত্যাশা করা।"

অবশ্য শুধু মুসলমানেরাই যে এই ইংরেজদের এই বিভেদনীতির শিকার হয়েছিলেন, এমন নয়। হিন্দু নেতাদের মুখেও জাতীয়তাবাদরে কথা শোনা গিয়েছিল ঈষৎ পরবর্তীকালে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে লালা লাজপত রায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে যে চিঠি লিখেন সেখানে তিনি বলেন যে, মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ ও মনেপ্রাণে দেশপ্রেমিক, তাঁরা কিন্তু মুসলিম ইতিহাস, মুসলিম আইন বা ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতি একান্ত অনুগত। আর তাদের এই আনুগত্যের ফলে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য অবাস্তব বলে মনে হয়। বীর সাভারকরও বলেছিলেন যে, হিন্দুরা হল একটি জাতি, হিন্দুস্থান হল হিন্দুদের অবস্থান। মুসলমানরা

এখানে আঞ্চলিক নাগরিক।

ইংরেজরা শুধু যে হিন্দু-মুসলমান ভেদ সৃষ্টি করার প্রয়াস করেই ক্ষান্ত ছিল, এমন নয়। তারা হিন্দুদের সমাজব্যবস্থায় থাকা বর্ণভেদকেও হাতিয়ার করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল। এই কথা ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, হিন্দু উদ্ধবর্ণরা তথাকথিক নিম্নবর্ণের ওপর যুগ যুগ ধরে অন্যায় করে এসেছে। আম্বেদকারের মতো মানুষের মনে এর বিরুদ্ধে ক্ষোভ জমে থাকা খুব স্বাভাবিক। স্মরণযোগ্য যে, পরবর্তীকালে আম্বেদকারের মনের এই ক্ষোভের কথা জানতো ও এর ফায়দা ওঠাতে চেয়েছিল। এই ক্ষোভ থেকেই জাত অভিমানে আম্বেদকার স্বাধীনতা সংগ্রাম আন্দোলনের পথ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিলেন ও নিম্নবর্ণের উন্নয়নের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। ইংরেজরা এই বিরোধকে রাজনৈতিক ভেদে পরিণত করার লক্ষ্যে হিন্দুদের মধ্যে আলাদা নির্বাচন চালু করার সিদ্ধান্ত নিতে চেয়েছিল। আম্বেদকার একে সমর্থনও করেছিলেন। কিন্তু গান্ধীজি এর বিরুদ্ধে আমরণ অনশন করেন ও আম্বেদকারের সঙ্গে নানাভাবে অনেকবার আলোচনায় মিলিত হন। আম্বেদকার গান্ধীজির কথা মানতে স্বীকৃত হন। হিন্দুদের আলাদা আলাদা নির্বাচনের প্রস্তাব অস্বীকার হয়। কিন্তু মুসলমানদের স্বতন্ত্র প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থায় সরকারের প্রচেষ্টা সফল হয়। লক্ষ্যণীয় যে মুসলমানদের মধ্যে এরকম স্বতন্ত্র প্রতিনিধিত্বের প্রস্তাব প্রথম ইংরেজের কাছ থেকে এসেছিল। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ডাফরিন সর্বপ্রথম এমন প্রস্তাব করেছিলেন। বহুদিন পর ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে মুসলমানেরা লর্ড মিন্টোর কাছে এমন দাবি পেশ করেন। ততদিনে ভেদটা অনেকটাই স্পষ্ট হতে শুরু করেছিল।

১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ সরকার বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা করে। ভারতবর্ষে স্বাধীনতা সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমেই পাওয়া যাবে — এই বিশ্বাসে ততদিনে দেশের বিভিন্ন স্থানে নানা গুপ্ত সমিতি গঠিত হতে শুরু করেছিল। ফলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ছিল বিভিন্ন স্থানে। এই উত্তেজনা সঞ্চারে বাংলার একটি বড় ভূমিকা ছিল। তাই সরকার ভেবেছিল যে বাংলাকে দুর্বল করে দিলে আন্দোলনের গতিবেগ মন্দ হয়ে পড়বেই। চরমপন্থী বাঙালিদের দুর্বল করে দিতে এবং বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের কথা ঘোষণা করেন। কংগ্রেস এর তীব্র প্রতিবাদ করে। ফলে সরকার সাময়িকভাবেই প্রস্তাব বাতিল করে দেয়। কিন্তু দুবছর পর ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে হঠাৎ করেই ইংরেজ সরকার ঘোষণা করে দেয় সে 'বঙ্গভঙ্গ বিল' আইনে পরিণত হয়েছে। হিন্দু-মুসলমান বিভেদ সৃষ্টি যে এই বঙ্গভঙ্গের মূলে রয়েছে তা বোঝা যায় লর্ড কার্জনের একটি উক্তি থেকে। বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করার কয়েকদিন পূর্বেই মুসলমান নেতাদের উদ্দেশ্য তিনি বলেছিলেন—

"আমি আপনাদের একটি মুসলমান প্রদেশ দিচ্ছি।" (Pathway to Pakistan – Khaliquzzaman Choudhury, p - 237)

কার্জনের এই উক্তি থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে ধর্মভিত্তিক দেশভাগের ভাবনা শাসকদের মনে শুরু থেকেই কাজ করে যাচ্ছিল। অবশ্য বঙ্গভঙ্গকে সরকার এবারও তীব্র গণ-আন্দোলনের চাপে বাধ্য হয়ে প্রত্যাহার করে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে। এইভাবে বঙ্গভঙ্গ প্রত্যাহার করায় বেশ কিছু মুসলমান নেতা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। এমনই সময়ে ইংরেজদের

সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম লিগের জন্ম হয়। নবাব সালিমুল্লা, আগা খাঁ, নবাব উলমুলুক — এরা প্রাথমিক অবস্থায় মুসলিম লিগকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

আগা খাঁর নেতৃত্বে গঠন হওয়া মুসলিম লিগের উদ্দেশ্য ছিল শাসন পরিচালনায় মুসলমানদের সহজ যোগদানের পথ প্রশস্ত করা। ইংরেজরা অবশ্য নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির কাজেই মুসলিম লিগকে ব্যবহার করার প্রয়াস করেছিল। অবশ্য অনেক মুসলমান নেতা ছিলেন যাঁরা হিন্দু মুসলমান ঐক্যের কথা বলতেন, আর অনেক হিন্দু নেতাও ছিলেন যাঁদের আচরণে মুসলমানদের ভীত করে তুলেছিল। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু মহাসভা গঠিত হওয়ার পরই সম্ভবত এই বিরোধ প্রতিষ্ঠানিক আকার ধারণ করে। হিন্দু মহাসভা আসলে অহিংস নীতির প্রতি আস্থাশীল ছিল। বি. এস. মুঞ্জে এক সংবাদদাতাকে প্রসঙ্গত বলেছিলেন যে হিন্দু মহাসভার নীতি হল নিম্নরূপ —

"আমরা কংগ্রেসের অহিংসা এবং অসহযোগের নীতি বিশ্বাস করি না, আমরা তার বিরোধী। আমরা সমবেদনাপূর্ণ সহযোগিতায় (responsive co-oparation) বিশ্বাসী। প্রকৃতপক্ষে এটি হল প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুগবৎ চুক্তি এবং সংগ্রাম। অনুরূপভাবে আমরা আধুনিক ইউরোপিয়ান পদ্ধতি দ্বারা বিজ্ঞানসম্মতভাবে সংগঠিত হিংসায় বিশ্বাস করি। আমরা বিশ্বাস করি যে যথাসময়ে অহিংস সংগ্রাম ছাড়া স্বরাজ অর্জিত হতে পারে না। ... মুসলমানদের সঙ্গে আমরা যেভাবে সহযোগিতা করে থাকি তার প্রকৃতি কংগ্রেস তাদের সঙ্গে যেভাবে সহযোগিতা করে থাকে তা থেকে ভিন্ন। কংগ্রেস মনে করে যে মুসলমানদের সহযোগিতা ছাড়া স্বরাজ লাভ করা যাবে না। আমরা বিশ্বাস করি যে সময় যখন আসবে তখন মুসলমানদের বিরোধিতা সত্ত্বেও আমরা স্বরাজ অর্জন করব।" (দেশবিভাগ, পশ্চাৎ ও নেপথ্য কাহিনি পৃ- ১৮)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংরেজ সরকার ভারতবর্ষের মুসলমানদের কথা দিয়েছিলেন যে, তাঁরা যদি তুরস্ককে যুদ্ধে ইংলণ্ডের সঙ্গে যোগ দিতে প্ররোচিত করেন তবে ইংরেজরা তুরস্কের খলিফার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখবে। ভারতবর্ষের মুসলমানরা ইংরেজদের কথা মতো কাজ করেছিলেন আর নিজেরাও যথাসম্ভব সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু ইংরেজ কথা রাখেনি, তাঁরা খলিফাকে পদচ্যুত করেছিল। এই বিশ্বাঘাতকতায় মুসলমানারা আহত হয় এবং গান্ধীজির সহায়তায় খিলাপৎ আন্দোলন শুরু হয়। হিন্দুদেরও তিনি এই আন্দোলনে যুক্ত হতে বলেছিলেন। কিন্তু খিলাপৎ আন্দোলন ভালো করে শুরু হওয়ার আগেই তুরস্কের জনগণ নিজেই খলিফাকে সরিয়ে দেয়। ফলে এই আন্দোলনের বন্ধ হয়ে যায়। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে গান্ধীজি অসহোযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। কিন্তু মুসলমান সমাজের বৃহৎ অংশ এই আন্দোলনে যোগ দেয়নি। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দকে কংগ্রেস পূর্ব স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করে। এর ফলে খিলাফৎ আন্দোলনে গান্ধীজির ঘনিষ্ঠ সহযোগী মৌলানা মহম্মদ আলি গান্ধীজিকে ত্যাগ করে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির দিকে আকর্ষিত হয়। এই সুযোগ পেয়ে ইংরেজরা মুসলমানদের বোঝাতে চেষ্টা করে যে গান্ধী নন ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের আসল বন্ধু। ২১/৯/১৯২২ তারিখে লর্ড রিডিং ভারত সচীবকে লিখেছিলেন

"আমি এখুনি আপনাকে একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি, তাতে আপনি দেখতে

পাবেন যে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির কাজকে আমরা প্রায় সম্পূর্ণ করতে পেরেছি।"

ইতিমধ্যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ আরও বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ১৯৩৭ সালে হিন্দু মহাসভার সম্মেলনে সভার কর বলেছিলেন— "ভারতবর্ষের অধিবাসীরা আজ একটি একক ও সম্প্রকৃতির জাতিরূপে পরিগণিত হতে পারে না। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষে আজ দুটি প্রধান জাতি রয়েছে। তারা হল হিন্দু এবং মুসলমান। ভারতবর্ষে এই দুটি বিবাদমান জাতি বাস করেছে।"

মুসলীম লীগও এই দ্বিজাতি তত্ত্বে বিশ্বাস করত। এই তত্ত্বের ভিত্তিতে তারা দেশভাগের দাবি উত্থাপন করেছিল। ভারতবর্ষের পৃথক নির্বাচনের দাবি এবং সাধারণ নির্বাচন মুসলীম লীগের কাছে একটি বৃহৎ সুযোগ হয়ে ওঠে। এই দাবির আকার প্রকার ও প্রকৃতি ক্রমশ বৃদ্ধি হয়ে শেষপর্যন্ত দেশ বিভাগের দাবিতে পরিণত হয়েছিল।

অবশ্য কিছু পূর্ব থেকেই হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের দাবি ওঠা শুরু হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে সেই সময়ে গঠিত সাইমন কমিশনে (১৯২৭) বিষয়টি নিয়ে চর্চা হয়। মন্টেগু চেমস্‌ফোর্ট এরকম ধর্ম-ভিত্তিক নির্বাচনের সাংঘাতিক পরিণাম সম্পর্কে কমিশনকে সাবধান করে দিয়েছিলেন — "ধর্ম এবং শ্রেণী বিভেদের অর্থ হল পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক ক্যাম্প সৃষ্টি করা। এই বিভেদ নিজেদের নাগরিকরূপে ভাবতে শেখায় না, শেখায় সে কোন দলে আছে তা ভাবতে।" ওলিভার বলেছিলেন, "সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের পদ্ধতি হল উদ্দেশ্য সাধনের এক বিপদজ্জনক পদ্ধতি। এই পদ্ধতি যে সংবিধান রচনার কথা ভাবে তা কখনই সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের দ্বারা সফল হতে পারে না। কমিশন এঁদের কথায় সহমত হয়েও শেষ পর্যন্ত সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন তা তাঁদের কথায় — "আমরা একমত যে একটি প্রদেশে মুসলমানদের জন্য সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব অবশ্যই বজায় থাকবে এবং মুসলমান ভোটারদের বিশেষ সংরক্ষণ থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।" কিন্তু বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৯৩৫-এর শাসন সংস্কারে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে নির্বাচন ব্যবস্থা স্বীকৃত হয়েছিল।

১৯৩২ সালে কিছু মুসলমানের বিরোধ দূর করতে এলাহাবাদে একটি ঐক্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সিন্ধুপ্রদেশকে বোম্বাই থেকে আলাদা করে একটি মুসলমান প্রধান প্রদেশে রূপান্তরিত করা এবং যৌথ নির্বাচন প্রথা চালু করা নিয়ে কিছু জটিলতা দেখা দিলেও উপস্থিত মুসলীম নেতৃবিন্দ সিন্ধু প্রদেশের বিনিময়ে যৌথ নির্বাচনে সায় দেন। কিন্তু ভারত সচীব সেমুয়েল -এর হস্তক্ষেপে এই প্রস্তাব বাতিল হয় এবং সম্মেলন ব্যর্থ হয়ে যায়। দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে মুসলমান নেতারা পৃথক নির্বাচনের দাবি উত্থাপন করেছিলেন। শিখ ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের নেতারাও পৃথক নির্বাচন চাইছিলেন। গান্ধীজি সেই সময় পৃথক নির্বাচন চাইছিলেন। গান্ধীজি সেই সময় পৃথক নির্বাচন করতে প্রস্তুত ছিলেন এই শর্তে যে মুসলমানেরা স্বরাজের দাবি সমর্থন করেবেন আর যৌথ নির্বাচন বিষয়টিকে পরবর্তীকালে গণভোটের ওপর ছেড়ে দেবেন। ইংরেজরা কোনভাবেই চায়নি যে হিন্দু মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ হোক। আম্বোদকারের ভূমিকা সেই সময়ে কেমন

ছিল তা জানা যায় তদানীন্তন ভাইসরয়ের একটি চিঠিতে—

"তিনি (আম্বেদকার) বলেন যে তিনি বর্তমান অবস্থায় সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট এবং তিনি পাকিস্তান ধারণার পক্ষে। কেন-না তার অর্থ হল বিটিশদের আর ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যেতে হবে না।"

মুসলীমলীগের লাহোর অধিবেশনে দেশবিভাগের প্রস্তাব গৃহিত হওয়ার পর ভারত জুড়ে প্রতিবাদের সৃষ্টি হয়। হিন্দু মহাসভা ১০/৫/১৯৪২ তারিখে পাকিস্থান বিরোধী দিবস উদ্‌যাপন করে। গান্ধীজিও এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করেছিলেন। ওই একই সময়ে গান্ধীজির নেতৃত্বে ভারতছাড়ো আন্দোলন শুরু করেছিলেন। প্রাদেশিক মন্ত্রী সভাগুলো থেকে কংগ্রেস পদত্যাগ করায় একধরনের শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল। মুসলীম লীগ এই সুযোগের সদ্‌ ব্যবহার করে তারা ইংরেজদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। ৪২ -এর আন্দোত এত তীব্র হয়েছিল যে, এর তীব্রতা জিন্নার মনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ইংরেজ রাজত্বের সমাপ্তি আসন্ন। ১৯৮৩ -এর লীগের করাচি অধিবেসনে জিন্না স্পষ্টই বলেন, Devide and quit।

১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দের ৭ মে জার্মানি মিত্র পক্ষের কাছে আত্মসমর্পন করে। জালান আত্মসমর্পন করেছিল আরও কয়েক মাস পরে। যুদ্ধের মিত্র পক্ষের জয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইংলেণ্ডেরও জিত হয়। কিন্তু ততদিনে ইংলেণ্ডের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে যায়, সাময়িক শক্তিতে সে তৃতীয় স্থানে নেমে আসে। তারা উপলব্ধি করেছিল যে এবার ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিতে হবে। ইতিমধ্যে ইংলেণ্ডের নির্বাচনে শ্রমিক দল জয় লাভ করে। শ্রমিক দল আগেই বলেছিল যে, তারা জয়ী হলে ভারতবর্ষে হস্তান্তর হবে। এই উদ্দেশ্যে ১৯৪৬ সনে ইংলেণ্ডে মন্ত্রী কমিশন গঠিত হয়। মন্ত্রী কমিশনের আহ্বানে ১৯৪৬ সালের ৯ মে যে সম্মেলন হয়েছিল তাতে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আজাদ, নেহেরু, পেটেল প্রভৃতি নেতারা যোগ দিয়েছিলেন। মুসলীমলীগের পক্ষ থেকে যোগ দিয়েছিলেন জিন্না, লিয়াকৎ আলি খাঁ, মহম্মদ ইসমাইল প্রভৃতি। সেই সময়ে গান্ধীজিও সিমলায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু মন্ত্রী মিশন যে সুপরিশগুলো দিয়েছিল সেগুলোতে কংগ্রেস এবং মুসলীম লীগ একমত হতে পারেনি। মন্ত্রী মিশন এক অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিল। জিন্না এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৪৬ -এ ১৬ আগস্ট কোলকাতায় প্রত্যক্ষ সংগ্রাম উপলক্ষে ভয়ঙ্কর দাঙ্গা হয়েছিল। এই দাঙ্গাই স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে, আর দেশভাগকে আটকে রাখা যাবে না। এরপরই ওয়াভেলকে গভর্নর জেনোরেলের পথ থেকে সরিয়ে লর্ড মাউন বেটেনকে গভর্নর জেনারেলের পদে নিয়োগ করা মাউন বেটেন প্রথম থেকেই দেশভাগের পক্ষ ছিলেন।

ইতিমধ্যে কংগ্রেসও দেশভাগ মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল। গান্ধীজিকে প্রায় অন্ধকারে রেখেই নেহেরু এবং পেটেলকে দেশভাগের জন্য রাজি করিয়ে ফেলেন। এই প্রস্তাব মতোই বাংলা এবং পাঞ্জাবকে ভাগ করে পাকিস্তান গঠনের প্রস্তাব করা হয়। এবং ১৯৪৭ সনের ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতার মাধ্যমে দেশবিভাগের পরিকল্পনা পরিণত লাভ করে। দেশবিভাগের সময় ঠিক করা হয়েছিল যে, পাকিস্তানে থাকা হিন্দুরা হিন্দুস্থানে

এবং ভারতবর্ষে থাকা মুসলমানরা বিনা বাধায় নিজস্ব বাসস্থান হিসেবে যে কোন একটা দেশে থাকতে পারবে। কিন্তু বাস্তবে এটা হয়নি। দু-দেশেই হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে প্রচণ্ড সম্প্রাদিয়ক দাঙ্গা হয়। হাজার হাজার লোকের মৃত্যু হয়, লক্ষ লক্ষ লোক গৃহহীন হয়ে শরণার্থী হয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। বাংলা এবং পাঞ্জাবের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক মানচিত্র পরিবর্তিত হয়ে যায়। এই সময় পরিবর্তনের সাক্ষ্য দেয় দেশবিভাগ নিয়ে লিখিত সাহিত্যগুলি। যা আজও সমানভাবে বহমান।

৪.৩ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

এই বিভাগে আমরা ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে দেশভাগের প্রসঙ্গ আলোচা করেছি। আমরা দেখেছি যে কীভাবে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাসের সৃষ্টি হল। কোন সম্প্রদায়ের কী কী ভূমিকা ছিল কিংবা কোন কোন নেতা এই বিভেদ সৃষ্টিতে ইন্ধন যুগিয়েছিল তা জানতে পেরেছি। অছাড়া ঐতিহাসিক দিক থেকে যথা সম্ভব নিরপেক্ষ আলোচনা করে হিন্দু-মুসলমান নেতা নির্বিশেষে কীভাবে এঁরা আসলে ইংরাজের পাতা ফাঁছে পা দিয়েছিলেন সেই প্রসঙ্গে এখানে সবিশেষ জানতে পেরেছি।

৪.৪ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

পঞ্চম বিভাগের শেষে দ্রষ্টব্য।

৪.৫ প্রসঙ্গ- পুস্তক (References/Suggested Readings)

পঞ্চম বিভাগের শেষে দ্রষ্টব্য।

বিভাগ-৫

রক্তমণির হারে

রক্তমণির হারে : নির্বাচিত গল্প আলোচনা

বিষয় বিন্যাস

৫.০ ভূমিকা (Introduction)

৫.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

৫.২ রক্তমণির হারে : নির্বাচিত গল্প আলোচনা

৫.২.১ আপদ

৫.২.২ পরিচিতা

৫.২.৩ মধুবন্তী

৫.২.৪ উইপোকা

৫.২.৫ জটায়ু

৫.৩ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

৫.৪ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

৫.৫ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

৫.০ ভূমিকা (Introduction)

ইংরাজেরা ভারতবর্ষে আসে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে। এখানে এসে তারা দেখল এখানকার রাজাদের মধ্যে মিল নেই। তারা এর সুযোগ নিল। ১৭৫৭ সনে ইংরাজ সেনাপতি রবার্ট ক্লাইভ বাংলার শেষ শক্তিশালী নবাব সিরাজ-উ-দোল্লাকে পরাস্ত করেন। তখন থেকেই ভারতবর্ষে শুরু হয় ব্রিটিশের রাজত্ব। আমরা যে স্বাধীনজাতি অন্য একটি জাতির হাতে পরাজিত হলাম বা আমরা যে পরাধীন এই বোধটুকু আসতেই আমাদের প্রায় একশ বছর লাগল। এর ফলস্বরূপ ভারতীয়রা ১৮৫৭ সনে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ করলেন। যা ইতিহাসে সিপাহী বিদ্রোহ নামে বিখ্যাত হয়ে আছে। প্রথম শ্বহিদ হলেন মঙ্গল পাণ্ডে। এরপর থেকে অজস্র মঙ্গলপাণ্ডে মৃত্যুবরণ করলেন নিজের মাতৃভূমি ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার জন্য। অজস্র প্রাণের আত্মাহুতির ফলে অবশেষে এল সেই বাঞ্ছিত দিনটি ১৯৪৭ সনের ১৫ আগস্ট। দীর্ঘ ১৯০ বছর ব্রিটিশের অধীনে থাকার পর ভারতবর্ষ স্বাধীন হল। আমরা স্বাধীন ভারতবর্ষে শ্বাস ফেললাম।

স্বাধীনতা একটি জাতির জন্মগত অধিকার। পৃথিবীর সব প্রাণী স্বাধীন থাকতে চায়। মানুষও তার ব্যতিক্রম নয়। স্বাধীনতা মানে আনন্দ। কিন্তু ভারতবর্ষে বাঙালিদের

জন্য স্বাধীনতা আনন্দ নিয়ে আসেনি বরং দিয়েছে দেশভাগের যন্ত্রণা। চতুর ইংরেজ ভারতবর্ষ ত্যাগ করার পূর্বে একটি বিরাট আঘাত দিয়ে যায় ভারতীয়দের। তারা ভারতবর্ষকে দুই ভাগে ভাগ করে। জন্ম হয় নতুন একটি দেশের যার নাম পাকিস্তান। দেশভাগের ফলে প্রচুর লোককে বাস্তুহারা হতে হয়। এরপর থেকেই শুরু হয় এঁদের হারাশাস্তি। এই হারাশাস্তির কথাই কবি লেখকদের লেখতে উঠে এসেছে। আমাদের 'রক্তমণির হারে' — এর নির্বাচিত গল্পগুলির মধ্যে ও দেশভাগের প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতির দৃষ্টান্ত বর্তমান।

৫.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই বিভাগ থেকে আপনারা 'রক্তমণির হরে' — এর নির্বাচিত গল্পগুলির মূলভাব ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত হবেন।

৫.২ রক্তমণির হারে : নির্বাচিত গল্প আলোচনা

এবার আমরা 'রক্তমণির হারে' — এর নির্বাচিত গল্প 'আপদ', 'পরিচিতা', 'মধুবনতী', 'উইপোকা' ও 'জটায়ু' গল্প আলোচনায় অগ্রসর হব।

৫.২.১ আপদ

রবীন্দ্র ছোটোগল্পে 'আপদে'র একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। কিন্তু আমাদের আলোচ্য 'আপদ' গল্পটি রবীন্দ্রনাথের নয়, এটি কল্লোল-গোষ্ঠীর অন্যতম লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। গল্পটি দেশভাগ কেন্দ্রিক। সদ্য ভারত স্বাধীন হয়েছে এবং ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হয়ে পাকিস্তান নামে আরেকটি নতুন সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। দেশভাগের ফলে প্রচুর লোক নিজেদের বাস্তুভিটা ত্যাগ করে তৎকালীন পূর্ববঙ্গ থেকে চলে এসেছেন ভারতবর্ষে উদ্বাস্তু হিসেবে।

গল্পটিতে প্রধান চরিত্র দুটি। কনাদ এবং নলিনী। তাঁরা স্বামী-স্ত্রী। গল্পটির শুরু একটি দুঃসংবাদ দিয়ে। ঘরে চাউল নেই। তাদের হাতে অর্থও নেই চাউল কিনে আনার মতো। এই দুঃসংবাদটাকে লেখক তুলনা করেছেন "স্বাধীনতা পাওয়ার বাসি পচা সংবাদটার" সঙ্গে। অথচ অর্থ থাকলে কালো বাজারে চাল পাওয়া যাচ্ছে। স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে একদল মুনাফা আদায়কারী লোক চাউলের কালোবাজারি করে, যার ফলে সাধারণ মানুষকে না খেয়ে উপোস থাকতে হয়।

নলিনীর কথাগুলোর যুক্তি আর ব্যাখ্যা একটু তির্যক ও রসালো হয়, কারণ তিনি কথাগুলো রসিকতা করেই বলেন। নলিনী বাঁকা হাসি হেসে কনাদকে বলেন — "তোমারা স্বাধীন হয়েছ, আমরা তো হইনি। আমরা ঘরের কোণে হাঁড়িই ঠেলছি। হাঁড়ি চড়াবার ব্যবস্থা তোমরাই বাদ দিয়েছে, আমরা করব কি?" পূর্বে অন্য কথা নিয়ে সে তার স্বামীকে ঠোক্কর দিত কিন্তু আজকাল এই স্বাধীনতাকে সে পেয়ে বসেছে। প্রথমে তর্ক শুরু হয় আমি তুমি দিয়ে তারপর আমরা, তোমরাতে পরিণত হয়। অল্পসময়ের মধ্যেই সে একটি

জাতির প্রতিনিধি হয়ে দাঁড়ায়। নলিনী তার স্বামীকে এমনভাবে সন্দেহ করে যেন সরকারী ষড়যন্ত্রে তার স্বামীও সমান অংশীদার।

বাড়িতে যে চাল ছিল তা দিয়ে 'বিষ্যুদবার' পর্যন্ত যাবার কথা কিন্তু পাকিস্তান থেকে দুটি আপদ বাড়িতে এসেছে এবং তাদের পেট ভরাতে গিয়েই রেশনের চাল-আটা দু-দিন পূর্বেই শেষ হয়েছে। কনাদ ভাবেন চোরা বাজারে যাবে সে চালের সন্ধানে। চোরা চালে কম খেয়ে কোনো মতে চলবে।

অপরদিকে কনাদের বাড়ির পাশেই একটি সিনেমা হল তৈরি হচ্ছে। এখানেই লোক আসবে বাস্তব জগৎ থেকে দূরে সরে যেতে, কিছু সস্তা আনন্দ ক্রয় করতে।

গত রাতে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা দুইজন অতিথিকে খাওয়ানোর ফলে নলিনীকে উপোস দিতে হয়েছে। যুক্তিতর্কে এখন আর কনাদ নলিনীর সঙ্গে পেরে উঠেন না। কিছুদিন আগেও তিনি বোঝাতেন। শেষে বলতেন, "তুমি কি বুঝবে, তুমি মেয়ে মানুষ, তোমার ত্যাগ নেই, ধৈর্য নেই, তুমি স্বার্থপর।" ধীরে ধীরে তিনি বুঝতে লাগলেন স্বাধীনতা কিংবা নলিনীর অদ্ভুত জ্বালার মানে বোঝা এতটা সহজ নয়।

সকালবেলাই সিনেমা হাউসটার কাজ শুরু হয়ে গেছে। শ্রমিকদের দেখে কনাদ ভাবছেন এরা বোধহয় ভালোই মজুরি পায়। না হলে কথায় কথায় কেনো ওরা স্টাইকের কথা বলবে। ওরা যদি শুধু আদায়ের কথা ছেড়ে দিয়ে এই দুর্দিনে কাজ করে যেত তাহলেতো কোনো সমস্যাই থাকত না। যত দালান বেরে উঠেছে তত তাঁর পুরানো চিন্তার মধ্যে আঘাত লাগছে।

সেই পুরানো ত্যাগবাদী চিন্তা এখন তার নাই। তাঁর কথা শুনে তাঁর স্ত্রী বলেন — "এতটুকু আশা ভরসা থাকলে মানুষ যেন কষ্ট সইতে নারাজ হয়। ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে আধপেটা খেয়ে প্রাণপাত করে না মানুষ একটু সংস্থানের জন্য? মানুষ ভূত কিনা সুখে থাকতে নিজেকে কিলোবে! ত্যাগ ত্যাগ করে তোমার সবাইকে সন্ন্যাসী বানাতে চাইছ।" যে ত্যাগের ফলে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছিল সেই ত্যাগের ফলস্বরূপ বাঙালিরা পেল দেশভাগের মতো একটা মর্মান্তিক যন্ত্রণা। তাই যুক্তিবাদী, বাস্তববাদী নলিনীর কাছে এখন আর ত্যাগের কথা ভালো লাগে না। দেশকে ভালোবাসেন বলে কনাদকে রীতিমতো শ্রদ্ধা করতেন তিনি। এখন পরিস্থিতির বিপাকে পড়ে তিনি ভুলে গেছেন আজও যে তিনি দেশকে ভালোবাসেন। মানুষ ভেবেছিল স্বরাজ এলে দেশে কোনো কিছুর অভাব থাকবে না, সবাই অন্তত পক্ষে খেয়ে পড়ে সুখে থাকতে পারবে। কিন্তু এর বিপরীতে যখন মানুষের জীবনে নেমে এলো অসীম দুঃখের জ্বালা তখন আর মানুষ সেই স্বাধীনতাকে ভালোভাবে নিতে পারেনি।

কিন্তু এতো দুঃখের মধ্যেও নলিনীর একটি সুখ আছে। তিনি একটি শিশুকে জন্মদান করেছেন। তাঁর মেয়ে-জীবন সার্থক হয়েছে। তিনি জায়া থেকে জননীতে পরিণত হয়েছেন।

এত কিছু হবার পরও কেনাদকে তিনি কেন বাঁচিয়ে চলেন এ-কথাই কনাদ ভেবে

পান না। নিজে উপোস থেকে রাত্রে কেন তিনি জানাননি যে ঘরে চাল নেই। অল্পসময়ের জন্য কাছে না পেয়ে কনাদ তাঁকে ভেবেছিলেন স্বার্থপর। এখন তাঁর সে কথা ভেবে নিজের লজ্জা অনুভব হচ্ছে। এটাই যে ভারতীয় মহিলার বৈশিষ্ট্য। তারা নিজেরা কষ্ট সহ্য করে নিজের স্বামী পুত্রকে সুখে রাখে এতোটুকু ভাবার ক্ষমতা কনাদের নেই। তাই তিনি বারবার নলিনীকে স্বার্থপর বলে ভাবেন।

সকালে নোংবা বাস্তায় তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে একটি বেশ্যা চিংড়ি মাছ কিনছে। নলিনীর মতো দেখতে। এখনও কনাদ নলিনীকে স্বার্থপর বলেই ভাবেন। কারণ, নলিনী জানেন কনাদের জন্যই তাঁর সব। তাই তাঁকে বাঁচিয়ে রাখতেই তিনি নিজে না খেয়ে উপোস থেকে কনাদকে ঘুমোতে দেন। তাঁকে বেশি চটানো উচিৎ না বলেই তিনি তাঁর বাসনা পূর্ণ করতে তাঁর অবশ দেহটাকে পাশ ফিরিয়ে শীর্ন হাত দুটিকে গলায় জড়িয়ে দেন। কনাদ বাঁচলেই সে নলিনীর স্বার্থ বেঁচে থাকবে। কিন্তু নলিনীর এতে তো কোনো স্বার্থ নাই। সংসারের প্রত্যেকটা নারীর মতোই তিনি তাঁর স্বামী থেকে চেয়েছেন ভাত-কাপড়-আশ্রয়। এটাই সংসারের নিয়ম। কিন্তু গলদ ছিল কনাদের চিন্তা ধারায়, কনাদের মূল্যবোধে। তাই সংসারের প্রচলিত নিয়মে নলিনীর চলাটাও একটা খুঁত হয়েছে তাঁর মনে।

নামকরণ : গল্পটির নাম 'আপদ'। সাধরণভাবে দেখা যায় গল্পটিতে পাকিস্তান থেকে দুইজন অতিথি এসেছে, এবং তাদের জন্যই নলিনীদের সাপ্তাহিক বরাদ্দ খাবার তিনদিন পূর্বেই শেষ হয়েছে যার জন্য তাদের উপোস দিতে হচ্ছে। তাই এরা আপদ স্বরূপ। লেখক এক জায়গায় কনাদের মাধ্যমে বলেছেনও— "কাকীমা আর খুকীকে এখানে রেখে রমেশ কাকা ছেলেকে নিয়ে হোটেলে উঠে যে সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছে। সেজন্য কনাদের কৃতজ্ঞতার সীমাছিল না। তবু কাকীমা আর খুকীকে তার মারতে ইচ্ছে হচ্ছে।" আর নামকরণটির ব্যঙ্গাত্মক দিকটির যদি নজর দেই তাহলে দেখা যায় স্বাধীনতাকেই লেখক এখানে আপদ বলেছেন। ভারত স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হয় দেশভাগ। আর সেই দেশভাগ মানুষের জীবনে নিয়ে আসে অমানিশা। স্বাধীনতার পূর্বে মানুষ যে স্বরাজের চিন্তা করেছিল প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতা তাদের সেই স্বাধীনতাটুকু দিতে পারেনি। এর বদলে স্বাধীনতা দিয়েছে প্রচুর দুঃখ। স্বাধীনতার পূর্বে প্রত্যেকটি দেশভাগের ফলে সেই দুমুঠো চাউলও তাদের পাওয়া কষ্ট হয়ে যায়। তাই স্বাধীনতা এখানে আনন্দের না হয়ে, হয়েছে আপদ স্বরূপ। আর এখানেই গল্পটির নাম সার্থক হয়েছে বলতে হয়।

আত্মসমীক্ষাত্মক প্রশ্ন

(১) 'আপদ' গল্পের কাহিনি বিশ্লেষণ করুন।

.....

.....

.....

(২) 'আপদ' গল্পের মূল বিষয়বস্তু ও নামকরণ আলোচনা করুন।

.....

.....

.....

.....

৫.২.২ পরিচিতা

পরিচিতা গল্পটিতে রয়েছে একটি মধ্যবিত্ত সংসারের কাহিনি। ১৯৪৭ সনে দেশভাগ হবার পর প্রচুর লোক এদেশে চলে আসে রিফিউজি হিসেবে। তাদের জীবনে একেবারে মৌলিক প্রয়োজনীয় বস্তুগুলোও ছিল না। তাই তারা জীবনধারণের জন্য এদেশে এসে বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্তি হয়, এবং এদের প্রতি পদে পদে এখানে হোঁচট খেতে হয়। এই গল্পেও এই কথা আছে।

গল্পটির কাহিনি বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখি গল্পটিতে একটি সুখী মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবি সংসারের চিত্র অঙ্কন করেছেন লেখক সতীনাথ। গৃহকর্তার নাম প্রশান্ত এবং তাঁর স্ত্রী শৈল। তাঁদের একটি সন্তানও বর্তমান। বাড়িতে একজন কাজের মহিলাও আছে যে গুলটেনের মা নামে পরিচিত। গুলটেনের মাকে মাসিক আটটাকা মাইনে দেওয়া হয়। এই গুলটেনের মা কিছুটা মুখরা হওয়ায় প্রশান্ত তাকে বরাবরই অপছন্দ করেন। তাই প্রশান্তকে বলতে দেখা যায় — "ছাড়িয়ে দিলেই হয় এটাকে। আজকাল আবার লোকের অভাব। রেফিউজি ক্যাম্পের হাজারটা লোক ঘোরাঘুরি করছে কাজের খোঁজে।" কিন্তু শৈল অপরিচিতা একজনকে কাজে রাখতে রাজি নন, এর চেয়ে পরিচিতা গুলটেনের মা-ই ভালো।

প্রশান্তের একটা নেশা আছে। তিনি তাস খেলেন। প্রায়ই তাই বাড়িতে ফিরতে তাঁর বিলম্ব হয়। তিনি যখন বাড়ি ফিরেন তখন বাড়ি নিস্তব্ধ। সেদিনও বাড়ি ফিরতে দেরি হয়েছিল কিন্তু দেখলেন সবাই জেগে আছে। সবাই জেগে আছে দেখেই তাঁর মন বলে উঠল হয়ত বাড়িতে কোনো অঘটন ঘটেছে, আবার খরচ। কিন্তু বাড়িতে গিয়ে দেখলেন তাঁর ছেলে বেলার অঙ্কের মাস্টার দ্বারিক মুখুজ্যে এসেছেন। স্কুলজীবনে বোর্ডিং -এ থাকার সময় কুলকুচো খেলার আবিষ্কার করেন প্রশান্ত। একমাত্র এই খেলাতেই তিনি পারদর্শী ছিলেন। অপরদিকে দ্বারিক মুখুজ্যে ছিলেন খাঁটি ব্রাহ্মণ। এই খেলার ব্যাপার তাঁর কানেও যায়। তাই তিনি প্রশান্তদের স্কুল থেকে রাস্টিকেট করার ভয় দেখান। তখন থেকেই প্রশান্ত তাঁর উপর বিলক্ষণ চটা। প্রশান্ত জানতে পারলেন যে তিনি তাঁর নিকট মেয়ে বিয়ের সাহায্য চাইতে এসেছেন। এই রকমই একটা ভয় ছিল প্রশান্তরও। পনেরোটা টাকা দিয়ে তাঁর থেকে নিস্তার পেলেন দম্পতি। কিন্তু পারিবারিক বাজেটের উপর একটা বিরাট আঘাত এল। প্রথমে শৈল কাজের মেয়েলোককে ছাড়ার প্রস্তাব করলেন কিন্তু প্রশান্ত রাজি হননি। শেষে স্থির হল যে চাঁপা যেহেতু ছয় টাকায় কাজ করতে তৈরি তাই

গুলটেনের মাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। হলও তাই। চাঁপা অপরিচিতা তাই তার প্রতি শৈলর সন্দেহও আছে। তিনি ভাবেন — "এ মাইনে নেবে ছটাকা করে। পনের টাকা পুরোতে লাগবে আট মাস। ততদিন এখানে রেফিউজি ক্যাম্প টিকলে হয়। ... শোনা যাচ্ছে যে শিজাগিরই এখানকার ক্যাম্প উঠে যাবে। ভালই হবে। চাঁপা-টাঁপার মতো মেয়েদের বেশিদিন রাখা কোনো কাজের কথা নয়।" অপরদিকে গুলটেনের মা দুইজনের ওপরেই চটে।

ওই রাতে প্রশান্তের আবার কুলুকুচো খেলার কথা মনে পড়ে। তাই রাতে স্ত্রীর অবর্তমানে তিনি কুলকুচো খেলা অভ্যাস করেন। কুলকুচোর জলগুলো গিয়ে পড়ে এঁটো বাসনগুলোর উপর। কয়েকদিন পরে প্রশান্ত দেখলেন বাড়িতে শিং মাছ আনিয়েছেন শৈল। অথচ আঁষহীন মাছের তিনি বিরোধী। শৈল খোকার পেট ঠিক না থাকায় শিং মাছ আনিয়েছেন।

প্রশান্তের নেশার কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। তিনি মাসে দেড়টাকা হারেন তাস খেলে। ইদানিং তাঁর অনুশোচনা হয়েছে — "যাদের সংসারে একটা দুটো পয়সার হিসেব করে চলতে হয়, তাদের পক্ষে কি নিজের ফুর্তির জন্য মাসে দেড়টাকা করে বাজে খরচ করা উচিত?" তাই তিনি আর তাস খেলতে যাবে না স্থির করলেন। সে রাতে প্রশান্ত তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েন। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলেন গুলটেনের মা বাড়ির কাজ করছেন। সেদিন অফিস থেকে বাড়ি ফিরে দেখেন বাড়িতে এক কুরুক্ষেত্র শুরু হয়েছে। চাঁপা এবং গুলটেনের মার মধ্যে অকথ্য গালাগালি চলছে। চাঁপার কথায় বোঝা গেল সে শুধু এতসময় ধরে বাবুর অপেক্ষা করছে। তাঁর থেকে সে সুবিচার চায়। তাকে কেনো চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে তা সে জানে না। সে শুধু শৈলকে বলেছিল "তাঁর মতো ঝি-চাকরের উপর দরদ আর কোনো বাড়িতে সে দেখেনি। এঁটো বাসনগুলোয় জল ঢেলে ভিজিয়ে রাখলে কি চাকরের মাজতে কত সুবিধে, এ কথা কি সব বাড়িতে খেয়াল রাখে?" তাই তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হল। আজ-চাঁপা এখানে চারদিনের বেতন নিতে এসেছিল। তাকে শৈল ভাত খেয়ে যেতে বলায় সে ভাত খায়। ভাত খাবার পর সে জানতে পারল সে সিঁদুর মাখানো শিঙ্গিমাছ খেয়েছে। সিঁদুর মাখানো শিং মাছ খেলে কুষ্ঠ বার হয়। গুলটেনের মা শৈলকে বুদ্ধি দিয়ে একাজ করিয়েছে। চাঁপা প্রশান্তের কাছে এর বিচার চাইল। তাকে কোনো মতো দুটো টাকা আর একটি পুরনো শাড়ি দিয়ে বিদায় করেন প্রশান্ত। গল্পটির শেষে লেখক বলছেন — "গুলটেনের-মায়ের পরামর্শে, তার কপালে ঠেকানো শিঙ্গিমাছ চাঁপাকে খাওয়ানো, ছেলেমানুষি না? কিন্তু কি করবে প্রশান্ত শৈলকে? স্ত্রীর চেয়েও বেশি ছেলে মানুষি সে নিজে করেছে এঁটো বাসনগুলোর উপর কুলকুচো - কুলকুচো খেলা করে।"

প্রশান্ত তাঁর একটা কু-অভ্যাস পুনরায় আরম্ভ করার ফলে তাঁর সন্দেহ পরায়ন স্ত্রীর তাঁর এবং চাঁপার সম্পর্কের প্রতি সন্দেহ হয় এবং তাকে কাজ থেকে বরখাস্ত করা হয়। বেচারী চাঁপা কাজ পেয়ে একটা সুখের স্বপ্নের আশা হয়তো করেছিল কিন্তু নিমিষেই সে স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। সে কিন্তু শৈলকে দোষ দেয়নি, দোষ দিয়েছে ভগবানকে। একটু

সময়ের জন্যও শৈল এই বিদেশী অসহায় রিফিউজি রমনীটির কথা চিন্তা করেননি। সে যুগে দেশভাগের ফলে হয়তো এরকম অজস্র চাঁপাকে এরকম নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

গল্পটি থেকে আমরা আরেকটি কথা অনুমান করতে পারি যে স্বাধীনতা-উত্তরকালে প্রচুর লোক এদেশে চলে আসে রেফিউজ হিসেবে। তাদের ছিল না কাজ। তাই তারা কম টাকাতেও কাজ করতে রাজি হয়। যার ফলে এখানকার লোকেদের কর্ম সংস্থানের মধ্যে আঘাত দেয়। যে গুলটেনের মাকে আমরা প্রথমে দেখি কথায় কথায় মালিককে কাজ ছাড়ার হুমকি দেয় আবার সেই গুলটেনের মাকেই দেখি যখন তার হাত থেকে কাজ চলে তখন সে কাজটুকু ফিরে পাবার জন্য তুকতাক করে।

নামকরণ : যে কোনো শিল্প সৃষ্টি করার পর সাহিত্যিককে তার নামকরণ নিয়ে ভাবতে হয়। সাহিত্যে নামকরণ একটা বিরাট ব্যাপার। কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন রাখা যেমন চলে না তেমনি সাহিত্য সৃষ্টি করার পরেও যে কোনো একটি নাম রেখে দিলেই হল না। তাই স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে আমরা দেখি তাঁর একই সৃষ্টিকে তিনি বিভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ করেছেন। নাটক, গল্প, উপন্যাস যাইহোক না কেনো, নামকরণের একটি বিশেষ মূল্য রয়েছে। কোনো গল্প বা উপন্যাসের মূল কথা প্রথমে প্রকাশিত হয় নামের মাধ্যমেই।

পরিচিতা কথার সাধারণ অর্থ হচ্ছে পরিচিত মহিলা। এই গল্পে আমরা দুইজন কাজের মহিলাকে দেখতে পাই। একজন পরিচিতা অপরজন অপরিচিতা। অপরিচিতা মানুষের প্রতি সন্দেহ থাকাটা স্বাভাবিক। গল্পের নাম পরিচিতা। গল্পে একজন পরিচিতা নারীও আছে। তাই বাহ্যিক দিক থেকে নামকরণ সার্থক। নামকরণের ব্যঞ্জনার দিকটির দিকে নজর দিলে দেখা যায় শৈল আর্থিক সাশ্রয়ের জন্য কিছুদিন চাঁপাকে কাজে রাখেন। কিন্তু অচিরেই চাঁপা এবং তাঁর স্বামীর সম্পর্কের প্রতি তাঁর সন্দেহ হয় আর তাকে কাজ থেকে বরখাস্ত করেন। শেষে আবার সেই পরিচিতা মহিলা গুলটেনের মাকেই ফিরিয়ে এনেছেন। অপরিচিতা এবং পরিচিতার দ্বন্দ্বে শেষে পরিচিতা মহিলারই জয় হল। সেই অপরিচিতা মহিলা যেন আর কোথাও কাজ না পায় সেজন্য তারা ষড়যন্ত্র করতেও পিছপা হননি। আর এখানেই গল্পটির নামকরণ সার্থক হয়েছে।

আত্মসমীক্ষাত্মক প্রশ্ন

(১) 'পরিচিতা' গল্পের কাহিনি আলোচনা করুন।

.....

.....

.....

.....

(২) 'পরিচিতা' গল্পের মূল বিষয়বস্তু ও নামকরণ বিশ্লেষণ করুন।

.....

.....

.....

.....

৫.২.৩ মধুবন্তী

১৯৪৭ সালের দেশভাগ নিয়ে আসে মানুষের জীবনে ঘোর অন্ধকার। দেশভাগের ফলে প্রচুর লোককে শরণার্থী হিসেবে ভারতবর্ষে চলে আসতে হয়। এদের না ছিল অর্থ, না ছিল বাড়ি ঘর। এরা উদ্বাস্তু। নিজেদের বাস্তুভিটা ত্যাগ করে এদেশে আসার পর এদের স্থান হল শ্মশান সদৃশ জায়গায়, যেখানে ভদ্রলোক কখনও যায় না। শিয়াল, কুকুর কিংবা বিষধর সাপের সঙ্গে লড়াই করে এরা তৈরি করে নিজেদের বাস্তুভিটা, যেখানে সাধরণত ভদ্রলোক যেচে পারে না।

'মধুবন্তী' একটি দেশভাগের পটভূমিতে লেখা ছোটোগল্প। গল্পটির শুরু একটি আধুনিক সুসভ্য সমাজের বর্ণনা দিয়ে। গল্পের নায়ক চিত্ত দত্ত। তিনি এসেছেন কলকাতার পাশের এক অভিজাত উপনগরে এক পরিচিত ভদ্রলোকের বাড়ি। চা-এর নিমন্ত্রণ ছিল। শহর থেকে দূরে এক আনন্দমুখর পরিবেশে এসে তাঁর ভালো লাগল। তাই তাঁকে বলতে শোনা যায়, "কলকাতার বদ্ধগলিতে থাকি, এখানে এসে যেন নিশ্বাসফেলে বাঁচলুম। যেতে ইচ্ছে করছে না।"

ভদ্রমহিলার মুরগির নিমন্ত্রণকে অস্বীকার করে তিনি বাড়িতে ফেরার জন্য একটি বটগাচের নিচে দাঁড়িয়ে বাসের জন্য অপেক্ষা করছেন, এমন সময় তাঁর একটি পুরণো কথা মনে হল। রেল লাইনের ওপারেই তালডাঙা কলোনি। তালডাঙা কলোনিতে তাঁর পরিবার থাকেন। এঁদের বাড়ি ছিল পূর্ব্ববঙ্গের বরিশাল জেলায়, নায়কেরও বরিশাল জেলাতেই। দেশভাগের পরবর্তী সময়ে এঁরা চলে আসেন কলকাতায়। এখানে এসে তাঁরা বসবাসেরজন্য একটি শ্মশান সদৃশ স্থানকে তালডাঙা কলোনিতে পূর্ণ করেন।

তালডাঙা কলোনিতে যাওয়ার পথে চিত্ত বাবুর মনেপড়ে পুরোনো দিনের স্মৃতি কথা। তিনি লণ্ঠন ধরে জয়াকে খাল পার করে দিয়ে থেকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন হিজল গাছের তলায় এবং তাঁর একটি হাত ধরে বলেছিলেন, "পাশ করে চাকরি বাকরি জোটাতে আমার আরো তিনি-চার বছর লাগবে। এর মধ্যে তুমি ফস করে আর কাউকে বিয়ে করে ফেলবে না তো?" এরকম কথা ভাবতে ভাবতে তিনি চললেন। জয়ার বাবার নাম যতীন মিত্র। একটি দোকানে এসে তিনি যতীন মিত্রের বাড়ির কথা জিজ্ঞেস করলে একটি লোক তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন।

অনেক কষ্টের মধ্যে দিয়ে দুর্গম রাস্তা পার করে চিত্ত বাবু এসে পৌঁছলেন যতীন মিত্রের বাড়ি। যতীন মিত্রের সখ হল কবিতা লেখা। নায়ক ভেবেছিলেন তিনি তাঁর নিকট এলে তাঁকে আবার সেই পুরোনো দিনের মতোই কবিতা শোনাবেন মিত্র মহাশয়। কিন্তু এর বিপরীত হল। কিছু সুখ দুঃখের গল্প করে তিনি বারবার জয়ার কথা জিজ্ঞেস করতে চাইছিলেন, কিন্তু পারলেন না। তিনি ভাবতে লাগলেন তিনি কেন এখানে এসেছেন? যতীন একদিন ভদ্রতা করে আসতে বলেছিল তিনি ভদ্রতা করে বলতে পারতেন যে নিশ্চয় যাবেন। সত্যিই কি আসতেন এখানে যদি না ওই দক্ষিণের গোল বারান্দায় ঝাউ আর ফুলের টব-কাঁপানো বাতাসটা না বইত, যদি সেই ভদ্রমহিলার সেতারে মধুবন্তী রাগ তাঁর মনে মোহ না জাগাত। যদি সেই হিজলতলাটা তার মনে না পড়ত। এরকম কথা ভাবছেন এমন সময় জয়া এল সেখানে। জয়া আর কিশোরী নাই, ছাব্বিশ বছরের তরুণী। জয়ার দিকে তিনি ভালো করে তাকাতে পারছিলেন না। তাঁর মনে ভয় ছিল জয়া কি বারো বছর আগের কথাটা মনে রেখেছেন।

যে পরিবেশে গিয়ে চিত্ত বাবুর চিত্তের মধ্যে জোয়ার এসেছিল সে পরিবেশ এখানে নাই। তিনি বুঝতে পারলেন, "এখানে দক্ষিণের বারান্দা নেই-ঝাউপাতায় সমুদ্রমর্মর তুলে এখানে বাতাস আসে না, সেতারে মধুবন্তী রাগ এখানে বারো বছর আগেকার স্মৃতিকে স্বপ্ন করে তোলে না।" তাই তিনি উঠে পড়লেন। একবারও যতীন কাকা কিংবা জয়া তাঁকে বসতে বললেন না। বরং লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে জয়া তাঁকে এগিয়ে দিতে গেলেন। কথা বলতে বলতে তাঁরা এগিয়ে গেলেন সে-ই চায়ের দোকানের নিকট। জয়া এগিয়ে এসে তাঁকে প্রণাম করলেন। এই একবারের জন্য তাঁর মনে হল জয়া কোমল, নমনীয় হয়ে উঠেছে, এই মুহূর্তেই তিনি তাঁকে টেনে আনতে পারেন। কিন্তু কুকুরের ডাক মুহূর্তটিকে ছিঁড়ে টুকরো টুকুরো করে দিল। আর জয়া কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে মাঠের মধ্যে ফিরে চললেন। তাঁকে জয়া অল্প সময় দিয়েছিলেন কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন না। একবার পিছন ফিরে দেখলেন কিন্তু অনেক গুলো আলোর মধ্যে কোনটি জয়ার আলো সেট বোঝার ক্ষমতা নেই। আর ওই ভাঙা পোলটা পেরিয়ে যাবার সাহসও তিনি রাখেন না।

মধুবন্তী একটি চমৎকার প্রেমের গল্প। দেশভাগের প্রভাব প্রেমের মধ্যেও পড়েছিল। দেশভাগের ফলে নিজের বাস্তুভিটা ত্যাগ করে এক অজানা জায়গায় এসে স্বরবাঁধলেন যতীন মিত্র। যে পরিবেশের কথা কলকাতায় থেকে চিত্ত কখনোও কল্পনা করতে পারেননি। তালডাঙা কলোনিতে আসার পর তাঁর রোমান্টিক চিন্তার মধ্যে বিরাট একটা আঘাত লাগে। তাই তিনি ফিরে যেতে চান সেই রোমান্টিক পরিবেশে। তাঁকে ভাবতে দেখা যায় "আমার পুবের দত্তনগরই ভাল। সেখানে দক্ষিণের গোল বারান্দায় বসে সেতার শুনতে শুনতে আমি জয়ার কথা ভাবতে পারব।" আর জয়া জ্বলতে জ্বলতে এখন খাঁটি সোনাতে পরিণত হয়েছেন।

মুহূর্তের জন্য তিনি ভুলে গেছেন তাঁর বর্তমান অবস্থার কথা। তাই চিত্তকে সময় দেন। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই ঘুরে দাঁড়ান তাই আর ফিরে তাকান না। চলে যান। মানুষ যখন কঠিন বাস্তবের মধ্যে পড়ে তখন প্রেম সম্ভব নয়। রোমান্টিক আর বাস্তবের মধ্যে

এক বিরাট ফারাক রয়েছে।

এই গল্পে লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বিচিত্র ভাষাশৈলীর পরিচয় দিয়েছেন। তিনি চরিত্রর অনুযায়ী ভাষা প্রয়োগ করেছেন। যা গল্পটিকে আরোও সুন্দর করে তুলেছে। পূর্ববেঙ্গের লোকদের মধ্যেই তিনি দুই ধরনের ভাষার ব্যবহার করেছেন। লেখককে যে লোকটি এগিয়ে দিতে এসেছিলেন তাঁর সুখের ভাষা এরকম, " বাঁদিকের রাস্তাটা দিয়া যান। এটটু হাঁটলেই একটা খাজুর গাছ পাইবেন— তার পূর্বদিগের ঘরখান। সাবধানে যাইবেন— বাড়ির সামনেই বাঁশের পোলটা কিন্তু ভাংগা।" যতীন মিত্রের মুখে যে ভাষা স্থান পেয়েছে তা এ-রকম, "কিন্তু তুই তো দেখি আইজকাইল একেবারে কইলকাতার কথা কস। দ্যাশের কথা ভুলিয়া গেছস নাকি?"

চরিত্র আলোচনা :

চিত্ত দত্ত : চিত্ত চিত্ত মাধুবন্তী গল্পের নায়ক, বাড়ি ছিল পূর্ববঙ্গের বরিশাল জেলায়। তাঁর পিতার নাম মাখন দত্ত। বর্তমানে কলকাতায় থাকেন। একটা ভালো চাকরি করেন, মাইনে চারশো টাকা। তাঁর সখ লেখালেখি। তাঁর বাল্য-প্রেমিকার নাম জয়া।

একদিন বিকেলে তিনি তাঁর একজন পরিচিত বন্ধুর বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণে এসেছিলেন। ছিমছাম পরিবেশে তাঁর বন্ধুর বাড়ি। সেখানে চা খেতে খেতে সন্ধ্যা হল। দক্ষিণের গোল বারান্দায় ফুলগুলো খুশি হল বসন্তের হাওয়ায়, তার উপর ভদ্রলোকের বিদূষী গুণবতী স্ত্রী, সেতার বাজালেন। সবমিলিয়ে সুন্দর একটি পরিবেশে এসে তাঁর মনে প্রেমের সঞ্চার হল। মনে পড়ল বাল্য-প্রেমিকা জয়ার কথা। তাই তালডাঙা কলোনিতে যাবার জন্য প্রস্তুতি নিলেন। শহর থেকে দূরে একটি শ্মশানের মতো জায়গায় তালডাঙা কলোনি অবস্থিত। বর্তমানে জয়া সেখানে সপরিবারে থাকেন। অনেক কষ্ট করে লোকের সাহায্য নিয়ে দুর্গম তালডাঙা কলোনিতে চিত্তবাবু পোঁছলেন। যে পথিক তাঁকে এগিয়ে দিয়েছিলেন তিনি ভেবেছিলেন যতীনের সঙ্গে দেখা হলে তিনি তাঁকেও কবিতা শোনাবেন। চিত্ত দত্তের ভাষায়, "কল্পনা করেছিলুম, যতীনকাকা আমাকে পেলেই কবিতা পড়তে শুরু করবেন— নিজের লেখায় নিজেই চেলেমানুষের মত উচ্ছাসিত হয়ে উঠবেন। বলবেন : ক্যামন, এইখানে আইডিয়াটা ভাল হয় নাই?" কিন্তু তাঁর সেই সম্ভাবনাটা ভুল প্রমাণিত হল।

চিত্ত দত্ত এত যে ভীরু, তিনি যে উদ্দেশ্য নিয়ে জয়ার বাড়িতে এসেছিলেন তা একবারও বলতে পারলেন না। যে পরিবেশে, গিয়ে তাঁর জয়ার কথা মনে হয়েছিল হয়তো বর্তমান পরিবেশের সঙ্গে সে পরিবেশের মিল নেই বলেই তিনি একবারও ইচ্ছে থাকা সত্বেও জয়ার কথা বলতে পারলেন না। একদিন এই জয়াকে তিনি বলেছিলেন, "পাশ করে চাকরি বাকরি জোটাতে আমার আরো তিন-চার বছর লাগবে। এর মধ্যে তুমি ফস্ করে আর কাউকে বিয়ে করে ফেলবে না তো?" তাই জয়া যখন তাঁর সম্মুখে এলেন তখন তিনি তাঁর কপালের দিকে লক্ষ করলেন। তাঁর কপালে একটা সিঁদুরের ফোঁটা না থাকায় তাঁকে চিত্তের কাছে বেমানান দেখাচ্ছিল।

যে উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি তালডাঙা কলোনিতে এসেছিলেন সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ না করেই চলে গেলেন। যাওয়ার সময় কটি মুহূর্তের জন্য জয়া তাঁকে সুযোগ দিয়েছিলেন কিন্তু সে সুযোগ চিত্তবাবু ধরতে পারেননি। কারণ যে মধুবন্তী রাগের আবেশে তাঁর মনে প্রেমের সঞ্চার হয়েছিল সেই মধুবন্তী রাগই উদ্বাস্তুদের কলোনিতে নেই। চিত্ত দত্ত রোমান্টিক। আর জয়া এবং তাঁর সংলগ্ন পরিবেশ বাস্তব। সেই বাস্তবকে গ্রহণ করার মতো ক্ষমতা চিত্তবাবুর ছিল না। তাই তাঁকে শেষে বলতে শোনা যায় "ওই ভাঙা পুলটা পেরিয়ে যাবার সাহস আর আমি রাখি না।

হোগলা বনের তলায় মড়ার হাড়গুলো ওখানেই থাকুক। আমার পুবের দত্তনগরই ভাল। সেখানে দক্ষিণের গোল বারান্দায় বসে সেতার শুনতে শুনতে আমি জয়ার কথা ভাবতে পারব।"

জয়া : 'মধুবন্তী' গল্পর অন্যতম মহিলা চরিত্র জয়া। তাঁর পিতার নাম যতীন মিশ্র। ভাই নীরদ। তাঁদের বাড়ি ছিল পূর্ববঙ্গের বরিশাল জেলায়। দেশভাগের পর উদ্বাস্তু হয়ে তাঁদের ঠিকানা হয় তালডাঙা কলোনি। তাঁর বাল্য প্রেমিকের নাম চিত্ত দত্ত। বারো বছর পূর্বে চিত্তের সঙ্গে তাঁর শেষ দেখা হয়েছিল। একদিন চিত্ত তাঁকে বলেছিলেন যে লেখাপড়া শিখে তাঁর প্রতিষ্ঠিত হতে অন্তত তিনি-চার বছর সময় লাগবে, এর মধ্যে তিনি যেন কাউকে বিয়ে না করে ফেলেন। জয়া প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন করবেন না। তারপর প্রায় ছুটে মিলিয়ে গিয়েছিলেন অন্ধকারের ভেতর। এই জয়ার কথাই আজ চিত্তের মনে পড়েছে। তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে তালডাঙা কলোনিতে এসেছেন। চিত্ত আসার অনেক সময় পর জয়ার আগমন। প্রথম দৃশ্যে লেখক জয়ার যে বর্ণনা দিয়েছেন তা এমন, "সেদিনকার কিশোরী নয় ছাব্বিশ বছরের জয়া। কোমরে শক্ত করে বাঁধা ডুবে শাড়ি—খালি পায়ে ভিজে মাটি জড়ানো। লণ্ঠনের আলো নিচে থেকে সম্পূর্ণ মুখে পড়েনি— একটা বিচিত্র আলাছায়ায় মুখখানাকে অনেক দূরের আর অনেকখানি অচেনা বলে মনে হল। শুধু অদ্ভুত চওড়া লাগল সাদা কপালটা— একটা সিঁদুরের ফোঁটা না থাকায় কী বেমানান দেখাচ্ছে জয়াকে।"

চিত্ত জয়াকে যে কথা দিয়েছিলেন তা তিনি রাখেননি, এ নিয়ে জয়া কিন্তু একটুও অভিমান করলেন না চিত্তের প্রতি। প্রথম দর্শনে চিত্তকে দেখেই তিনি বললেন, " চিত্তদা? আরে, কী ভাগ্য আমাদের।" অনেক কষ্ট সহ্য করে অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা পার করে জয়ার মুখে এখন কঠিন সতকর্তা। জয়া চিত্তকে দেখেই বুঝেছিলেন যে তিনি হয়তো দত্তনগরে এসেছিলেন, যাবার সময় তাঁদের ওখানে ঢুকেছেন। চিত্ত যে জয়াকে বারো বছর আগে রেখে এসেছিলেন বর্তমান জয়া আর সে জয়ার মধ্যে এখ বিরাট পার্থক্য। চিত্ত যখন চলে যাবার জন্য উঠলেন তখন কিন্তু তিনি একবারও অনুরোধ করলেন না বসার জন্য। বরং তিনিই লণ্ঠন হাতে নিয়ে তাঁকে এগিয়ে দিতে গেলেন। তখন কথায় কথায় জানা গেলো যে জয়া বর্তমানে একটি স্কুলে কাজ করে, আট-দশ টাকা মাইনে পায়।

একেবারে শেষে চিত্ত যখন চলে যাবেন তখন জয়া তাঁকে প্রণাম করেছিলেন

একেবারে কোমল হয়ে। এই এক মুহূর্তের জয়া নমনীয় হয়ে তাঁর বারো বছর আগে দেওয়া সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু ভীরু চিত্তের পক্ষে সেই সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। জয়া আবার আগের মতোই মিলিয়ে গেছেন অন্ধকারের ভেতর।

যতীন মিত্র : যতীন মিত্র জয়ার পিতা। তাঁর বাড়ি ছিল পূর্ববঙ্গের বরিশাল জেলায়। দেশভাগের পর শরনার্থী হিসেবে চলে আসেন ভারতে। ভারতে আসার পর তাঁর জায়গা হয় তালডাঙা কলোনিতে। তাঁর শখ ছিল কবিতা লেখা। সে যুগে তাঁর লেখা কবিতা 'মানসী' ও 'মর্মবাণী'তে প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর লেখা কয়েকটি কবিতা হল তখন হাসিল, সুবাস ভাসিল, আসিলেন উষারানি। কিন্তু গ্রামের লোক তাঁকে শ্রদ্ধা করত। তিনি কবিতা না পড়লে গ্রামের কোনো অনুষ্ঠানই সেদিন সম্পূর্ণ হত না। এখানে গ্রামের লোক তাঁর কবিতা লেখার ব্যাপার নিয়ে কৌতুক করে বলে, "ভারি মজার লোক ওই বুড়ায় ! দিনরাত্তির পদ্য লিখতে আছে— গেলে আর ছাড়ান নাই — শুনাইবোই শুনাইবো।"

এই যতীনের বাড়িতেই সেদিন চিত্ত দত্ত এসেছিলেন। চিত্ত বাবুর তাঁকে দেখেই মনে হল "ঠিক সেই চেহারা— একটু কুঁজো হয়ে গেছেন আর কপালে অনেকগুলো রেখার কুঞ্চন। মাতার চুলগুলো ধপধপে সাদা, চশমার পুরু লেনস-দুটো ম্যাগনিফায়িং গ্লাসের মত ঝকঝক করছে।" এই যতীন মিত্রের প্রথম আওয়াজেই চিত্ত বুঝতে পারলন যে এই যতীন কাকা এখন আর খুব আনন্দে নেই। দেশভাগের ফলে তাঁকে দুমড়ে মুচড়ে রেখে দিয়েছে। একবারে নিম্নতম সভ্যতাটুকু তিনি ভুলে গেছেন। কেউ প্রণাম করলে তাঁকে আশীর্বাদ করতে হয়, কিন্তু যতীন মিত্রকে চিত্ত প্রণাম করার পর আশীর্বাদ পর্যন্ত করলেন না।

তিনি যে বেঁচে আছেন এতেই তিনি সন্তুষ্ট। অন্য অনেকের তুলনায় তিনি ভালো আছেন। তাই চিত্তের একটি প্রশ্নে তিনি উত্তর করেন, " খারাপ থাকুম ক্যান? শিয়ালদার অবস্থা দেখছি, ট্রানজিট ক্যাম্পের অবস্থাও দেখেছি। তার— গো তুলনায় তো স্বর্গেই আছি।" তিনি চিত্তকে দেখে বুঝতে পেরেছেন এই চিত্ত আর আগের চিত্ত নেই। তাই বলেন— "কিন্তু তুই তো দেখি আইজকাইল একেবারে কইলকাতার কথা কস। দ্যাশের কথা ভুলিয়া গেছস নাকি?" যে দেশের জন্য এতো যন্ত্রণা সহ্য করতে হচ্ছে সেই দেশকে তিনি এখনো ভুলতে পারছেন না। যে দেশ থেকে বাস্তুভিটা ত্যাগ করে আসতে হয়েছে সেই দেশকে আঁকড়ে তিনি এখনও বাঁচতে চান। এখনও তাই সেটিই তাঁর নিকট দেশ। চিত্তবাবু মনে মনে ভয় পেয়েছিলেন তাঁকে পেলেই যতীনকাকা কবিতা শোনাতে বসবেন। কিন্তু ব্যতিক্রম তিনি কিন্তু চিত্তকে কবিতা শোনাননি। তিনি কেন চিত্তকে কবিতা শোনাননি কারণ সেই চিত্তে গ্রামের চিত্ত নেই। এখানে আসার পর তাঁর চাহিদারও পরিবর্তন হয়েছে। তা বুঝতে পারেন যতীন মিত্র। তিনি অভিজ্ঞ লোক।

দেশভাগের ফলে কত প্রতিভা যে নষ্ট হয়ে গেছে তার জ্বলন্ত উদাহরণ এই যতীন মিত্র। তাঁর প্রতিভা ছিল। কিন্তু সে প্রতিভায় আঘাত আনল দেশভাগ। তাই গ্রাম থেকে শুরু হয়ে গ্রামেই তাঁর প্রতিভা সীমিত থেকে গেল।

মনে রাখবেন, মধুবন্তী এমন একটি রাগ যা ভারতীয় ক্ল্যাসিকাল মিউজিকে ব্যবহৃত

হয়। এই রাগটি কল্যাণ মুডের উপর ভিত্তি করে আছে। এটি একটি রোমান্টিক রাগ যা ভালোবাসার উপর ভিত্তি করে আছে। এটি একটি ভালোবাসা এবং রোমাঞ্চের খুব মিষ্টি রাগ। মধুবন্তী বিকেল ৪ টা পরে রাত ৮ টার ভেতরে বাজানো হয়।

নামকরণ : সাহিত্যের সব ফর্মেই নামকরণ একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। নামকরণের মাধ্যমে গল্প বা কবিতার মূল সুরকে বোঝার চষ্টা করা হয়। শুধু বাহ্যিক দিক থেকে বিচার করে নামকরণের মর্মসত্যকে বোঝা যায় না। আমরা মধুবন্তী গল্পে বাহ্যিক দিক থেকে দেখি গল্পটিতে মধুবন্তী রাগের কথা আছে। এই মধুবন্তী রাগের আবেশে এসে নায়ক চিত্ত দত্তের বাল্যপ্রেমিকা জয়ার কথা মরে পড়ে। তিনি সেই রোমান্সের বশবর্তী হয়ে দুর্গম রাস্তা পের করে জয়ার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হন। কিন্তু সেখানের পরিবেশ মধুবন্তী রাগের জন্য যথোপযুক্ত নয়। তাই তিনি সেখান থেকে ফিরে আসেন। রোমান্টিক পরিবেশেই মধুবন্তী রাগকে মানায় অন্যত্র নয়. ব্যঞ্জনার দিক থেকেও নামকরণটি সার্থক হয়েছে।

আত্ম-সমীক্ষাত্মক প্রশ্ন

১। মধুবন্তী কি? মধুবন্তী গল্পের মূল কাহিনি আলোচনা করুন।

.....

.....

.....

.....

২। মধুবন্তী গল্পের নামকরণ কতোটুকু সার্থক হয়েছে আলোচনা করুন।

.....

.....

.....

.....

৩। লেখক মধুবন্তী গল্পে তালডাঙা কলোনীর যে বর্ণনা দিয়েছেন তা আলোচনা করুন।

.....

.....

.....

.....

৪। চিত্ত দত্ত চরিত্রটি আলোচনা করুন।

.....

.....

.....

৫। জয়া চরিত্রটি আলোচনা করুন।

.....

.....

.....

৬। যতীন মিত্র চরিত্রটি আলোচনা করুন।

.....

.....

.....

৫.২.৪ উইপোকা

উইপোকা একটি অতি সুন্দর গল্প। গল্পটি দেশভাগ কেন্দ্রিক। গল্পটিতে লেখক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় দেখিয়েছেন দেশভাগের ফলে একটি বাল্যপ্রেম পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারেনি। এবং প্রেমিক নিজের প্রাণ আত্মাহুতি দিয়েছেন। শেষে সেই বাল্যপ্রেমিকা একটি বিশেষ কাজে নিজের দেশ বাংলাদেশে যান এবং সেখানে গিয়ে তিনি নষ্টালজিক হয়ে পড়েন। গল্পে অতীতের অংশটুকু প্রেমিকার স্বপ্নের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে।

খুলনা জেলা বাংলাদেশের একটি বিখ্যাত জেলা। এই খুলনা জেলাতেই বাস ছিল গল্পের নায়ক সইফুল ও নায়িকা মৃণালিনীর। দেশভাগের ফলেই মৃণানিলীর পিতা অনুকূল ভট্টশালী কলকাতা চলে যান। সেখান থেকে মৃণালিনী একটি চিঠি লেখেন। সেই চিঠির আঘাত সহ্য করতে না পেরে এখন থেকে সাতত্রিশ বছর আগে সইফুল আত্মহত্যা করেন। আর অপরদিকে মৃণালিনী আমেরিকা চলে যান সোসিয়াল সায়েন্সে মাষ্টার করতে । আজ সাতত্রিশ বছর পরে তিনি খুলনা ফিরেছেন গবেষণার কাজে। বর্তমান খুলনার সঙ্গে সাতত্রিশ বছর পূর্বের খুলনার এক বিরাট তফাৎ তাই মৃণালিনীকে বলতে শোনা যায়,"সব জায়গার মতই এখানকার পৃথিবীও আগের চেয়ে অনেক ডাগর হয়েছে। বটগাছ গুলোরও আশি বছর বয়স গেল। জঙ্গলের জায়গায় কলেজ, রেডিও স্টেশন- কত কি।"

এখানকায় মৃণালিনীকে সাহায্য করার দায়িত্বটা নিয়েছেন সইফুলের ছোটোভাই রেফিজুদ্দিন দফদার। তিনি এই জেলার ডেপুটি কমিশনার। গবেষণার কাজে ঘোরার

সময় একবার গাড়ি নষ্ট হলে বসে বসে মৃণালিনীর চোখে ঘুম লেগে যায়। আর এই সুযোগে লেখক মৃণালিনীর স্বপ্নের মাধ্যমে একটি নাটকের দ্বারা তাঁর পূর্বের কাহিনিটি বর্ণনা করেন। কাহিনিটি এমন সইফুল -মৃণালিনী একে অপরকে ভালোবাসেন। তাঁরা প্রতিদিন দেখা করেন। এঁদের কথোপকথনের মাধ্যমেই জানা যায় দশভাগ হলে অনুকূল ভট্টশালী চলে যাবেন কলকাতা।

ঘুম ভাঙলে চলতে চলতে মৃণালিনী বুঝতে পারলেন," দেশ বিভাগের সবচেয়ে প্রত্যক্ষ পরিণাম, একটি নতুন মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজের উদ্ভব। তাঁরাই আজ উকিল, ডাক্তার, প্রশাসক, অধ্যাপক।" অথচ এই মধ্যবিত্তের বয়স শুধু সাতত্রিশ।

রেফিজুদ্দিনের মুখে মৃণালিনী জানতে পারেন তাঁর মা বাবা মারা গেছেন। বর্তমানে তাঁদের পুরান বাড়িতে দাদি থাকেন। দাদি কম বয়সে বিধবা হন। তারপর আবার এক হজ ফেরত বৃদ্ধকে বিয়ে করেন। বর্তমানে তাঁর সঙ্গে তিনিই থাকেন। মৃণালিনী রেফিজুদ্দিনের নিকট জানতে চাইলেন যে সইফুলের কী হয়েছিল। তখন তিনি বললেন, "ভাইজান মেলাঙ্কলিয়া রোগে ভুগত। যাকে বলে স্থায়ী বিপদ। কেমেস্ট্রি অনার্স পড়েছিল দৌলতপুরে। ল্যাব থেকে পটাসিয়াম সায়ানাইড নিয়ে আসে লুকিয়ে। ওরকম ডিপ্রেসনের ভেতর একসমর। পোস্টমর্টেমে সব জানা যায়। মা অনেকদিন অব্দি বলত — কার একখানা চিঠি পেয়েই নাকি— " চিঠি কে লেখেছে তা কেউ জানতেন না কারণ মৃত্যুর পূর্বে একদিন সইফুল খাম-সহ চিঠিটিকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেন। অনেক চেষ্টা করেও জানা যায়নি চিঠিটির লেখক বা লেখিকাকে। এই ধরনের কথা বলতে বলতেই গাড়িটি এসে দাঁড়াল 'দফাদার মঞ্জিল' এর সম্মুখে।

বারান্দায় উঠেই মৃণালিনী বুঝতে পারলেন, "এখানে চেষ্টার সঙ্গে পুরণো শোক মিশে আছে। ছক্কু, বজলুর, রেফুজুদ্দিন— সবাই চেষ্টা করেই বড় হয়েছে। তাদের সব কাজে সইফুলের জন্যে শোক গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে মিশে আছে। ছক্কু বজলুর সবাইকেই সে ছোট দেখেছে। এদের শরীরের ভেতর ব্যথার রক্তে সইফুল শুয়ে আছে। বিকেল আসতে কত দেরি। অথচ এরই ভেতর তার ছায়া মিশে গেল রোদে।"

দাদির জন্য সঙ্গে করে ইলিশ নিয়ে এসেছিলেন মৃণালিনী। বাড়িতে এসেই দাদির সঙ্গে দেখা হল। কিছুক্ষণ পরে দাদুর সঙ্গেও। প্রথমে দেখার পরই মৃণালিনী এঁদের প্রণাম করলেন। দাদুকে দেখে তাঁর মনে হল— "এই মানুষটা কী এইমাত্র মহাভারত থেকে উঠে এল।" তারপর কিছু সময় ঠাট্টা মস্করা দাদু-নাতিত্ব মধ্যে চলন। এই দাদু দেশভাগের আগে শেয়ালদাতে কাজ করতেন। তিনি মৃণালিনীকে বলেন— "কলকাতায় মাল গস্ত করে ওই শেয়ালদায় ওয়াগনে তুলে দিতাম। আর গোয়ালন্দে ছাড়ায়ে নেতাম। সে একদিন গেছে। শেয়ালদার ধীরেন উড়িয়ার পাইস হোটেল আমার বাঁধা ছেল।" এই বৃদ্ধ প্রাচীনের সাক্ষী। তাঁর মধ্যে বেঁচে আছে দেশভাগের পূর্ববর্তী ভারতবর্ষ। এই বিরানব্বই শাল বয়সী বৃদ্ধের মধ্যে এখনও প্রচণ্ডভাবে জেগে আছে বেঁচে থাকার ইচ্ছা। তারপর সেখানে এলেন রেফিজুদ্দিনের স্ত্রী বেহানা। এর একসঙ্গে বসে সন্ধ্যা পর্যন্ত গল্প করে কাটাল। রাত আটটার সময় মৃণালিনী গেস্ট হাউসে যাওয়ার কথা বললে দাদি বললেন,

" কোথায় যাবি পোড়ার মুখি। একটা রাত তো আমাদের সঙ্গে কষ্ট করে শুবি।"

এক সময় ঘুম মৃণালিনীকে দখল করে নিল। মৃণালিনী স্বপ্নে দেখলেন যে তিনি পাশের ভাড়া বাড়িটায় ঢুকে লক্ষ্মীর আসনের কাঠের বাকসটার ডালা খুলেছেন এবং সেটার মধ্যে থিক থিক করছে কতগুলো উইপোকা। ভালো করে দেখলেন উইপোকা নয়, সেগুলি কুচি কুচি করে ছেঁড়া কোনো চিঠির কাগজ। দাদির ধাক্কায় ঘুম ভাঙল। দাদি চা নিয়ে এসে উপস্থিত হয়েছেন। দাদি জানতে চাইলেন যে সউ ফুলকে কি চিঠিটা তিনি লিখেছিলেন। মৃণালিনী উত্তর দিলেন কিছু মনে নেই কিন্তু তাঁর চোখ থেকে নিজে নিজেই জল ঝড়ে পড়তে লাগল।

গল্পটিতে দেখলাম দেশভাগ কীভাবে একটি প্রেমিক-জোড়াকে নিংরে রেখে দিল। দেশভাগের ফলেই মৃণালিনী বাধ্য হন দেশ ত্যাগ করে কলকাতায় চলে আসতে। আর সেই বিচ্ছেদকে সইফুল সহ্য করতে পারেন নি। মৃণালিনীর চিঠি লেখার পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে শুধু দেশভাগের জন্যই। নতুবা সইফুলের মধ্যে প্রতিভা ছিল একজন যোগ্য লোক হয়ে ওঠার। কিন্তু কম বয়সে সেই মর্মান্তিক আঘাত সহ্য করার মতো ক্ষমতা তথা মানসিকতা সইফুলের ছিল না। তাই তিনি আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেন এবং একটি প্রেম কলিতেই নষ্ট হয়ে যায়। আর অপরদিকে দাদু হচ্ছেন সেই অবিভক্ত ভারতবর্ষের সাক্ষী।

চরিত্র বিচার:

মৃণালিনী : এই গল্পের প্রধান চরিত্র হলেন মৃণালিনী। কারণ প্রতিটি চরিত্রই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাঁর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তাঁর বাল্যকাল কেটেছে পূর্ববঙ্গের খুলনা জেলায়। তাঁর পিতার নাম অনুকূল ভট্টশালী। বাল্যকালে তাঁর প্রেম ছিল পাশের বাড়ির সইফুলের সঙ্গে। দেশভাগের ফলে অনুকূলবাবু এদেশ ছেড়ে কলকাতা চলে যান। মৃণালিনীও তাঁর পিতার সঙ্গে কলকাতা চলে যান। তারপর সোসিয়াল সায়েন্সে এম' এ পড়তে চলে যান আমেরিকা।

সাতত্রিশ বছর পর গবেষণার কাজে এসেছেন খুলনায়। এখানে তাঁর কাজে তাঁকে সাহায্য করছেন রেফিজুদ্দিন দফাদার। মৃণালিনী একজন শিক্ষিতা মহিলা। তিনি বুঝতে পারেন দেশভাগের ফলে সবথেকে বেশি লাভান্বিত হয়েছে মুসলমান মধ্যবিত্তরা। তাই তাঁকে মনে মনে বলতে দেখা যায় —"দেশ বিভাগের সবচেয়ে প্রত্যক্ষ পরিণাম একটি নতুন মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজের উদ্ভব। তাঁরাই আজ উকিল, ডাক্তার, প্রশাসক, অধ্যাপক।"

দাদির সঙ্গে আগে থেকেই মৃণালিনীর সুহৃদ্য সম্পর্ক। তাই দাদির ইলিশ মাছ খেতে ভালো লাগে বলে তিনি দাদির জন্য ইলিশ মাছ নেন। বারবার তিনি রেফিজুদ্দিনের নিকট সইফুলের কী হয়েছিল সে সম্পর্কে জানতে চান। তাঁর কাছ থেকেই জানতে পারেন যে কার একখানা চিঠি পেয়ে সইফুল পটাসিয়াম সায়নাইড খেয়ে মৃত্যুবরণ করেন। এরপর দফাদার বাড়িতে আসেন মৃণালিনী। এখানে তাঁর সঙ্গে দাদি, নতুন দাদু, রেহানা এঁদের সঙ্গে দেখা হয়।

অনেক কথোপকথন হয় এঁদের সবার মধ্যে। রাত আটটার সময় তিনি যখন মজলিশ থেকে উঠবেন তখন দাদি তাঁকে সে রাত্র সেখানে থেকে যাওয়ার অনুরোধ করেন। সম্পূর্ণ দিনের ক্লান্তির ফলে অল্পতেই তাঁর চোখে নিদ্রা আসে এবং তিনি স্বপ্ন দেখেন যে তিনি পাশের বাড়ির ভাড়া বাড়িটায় ঢুকে লক্ষ্মীর আসনের কাঠের বাক্সের ডালাটা খুলে ফেলেছেন। সেখানে কতগুলো টুকরা। এমন সময় তাঁর স্বপ্ন ভাঙাল। আসলে সইফুলকে চিঠিটা লিখেছেন মৃণালিনী। এ সত্যটুকু কেউ না জানলেও দাদি জানতেন। তাই শেষে দাদির তাঁর নিকট জানতে চেয়েছিলেন যে তিনি চিঠিটিতে কী লিখেছিলেন। কিন্তু কোনো উত্তর তাঁর কাছে ছিল না। তাই তাঁক চোখ দিয়ে জল বেরোতে লাগল। এই চোখের জলের দ্বারাই মৃণালিনী প্রায়শ্চিত করলেন।

রেফিজুদ্দিন : রেফিজুদ্দিন সইফুলের ছোটো ভাই। বর্তমানে খুলনা জেলার ডেপুটি কমিশনার। মৃণালিনী স্কুল জীবনে তাঁর বড় ভাইয়ের সঙ্গে পড়তেন। তাঁর গায়ে নস্যি রঙের সাফারি। তাঁর চেহারাটা ঝকঝকে। মৃণালিনীকে তাঁর ঝাপসা ঝাপসা মনে আছে। তাঁর ভাষায়, "আপনার চেহারা আমার মনে পড়ে। আপনারা শাড়ি ধরেছেন সবে। দলবেঁধে ভৈরবের তীর বেড়াতে যেতেন বোধহয়। শিববাড়ি অব্দি ভাইজানরাও যেত দল বেঁধে হাঁটতে হাঁটতে — আমায় একদিন দলে নিয়েছিল হয়ত।"

এ যাত্রায় তিনি হলেন মৃণালিনীর গাইড। আগের খুলনা শহরের যে পরিবর্তন গুলো হয়েছে সেগুলো তিনি আঙুল দিয়ে মৃণালিনীকে দেখাচ্ছেন। তিনিই সইফুলের মৃত্যুর কাহিনিটি তাঁর নিকট বর্ণনা করেন। দাদির পুনরায় বিয়ে করা কিংবা নতুন দাদুর বিষয়ে তিনিই মৃণালিনীকে বলেন। মৃণালিনী যখন ইলিশ মাছ কিনছিলেন তখন তাঁর মনে হয়েছিল যেন মাছগুলো তাঁকে অনেক দিন ধরে চেনে।

তিনি দফাদার মঞ্জিলে থাকেন না। স্ত্রী রেহানা এবং বাচ্চাদের নিয়ে সরকারি কোয়ার্টারে থাকেন। তিনি একজন বড় অফিসার হলেও দাদুর সঙ্গে ঠাট্টা করতে ইতঃস্তত করেন না। তিনি দাদুকে বলেন— " সে জন্যে আপনার তো অ্যাপোলোজেসিক হবার নেই কিছু। আপনি বিয়ে করেছেন। ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনি হয়েছে। তারপরেও আমাদের নতুন দাদু হলেন। আমাদের কি ভাগ্য!"

রেফিজুদ্দিন এই গল্পের একটি জীবন্ত চরিত্র। তাঁর দ্বারা লেখক নতুন এবং পুরানের সেতুবন্ধন করিয়েছেন। তাঁর বর্ণনাতেই জীবন্ত হয়েছে অতীতের বর্ণনাগুলো।

নতুন দাদু : নতুন দাদু হলেন রেফিজুদ্দিনের দাদির নতুন স্বামী। তাঁদের মায়ের বিয়ের কিছু পরেই — তাঁর মায়ের বাবা মারা যান। তিনি কম বয়সেই বিধবা হন। সুন্দরী বিধবা। তাই চারদিক থেকে প্রোপোজালও আসতে থাকে। অনেকদিন তিনি কাউকে বিয়ে করেননি। শেষে এক সুপুরুষ ভদ্রলোক— যৌবনে হজে গিয়েছিলেন, তাঁকে বিয়ে করলেন। তিনিই এই নতুন দাদু। তাঁর বয়স হবে বিরানব্বই-তিরানব্বই। তাঁর আগের নাতিরা আছে। তারা ঢাকা থেকে মাঝেমধ্যে যথাসাধ্য সাহায্য পাঠান। বাকি এই নতুন নাতনিরাই তাঁকে দেখেন। তিনি বর্তমানে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে দফাদার মঞ্জিলে থাকেন। রীতিমতো চলাফেরা করতে পারেন। শুক্রবারে মগরের নামাজ রাখতে মসজিদে যাবেনই। বাড়িতে

পাঁচ ভক্ত নামাজ পড়েন। হাসিখুশি মানুষ। কলকাতার শেয়ালদার গল্প করতে খুব ভালোবাসেন।

মৃণালিনী প্রথম দর্শনেই এই দাদুকে চিনতে পেরেছিলেন। মাথার শাদা চুলের ওপর রঙিন সিলকের রুমাল বাঁধা। তার কিনারে কিনারে ঘামের ফোঁটা। গোলাপী রঙের ফতুয়া গায়ের রঙের সঙ্গে মিশে গেছে। তিনি ভদ্র। প্রথম দর্শনে তিনি মৃণালিনীকে আপনি বলে সম্বোধন করেছেন। মৃণালিনীর তাঁকে প্রণাম করতে গিয়ে মনে হল, "এই মানুষটা কী এইমাত্র মহাভারত থেকে উঠে এল।" তাঁকে প্রণাম করতে গেলে তিনি বললেন, "করেন কি করেন কি! আমারে আর কদমবুসি করতি হবে না। আমি হলাম সে এটা ফালানো মানুষ আপনারা হলেন গে কলকেতার লোক।"

রেফিজুদ্দিন তাঁর সঙ্গে ঠাট্টা করলে তিনি বলেন, "আমি তো আর টাকা-পয়সা আয় করতে পারিনে।" তিনি যে সিগারেটের নেশা করেন তা জাদির কথা থেকে জানা যায়। কত বছর আগে তিনি হজে গিয়েছিলেন এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, "সে প্রথম মহাযুদ্ধের পয়লা বছরে। পালের জাহাজে চড়ে। তা সত্তর বছর হতি চলল।" শেয়ালদার কথা উঠলে তিনি বলেন যে কলকাতার মাল গস্ত করে ওই শেয়ালদায় ওয়াগনে তুলে দিতেন। আর গোয়ালন্দে ছাড়ায়ে নেতাম। আর ধীরেন উড়িয়ার পাইস হোটেল তাঁর বাঁধা ছিল।

এই বৃদ্ধলোকটির বাঁচার ইচ্ছা প্রবল। তাঁর মধ্যে লুকিয়ে আছে প্রচুর জীবনী শক্তি। তাই লেখক এই লোকটি সম্পর্কে মন্তব্য করেন, "দরজার ফ্রেমের ভেতর পালের জাহাজে হজ করে ফিরে আসা মানুষটি নবব্বুই পার করে দাঁড়িয়ে। মহাভারতের মানুষজন এমন পরস্পর বিয়ে করত। বিয়ে করে সারা সংসার কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে খরচা করে দিয়ে ফের বিয়েতে বসত। মৃণালিনী ভট্টশালী এই পুরনো গাছের ধারা মানুষটার সামনে দাঁড়িয়ে পরিষ্কার বুঝল— সোশ্যাল সায়েন্স বলে কিছু হয় না — ও নামে কিছু নেই। বিরানব্বুইতেও উঠে আসা কনের মত দাদিকে বিয়ে করে দাদিদের বাড়িতে রয়ে গেছে। এঁরই নাম বাঁচার ইচ্ছে। কিংবা বেঁচে থাকার সুখ হল গিয়ে এক কথায়— নতুন দাদু। জীবনের ওঠা পড়া ওঁর মুখের সরল হাসিখানা মুছে ফেলতে পারেনি।"

নামকরণ : উইপোকা গল্পটির নামকরণটি যদি আমরা বিচার করি তাহলে বাহ্যিক দিক থেকে দেখতে পাই একবার গল্পটিতে উইপোকার প্রসঙ্গ এসেছে। মৃণালিনী স্বপ্নে সেই কুচিকুচি কাগজের টুকুরা গুলোকে উইপোকা বলে মনে করেছিলেন। তাই বাহ্যিক দিক থেকে নামকরণ সার্থক। ব্যঞ্জনার দিকে লক্ষ করলে দেখি উইপোকা যেমন অনেক দিন ধরে বাড়ির মাটির নিচে থাকে, তারা মরে না। সেইরকমই সাতত্রিশ বছরে পুরোনো সেই চিঠির স্মৃতি এখন পর্যন্ত এই পরিবারের লোকদের মন থেকে মুছে যায়নি, তা এখনও তাঁদের মনে স্মৃতি হয়ে আছে। তাই এই ব্যঞ্জনার দিক থেকেও নামকরণটি সার্থক হয়েছে।

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

১। উইপোকা গল্পটি মূল কাহিনিটি আলোচনা করুন।

.....

.....

.....

.....

২। উইপোকা গল্পের নামকরণ কতোটুকু সার্থক হয়েছে তা আলোচনা করুন।

.....

.....

.....

.....

৩। নতুন দাদু চরিত্রটি আলোচনা করুন।

.....

.....

.....

.....

৪। মৃণালিনী ভট্টশালী চরিত্রটি আলোচনা করুন।

.....

.....

.....

.....

৫। রেফিজুদ্দিন দফাদার চরিত্রটি আলোচনা করুন।

.....

.....

.....

.....

৫.২.৫ জটায়ু

(জটায়ু একটি পাখির নাম। মনে রাখবেন রামায়ণ কাব্যে আমরা এই পাখিকে পাই। রাবণ বোনের অপমানের প্রতিশোধ হিসেবে সীতাকে পঞ্চবটী বন থেকে অপহরণ করেন। অপহরণ করে নিয়ে যাবার সময় রাস্তায় জটায়ুর দেখা হয়। জটায়ু তার যথাসর্বস্ব দিয়ে সীতাকে রাবণের কবল থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে। কিন্তু দুর্ধুর্ষ রাবণের সঙ্গে সে পেরে ওঠে না। অবশেষে যুদ্ধে তার ডানা দুটোকে হারাতে হয় এবং সে মৃতুবরণ করে।)

জটায়ু গল্পটি একটি করুণ রসের গল্প। দেশভাগের পটভূমিকায় রচিত হয় গল্পটি। গল্পের মধ্যে মূল চরিত্র দুইটি। নিত্যচরণ ও তাঁর স্ত্রী দুর্গা। নিত্যচরণদের বংশে নাচ ছিল। আজ সন্ধিপূজা উপলক্ষে নিত্য নাচবে। মায়ের চোখের সামনে তাঁর স্থান হয়েছে। দৈর্ঘ্য, প্রস্থে আট-দশ হাত জমি কোদাল দিয়ে কুপিয়ে, জল ঢেলে -ঢেলে পেছল করা হয়েছে। হাঁটতেই কষ্ট। এর-ওপর নিত্যচরণ পাখির মতো উড়বেন। মাথায়, দাঁতে পেতলের মালশা থাকবে। মালশায় আগুন। আর নিত্যচরণ শরীর মুচড়ে পায়ের উর ঠিক রেখে আশ্চর্য ছাঁদে নাচবে। নিত্যচরণ আগুন হয়ে যাবে। তাই তিনি আজ সেজেছেন। সাবান ঘষে-ঘষে মাথার চুল ফাঁপিয়েছেন। কপালে সিঁদুর দিয়ে ফোঁটা কেটেছেন। গোঁয়ারের মতো মুখে সবসময় একটা উদাসীন অন্যমনস্ক হাসি লেগে আছে।

নিত্যচরণের সেই নাচ দেখতে তাঁর স্ত্রী দুর্গাও এসেছেন। দপ করে তাঁর শরীরে আগুন জ্বলে উঠল। দুর্গা আগুনের দিকে তাকালেন। এত আগুন অনেকদিন দেখেননি। একদিন এই আগুনে জ্বলেই দুর্গার বাবা মারা যান। আগুনের মধ্যে তাঁর বাবাকে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছিল। তিনি চিরজীবন গাঁয়ে গাঁয়ে কথকতা করেছেন। কিন্তু পুরাণের কোন দেবতা দেবী এসে তাঁকে রক্ষা করেনি। তাঁর মা-বাবা সবাই মরেছে। এমনকি দেশও ছাড়তে হয়। পালিয়ে এসে স্টেশনে থাকার সময় নিত্যাচরণের সঙ্গে বিয়ে হয়। কোন এক অজানা হাতের আতঙ্কে দুর্গা ভীত। সেই হাত তাঁর নতুন আশ্রয়টি দুমড়ে দিতে চায়। ঘুমের মধ্যে ভয় পেয়ে নিত্যচরণের হাতটাকে ধরেই কতদিন ভয় পেয়েছেন।

একটা ট্রেন আসছে। নাচতে নাচতে নিত্য দুর্বোধ্য বিস্ময়ে গাড়িটার দিক দেখতে থাকল। আর গাড়ির দিকে তাকিয়ে অজান্তেই তাঁর পা দ্রুত হয়ে উঠছে। একেবারে হঠাৎ নিত্যচরণ পিছলে গেল। লাইনের ফাঁকে পড়ছে বলে মরেনি, কিন্তু একটা কবজি আর একটা ডানা কামড়ে ছিঁড়ে নিল। আর নিত্যাচরণ কাঁদতে লাগল এ কথা বলে, "ক্যান এমন হইল, বউ ক্যান হইল। কে কাঁদছে। কোনো পাপ ত করি নাই।"

তবুও নিত্যচরণ নেচে চলেছেন। এখন তাঁকে দেখলে ভয় লাগে। লেখক লিখেছেন— "একটু আগে যাকে বীর মনে হচ্ছিল, এখন তার দিকে তাকাতে বুক শুকিয়ে যায়। কারণ চোখ দুটো লাল হয়েছিল আর মুখে সেই উদ্ধত উদাসীন হাসি ছিল। উদোম, দাপুটে শরীরটায় ঠুঁটো দেখলে হঠাৎ মনে হয় পুরাণের একটা পুরুষ মাটিতে নেমে এসেছে।" নিত্যাচরণকে দেখে মনে হচ্ছে যেন তাঁর শরীর থেকেই আগুন বেরোচ্ছে। ভয়ে কেউ আর্তনাদ করে উঠল। উত্তেজনায় অনেকে ওঠে দাঁড়িয়েছে। উত্তেজনায় ঢাকিরাও নাচছে। বুড়ো ঠাকুর প্রতিমার সামনে নাচতে শুরু করেছে। ধীরে

ধীরে সবাই নাচতে শুরু করেছে। আর তিনটে সারিতে আগুন নাচছে। লাল, হলুদ, বেগনি। এই দৃশ্য দেখে দুর্গার পুরোনো কথা মনে পড়ল। তাঁর বাবার মৃত্যু এবং নিত্যচরণের হাত কাটার মধ্যে কোথায় যেন একটা সামঞ্জস্য দেখতে পেল।

একটা অচেনা হাত বারবার দুর্গাকে ভয় দেখাচ্ছিল। নিত্যচরণ যখন আগুনের মধ্যে নাচছে তখন সেই লোমশ হাতটা দুর্গার গলায় সুড়সুড়ি দিল, আঙুলে আংটি। দুর্গা প্রাণপনে চিৎকার করল কিন্তু কেউ শুনল না। নাচতে নাচতে নিত্যাচরণ তাঁর স্ত্রীকে মরার প্রস্তাব দিলেন। নিত্যচরণের দুইচোখ তখন কালীর জিভ। সমস্ত গা ফেটে ঘাম বেরুচ্ছে। কাদায় পা এলোমেলো হয়ে উঠেছে। যে কোনো মুহূর্তে টলে পড়ে যাবে। একটা ক্লান্ত, অতিপ্রাকৃত আত্মা কোনরকম ডানা ঝাপ্টাচ্ছে।

দুর্গা দেখলেন আগুনটা সাপের মতো এঁকেবেঁকে এগোচ্ছে। আর কে যেন এই আগুনের স্রোত মন্থন করে ওঠে, দাঁড়িয়ে বললেন "আমি এসেছি"। শেষ পর্যন্ত নিত্যচরণ মারা গেলেন। দুর্গা বললেন, "আমি চাই নাই তুমি মর, কোনোদিন চাই নাই, জীবনে বড় সাধ আছিল গো।"

দুর্গা শেষে দেখতে পেলেন আগুনের বেড়ার ভেতর তাঁর নিয়তি এসে দাঁড়িয়েছে। যে শত্রুর চেহারা তিনি স্পষ্ট করে চিনতেন না অথচ ভয় পেতেন— তিনি আর কেউ নয় নিত্যচরণ।

স্ত্রীর উপার্জন করা টাকায় খেতে লজ্জা বলে নিত্যচরণ পূজায় এই আগুন নিয়ে খেললেন। শেষ পর্যন্ত নিজের প্রাণ বিসর্জন দিলেন।

নামকরণ : নামে কি আসে যায় এরকম একটা কথা প্রচলিত থাকলেও সাহিত্য নামকরণ মোটেই ফেলনা নয়। কোন একটা সাহিত্য সৃষ্টি করার কবি সাহিত্যিক এর নামকরণ নিয়ে বারবার চিন্তা করেন। লেখক দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এর ব্যতিক্রম নন। তিনি গল্পটির নামকরণ করেছেন জটায়ু। যদিও গল্পটিতে কোনো জটায়ু পাখির কথা সরাসরি নেই, কিন্তু ব্যঞ্জনার দিক থেকে নামকরণটি সার্থক। সীতাকে রাবণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য জটায়ু প্রাণপনে চেষ্টা করে এবং শেষ পর্যন্ত হাত কেটে মৃত্যুবরণ করে এখানেও নিত্যচরণ তাঁর স্ত্রীকে ভরণ পোষণ দেবার জন্য প্রাণপনে চেষ্টা করে এবং শেষ পর্যন্ত গল্পটিতে দেখা গেল নিত্যচরণেরও হাত কাটে এবং তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাই নামকরণ সার্থক হয়েছে বলতে হয়।

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

১। 'জটায়ু' গল্পের মূল কাহিনি আলোচনা করুন।

.....

.....

.....

২। 'জটায়ু' গল্পের নামকরণ কতটুকু সার্থক হয়েছে তা নিজের যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

.....

.....

.....

৩। 'জটায়ু' গল্প অবলম্বনে নিত্যচরণ ও দুর্গা চরিত্র আলোচনা করুন।

.....

.....

.....

৫.৩ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

এই অধ্যায়ের প্রথমেই আলোচিত হয়েছে 'আপদ' গল্পটি। দেশভাগের ফলে আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত সময়ে পাকিস্থান থেকে আগত দু-জন অতিথি কীভাবে আপদ স্বরূপ — এই কথা এই গল্পে প্রকাশিত হয়েছে। দেশভাগের প্রেক্ষিতে লেখা 'পরিচিতা' গল্পে প্রকাশিত হয়েছে বিপদে পড়ে রিফিউজিরা কীভাবে বাধ্যতামূলকভাবে বিভিন্ন বৃত্তিতেচ নিযুক্ত হয়। 'মধুবন্তী' গল্পেও দেশভাগের চরম পরিস্থিতির ফলে উদ্বাস্তুদের জীবনচিত্র ও একটি অসফল প্রেমের কাহিনি রয়েছে। দেশভাগের ফলে প্রেমিকা অন্যদেশে চলে গেলে সেই প্রেমিকার একটি চিঠিতে ব্যর্থ প্রেমিকের আত্মহত্যার করুণ কাহিনি নিয়ে রচিত হয় 'উইপোকা' গল্পটি। দেশভাগের পটভূমিতে লেখা 'জটায়ু' গল্পে পৌরাণিক চেতনার মধ্য দিয়ে বাস্তব-জীবনের একটি করুণ কাহিনি ফুটে উঠেছে।

৫.৪ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

এই বিভাগের আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্নগুলি দ্রষ্টব্য।

৫.৫ প্রসঙ্গ- পুস্তক (References/Suggested Readings)

(১) রক্তমণির হারে — সম্পা: দেবেশ রায়

(২) পঞ্চাশের মন্বন্তর বাংলা সাহিত্য — বিনীতা রায়চৌধুরী

(৩) দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্য — গোপিকা নাথ রায় চৌধুরী

(৪) ভাঙা দেশ, ভাঙা মানুষ বোবা বাংলা সাহিত্য — অশ্রুকুমার শিকদার

(৪) দেশবিভাগ পশ্চাৎ ও নেপথ্য কাহিনি — ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যা

* * *

বিভাগ-৬

তপস্বী ও তরঙ্গিণী

তপস্বী ও তরঙ্গিণী : সৃষ্টি-প্রসঙ্গ, মিথের ভূমিকা ও মূল নাট্যবিষয়

বিষয় বিন্যাস

৬.০ ভূমিকা (Introduction)

৬.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

৬.২ সৃষ্টি প্রসঙ্গ

৬.৩ মিথের ভূমিকা

৬.৪ মূল নাট্য বিষয়

৬.৪.১ কাব্যনাট্য কি না

৬.৪.২ একটি রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

৬.৫ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

৬.৬ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

৬.৭ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

৬.৮ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

৬.০ ভূমিকা (Introduction)

বুদ্ধদেব বসুর প্রধান পরিচয় তিনি কবি, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক ও গল্পকার। কিন্তু এ-কথা অনস্বীকার্য যে, সাহিত্যচর্চার সূচনালগ্ন থেকে নাট্যরচনার প্রতিও তিনি ছিলেন যথেষ্ট আন্তরিক। বুদ্ধদেব যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তখনই 'একটি মেয়ের জন্য' নামে একটি একাঙ্ক নাটক লেখেন এবং তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে অভিনীত হয়। পরে নর্থব্রুক হলে অভিনীত হয় তাঁর উপন্যাস 'যে দিন ফুটল কমল'-এর নাট্যরূপ। কলকাতায় রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের জন্য 'শ্যামবাজারিক বিধিবিধান' অর্থাৎ পর্বাঙ্ক, গর্ভাঙ্ক, সখির নাচ ইত্যাদি সব কিছু রেখে তিনি রচনা করেন 'রাবণ' নাটক। নাটকটি ১৯৯১ সালে 'সানন্দা' পত্রিকায় পরপর কয়েকটি কিস্তিতে প্রকাশিত হয়। ১৯৪৪ সালে বুদ্ধদেব তাঁর 'কালো হাওয়া' উপন্যাসের নাট্যরূপ রচনা করেন। এর বাইশ বছর পর আবার তিনি নাট্যরচনার জগতে ফিরে আসেন, লেখেন 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'। তাঁর নাট্যরচনার কালপর্যায় বিচার করলে ১৯৬৬ থেকে ১৯৭৩, এই সাত বছরকেই সর্বোত্তম বলে সিদ্ধান্ত করা যায়। এই কাল পর্যায়ের প্রথম নাটক 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'। এই সময়ে রচিত বিভিন্ন নাটকের একটি তালিকা এখানে দেখে নেওয়া যেতে পারে —

ক	**নাটক**	১. তপস্বী ও তরঙ্গিণী (১৯৬৬)
		২. কলকাতার ইলেক্ট্রা (১৯৬৮)
		৩. পুনর্মিলন (১৯৭০)
খ	**কাব্যনাট্য**	১. কালসন্ধ্যা (১৯৬৮)
		২. অনাম্নী অঙ্গনা (১৯৭০)
		৩. প্রথম পার্থ (১৯৭০)
		৪. সংক্রান্তি (১৯৭৩)
		৫. প্রায়শ্চিত্ত (১৯৭৩)
		৬. ইক্কাকু সেন্নিন (১৯৭৩)
গ	**একাঙ্ক নাটক**	১. পাতা ঝরে যায় (১৯৬৬)
		২. বাবু ও বিবি (১৯৬৬)
		৩. সত্যসন্ধ্যা (১৯৬৭)
		৪. চরম চিকিৎসা (১৯৬৮)

প্রসঙ্গত, এটাও আমাদের জেনে নেওয়া প্রয়োজন যে, উল্লিখিত নাটকগুলোর অধিকাংশ (কাব্যনাট্যগুলোরও) পুরাণের কাহিনিকে আশ্রয় করে রচিত হয়েছে। 'ইক্কাকু সেন্নিন' জাপানি পৌরাণিক কাহিনি আশ্রিত এবং 'কলকাতার ইলেক্ট্রা' গ্রিক পুরাণের বহু পরিচিত কাহিনির নাট্যরূপ। এছাড়া 'কালসন্ধ্যা', 'অনাম্নী অঙ্গনা', 'প্রথম পার্থ', 'সংক্রান্তি' এমনকি আমাদের আলোচ্য 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'র কাহিনি ভারতীয় পুরাণ অর্থাৎ রামায়ণ-মহাভারতকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ :

পৌরাণিক কাহিনির নব-রূপায়ণ বিশ্বসাহিত্যে সমাদৃত হয়েছে। পুরাণের পুনর্জন্মে উদ্দীপিত হয়েছেন রাসিন, শেলি, জেমস্ ফ্রেজার, রবার্ট ব্রিজেস, ইয়েটস, এলিয়ট, হেমিংওয়ে বা আধুনিক ফরাসি নাট্যকারের। সিক্কতো, সার্ত্র, আনুয়ি এঁদের গভীরতম তত্ত্ব বা নবরূপায়ণ পদ্ধতি বুদ্ধদেবের বহুব্যাপী চেতনায় ক্রিয়াশীল ছিল।

৬.১ উদ্দেশ্য

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-৭৪) এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের মতো নাট্যরচনাতেও তাঁর দক্ষতা ছিল আন্তরিক। নাট্য রচনাকে শিল্পিত করে তুলতে তিনি ছিলেন সতত সচেতন। গভীর আন্তরিকতা

দিয়েই তিনি কাহিনি চয়ন, চরিত্র পরিকল্পনা, সংলাপ রচনা এবং অসাধারণ নাট্যমুহূর্তগুলো নির্মাণ করেছেন। নিঃসন্দেহে তাঁর নাটকগুলো বাংলা নাট্যসাহিত্যে এক মূল্যবান সংযোজন।

আমরা যখন বুদ্ধদেব বসু রচিত 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' নাটকটি পড়তে চলেছি তখন এ-কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রোত্তর যুগে পুরাণ এবং বিশেষভাবে মিথ ব্যবহারের ক্ষেত্রে লেখকের একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। তিনি জীবনের একনিষ্ঠ সাহিত্য সাধনার বিবর্তন এবং যোগসূত্রেই তাঁর উত্তরজীবনে ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য মিথকাহিনির আশ্রয়ে আধুনিক মানুষের দ্বন্দ্ব-বেদনাকে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

সুতরাং বর্তমান এককে আমরা বুদ্ধদেব বসুর এই অসাধারণ নাটকটির পাঠ-প্রসঙ্গে বিশেষ কয়েকটি দিক সম্বন্ধে জেনে নিতে পারি— যেমন নাটকটির সৃষ্টি প্রসঙ্গ, মিথের ভূমিকা, মূল বিষয়ের মূল্যায়ন এবং নাট্যস্বরূপ। আমাদের লক্ষ্য উক্ত দিকগুলোর সঠিক পরিচয় লাভ, যাতে নাটকটি সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠে।

৬.২ সৃষ্টি প্রসঙ্গ

আসুন, এবার আমরা বুদ্ধদেব বসুর নাট্যরচনার এই প্রেক্ষিত বা পটভূমিকে আশ্রয় করে 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'র সৃষ্টি প্রসঙ্গ একটু আলোচনা করে নিই। মনে রাখতে হবে 'রাবণ' নাটকটিকে বাদ দিলে। (কেননা এর মঞ্চাভিনয় হয়নি) 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'ই পুরাণ প্রসঙ্গ নিয়ে রচিত বুদ্ধদেবের প্রথম সার্থক নাটক। ইতিপূর্বে এই বিষয়বস্তু নিয়ে রাজকৃষ্ণ রায় লেখেন 'ঋষ্যশৃঙ্গ' নামে একটি গীতিনাট্য (১৮৯২) এবং রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'পতিতা' নামে একটি কবিতা (১৮৯৭)। এই বিষয়বস্তু বলতে 'রামায়ণ' এবং বিশেষ করে 'মহাভারত'-এ বর্ণিত ঋষ্যশৃঙ্গ এবং বারাঙ্গনা-সম্পর্কিত কাহিনিটির কথা বলা হয়েছে। বুদ্ধদেব এই কাহিনিকে শুধু বন্ধ্যা পৃথিবীতে অলৌকিক শক্তিতে বৃষ্টি নামানোর একটি প্রাচীন জাদু কাহিনি রূপেই দেখেননি, আধুনিক মানব-জীবনের সার্থকতার পথ-নির্দেশও সেখানে দিতে চেয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ 'পতিতা' কবিতার মধ্যে রামায়ণ থেকে ঋষ্যশৃঙ্গ কাহিনির একটি সঙ্কেত-সূত্র গ্রহণ করে একটি নারীর জীবনে আশ্চর্য প্রেমের জাগরণ দেখিয়েছেন। এই সঙ্কেতের মর্মকথা হল এই যে, প্রেমের প্রভাব বিশ্বব্যাপী। গণিকাও তার প্রভাবমুক্ত নয়। এভাবে যে নারীত্বের জাগরণ হল তা বুদ্ধদেবকে প্রাথমিক-ভাবে উদ্বুদ্ধ করলেও ঋষ্যশৃঙ্গ-মিথ-কাহিনিকে তার আদিম রিচ্যুয়ালের সঙ্গে যুক্ত করে যেভাবে 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'তে বিন্যস্ত করেছেন— রবীন্দ্র-মানসে সেই ভাবের কোনো সূচনা ছিল না। আর 'ঋষ্যশৃঙ্গ' গীতিনাট্যটির কথা বিশেষ আলোচনার যোগ্য নয় এই প্রসঙ্গে, কেন-না নাট্যকার সেখানে শুধু মূল কাহিনির বিবরণটুকুই দিয়েছেন। বুদ্ধদেব তাঁর নাটকটিতে ঋষ্যশৃঙ্গের বারাঙ্গনা-সমাগম, কৌমার্যনাশ, অঙ্গরাজ্যে বৃষ্টিপাত ঘটানো প্রভৃতি ঘটনা-সম্বলিত অলৌকিক

রসযুক্ত মিথ-কথার সামগ্রিক সংযোগে শুধু তরঙ্গিণীর নয় ঋষ্যশৃঙ্গেরও কাম থেকে প্রেম তথা পুণ্যের পথে উত্তরণের রূপ এঁকে দেখিয়েছেন। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'মহাভারতে' বর্ণিত ঋষ্যশৃঙ্গ কাহিনির 'অনুপুঙ্খ সমেত' বিস্তার তাঁর কল্পনাকে জাগিয়ে তুলেছিল। 'কবিতার শত্রু ও মিত্র' গ্রন্থে লেখকে নিজেই এ-সম্পর্কে লিখেছেন,— "সেই আমি প্রথম নিচ্ছি কালীপ্রসন্নর মহাভারতের আস্বাদ; সব বিস্তার ও অনুপুঙ্খ সমেত ঋষ্যশৃঙ্গের উপাখ্যান পড়ে চমকে উঠেছি— এর আগে রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা'-র বাইরে কিছু জানতাম না। দুর্ভিক্ষের পশ্চাৎপট, গাঁয়ের মেয়েরা, অজ্ঞান কিশোর তপস্বী ও বিদগ্ধ চতুর বারাঙ্গনার প্রথম দৃষ্টি বিনিময়ের আশ্চর্য মুহূর্ত— এই সবই আমার কল্পনায় ধৃত হয়েছিল তখন। ....." (পৃ: ৬৭-৬৮)। অঙ্গরাজ্যে অনাবৃষ্টি, নারী সম্পর্কে অজ্ঞান ব্রহ্মচারীকে ছলনায় বিভ্রান্ত করে নগরীতে নিয়ে আসার মন্ত্রণা ইত্যাদি সবই কালীপ্রসন্নের মহাভারতের অনুরূপ। কিন্তু Jessi L. Weston তাঁর 'From Ritual to Romance' গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে ঋষ্যশৃঙ্গ আখ্যানের যে উল্লেখ করেছেন সেখানে আছে, ঋষ্যশৃঙ্গকে মোহাবিষ্ট করে বৃদ্ধা কার্যসিদ্ধি করলেন কয়েকজন সুন্দরী নারীর সাহায্যে। Weston-এর এই উল্লেখ পাশ্চাত্যের 'গ্রেল লিজেণ্ড' প্রসঙ্গে করা হয়েছে। বুদ্ধদেব সম্ভবত তাঁর তুলনামূলক বিশ্বপুরাণ অধ্যাপনার সূত্রে Weston-এর গ্রন্থটি পড়েছিলেন। আর 'মরচে পড়া পেরেকের গান' গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি তো লিখেইছিলেন, — "... ইউরোপীয় হোলি গ্রেইল উপাখ্যানের যেটি অখৃষ্টীয় ও প্রাচীনতর অংশ, অনেক পণ্ডিতের মতে তার আদি উৎস এই ঋষ্যশৃঙ্গ কাহিনি।" যাইহোক, এই সমস্ত উল্লেখের পরও নাটকটির সৃষ্টিসূত্র তথা নাট্যঘটনা বিস্তারের কথা জানতে বুদ্ধদেব বসু লিখিত ভূমিকাটি আমাদের অবশ্য পঠনীয়। সেখানে তিনি লিখছেন— "ওই নাটকের অনেকখানি অংশ আমার কল্পিত নিজের মনোমতো করে নতুনভাবে সাজিয়ে নিয়েছি, তাতে সঞ্চার করেছি আধুনিক মানুষের মানসতা ও দ্বন্দ্ববেদনা।" যদি আমরা লেখক রচিত 'আমার ছেলেবেলা' এবং 'আমার যৌবন' পড়ি তাহলে দেখব 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' রচনার পটভূমি তৈরি হয়েছে সেই প্রাক্ যৌবনেই। তখনই তিনি ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে দাদামশাইয়ের আগ্রহে সংস্কৃত চর্চাও করতেন। কাব্যরচনার প্রথম পর্ব থেকে বুদ্ধদেব সচেতন-ভাবে পুরাণ-কথার ভাবরূপকে তাঁর আধুনিক পাশ্চাত্যধর্মী মানসতার সঙ্গে সংলগ্ন করে তাকেই গ্রহণ করতে চেয়েছেন এবং পেরেছেন। তাঁর সেই প্রবণতা বর্ধিষ্ণু -ভাবে রূপ পেয়েছে উত্তর-জীবনের পুরাণাশ্রিত কাব্যনাটকগুলোর রচনায়। প্রাক্‌যৌবন পর্ব থেকে তাঁর চর্চা যে প্রেক্ষাপট তৈরি করে রেখেছিল, পরবর্তী জীবনে নানা পাঠ-অভিজ্ঞতা তাকে ঋদ্ধ করেছে। 'কবিতার শত্রু ও মিত্র' লেখাটিতে লেখকের স্বীকারোক্তি আমাদের এই সিদ্ধান্তে আসতে সাহায্য করে। —". . . প্রথম পরিকল্পনার সময় আমি ঋষ্যশৃঙ্গ বিষয়ে যথেষ্ট জানতাম না বিষয়টির মর্মস্থলে প্রবেশ করিনি তখনও, সেটিকে একটি স্বকীয় রচনায় জীবন্ত করে তোলার মতো তহবিল আমার ছিলো না, ওগুলি সংগৃহীত হল নানা দেশে ঘুরে বেড়াবার ও ক্লাস পড়াবার সময়, পড়াবার জন্য অনেক বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে, আর বিশ্বপুরাণে আমার বিবর্ধমান কৌতূহলবশত।" (পৃ: ৬৮)। এই পাঠ অভিজ্ঞতার সঙ্গে যখন লেখকের কল্পনার সুষম মেলবন্ধন হল, তখনই 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' শীর্ষক শিল্পকর্মটির সৃষ্টি সম্ভব হল।

আত্মসমীক্ষামূলক প্রশ্ন:

'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' নাটক রচনার প্রেক্ষাপট সম্বন্ধে যা জানলেন সেটা কী? (ন্যূনাধিক ১৫০ শব্দের মধ্যে লিখুন)

.....

.....

.....

.....

৬.৩ মিথের ভূমিকা

আধুনিক সাহিত্যে বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর নবযুগের সাহিত্যে মিথ ব্যবহারের একটি বিশেষ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। জেমস্ জয়েস, টমাস মান, টি. এস. এটিয়ট এবং আরও অনেকে সচেতন-ভাবে প্রাচীন মিথ-পুরাণের আশ্রয়ে নিজেদের চিন্তাকে রূপ দিয়েছেন। একথা আমরা আগেও উল্লেখ করেছি। কিন্তু এরকম করার কারণটা ভেবে দেখেছেন কি? আসুন এই প্রসঙ্গে আমরা রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করি। তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন,— "আমাদের সুপ্রত্যক্ষ নরনারীর বিষামৃতময় প্রণয়লীলাকে কবি একটি সুবিশাল ঐতিহাসিক রঙ্গভূমির মধ্যে স্থাপিত করিয়া তাহাকে বিরাট করিয়া তুলিয়াছেন। হৃদ্‌বিপ্লবের পশ্চাতে রাষ্ট্রবিপ্লবের মেঘাড়ম্বর, প্রেমদ্বন্দ্বের সঙ্গে এক বন্ধনের দ্বারা বদ্ধ রোমের প্রচণ্ড আত্মবিচ্ছেদের সমরায়োজন। . . . আদি এবং করুণ রসের সহিত কবি ঐতিহাসিক রস মিশ্রিত করিতেই তাহা এমন একটি চিত্তবিস্ফারক দূরত্ব ও বৃহত্ত প্রাপ্ত হইয়াছে।" রবীন্দ্রনাথ যাকে 'ঐতিহাসিক রস' বলেছেন তাকেই 'মিথ পুরাণের রস' বলা যায়। আধুনিক কবি-সাহিত্যিক তাঁর নিজস্ব কালের কাহিনিকে একটি দেশে কালাতীত বিশ্বজনীন আবেদনে সমৃদ্ধ করে তুলতে চান। তাঁর কালের নরনারীর 'সুপ্রত্যক্ষ' জীবনকে 'একটি সুবিশাল' মিথিক ও পৌরাণিক 'রঙ্গভূমি' বা আবহে স্থাপন করতে চান। অন্যান্য পাশ্চাত্য কবি-সাহিত্যিকদের মতো বুদ্ধদেব বসুও বর্তমান নাটকটিতে সেই কাজই করেছেন। তাই মিথের ব্যবহার 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'র একটি আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে।

আমরা সবাই জানি এই নাটকে বুদ্ধদেব মহাভারতীয় ঋষ্যশৃঙ্গ কাহিনির (মিথ) ব্যবহার করেছেন, এবং যেটা আমাদের দ্রষ্টব্য বা যার জন্য আমরা নাটকটিতে মিথের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে চাইছি, সেটা এই যে, আধুনিক ক্ষয়িষ্ণু মানব-সভ্যতার এক পরিপুরক শক্তি ওই ঋষ্যশৃঙ্গ কহিনির মধ্যে নাট্যকার উপলব্ধি করেছেন। তবে প্রাচীন কাহিনির অর্থ পরিবর্তন করে তার মধ্যে নতুন যুগের বাণী সঞ্চার— 'পুরাণের পুনর্জন্মের' নামে শুধু এই কাজটি বুদ্ধদেব করেননি। তিনি মিথকে স্বভূমিতে রেখেই তার প্রাচীনতম ও বিশ্বগত তাৎপর্য যেমন গ্রহণ করেছেন তেমনি সেই আদি কাহিনিকে নতুনভাবে সাজিয়ে

তার মধ্যে আধুনিক তথা বিশ্বজনীন যুগ-মানসতা সঞ্চার করেছেন। আধুনিক-কালের সাহিত্যিক বুদ্ধদেব কালের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী 'ঈশ্বর'-বিচ্ছিন্ন হয়েও মিথ ব্যবহারের মাধ্যমে আধুনিক খণ্ডিত জীবনে চিরকালীন মানব-মূল্যবোধ সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন এবং সেজন্যই সমালোচকের সমালোচনার জবাব দিতে গিয়ে তিনি বলেন— "আমার কল্পিত ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণী পুরাকালের অধিবাসী হয়েও মনস্তত্ত্বে আমাদেরই সমকালীন।" (পূর্বকথন, 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী')।

প্রসঙ্গত এখানে মিথের বিষয়ে দু-চার কথা বলে নেওয়া যেতে পারে। মিথের পুরনো সংজ্ঞা ছিল এরকম — "A purely fictitious narrative usually involving super natural persons, actions or events, and embodying some popular idea concerning natural or historical phenomena." কিন্তু বিশ শতকীয় চিন্তাধারায় মিথ নিছক গালগল্প নয়, তা 'সত্য ইতিহাস'। কোনো সাংকেতিক ঘটনা এবং উপাখ্যানের রূপ মিথের মধ্যে থাকে যার মাধ্যমে পাঠক বাস্তব জগতেই অলৌকিকতার উদ্ভাসন দেখতে পান। অর্থাৎ 'মিথ'-এর মৌলিক অর্থ মানবভাগ্য বা মানব-সংস্কৃতির সঙ্গে আবহমান কাল ধরে জড়িত কোনো-না কোনো ভাবে অলৌকিকতা নির্ভর কাহিনি বা মন্ত্রকথা। জেনে রাখা প্রয়োজন, আপাত দৃষ্টিতে মিথ ও পুরাণ সমার্থক হলেও বাস্তবে এদের মধ্যে পার্থক্য আছে। মিথের ধারণা অনেক প্রাচীন ও ব্যাপক। পুরাণ কথার আকর মিথের মধ্যে নিহিত। পুরাণ কথার সঙ্গে মিথের আখ্যায়িকার একটি প্রধান পার্থক্য এই যে— পুরাণকথার পরিবর্তন যেমন মূল পুরাণের সঙ্গে আক্ষরিকভাবে মিলিয়ে নেওয়া যায়, মিথগত আখ্যায়িকার পরিবর্তন মূলের সঙ্গে অত স্পষ্টভাবে মিলিয়ে নেওয়া যায় না, কারণ সেক্ষেত্রে মিথের মূল নিহিত থাকে মানব জাতির অনন্ত স্মৃতির ভাণ্ডারে।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ :

মিথের আখ্যানগুলোর মধ্যে আধুনিক যুগের যেসব মনস্তত্ত্ব সন্ধানী লেখক মানবমনের দুর্গম রহস্যের সন্ধান করেছেন— তাঁরাই বিশ শতকে মিথ-নির্ভর শিল্পভাবনাকে সর্বাপেক্ষা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করতে সক্ষম হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ফ্রয়েড ও ইয়ুং-এর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ্য। ফ্রয়েডের মানব-মনের জটিলতা সন্ধানে সাহিত্যের মর্মকথা ধরা পড়েছে। বিশেষভাবে ধরা পড়েছে চিরকালীন সাহিত্যে আদিম যুগের মিথ-সম্ভূত সাহিত্যের সংকেতময় প্রেরণার কথা। ইয়ুং-এর ধারণায় 'মিথ' গালগল্প নয়, সামাজিক স্মৃতিতে বা সামূহিক নির্জ্ঞানে (collective unconscious) তারা সক্রিয় থাকে। এই সামূহিক নির্জ্ঞানের বিষয়বস্তুকেই আমরা মানবমনের ইতিহাসে আবহমান কাল পুনরাবৃত্ত 'আদিরূপ' বা 'আর্কেটাইপ' বলতে পারি। বুদ্ধদেব বসু এঁদের আলোচনা ও পাশ্চাত্য-সাহিত্যে মিথের নতুন ব্যবহার সম্বন্ধে জেনেছিলেন এবং 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'তে তাকে ব্যবহার করেছেন।

যাইহোক, আমরা ফিরে যাই 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'র প্রসঙ্গে। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে, মূল্যবোধের পতনে, পাশ্চাত্য সাহিত্যে যে তীব্র যুগচেতনা,

যুগযন্ত্রনা, অবক্ষয়ের বোধ এবং তার থেকে উত্তীর্ণ হবার জন্য আধুনিক-কালে নৃতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব নির্দেশিত পথে প্রাচীন মিথ-কাহিনির আশ্রয়ে নিজস্ব ও সমকালীন জীবন জিজ্ঞাসা রূপায়ণের যে প্রয়াস দেখা গেল তার সঙ্গে বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং অবশ্যই বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যরচনায় মিথ ব্যবহারের প্রবণতার সাদৃশ্য দেখা যায়। আমরা আগেও বলেছি যে, অলৌকিক ও সাংকেতিক ভাবের ঘটনা-প্রধান মিথ কাহিনির প্রতীকী বিন্যাস বুদ্ধদেবের সাহিত্যচর্চার প্রথম যুগ থেকেই বিদ্যমান। 'উর্মিলা' গল্পটি ছাড়াও 'দময়ন্তী' 'দ্রৌপদীর শাড়ী' প্রভৃতি এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। প্রাণ ও মন, শিল্প ও জীবন, যৌনতা ও প্রেম, মৃত্যু ও অমরতা প্রভৃতি বিষয় সার্থক-ভাবে প্রকাশ করার জন্য তিনি সারাজীবন একটি উপযুক্ত মাধ্যম খুঁজেছেন এবং পুরাণ-কাহিনিগুলোর মধ্যে আধুনিক পাশ্চাত্য কবি লেখকদের মতো নিজের শিল্পী-জীবনের সমগ্র ভাব প্রকাশের উপযোগী একটি 'আধার' পেতে চেয়েছেন। পূর্বোল্লিখিত রচনাগুলো যদি এর সূচনা হয়, তবে কাঙ্ক্ষিত 'আধার' পেয়ে পূর্ণতা লাভ করেছেন তিনি মহাভারতীয় ঋষ্যশৃঙ্গ মিথ-কাহিনির মধ্যে। মহাভারতে বর্ণিত ঋষ্যশৃঙ্গ এবং বারাঙ্গনা সম্পর্কিত কাহিনিটিকে তিনি কেবল বন্ধ্যা পৃথিবীতে অলৌকিক শক্তিতে বৃষ্টি নামানোর একটি প্রাচীন জাদু কাহিনিরূপেই দেখলেন না, আধুনিক বিশ্ব-জীবনের তথা তাঁর শিল্পী-জীবনের সার্থকতার পথনির্দেশও তিনি সেই প্রাচীন মিথ-কাহিনিতে পেলেন।

আমরা যদি কাহিনিটুকু বিশ্লেষেণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে পড়ি তাহলে বোঝা যাবে যে, বুদ্ধদেব মিথ-কাহিনির পাত্র-পাত্রীর মধ্যে আধুনিক মানুষের দ্বন্দ্ব-বেদনা এবং এ-যুগের ব্যক্তি-মানুষের জীবনে 'রোমাণ্টিক আবেগ' জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। এই রোমাণ্টিক আবেগের বিবর্তনের যে কাহিনি তিনি রচনা করেছেন তা বিশেষভাবে আধুনিক যুগের সামগ্রী, অথচ মিথ-কাহিনির সামগ্রিক বিন্যাসেই এই আধুনিক জীবন-কাহিনিকে পাঠকের কাছে পরিবেশন করেছেন। কামের প্রভাবে ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণীর জীবন বিচিত্র ঘাত প্রতিঘাতের পরিণামে প্রথমে প্রেমে এবং পরে তাঁদের 'পুণ্যের' পথে 'নিষ্ক্রমণের' যে রূপ বুদ্ধদেব প্রকাশ করেছেন তা একান্ত ভাবেই বুদ্ধদেব ভাবিত এবং বিশ-শতকীয় ব্যক্তি-মানুষের জীবন-যন্ত্রণা ও মুক্তি কামনার স্মারক। তিনি উত্তরোত্তর-ভাবে ব্যক্তি মানুষের কাম বা দেহপিপাসার বিকাশকে প্রাচীন অলৌকিক বৃষ্টিপাত ঘটনার সমান্তরাল-ভাবে রূপ দিতে সক্ষম হয়েছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তরঙ্গিণীর (২য় অঙ্ক) মন্তব্য স্মরণীয়—

> "জাগ্রত হোক সুপ্তেরা। সুপ্ত হোক যারা
>
> জাগ্রত। গলিত হোক শিলা। ...।"

আবার ছলনা করে ঋষ্যশৃঙ্গের প্রসাদী ফল খেয়ে সে মন্ত্রের মতো উচ্চারণ করে,— "জাগলো জন্তু। ভাঙলো নিদ্রা। সুপ্ত হলো যারা জাগ্রত ছিলো। চঞ্চল হলো মনোরথ, উচ্ছল হলো নির্ঝর। মেঘ জমলো আকাশে, চমক দিলো বিদ্যুৎ। বিলোল হলো বজ্র। নামলো বৃষ্টি।"

এখানে আমরা তরঙ্গিণীর বা একজন নারী আর তার যোগ্য পুরুষের সঙ্গে পরিপূর্ণ দেহ-মিলন-কামনার ও আদিম মানবসমাজের ভূমি-উর্বরতা সাধনের "রিচ্যুয়াল" বা

ক্রিয়াকাণ্ডের যেন পরিচয় পাই। ব্যক্তি-হৃদয়ের কামনার তৃষ্ণাকে বুদ্ধদেব এইভাবে সমগ্র প্রকৃতি-জগতের সমগ্রতার মধ্যে প্রসারিত করে দেন। কামনার পথ ধরেই ব্যক্তির সমগ্র সত্তার উন্মীলন তখন নাটকটির সত্যবস্তু হয়ে ওঠে।

দুই বিপরীত ইচ্ছার তরঙ্গ নিয়ে ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণী মিলিত হন—

"তরঙ্গিণী : এসো প্রেমিক, এসো দেবতা— আমাকে উদ্ধার করো।

ঋষ্যশৃঙ্গ : এসো দেহিনী, এসো মোহিনী— আমাকে তৃপ্ত করো।"

এরপর ঋষ্যশৃঙ্গের অঙ্গরাজ্যে আগমন, বৃষ্টিপাত, রাজকুমারী শান্তার সঙ্গে বিবাহ ইত্যাদি ঘটনাযুক্ত সংক্ষিপ্ত (সময়কাল এক বছর) অধ্যায় পার হয়েই দুটি চরিত্রে দেখা দেয় আধুনিক মানুষের যন্ত্রণা-বোধ। যন্ত্রণা কি শুধু ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণীর— সেটা কি অংশুমান বা চন্দ্রকেতুরও নয়? তবু 'কাম' থেকে 'প্রেম' যাত্রার যে পথ বুদ্ধদেব 'পুণ্যের পথ' হিসাবে সমস্ত জগতের কাছে তুলে ধরতে চান, তাতে ঋষি ও বারাঙ্গনার জীবন-যন্ত্রণাই প্রধান হয়ে ওঠে। তরঙ্গিণীর যন্ত্রণার ছবি আছে তৃতীয় অঙ্কে—

"আমি চাই সেই দৃষ্টি, যার আলোয় আমি নিজেকে দেখতে পাবো। দেখতে পাবো আমার অন্য মুখ, যা কেউ দ্যাখেনি, অন্য কেউ দ্যাখেনি।"

আর ঋষ্যশৃঙ্গের যন্ত্রণা চতুর্থ অঙ্কে—

"গভীর— আরো গভীর, শূন্য থেকে গাঢ়তর শূন্য—

সেখানে আমি হংস, আমি বংশীধ্বনি, আমি সর্বগ ও স্থানু, নক্ষত্র থেকে নক্ষত্রে আমি ব্যাপ্ত, তরঙ্গ থেকে তরঙ্গে আমি চঞ্চল— তার আলিঙ্গনে লুপ্ত হয়ে, তার বৈভবের অন্তরালে।"

সে কোথায়? সে কে 'তার নাম পর্যন্ত জানি না'।

শান্তার সঙ্গে ঋষ্যশৃঙ্গের সম্পর্ক তখন শুধু কর্তব্য আর নিয়ম পালন। তা স্বতঃস্ফূর্ত নয়— প্রাণহীন, মেকি। তাই রাজকবির 'আশীর্বচন' প্রসঙ্গে ঋষ্যশৃঙ্গের উক্তি সংকেতধর্মী — "... যেখানে বক্তব্য কিছু নেই, সেখানে বাক্যে কী এসে যায়?" অন্যদিকে তরঙ্গিণীও তার স্বধর্মপালনে নিরুৎসুক। চন্দ্রকেতুকে সে ফিরিয়ে দেয়, ধন-সম্পদের লোভ তাকে আকৃষ্ট করে না। সে 'একশত চন্দ্রকেতুকে বিলিয়ে দিতে' পারে 'জগতে যত বামাক্ষী আছে তাদের মধ্যে।' লোলাপাঙ্গীকে সে বলতে পারে—

" ... আমি যে বড়ো উচ্ছল। উদ্বেল আমার হৃদয়। আমার কোথাও আশ্রয় নেই।"

চতুর্থ অঙ্কে পরস্পরের সামনে দুজনেরই এই হৃদয়-যন্ত্রণা ব্যক্ত হল। ঋষ্যশৃঙ্গের কাছে তরঙ্গিণী 'হৃদয়ের বাসনা', 'শোণিতের হোমানল'। আর তরঙ্গিণীর দৃষ্টিতে ঋষ্যশৃঙ্গ হারিয়ে যাচ্ছেন, — '... তুমি কেন হারিয়ে যাচ্ছো? তোমার চোখের সেই দৃষ্টি আর কি ফিরে আসবে না?' এখানে তরঙ্গিণীই যেন খানিকটা 'তপস্বী' আর তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গ অভিজ্ঞ প্রণয়ী 'তরঙ্গিণী'। নায়ক-নায়িকার অন্তর্জীবনের এই সঙ্কটই আধুনিক মানুষের দ্বন্দ্ব-বেদনা। এখানে এসে ঋষ্যশৃঙ্গ জীবনের যে দুর্লভ সমাধান দিলেন তা বুদ্ধদেবের

উদ্ভাবিত হলেও বৃহত্তর মিথ-কাহিনির আভ্যন্তরীণ সংযোগেই স্বাভাবিক ও দেশ-কালাতীত সত্য ঘটনা রূপেই ব্যক্ত হয়েছে। মিথ এই নাটকে এ-ভাবেই তার সত্য-পালনে এগিয়ে এসেছে।

আত্মসমীক্ষামূলক প্রশ্ন:

'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' নাটক পড়তে গিয়ে মিথ সম্বন্ধে জানতে হবে কেন? (ন্যূনাধিক ১০০ শব্দের মধ্যে লিখুন)

.....

.....

.....

.....

৬.৪ মূল নাট্যবিষয়

'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' নাটকে মিথের ভূমিকা জানবার পর আমরা সহজেই এর মূল নাট্য-বিষয়কে উপলব্ধি বা বিশ্লেষণ করতে পারি। আমাদের কাজকে বরং সহজতর করে দেন নাট্যকার স্বয়ং। নাটকটির প্রযোজনার জন্য পরামর্শ দিতে গিয়ে তিনি বলেই ফেলেন—

"লোকেরা যাকে 'কাম' নাম দিয়ে নিন্দে করে থাকে তারই প্রভাবে দু-জন মানুষ পুণ্যের পথে নিষ্ক্রান্ত হলো — নাটকটির মূল বিষয় হলো এই।"

আমরা দেখেছি ঋষ্যশৃঙ্গের হৃদয়ে যেমন ইন্দ্রিয়-লালসা জেগে উঠেছে তেমনি তরঙ্গিণীর হৃদয়ও বেজে উঠেছে তার অন্য মুখের সন্ধানে। এই ঘটনার ফলে ব্রহ্মচারীর হল 'পতন' আর বারাঙ্গনাকে অভিভূত করল 'রোমাণ্টিক' প্রেম। রোমাণ্টিক প্রেমের "প্রতীক পাশ্চাত্য সাহিত্যে ট্রিস্টান এবং আমাদের সাহিত্যে রাধা।" বিদগ্ধ পাঠকের নিশ্চয়ই পদাবলিকে বাদ দিয়ে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র 'রাধাবিরহ' অংশের রাধাকে মনে পড়বে। তরঙ্গিণী সেই রাধার মতো বিরহিণী আবেশ কাটাতে পারেনি তাই পূর্ব পরিচিত ঋষ্যশৃঙ্গের কামাতুর রূপ দেখে সে প্রথমে নিরাশ হল। শেষে ঋষ্যশৃঙ্গই তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন, কোথায় মানুষের সব কামনার চরম সার্থকতা। দু-জনেরই পরিণতি ঘটল এক সত্যিকার তপস্যায়।

মূল নাট্য-বিষয়ের দিকে এগিয়ে যাবার সূচনা হয়েছে চতুর্থ অঙ্কে। কামাতুর ঋষ্যশৃঙ্গ তখন তরঙ্গিণীর ব্যথিত হৃদয়ের কান্না শুনছেন— ". . . তোমার চোখের সেই দৃষ্টি আর কি ফিরে আসবে না?" এরপরই নাট্যকার নির্দেশিত ঋষ্যশৃঙ্গের ভাবান্তর আমরা দেখে নিতে পারি—

(তরঙ্গিণীর শেষ কথাগুলি শুনতে শুনতে ঋষ্যশৃঙ্গের মুখে ফুটলো প্রথমে সংশয়, তারপর বেদনা, অবশেষে শান্তি।)

এটাই পুণ্যের পথে নিষ্ক্রান্তির বা জীবন তপস্যা শুরু করার প্রথম অভিব্যক্তি। তরঙ্গিণীর 'তপস্বী' রূপ আর বেদনা মিশ্রিত উক্তি ঋষ্যশৃঙ্গর হৃদয় জাগিয়ে দিল। যে তৃষ্ণা অঙ্গদেশের যুবরাজ ও শান্তার পুত্রের জনক ঋষ্যশৃঙ্গকে অস্থির করে তুলেছিল,— যে নারী তাঁর দেহে প্রথম কামভাব জাগিয়েছিল তারই সঙ্গে পুনর্মিলনে সেই তৃষ্ণার শান্তি বলে ঋষ্যশৃঙ্গ ভেবেছিলেন— সেই তৃষ্ণাই তরঙ্গিণীর প্রভাবে রূপ বদল করে হয়ে উঠল এক আত্ম-অন্বেষা। তরঙ্গিণীর বিরহিণী মূর্তি দেখে ঋষ্যশৃঙ্গের দৃষ্টি খুলে গেল— তিনি বুঝতে পারলেন তাঁর কাঙ্ক্ষিত মুক্তির পথ আত্মনিগ্রহ নয়, কাম নয়, সন্ন্যাস— নিঃসঙ্গ, নিরালম্ব, নিরন্তর তপস্যা। তিনি তরঙ্গিণীকেও দেখালেন সেই তপস্যার পথ। দুজনেই একক ভাবে তপস্যার পথে পা বাড়ালেন।

প্রসঙ্গত বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা' কবিতাটি বুদ্ধদেবের এই নাটকটির উৎসভূমি হলেও রবীন্দ্রনাথ নারীর 'আনন্দময়ী মূরতি' স্বীকার করেছেন— দেহ সম্ভূত কাম এবং তার উত্তরণ ক্রিয়াকে জীবনের কেন্দ্রভূমি বলে মনে করেননি। কিন্তু বুদ্ধদেব ভারতবর্ষের প্রাচীন পুরাণ, মিথ, ধর্ম, দর্শন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত দেহ চেতনার ধারণাটিকে সামগ্রিক ভাবে নাটকে গ্রহণ করেছেন। ভারতবর্ষের তন্ত্রসাধনার ধারণায় যেমন 'দেহ ভান্ডে'ই 'ব্রহ্মাণ্ডের' প্রকাশ অনুভব করা হয়েছে, তেমনি তিনিও দেহ-কামনার উত্তরণের মধ্যেই নাটকটির নায়ক-নায়িকার জীবনের মুক্তি দেখিয়েছেন।

প্রথম পরিচয়ের পর ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণী এমন একটি সময়ে আবার পরস্পর মুখোমুখি হয়েছেন, যখন রাজমন্ত্রীর পুত্র অংশুমান ও চন্দ্রকেতু (তরঙ্গিণীর প্রেমিক) নিজেদের দাবি এবং প্রার্থনা নিয়ে যুবরাজ ঋষ্যশৃঙ্গের কাছে এসেছেন এবং বিভাণ্ডকও নিজের পুত্রকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আগ্রহী। কামনা থেকে উত্তরণের প্রয়াসে সেই সময়ে আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত ঋষ্যশৃঙ্গ মিথের আবহে থেকেই শান্তাকে তাঁর কৌমার্য প্রত্যর্পণ করে এবং অংশুমানের হাতে তাঁকে সঁপে দিয়ে জীবনে নতুন সাধনার পথে অগ্রসর হলেন। আর তরঙ্গিণীর সঙ্গে হল তাঁর 'শেষ কথা'— তরঙ্গিণীই তাঁর বন্ধন। সে-ই তাঁর মুক্তি— এ-কথা ঋষ্যশৃঙ্গ উপলব্ধি করেছেন; তাই তিনি তরঙ্গিণীকে বলেন,—

> "তুমি আমাকে যা উপহার দিলে আমি এখনো
> তার নাম জানি না। কিন্তু হয়তো তার মূল্য বুঝি।"

সেই বোধের জায়গা থেকে তরঙ্গিণীর প্রতি ঋষ্যশৃঙ্গের পথ নির্দেশ বা কাম থেকে মুক্তির উপায়— পুণ্যের পথে নিষ্ক্রমণের ইঙ্গিত ব্যক্ত হয়,—

> "আমার সেই দৃষ্টি, যা তোমাকে স্বপ্নেও কষ্ট দিয়েছে,
> তা আর আমার চোখে ফিরে আসবে না। কিন্তু তোমার
> সেই অন্য মুখ হারিয়ে যায়নি, তুমি তা ফিরে পেতে
> পারো। ... তা খুঁজতে হবে তোমাকেই, চিনে নিতে হবে তোমাকেই।"

ঋষ্যশৃঙ্গ জানেন যা তিনি হারিয়েছেন এবং যা তিনি ফিরে পেতে চান তার জন্য

প্রচলিত শাস্ত্রপাঠ আর যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নেই পিতা বিভাণ্ডকের সাহায্যের। একা তাঁকে 'হতে হবে রিক্ত', 'ডুবতে হবে শূন্যতায়।' সব কিন্তু শুরু করতে হবে শূন্য থেকে। সেখানে তরঙ্গিণী তাঁর শিষ্য বা অনুগামী হতে চাইলে তিনি তো তাকে অস্বীকার করবেনই— তপস্যা যে তাঁর একার— একক ব্যক্তি-মানুষের,—

" . . . আমাকে সব নতুন করে ফিরে পেতে হবে।
আমার গন্তব্য আমি জানি না, কিন্তু হয়তো তা
তোমারও গন্তব্য। যার সন্ধানে, তুমি এখানে এসেছিলে,
হয়তো তা আমারও সন্ধান, কিন্তু তোমার পথ
তোমাকেই খুঁজে নিতে হবে, তরঙ্গিণী।"

ঋষ্যশৃঙ্গ নিষ্ক্রান্ত হলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ-মন্ত্রে দীক্ষিত তরঙ্গিণীও একই ভাবে নিঃসঙ্গ, নিরাভরণ হয়ে সাধনপথে যাত্রা করল—

"আমার কী হবে তা জানি না। শুধু জানি, আমাকে যেতে হবে।"

এই নিষ্ক্রমনই কিন্তু সম্পূর্ণ নাট্যবিষয় নয়। আরও একটু উপসংহারে রয়ে গেছে। রাজপুরোহিত অনাদিকাল চক্রের প্রভাব মুক্ত এই দুই নায়ক-নায়িকার ভূমিকা বিশ্লেষণ করে বললেন,—

"কিন্তু এই চক্র থেকে নিষ্ক্রান্ত হলো দু-জনে,
অলক্ষ্যে পথে, আত্মবশ, নিঃসঙ্গ
তাদের ভূমিকা আজ বিচূর্ণিত ঘট, ঘটনার অধীন তারা নয় আর।"

'তপস্বী' যুবরাজ এবং বারাঙ্গনা তরঙ্গিণীর মনে অন্তর্দ্বন্দ্ব-মথিত প্রেম ও বিরহের জাগরণে আদিম কাম সম্ভূত অথচ কালাতীত এক জীবন তৃষ্ণার রূপ ফুটে উঠল। অস্তিত্বের সংকট সমাধানের এক আশ্চর্য ভাবসূত্র এই দুই নরনারী লাভ করলেন। তবে তাঁরা মানব-অস্তিত্বের সমস্ত প্রশ্নের ও সমস্যার সমাধান করলেন, তা নয়। তাঁদের পুণ্যের পথে নিষ্ক্রমণের পরও মানববিশ্বে নরনারীর জীবনে কামনা ও প্রেমকে কেন্দ্র করে অস্তিত্বের জিজ্ঞাসা ও সংগ্রাম চলতেই থাকবে। আমরা স্মরণ করি রাজপুরোহিতের অন্তিম মন্তব্য—

". . . লাস্য, তর্জন, ভঙ্গি— তরঙ্গের পর তরঙ্গ ঃ
নেপথ্যে আছেন সূত্রধার, শুধু তিনি কর্তা ।
কামনা, উদ্যম, সংঘাত — তরঙ্গের পর তরঙ্গ ঃ
নেপথ্যে আছেন কর্তা, কর্মের অবিরাম ঘূর্ণন ।"

রাজপুরোহিতের ইঙ্গিত এবং নাট্যকারের জীবনভাষ্য এক হয়ে মিলে গেছে বলেই প্রবহমান বিশ্বজীবন-কাহিনির মধ্যে ঋষ্যশৃঙ্গ-তরঙ্গিণীর ব্যক্তিগত রোমান্টিক প্রেম-কাহিনি নৈর্ব্যক্তিক কাল চেতনায় ব্যক্ত হতে পেরেছে। কালের অবিরাম ঘূর্ণনের মধ্যে এরা দুজন একটি তরঙ্গ — একটি বিশেষ তরঙ্গ রোমান্টিক প্রেম ও কাম ভাবনার।

৬.৪.১ কাব্যনাট্য কি না

প্রসঙ্গটি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার সূচনায় একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে নিচ্ছি। বুদ্ধদেব বসু 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'কে একটি নাটক হিসাবেই দেখেছেন। প্রযোজনার জন্য পরামর্শ দিতে গিয়ে কোথাও একে কাব্যনাট্য বলেননি। কিন্তু ১৩৭৯ বঙ্গাব্দের 'দেশ' সাহিত্য সংখ্যায় প্রকাশিত 'কবি ও কবিতা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বলেছেন,—

"সাবিত্রীকে নিয়ে একটি নাটক লেখার ইচ্ছে বহুকাল ধরে পোষণ করেছিলাম। সেই আকাঙ্খা পর্যবসিত হলো একটি দীর্ঘ কবিতায় যার আরম্ভ কীট্‌সের মৃত্যু-প্রসঙ্গ দিয়ে আর যাতে শিরোনামায় ছাড়া অন্য কোথাও সাবিত্রীর নাম উল্লিখিত হয়নি। আরো ভাল উদাহরণ হয়ত 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' — ঐ নাটকটাকেও কাব্য জাতীয় বলে ধরে নিচ্ছি।" স্বয়ং নাট্যকারের এই উক্তির পর নাটকটি 'কাব্যনাট্য' কি না — এই প্রশ্ন ও তার সমাধান আবশ্যিক হয়ে পড়ে। পাশ্চাত্য সাহিত্যে 'Poetic Drama' ও 'Verse Drama' এই দুটি শব্দই দীর্ঘকাল গুঞ্জরিত হয়ে চলেছে। খুবই স্বভাবিক যে প্রথমটি কাব্যনাট্য এবং দ্বিতীয়টি নাট্যকাব্য বা সংলাপ- কাব্য বলে মনে হতে পারে। অনেকেই এই দুটি পরিভাষার নিষ্পত্তি কাব্যনাট্য-নাট্যকাব্যের অর্থ ধরেই করতে চেয়েছেন। টি. এস. এলিয়ট স্বয়ং যখন 'Poetic Drama' নাম দিয়ে প্রবন্ধ লেখেন (দ্র: The Aims of Poetic Drama, 1949) এবং স্পষ্টতই 'Dramatic Poetry'-র অস্তিত্ব ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে যিনি পূর্বাপর সচেতন (দ্র: A Dialogue on Dramatic Poetry) তখন 'Poetic Drama'-র এলিয়ট অনুমোদিত আধুনিকতম অর্থটি আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের অন্তর্গত কাব্যনাট্য প্রসঙ্গ হতেই পারে। অবশ্য এলিয়টের আলোচনার ধরন থেকে বোঝা যায় যে তিনি 'Poetic Drama' এবং 'Verse Drama'-র কোনো ভেদ স্বীকার করেননি। বরং তাঁর কাছে কাব্যিক গদ্য-নাট্যের বিরোধিতাই প্রকাশ পেয়েছে। তবু বলা যায়, পুরাণ ভিত্তিক কোনো নাটকে যখন কাব্যরসময় সংলাপ থাকে তখন তা সাধারণ ভাবে কাব্যনাট্য।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

কাব্যনাট্য ও নাট্যকব্যর প্রভেদ সম্পর্কে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন,— "যেখানে কাব্যগুণের প্রাধান্য কাব্যবেষ্টনী সংহত— সেখানেই নাট্যকাব্য। যেখানে কাব্যগুণ নাট্যগুণকে অতিক্রম না করিয়া হয় উহার সমশক্তিসম্পন্ন সহযোগিতা অথবা আনুগত্য সম্পর্কে আবদ্ধ হইয়াছে সেখানে কাব্যনাট্য।" কাব্যনাট্যে কাব্যে মন্ময়তা, আবেগ ও কল্পনা নাটকের তন্ময়তা দ্বন্দ্ব-সংঘাত, চরিত্র ও ঘটনার চমক ইত্যাদির সঙ্গে এক সুসমঞ্জস ভারসাম্যে বিধৃত। কাব্য এখানে নাটকের বাহন কিম্বা সহচর। এমনকি পাত্র-পাত্রীদের সংলাপ আবেগমণ্ডিত ও সংবেদনশীল হলেও তা যে সর্বদা ছন্দোময় কাব্য তথা পদ্যেই লিখিত হতে হবে সে-রকম কোনো বাধ্যবাধকতাও কাব্যনাট্যের ক্ষেত্রে নেই। তবে আবেগস্পন্দিত কাব্যিক গদ্য তথা মুক্তছন্দের ব্যবহার কাব্যনাট্যে সঙ্গত। স্পন্দিত ভাষা ও নাটকীয় দ্বন্দ্ব-চমকের মেলবন্ধন কাব্যনাট্য।

কাব্যনাট্য প্রথমত নাটক, তারপর সে কাব্য। সেদিক থেকে দেখলে 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'ও প্রথমত নাটক। কারণ এতে অঙ্ক বিভাজন, চরিত্রের বিকাশ, সূচনা-নাট্যশীর্ষ অবরোহণ সমাপ্তি ইত্যাদি নানা নাট্যলক্ষণই রয়েছে। আগেই জেনেছি, স্বয়ং নাট্যকার একে নাটকই বলেছেন। এলিয়ট বলেছিলেন যে, কাব্যনাটকের রচয়িতা হবেন অভিজ্ঞ কবি এবং তাঁর নাটকের ভাষা হবে কাব্যধর্মী। অবশ্য ভাষা কাব্যধর্মী হলেও তাকে নাটক বলার প্রবণতা ভারতীয় সাহিত্যে রয়েছে। উদাহরণ রবীন্দ্রনাথও তাঁর 'বিসর্জন' নাটক। সুতরাং ভাষাই কাব্যনাট্যের সব কিছু নয়। এমনকি এলিয়টও কাব্যনাট্যের ভাষার কাব্যধর্মিতা স্বীকার করে স্বরচিত 'The Elder Statement', 'Murder in the Cathedral'- প্রভৃতি কাব্যনাট্যের আখ্যাপত্রে লিখেছেন, — "A Play by T. S. Elliot"। যাইহোক, আমরা আলোচনার সুবিধার জন্য কাব্যনাট্যের কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যকে সূত্রায়িত করে নিতে পারি—

১. কাহিনি হবে পুরাকালের এবং লেখক সেই কাহিনির 'মিথ'কে আধুনিকতা বা 'মর্ডানিটির' দিকে নিয়ে যাবেন,

২. সংলাপের ভাষায় প্রাচীনতার ছাপ থাকবে,

৩. সংলাপ হবে সঙ্কেতধর্মী, তাতে রহস্যময়তাও থাকবে,

৪. নাটকীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত অবশ্যই থাকবে।

পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখে নেব যে, 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'তে এই লক্ষণগুলো আছে কি না এবং কীভাবে আছে।

কাহিনির দিক থেকে দেখলে বুদ্ধদেব এলিয়টীয় আদর্শ মেনে পুরাকালের ঘটনাকে বর্তমান নাটকটিতে সন্নিবিষ্ট করেছেন। এর কাহিনি তিনি নিয়েছেন রামায়ণ ও মহাভারতের অন্তর্গত 'ঋষ্যশৃঙ্গ আখ্যান' থেকে। বুদ্ধদেব অবশ্য বলেছেন যে, তিনি যখন ৫৮ বছর বয়সে কালীপ্রসন্ন সিংহের 'মহাভারত' গদ্যানুবাদ পড়ছেন, তখনই ঋষ্যশৃঙ্গ উপাখ্যান সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে পারেন। এর আগে এ-বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা' কবিতা পড়ে। আর এর সঙ্গে রূপকল্পের আভাস পেয়েছিলেন এলিয়টের 'মার্ডার ইন্ দ্য ক্যাথিড্রাল' থেকে (দ্র: কবিতায় শত্রু ও মিত্র)। অবশ্য তিনি কাহিনিটিকে 'স্বকীয় রচনায় জীবন্ত' করে তোলার রসদ সংগ্রহ করেন প্রথম যৌবনের বিদেশী সাহিত্য পড়াশোনা, দেশ-বিদেশ ভ্রমণ এবং বিশ্বপুরাণে তাঁর 'বিবর্ধমান কৌতূহল' থেকে। তবে পুরাণ কাহিনির মধ্যে বুদ্ধদেব তাঁর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলন দেখিয়েছেন। তিনি নিজেই বলেছেন,— "... একটি পুরাণ-কাহিনিকে আমি নিজের মনোমতো করে নতুন ভাবে সাজিয়ে নিয়েছি ...।" ফলে পুরাণ-কাহিনিকে হুবহু অনুসরণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। আবার পুরাণের মধ্যে শুধুমাত্র আত্ম-প্রক্ষেপের পরিবর্তে তিনি জয়েস বা এলিয়টের মতোই আধুনিক জীবন কাহিনিতে পুরাণ-কল্পের সন্ধান করেন এবং নাটকে সামগ্রিক ভাবে পৌরাণিক কাহিনির ঘটনাগত সাঙ্কেতিক বিন্যাসটিকে ফুটিয়ে তুলতে চান। পুরাণ-কথাকে তিনি তার অলৌকিকতার সঙ্কেতমুক্ত ভাবেই আধুনিক

জীবনের কাহিনিতে গ্রহণ করেছেন। পুরাণের মধ্যে তিনি দেখেছেন আদিম তথা চিরকালীন মানবজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিচয়। এটা দেখাতে গিয়ে তিনি ঋষ্যশৃঙ্গ-মিথের আনুপূর্বিক আখ্যানটিকে স্তর পরম্পরায় বিন্যস্ত করেছেন।

সংলাপে প্রচুর পরিমাণে তৎসম শব্দ ব্যবহারে ভাষায় একটা প্রাচীনতার ভাব এসেছে। প্রত্যেকটি চরিত্রের সংলাপেই তৎসম শব্দের প্রচুর প্রয়োগ হয়েছে। দু-একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যাক্—

১. ২য় দূত— "... আর সংকট কালে দুর্ভিক্ষ দূরে রাখতে হলে মিতাহার ভিন্ন উপায় নেই।" (প্রথম অঙ্ক)

২. ঋষ্যশৃঙ্গ— "... সুন্দর আপনার আনন, আপনার দেহ যেন নির্ধূম হোমানল, আপনার বাহু, গ্রীবা ও কটি যেন ঋক্ ছন্দে আন্দোলিত।" (দ্বিতীয় অঙ্ক)

৩. রাজমন্ত্রী—"... "শুনেছি, তাঁর জন্মকালেই তাঁর মাতার মৃত্যু হয়। আর তাঁর পিতার আশ্রম নিতান্তই নির্জন; সেখানে অন্য অধিবাসী নেই।" (প্রথম অঙ্ক)

৪. তরঙ্গিণী — "... মুনিবর, আমি আপনার অভিবাদনের যোগ্য নই, আপনিই আমার অভিবাদ্য। ..." (দ্বিতীয় অঙ্ক)

৫. বিভাণ্ডক— "... যেমন তোমার অঙ্গ থেকে রাজবেশ, তেমনি তোমার সাধনা থেকে ক্রিয়াকর্ম স্খলিত হয়ে যাবে, লুণ্ঠিত হবে বিধিবিধান তোমার পদতলে। ..." (চতুর্থ অঙ্ক)

৬. লোলাপাঙ্গী— "প্রভু, এবার তো ওর অবস্থা আপনি স্বচক্ষে দেখলেন। শুনলেন ওর উন্মাদের মতো প্রলাপ। দেখলেন ওর জ্বালাময় চক্ষু।" (চতুর্থ অঙ্ক)

৭. অংশুমান— "আজ অঙ্গদেশে কুশল তো সর্বজনীন।" (তৃতীয় অঙ্ক)

৮. রাজপুরোহিত— "উজ্বল হলো মঞ্চ, নট নটী চঞ্চল,

বেদনা দেয় রোমাঞ্চ, হর্ষ করে বিধুর,

লাস্য, তর্জন, ভঙ্গি — তরঙ্গের পর তরঙ্গ"

এসমস্ত সংলাপ আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে বুদ্ধদেব একটা পুরাকালের কাহিনিকে নাটকের উপযোগী করে ব্যবহার করেছেন। আর পাত্র-পাত্রীরাও যেন সেই প্রাচীন-কালেরই আবহ সৃষ্টি করেছে সংলাপে, ভাষায়।

ভাষায় সংকেতধর্মিতা ও রহস্যময়তার প্রয়োগ কাব্যনাট্যের অন্যতম লক্ষণ। এ-নাটকে বিভিন্ন চরিত্রের মুখে আমরা এমন কিছু সংলাপ শুনি যার এই গুণগুলো অত্যন্ত প্রকট। যেমন প্রথম অঙ্কে রাজপুরোহিতের সংলাপ—

"... আদি উৎস জল। একই স্রোত অন্তরিক্ষে ও ভূতলে, ঔরসে ও বৃষ্টিতে, নির্ঝারিণী ও নারীগর্ভে, ..."। অঙ্গদেশে প্রচণ্ড খরা। এতে দূর হয়েছে পৃথিবীর উর্বরতা

এবং নারীও হয়েছে বন্ধ্যা। রাজা লোমপাদও হয়েছেন বীর্যহীন। অতএব প্রকৃতিতে নবসৃষ্টির কোনো লক্ষণ নেই। পৃথিবীর প্রাণরস এনে দেয় জল, তেমনি মানবের প্রাণ সৃষ্টিও ঔরসে। সেই রসধারা শুকিয়ে গেলে বিপর্যয় অনিবার্য। অঙ্গরাজ্যের দুর্যোগের কারণ বিশ্লেষণে রাজপুরোহিত এই বিষয়টিকেই ইঙ্গিতময় মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে ব্যক্ত করেন।

দ্বিতীয় অঙ্কে তরঙ্গিণীর একটি সংলাপও আমরা এই প্রসঙ্গে দেখে নিতে পারি।

—"ক্ষেত্রে বীজ, ক্ষেত্রে হল; গর্ভে বীজ, গর্ভে জল। বীজ, বৃক্ষ, ফুল, ফল, বীজ, বৃক্ষ।"

রাজপুরোহিতের বক্তব্যের সঙ্গে তরঙ্গিণীর এই বক্তব্যের মিল আমরা সহজেই আবিষ্কার করতে পারি। এখানেও প্রাণসৃষ্টি রহস্যের কথা বলা হয়েছে। উপরন্ত একটি চিরকালীন প্রাণ চক্রের কথাও বলা হয়েছে যা একটু ভিন্ন ভাবে ব্যক্ত হয়েছে রাজপুরোহিতেরই অন্তিম উক্তিতে —

"... চক্রনেমির মুহূর্ত-বিন্দুতে ঘূর্ণিত হবে তোমার।

বহু মঞ্চে, বহু ভুমিকায়, যতদিন আয়ু না হয় নিঃশেষ।" (চতুর্থ অঙ্ক)

অর্থাৎ 'বীজ, বৃক্ষ, ফুল, ফল, বীজ' — এই চক্রবৎ ঘুর্ণন আবহমান— মানুষও প্রকৃতি জগতের মতোই কালচক্রের এক একটি তরঙ্গ মাত্র।

ইঙ্গিতধর্মী ও রহস্যময় আরও অনেক সংলাপই নাটকটিতে আছে, তবে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য দ্বিতীয় অঙ্কে তরঙ্গিণী ও ঋষ্যশৃঙ্গের এই দুটি সংলাপ,—

"তরঙ্গিণী : এসো প্রেমিক, এসো দেবতা — আমাকে উদ্ধার করো।

ঋষ্যশৃঙ্গ : এসো দেহিনী, এসো মোহিনী — আমাকে তৃপ্ত করো।"

একই বিন্দুতে থেকে দুটি নরনারীর দুই ভিন্ন কামনা অবশ্যই তাৎপর্য্যবাহী। কামের প্রভাবে একজন কামিনী পরিণত হয়েছেন সাধিকায় আর সাধক পরিণত হয়েছেন কামবশ পুরুষে। এই রূপান্তর সংলাপ দুটিতে স্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে।

সংলাপ রচনার মধ্যে এই ইঙ্গিতময়তা যদি কাব্যনাট্যের কাব্যাংশটিকে সমৃদ্ধ করে তবে তার নাট্যাংশটিকে সারবান করে নাটকীয় দ্বন্দ্ব সংঘাত। আমরা ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণীর ভাবদ্বন্দ্বকে প্রত্যক্ষ করেছি। কিন্তু আরও নাটকীয় দ্বন্দ্ব এনে দিয়েছেন বিভাণ্ডক, অংশুমান এবং চন্দ্রকেতু। এঁদের নানা আচরণের মধ্য দিয়ে নাট্যঘটনা উপসংহারে এগিয়ে গেছে। নাটক শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছয় চতুর্থ অঙ্কে যখন নাটকের প্রধান পাত্র-পাত্রীদের সামনে একথা প্রকাশিত হয় যে অংশুমান ও শান্তা যেমন পরস্পরের প্রতি আসক্ত ঠিক তেমনি ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণীও— যদিও উভয়ের আসক্তির স্বরূপে পার্থক্য আছে। নাটকীয় দ্বন্দ্ব এখানে চরম। তারই মধ্যে ঋষ্যশৃঙ্গের স্বীকারোক্তি নাট্যঘটনাকে পরিণামমুখী করে তোলে।

সুতরাং নাট্যকার 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'কে নাটক বললেও, কাব্যনাট্যের এলিয়ট উল্লিখিত গুণাবলি বা চরিত্রের সঙ্গে কিছু অমিল থাকলেও আমরা একে কাব্যনাট্য বলতেই পারি।

আত্মসমীক্ষামূলক প্রশ্ন:

কাব্যনাট্য সম্বন্ধে যা জানলেন তার প্রেক্ষাপটে 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'কে কাব্যনাট্য বলতে কোন কোন দিক আলোচনা করবেন? (ন্যূনাধিক ১০০ শব্দের মধ্যে লিখুন)

.....

.....

.....

.....

৬.৪.২ একটি রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' নাটকের উপপাদ্য যা, সেখানে রাজনৈতিক প্রসঙ্গের উল্লেখ অবান্তর। প্রেক্ষাপট হিসাবেও বর্তমান নাটকে রাজনীতির কোনো স্থান নেই। দেবজ্ঞদের অনুমান, অঙ্গরাজ্যে সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনতে ঋষ্যশৃঙ্গের মতো অপাপবিদ্ধ তপস্বীর প্রয়োজন— তাঁর সঙ্গে রাজকুমারী শান্তার বিবাহ দিলে বীর্যহীন অঙ্গরাজ্য আবার ফসলে ভরে উঠবে। সেজন্যই রাষ্ট্র অর্থাৎ রাজা লোমপাদের রাজ্য পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত রাজমন্ত্রী ঋষ্যশৃঙ্গকে রাজ্যে নিয়ে আসার উপায় তৈরি করেছেন। এর মধ্যে রাজনীতির কিছু নেই। কিন্তু আমাদের বক্তব্য হল— সব লেখা বা সব প্রসঙ্গেই রাজনৈতিক উপাদান থাকে, 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'ও তার ব্যতিক্রম নয়। প্রথমত, ঋষ্যশৃঙ্গর সঙ্গে শান্তার বিবাহ যতটা না মানব-নৈতিক, তার চেয়ে বেশি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। অমিত শক্তিধর ঋষ্যশৃঙ্গকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করে অঙ্গরাজ্যে চিরদিনের জন্য যদি ধরে রাখা যায়, তবে রাজ্যে আর কখনোই দুর্দিন নেমে আসবে না। লোমপাদের রাজ্যও আর অভিভাবকহীন হবে না। নাট্যকার এই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যর কথা গোপন রাখেননি। অংশুমানের উক্তিতে তাকে স্পষ্ট করেছেন। চতুর্থ অঙ্কে তিনি অর্থাৎ অংশুমান শান্তাকে বলেছেন, — "শান্তা, তুমি আমাকে বরণ করেছিলে। আমি তোমাকে বরণ করেছিলাম। আর এই ঋষ্যশৃঙ্গ — তোমার তথাকথিত পরিণয়— আমি একে বলি রাজনীতির যুপকাষ্ঠ।" যদিও বুদ্ধদেব বিবাহ ব্যাপারটিকে আদিকালের মানবজীবন কথা সমন্বিত পাণ্ডুলিপি রূপেই দেখেছেন তবু এই বিবাহ যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে সাধন করেছে তা অস্বীকার করা যায় না। না হলে রাজমন্ত্রী নিজের পুত্র অংশুমানকে কারাগারে বন্দী করার কথা ভাবতে পারেন না। দৈববাণী অকাট্য। রাষ্ট্রের মহৎ ত্রাণকর্মে অংশুমান ও শান্তা যদি বিঘ্ন হয়ে ওঠে— ওই ভয়ে রাজমন্ত্রী সিদ্ধান্ত নেন,— "আমি আজ রাত্রেই অংশুমানকে বন্দী করবো, কয়েকটা দিন কারাগারে কাটালে তার স্বাস্থ্যের হানি হবে না। পুরস্ত্রীরা শান্তার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবেন, ঋষ্যশৃঙ্গের আগমন কালে তাকে থাকতে হবে অনাহত ও প্রস্তুত।" এই উপায়েই তিনি নিজ পুত্র ও রাজকুমারীর প্রণয়কে প্রতিহত করেন। এঁদের বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য কি সফল হয়নি? হয়েছে বলেই ঋষ্যশৃঙ্গ-শান্তার বিবাহ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র তার নিজের প্রয়োজনে স্বর্ণমুদ্রা ও অন্যান্য সামগ্রীর লোভ

দেখিয়ে লোলাপাঙ্গী ও তরঙ্গিণীকে ব্যবহার করেছে। আর কার্যসিদ্ধি হয়ে যাওয়ার পর তাঁদের ভুলে গেছে। তৃতীয়ত, ঋষ্যশৃঙ্গ শান্তাকে কৌমার্য প্রত্যর্পণ করে চলে যাবার পরও অঙ্গরাজ্য এক রাষ্ট্রসংকটের সম্মুখীন হয়েছিল। রাজমন্ত্রী রাজ্যের ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তিত হয়েছেন। কিন্তু রাজপুরোহিতের মন্তব্যের পর তিনি অংশুমান ও শান্তাকে বর-বধূরূপে আশীর্বাদ করেন এবং বলেন— "ঘোষণা করবো, অঙ্গরাজপুত্রী ধর্মানুসারে দ্বিতীয় পতি বরণ করেছেন। রাষ্ট্র করবো সারা দেশে সু-সমাচার, জনগণের পূজার অঞ্জলি অটুট থাকবে— ঋষ্যশৃঙ্গ ও অংশুমানের পার্থক্য তাঁদের বোধগম্য হবে না।" চতুর্থত, প্রথম অঙ্কে রাজদূতের সঙ্গে গাঁয়ের মেয়েদের কথোপকথনেও আছে রাজনীতির স্পর্শ। মিথ্যা স্তোকবাক্যে গ্রামবাসীদের তারা ভোলাতে চেয়েছে, বোঝাতে চেয়েছে দুর্ভিক্ষের কারণ ও এই অবস্থায় তাদের করণীয় কী। উদাহরণ হিসাবে ২য় দূতের একটি সংলাপ এখানে উল্লেখযোগ্য— "স্তোকবাক্য শুনে ওরা যদি মনে শান্তি পায় তো ক্ষতি কী? আপাতত রাজভক্তি অচল রাখা আবশ্যক।" এই সমস্ত উল্লেখই নাটকটির রাজনৈতিক প্রসঙ্গ হিচাবে আলোচিত হতে পারে।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ :

রাজনীতির বিশ্লেষণ রাজনৈতিক। ইংরেজিতে বলে 'পলিটিক' বা 'পলিটিক্স্'। শেষেরটা 'পলিটিক'-এর বহুবচন হলেও অনেকসময় একবচনের অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এই 'পলিটিক' ফরাসি 'পলিটিক'-এর সঙ্গে তুলনীয়। উক্ত শব্দগুলো লাতিন ফরাসি বা বা গ্রিক শব্দসমূহের অর্থ হল রাজ্যপাট বা রাষ্ট্রশাসন সম্বন্ধীয় বা পরিচালনা সংক্রান্ত নীতি। বাংলায় রাজনীতি শব্দের আদত অর্থ 'রাজ্যশাসনবিধি'। অবশ্য আজকাল রাজনীতি, রাজনৈতিক শব্দগুলোর অর্থ বা ধারণায় প্রসার ঘটেছে। এখন রাজ্য বা রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় যাবতীয় ধ্যানধারণা, নীতি, কাজকর্ম এবং রাষ্ট্রের অন্তর্গত সমাজবদ্ধ জীবের বা নাগরিকের বেঁচে থাকার লড়াই সম্পর্কিত ধ্যানধারণা— ইত্যাদি সবই রাজনীতি বা রাজনৈতিক শব্দের অর্থের অন্তর্গত।

৬.৫ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

বুদ্ধদেব বসুর 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' পাঠান্তে প্রথম এককের আলোচনা আমরা এখানে শেষ করছি। আমরা সৃষ্টি প্রসঙ্গ আলোচনায় দেখেছি নাটকটি নির্মাণের পটভূমিকে। শুধু প্রাচ্য সাহিত্য-দর্শনচিন্তাই নয় পাশ্চাত্য সাহিত্য-দর্শনচিন্তারও পাঠ-পরিক্রমার নির্যাস এই নাটকটিতে আছে। অবশ্যই এর পূর্ব ভূমিকা রচিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা'য় যা এ নাটকটি পড়ার আগে অবশ্যই পড়ে নিতে হয়।

পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখেছি কীভাবে পুরাণ নির্ভর 'ঋষ্যশৃঙ্গ' মিথকে লেখক আধুনিকতার দিকে নিয়ে গিয়েছেন। আদিম অলৌকিকতাধর্মী মিথকথার কাম বা বৃষ্টি ও বীর্যর সমন্বয়-কাহিনিটি এ-যুগের ও চিরকালের জীবন-জিজ্ঞাসার সঙ্গে যুক্ত

হতে পেরেছে। যার মর্মকথাটি হল, কামোদ্ভুত আদি মানুষের জীবন-জিজ্ঞাসা অনন্ত কাল ধরে জৈব-জীবনবৃত্তের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হতে হতে ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণীর জীবনধারায় এক অভিনব স্বাতন্ত্র্যে রূপ লাভ করেছে। অন্তর্দ্বন্দ্ব মথিত প্রেম ও বিরহের জাগরণে আদিম কালসম্ভূত কালাতীত জীবনতৃষ্ণার রূপ ফুটে উঠেছে। তবে তাঁদের অস্তিত্বের সংকট সমাধানই শেষ কথা নয়, মানববিশ্বে নর-নারীর জীবনে কাম ও প্রেমকে কেন্দ্র করে জিজ্ঞাসা ও সংগ্রাম চলতেই থাকবে এটাই নাটকের পরিনতি, এটাই নাট্যকারের উপলব্ধি।

নাটকটির প্লট ও ভাষানির্মাণ, প্লট, চরিত্র, সময় ইত্যাদির বিচারে কাব্যনাট্য হয়ে ওঠায় কোনো বাধা নেই। এলিয়ট ও রবীন্দ্রনাথ যদি নাট্যকারের কাছে কাব্যনাট্য রটনার আদর্শরূপে বিবেচিত হন তবে 'নাটক' হিসাবে উল্লেখ করলেও এটা স্বরূপত কাব্যনাট্য। এবং এই কাব্যনাট্যের একটি এ-যাবৎ অনালোচিত দিক এর রাজনৈতিক প্রসঙ্গ। সমালোচকেরা রাজনৈতিক দিকটিকে প্রাধান্য দেননি। কিন্তু কী গভীরভাবে অঙ্গরাজ্যের স্বার্থোদ্ধারে রাজনীতির মায়াজাল ছড়ানো হয়েছে। নাটকের উপপাদ্য আধুনিক নর-নারীর জীবনে কামনা-বাসনার পর্যালোচনা হলেও, তার একটি উপাদান রাজনীতি। রাজনীতিবর্জিত আধুনিক নরনারী ও রাষ্ট্রজীবন আমরা কল্পনা করিই বা কীভাবে। তাই নাট্যকারও 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'র নাট্যদেহ নির্মাণে রাজনৈতিক প্রসঙ্গকে একেবারে এড়াতে পারেননি। বিশেষ করে নাটকের এক একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশে অংশুমান-লোলাপাঙ্গী-তরঙ্গিণী যখন রাষ্ট্রের পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যবহৃত হন তখন লেখকের রাজনৈতিক চেতনাকে নস্যাৎ করায় উপায় থাকে না।

৬.৬ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

মিথ : মানবভাগ্য বা মানব সংস্কৃতির সঙ্গে আবহমান কাল ধরে জড়িত কোনো-না-কোনো ভাবে অলৌকিকতা নির্ভর কাহিনি বা মন্ত্রকথা।

মহাভারতের কথা : বুদ্ধদেব বসু রচিত এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালে। (প্রকাশক— এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স, কলকাতা)। এর ভূমিকায় তিনি স্পষ্ট বলেছেন, "মহাভারত কোনো সুদূরবর্তী ধূসর স্থবির উপাখ্যান নয়, আবহমান মানবজীবনের মধ্যে প্রবাহমান।" তাঁর মহাভারত আশ্রয়ী নাট্য চতুষ্টয় সেই প্রবহমান জীবনধারার আলেখ্য। নাটক চারটি যথাক্রমে কালসন্ধ্যা, অনাম্নী অঙ্গনা, প্রথম পার্থ ও সংক্রান্তি। (মিথ ও পুরাণ কাহিনির সংযোগের জন্য এই গ্রন্থের "মহাভারতের গোত্র বিচার" অংশটি পড়ে নিতে পারেন।)

প্রায়শ্চিত্ত ও ইক্কাকু সেন্নিন : বুদ্ধদেব বসু রচিত এই দুটি নাটক আসলে অনুলিখন। 'প্রায়শ্চিত্ত' কবি ও নাট্যকার W. B. Yeats -এর 'Purgatory' নাটক এবং "ইক্কাকু সেন্নিন একটি জাপানি 'নো" নাটকের অনুলিখন।

নো (NO) নাটক : খ্রিস্টিয় চতুর্দশ শতকে জাপানে নো নাটক লেখা শুরু হয়। জাপানের ধ্রুপদী (Classic) — চিরায়ত সাহিত্যের ঘটনা নিয়ে কাব্যাকারে লেখা এই নাটক

আধ্যাত্মিক ও শৈল্পিক ভাবে জেন (Zen) বৌদ্ধধর্ম দ্বারা প্রভাবিত। কানামি কিয়তসু এবং তাঁর পুত্র জিয়ামি মোতোকিও নো নাটককে একুটি মহান শিল্পকলার পর্য়ায়ে নিয়ে যান।

ফ্রম রিচ্যুয়াল টু রোমান্স : জেসি. এল. ওয়েস্টন রচিত এই বইটি নিউইয়র্ক থেকে ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত হয়। পেগান রিচ্যুয়াল বা কর্মকাণ্ড কীভাবে খ্রিস্টান গ্রেল রোমান্সে পরিণত হয়েছে, সে বিষয়ে এখানে আলোচনা করেছেন লেখিকা।

মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রাল : টি. এস. এলিয়ট রচিত অন্যতম কাব্যনাট্য ১৯৩৫ সালে এটি রচিত হয় দ্বাদশ শতকের কাহিনি অবলম্বনে। ক্যান্টারবেরি ক্যাথিড্রালের সেইন্ট টমাস আ বেকেটের শহিদ হওয়ার ঘটনা এখানে বর্ণিত হয়েছে।

হোলি গ্রেল : এটা সেই পবিত্র পান পাত্র যেটা যিশুখ্রিস্ট তাঁর শেষ আহার বা 'Last Supper' -এ গ্রহণ করেছিলেন। কিংবদন্তী অনুযায়ী একমাত্র শুদ্ধাত্মাই গ্রেলকে গ্রহণ করতে পারে।

৬.৭ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

১। 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'কে কাব্যনাট্য বলা যায় কি না তা আলোচনা করুন।

২। 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' নাটকের মিথ নির্ভরতা বিষয়ে একটি নিবন্ধ লিখুন।

৩। "একটি পুরাণ কাহিনিকে আমি নিজের মনোমতো করে নতুনভাবে সাজিয়ে নিয়েছে, তাতে সঞ্চার করেছি আধুনিক মানুষের মানসতা ও দ্বন্দ্ববেদনা" — নাট্যকাহিনি বিশ্লেষণ করে নাট্যকারের এই বক্তব্যের সার্থকতা প্রতিপন্ন করুন।

৪। 'ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণী পুরাকালের অধিবাসী হয়েও সমস্ত মনস্তত্ত্বে আমাদেরই সমকালীন' —মন্তব্যটির আলোকে চরিত্র দুটি বিশ্লেষণ করুন।

৫। "যেহেতু তারা সাধারণ এবং পরাজিত, তাই আমাদের অনুকম্পা তাদের প্রাপ্য"— এই মন্তব্যের আলোকে নাটকের গৌণ চরিত্রগুলোর গুরুত্ব আলোচনা করুন।

৬। "লোকেরা যাকে 'কাম' নাম দিয়ে নিন্দে করে থাকে তারই প্রভাবে দু-জন মানুষ পুণ্যের পথে নিষ্ক্রান্ত হলো— নাটকটির মূল বিষয় হলো এই"—মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

৭। "তপস্বী ও তরঙ্গিণী" নাটক অবলম্বনে রোমান্টিক প্রেমের স্বরূপ বর্ণনা করুন।

৬.৮ প্রসঙ্গ পুস্তক (References/Suggested Readings)

১। *বাংলা সাহিত্যে মিথের ব্যবহার* ঃ কমলেশ চট্টোপাধ্যায়

২। *বুদ্ধদেব বসু : নানা প্রসঙ্গ (সম্পা.)* ঃ নরেশ গুহ

৩। *কালের মাত্রা ও রবীন্দ্র নাটক* ঃ শঙ্খ ঘোষ

৪। *নাট্য শিল্পী বুদ্ধদেব বসু* ঃ জগন্নাথ ঘোষ

৫। *আমার ছেলেবেলা* ঃ বুদ্ধদেব বসু

৬। *আমার যৌবন* ঃ বুদ্ধদেব বসু

৭। *কাব্যনাট্য* ঃ শঙ্খ ঘোষ

৮। *মহাভারতের কথা* ঃ বুদ্ধদেব বসু

* * *

বিভাগ-৭

তপস্বী ও তরঙ্গিণী

তপস্বী ও তরঙ্গিণী : কাহিনিবৃত্ত, চরিত্র বিচার ও ভাষা নির্মাণ

বিষয় বিন্যাস

৭.০ ভূমিকা (Introduction)

৭.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

৭.২ নাটকের কাহিনিবৃত্ত

৭.৩ চরিত্র বিচার

- ৭.৩.১ ঋষশৃঙ্গ
- ৭.৩.২ তরঙ্গিণী
- ৭.৩.৩ বিভাণ্ডক
- ৭.৩.৪ লোলাপাঙ্গী
- ৭.৩.৫ শান্তা-অংশুমান-চক্রকেতু

৭.৪ নাটকের ভাষা নির্মাণ

৭.৫ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

৭.৬ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

৭.৭ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

৭.৮ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

৭.০ ভূমিকা (Introduction)

আমরা জেনেছি 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'র কাহিনি পুরাণের 'ঋষ্যশৃঙ্গ' উপাখ্যান অবলম্বনে গড়ে উঠেছে। এমনকি বুদ্ধদেব বসুর অধিকাংশ নাটকই (এবং বেশ কিছু কবিতাও যায় মধ্যে 'দ্রোপদীর শাড়ি' অন্যতম) পুরাণকে আশ্রয় করেই রচিত হয়েছে। পুরাণ সম্বন্ধে নাট্যকারের এই সচেতনতা কিন্তু তাঁর জীবন-সায়াহ্নের পাঠ-অভিজ্ঞতার ফসল নয়। সাহিত্য-জীবনের শুরুতেও ভারতীয় পুরাণ ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতনতার প্রমাণ পাওয়া যায় বুদ্ধদেবের 'পুরাণের পুনর্জন্ম' শীর্ষক একটি 'সাহিত্য সিরিজ' (ধারাবাহিক রচনা) লেখার প্রয়াসে। সেটা তাঁর ঢাকা শহরে থাকাকালীন 'প্রগতি' যুগের কথা। সেখানে তিনি আধুনিক জীবন-যাত্রার প্রেক্ষিতে রামায়ণের উর্মিলাকে নিয়ে 'উর্মিলা' নামে একটি গল্প লিখেছিলেন। যদিও বুদ্ধদেবের এই প্রয়াস তখনকার মতো এই গল্প রচনাতেই শেষ হয়ে যায়, তবু অন্তরে পুরাণ ও আধুনিক জীবনের সংমিশ্রণ ব্যাপারটির অনুশীলন চলছিল।

এরই নিদর্শন 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী', যা ১৯৬৭ এতে তাঁকে আকাদেমি পুরস্কারের সম্মান-নে দেয়।

যাইহোক, প্রথম অধ্যায়ে আমরা জেনেছিলাম যে, ঋষ্যশৃঙ্গ-কাহিনিকে নিয়ে গীতিনাট্য 'ঋষ্যশৃঙ্গ' রচনা করেছিলেন রাজকৃষ্ণ রায় এবং রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'পতিতা' কবিতা। বলা বাহুল্য চরিত্রের বিস্তার, বিশ্লেষণ ও পরিণতির দিক দিয়ে এদের কোনোটাই 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'র সমতুল্য নয়। গীতিনাট্যটিতে আছে মূল কাহিনির বিবরণ মাত্র। আর রবীন্দ্রনাথের কবিতার সমাপ্তি ঘটেছে পতিতার হৃদয়জ্বালা প্রকাশের মাধ্যমে। তবে পতিতার মানসিক ভাবান্তরের কথা রবীন্দ্রনাথই প্রথম উল্লেখ করেন, যা রাজকৃষ্ণর গীতিনাট্যে ছিল না। এমনকি বাংলা রামায়ণে কৃত্তিবাসও এই ভাবান্তরের কথা ভাবেননি। কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদিকাণ্ডে 'লোমপাদ রাজ্যে অনাবৃষ্টি এবং ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন' বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। যেখানে এক বুড়ি 'শতেক যুবতী' নিয়ে বিভাণ্ড ক মুনির আশ্রমে গিয়ে 'মধু গাড়ু' খাইয়ে ঋষ্যশৃঙ্গকে অঙ্গরাজ্যে নিয়ে আসে। কিন্তু বুদ্ধদেব তাঁর নাটকে নিজস্ব মৌলিক ভাবনার প্রয়োগ করেছেন। ঋষ্যশৃঙ্গকে অঙ্গরাজ্যের রাজধানীতে নিয়ে আসার ব্যাপারে নিযুক্ত বারবধূকে তরঙ্গিণী নামে চিহ্নিতকরণ সেই মৌলিকতার দিকে প্রথম পদক্ষেপ। এই মৌলিক ভাবনাকে উদ্দীপ্ত করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পতিতা' কবিতার দ্বারা যেখানে ঋষ্যশৃঙ্গ আর পতিতা একে অপরের দিকে চেয়ে বিস্মিত, পুলকিত ও শিহরিত হয়েছিলেন। এই ভাবন্তর যেমন ঋষ্যশৃঙ্গকে আশ্রম থেকে নিয়ে এসেছিল লোকালয়ে, তেমনি সেই ভাবান্তরই পতিতাকে করেছে প্রেমিকা। বুদ্ধদেব এই নাটকে দুটি নারীপুরুষ— তরঙ্গিণী ও ঋষ্যশৃঙ্গের কাম থেকে পুণ্যের পথে উত্তরণের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। এঁদের চারিত্রিক বিকাশও এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই অগ্রসর হয়েছে। তবে 'আধুনিক মানুষের মানসতা ও দ্বন্দ্ববেদনা' শুধু এই দুটি চরিত্রের মধ্যেই ব্যক্ত হয়েছে, তা নয়। সেটা বিস্তৃত হয়েছে শান্তা, অংশুমান, চন্দ্রকেতু, বিভাণ্ডকের মধ্যেও। অবশ্য সেটা ঋষ্যশৃঙ্গ তরঙ্গিণীর সমতুল্য নয় কখনই। প্রত্যেকেই নিজস্ব সমস্যার বৃত্তে আবর্তিত হয়েছে।

আর একটি কথা, নাটকে বর্ণিত 'কাম থেকে পুণ্যের পথে নিষ্ক্রমণের' বিষয়টিকে ঋষ্যশৃঙ্গ বলেছিলেন রিক্ততা ও শূন্যতা। বুদ্ধদেবের অনেক নাটকেই, এমনকি শেষ জীবনের কবিতাতেও রিক্ততা ও শূন্যতার বিষাদবোধ বর্তমান। বলা যায়, পাশ্চাত্য আধুনিক কবিতা বোদলেয়ারের কাছেই বুদ্ধদেব এই রিক্ততা ও শূন্যতার প্রথম পাঠ নিয়েছিলেন। উন্মেষিত চেতনা থেকেই আধুনিক মানসিকতার জন্ম। এই চেতনা এমন এক রহস্যময় বোধের জন্ম দেয় যা মানুষকে নিয়ে যায় রিক্ততা ও শূন্যতার অন্ধকারে এবং সেখান থেকে আধ্যাত্মিকতার উৎসে। 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'র তপস্বী চরিত্রের পরিবর্তনে যে বিষাদবোধ কাজ করেছিল, তাতেও রয়েছে এই বোদলেয়রীয় আধ্যাত্মিক অন্বেষা। তবে নাটকটি সৃষ্টির অন্তরালে রয়েছে ইয়েটস্-এর সেই বিখ্যাত উক্তি, যা বুদ্ধদেব তাঁর নাটকের শিরোদেশে উল্লেখ করেছেন—

'I am looking for the face I had

Before the world was made'

(A Woman Young and Old)

ব্যাপারটা যেন সেই 'হারায়ে খুঁজি'র মতো। যা হারিয়ে যায়, তাকে তার পুরনো রূপে ফিরে পাওয়া যায় না অথচ সেটারই অনুসন্ধান চলে সারাজীবন। কেউ খুঁজতে গিয়ে হয়ে যায় অজানা পথের পথিক, আর কেউ মনের দুঃখ ঘোচাতে নতুন কিছুকে আঁকড়ে ধরে। প্রসঙ্গত, ঋষ্যশৃঙ্গের দ্বারা শান্তার কৌমার্য প্রত্যর্পণের বিষয়টিও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বেশ অর্থবহ। এটা কি ঘটনার পুরাণত্ব বজায় রাখতে লেখক ব্যবহার করেছেন, না কি অন্তর্গূঢ় আরও কোনো ব্যাখ্যা রয়েছে? এটা কি আধুনিক জীবনযাত্রার সেই দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করে, যা আছে লেখকের 'রাত ভোর বৃষ্টি' (১৯৬৭) উপন্যাসে? সেখানে তো মা সন্তানের জন্ম দিয়েও কুমারী থেকে যেতে পারেন। যা-ই হোক না কেন, —এই সমস্ত উল্লেখ, ঘটনার বিকাশ, চরিত্রের পরিণতি আমাদের একটা বিশেষ শব্দবন্ধের দিকে আকর্ষণ করে— সেটা হল 'বিষাদাত্মাক রোমান্স', যাকে অনেকে বলেছেন রোমান্টিক বিষাদ। চরিত্রগুলোর অধিকাংশের মধ্যে ব্যাপারটি ছড়িয়ে আছে।

৭.১ উদ্দেশ্য

অ্যারিস্ততল তাঁর কাব্যনির্মাণকলা বা 'পোয়েটিক্স্' গ্রন্থে ট্রাজেডির যে ছয়টি প্রত্যঙ্গের উল্লেখ করেছিলেন, যেকোনো নাটকের উপাদান তথা উপকরণ আলোচনায় সেগুলো অপরিহার্য। এগুলোর মধ্যে আখ্যানবস্তু, চরিত্র ইত্যাদি উপকরণের অন্তর্ভুক্ত এবং ভাষা ও সুর বা সঙ্গীত উপাদানযুক্ত। আমরা বর্তমান বিভাগে 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' নাটকের আখ্যানবস্তু, চরিত্রচিত্রণ, নাট্যভাষা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করব। কেন-না যেকোনো নাটককে হৃদয়ঙ্গম করার প্রদান উপকরণ এর কাহিনিভাগ। সেই কাহিনি কীভাবে বিভিন্ন চরিত্রের উপস্থাপনায় ও তাদের সংলাপে নাট্যকারের উদ্দেশ্যকে সফল করে তুলল — সেটা বুঝে নেওয়া আবশ্যক।

৭.২ কাহিনি বৃত্ত

এবার আমরা নাটকের সম্পূর্ণ কাহিনিটিকে সংক্ষেপে জেনে নেব। নাটকটিতে মোট চারটি অঙ্ক রয়েছে। ৬ টি পুরুষ চরিত্র আর ৩ টি নারী চরিত্র নিয়ে মুখ্য কাহিনিভাগ গড়ে উঠেছে। এছাড়া আছে দু-জন রাজদূত, কয়েকজন গাঁয়ের মেয়ে ও বারাঙ্গনা তরঙ্গিণীর কয়েকজন সখী। চরিত্রগুলোর সঙ্গে আমরা এভাবে পরিচিত হতে পারি —

প্রধান পুরুষ চরিত্র বা নায়ক	:	ঋষ্যশৃঙ্গ
এঁর পিতা	:	বিভাণ্ডক
তরুণী বারাঙ্গনা	:	তরঙ্গিণী
এঁর মা	:	লোলাপাঙ্গী
অঙ্গরাজ লোমপাদের কন্যা	:	শান্তা
(অঙ্গরাজ্যের) রাজমন্ত্রী		
রাজমন্ত্রীর পুত্র	:	অংশুমান
(অঙ্গরাজ্যের) রাজপুরোহিত		

নাটকটির সময়কাল একবছর, অর্থাৎ এক বছরের ঘটনাক্রম নাটকটিতে আছে। প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কের মধ্যে একদিন, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কের মধ্যে এক বৎসরের ব্যবধান। তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্কের ঘটনাকাল একই দিন। ঘটনাটা এইরকম —

গাঁয়ের মেয়েদের কথায় অঙ্গরাজ্যের অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষের চিত্রটি স্পষ্ট। অঙ্গরাজ্যের এই দুর্দিনে দৈবজ্ঞেরা বললেন, আজন্ম বনবাসী তরুণ তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গকে অঙ্গরাজ্যে নিয়ে এলেই দুর্যোগের অবসান হবে। ঋষ্যশৃঙ্গ কখনও কোনো নারীকে চোখে দেখেননি, তরুণ হলেও তিনি তপোবনে অগ্রগণ্য; তাই এই অসাধ্যসাধন শুধু তাঁর পক্ষে সম্ভব, কিন্তু সেজন্য তাঁর কৌমার্যনাশ প্রয়োজন। রাজমন্ত্রীর আজ্ঞায় বৃদ্ধা বারবণিতা লোলাপাঙ্গী ঋষ্যশৃঙ্গকে রাজ্যে নিয়ে আসার ভার নিল। অর্থলোভ তাকে এই দুরূহ কাজে সম্মত হতে বাধ্য করল। সে তার কন্যা তরঙ্গিণীকে ঋষি-অপহরণের জন্য প্রস্তুত করল। এটাই প্রথম অঙ্কের কাহিনি। এই অঙ্কেই আমরা জানতে পারি যে, রাজকুমারী শান্তা অংশুমানের প্রতি আকৃষ্ট ও দুজনে বিবাহে আগ্রহী। রাজমন্ত্রী এতে শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন, কারণ শান্তার সঙ্গে ঋষ্যশৃঙ্গের বিবাহ নির্দিষ্ট করেছেন দৈবজ্ঞেরা। তাই অংশুমানকে কারাগারে বন্দী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রাজমন্ত্রী। দ্বিতীয় অঙ্কে লোলাপাঙ্গীর রূপসী ও সর্ববিদ্যাপারদর্শী যুবতী কন্যা নিপুণ ভাবে তপস্বীকে ব্রহ্মচর্য থেকে ভ্রষ্ট করেছে। এখানেই বিভাণ্ডক পুত্রকে নিয়ে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। পিতা পুত্রকে তার জন্মকথা শোনান। নারী সম্বন্ধে অজ্ঞ ঋষ্যশৃঙ্গের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হয়। তিনি তরঙ্গিণী সঙ্গে অঙ্গরাজ্যে যান। সেখানে বৃষ্টি নামে। তৃতীয় অঙ্কের প্রথমেই পুনরায় সমৃদ্ধিশালী অঙ্গরাজ্যের ছবি। তরঙ্গিণীর এখানে ভাবান্তর ঘটেছে। সে তার স্বধর্মে স্থিত হতে পারল না। সে শুধু দর্পণে খুঁজতে লাগল তার সেই মুখশ্রী— যার কথা প্রথম দর্শনে নারী সম্পর্কে অনভিজ্ঞ মুগ্ধ ঋষ্যশৃঙ্গ বলেছিলেন। চন্দ্রকেতুর প্রণয় সে ফিরিয়ে দেয়। লোলাপাঙ্গী ও চন্দ্রকেতু ভাবে যে তরঙ্গিণী বোধহয় ঋষ্যশৃঙ্গের শাপগ্রস্ত হয়েছে। তাই তারা ঋষ্যশৃঙ্গের কাছে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। অন্যদিকে অংশুমান ঋষ্যশৃঙ্গের প্রতি তার বিরাগ লুকিয়ে রাখে না। তার দৃষ্টিতে ঋষ্যশৃঙ্গই তার উদ্‌ভ্রান্তির কারণ। সেও প্রতিকারের জন্য ঋষ্যশৃঙ্গের কাছেই যায়। চতুর্থ অঙ্কে ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণী আবার মুখোমুখি এমন একটা সময়ে যখন শান্তার প্রেমিক রাজমন্ত্রীর পুত্র অংশুমান এবং তরঙ্গিণীর প্রেমিক

চন্দ্রকেতু উভয়েই নিজের নিজের দাবি ও প্রার্থনা নিয়ে ঋষ্যশৃঙ্গের কাছে এসেছেন আর ঋষ্যশৃঙ্গের পিতা বিভাণ্ডকও পুত্রকে আশ্রমে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আগ্রহী। বুদ্ধদেব ঋষ্যশৃঙ্গের মিথ-কাহিনির সঙ্গে তাঁর পরিকল্পিত আধুনিক মানুষের দ্বন্দ্ব-বেদনা সমৃদ্ধ জীবন-কাহিনির পরিণতিকে এভাবে যুক্ত করলেন যে, ঋষ্যশৃঙ্গ শান্তাকে তাঁর কৌমার্য প্রত্যর্পণ করে অংশুমানের হাতে তাঁকে অর্পণ করলেন আর নিজে জীবনের পথে (পুণ্যের পথে) একক ভাবে নিষ্ক্রান্ত হলেন। ঋষ্যশৃঙ্গের আজ্ঞায় তরঙ্গিণীর নিষ্ক্রমণও অনুরূপ। অন্যদিকে অংশুমান লাভ করলেন শান্তাকে। চন্দ্রকেতুরও বিরহ যন্ত্রণার উপশম ঘটল, লোলাপাঙ্গীর আলিঙ্গনে। এখানেই নাট্যঘটনার ইতি। এই ঘটনাধারাকে অবলম্বন করেই বুদ্ধদেব পুরাণের পুনর্জন্ম ঘটিয়েছেন।

৭.৩ চরিত্র বিচার

বুদ্ধদেব বসুর অন্যান্য অনেক নাটকের মতো 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' নাটকের উপজীব্য অস্তিত্ব বিষয়ক কয়েকটি উদ্ভাস, জীবনের কোনো কোনো রহস্য। প্রেম কী, বেঁচে থাকার আদৌ কোনো অর্থ আছে কি না, সত্যের স্বরূপ কী — যেন কোনো ধর্মবকের মতো এই প্রশ্ন পরম্পরার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন বুদ্ধদেব এবং করেছেন যুধিষ্ঠিরের মতোই, আবেগের তাড়নায় নয়, প্রজ্ঞার প্রেরণায়। চিরকালীন প্রশ্নগুলোর আধুনিক উত্তর খোঁজার তাগিদে তিনি যে সমাধানের পথ নির্মাণ করেছেন,— এ-নাটকের চরিত্রগুলোও সেই পথের অভিমুখী। আধুনিক মানুষের মানসতা ও দ্বন্দ্ববেদনা প্রকাশ করার জন্য বুদ্ধদেবকে তাঁর চরিত্রগুলোর জন্য আধুনিক প্রচ্ছদের অনুসন্ধান করতে হয়নি — চরিত্রকে প্রাচীন প্রচ্ছদে রেখেই মিথের রসানুকূল প্রেরণায় সেকালের ব্যক্তিকে তিনি স্বকালের করে তুলতে পেরেছেন।

৭.৩.১ ঋষ্যশৃঙ্গ

ঋষ্যশৃঙ্গ ব্রহ্মচারী। তিনি তপস্বী বিভাণ্ডকের পুত্র, আজন্ম মাতৃকোল বিচ্যুত। কারণ বিভাণ্ডক যে কিরাত রমণীকে চিত্তবিকারের জন্য গ্রহণ করেছিলেন, ঋষ্যশৃঙ্গের জন্মের পরই তাঁর প্রতি আগ্রহ হারান ও সেই রমণীকে পরিত্যাগ করে বনান্তরে চলে যান। অতএব নারী কী তা ঋষ্যশৃঙ্গ জানেন না। আর কামকলাতেও তিনি একেবারে অনভিজ্ঞ। অঙ্গদেশে যখন অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, দৈবজ্ঞেরা বললেন, আজন্ম বনবাসী তরুণ তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গকে রাজধানীতে নিয়ে আসতে পারলেই দুর্যোগের অবসান হবে। ঋষ্যশৃঙ্গ তরুণ হলেও তপোবনে অগ্রগণ্য— তাই এই অসাধ্য সাধন শুধু তাঁর পক্ষেই সম্ভব, তবে এর জন্য তাঁর কৌমার্যনাশ প্রয়োজন। কামকলা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা ও নারীরূপের বিষয়ে কিছুই না জানা ঋষ্যশৃঙ্গকে ভ্রষ্ট করা খুবই সহজ হয়ে গেল রূপসী বারাঙ্গনা তরঙ্গিণীর। তারপর তাঁকে নগরে নিয়ে আসা কঠিন হল না। তিনি নগরে ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গেই বৃষ্টি হল, দুর্ভিক্ষ দূর হল। রাজা লোমপাদ তাঁর কন্যা শান্তার সঙ্গে ঋষ্যশৃঙ্গের বিয়ে দিলেন।

কিন্তু ঋষ্যশৃঙ্গ স্ত্রী শান্তার সঙ্গে বিবাহোত্তর পর্বে তৃপ্তি পেলেন না। তাঁর দেহে জেগেছে কাম, ফলে হল 'পতন'। বিভাণ্ডকের নিষেধাত্মক স্মৃতিচারণ সত্ত্বেও তিনি সেই পথেই পা বাড়ালেন। তিনি স্বপ্নে, জাগরণে সন্ধান করতে লাগলেন তরঙ্গিণীর সেই নারীরূপ, যে রূপের বিভা তাঁকে নারী সম্পর্কেই কেবল চেতনা দান করেনি, তাঁর নিজস্ব পৌরুষ সম্পর্কেও তাঁকে প্রথম অবহিত করে তুলেছিল। তাঁর অতৃপ্তির প্রকাশ ঘটল এবং সত্যকে তিনি সবার সামনে তুলে ধরলেন তখনই যখন শান্তার প্রেমিক ও রাজমন্ত্রীর পুত্র অংশুমান আর তরঙ্গিণীর প্রেমিক চন্দ্রকেতু উভয়েই নিজের দাবি এবং প্রার্থনা নিয়ে ঋষ্যশৃঙ্গের কাছে এসেছেন এবং বিভাণ্ডকও পুত্রকে তপোবনে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আগ্রহী। তিনি অনায়াসে বললেন, "শোনো আমি সকলের সামনে বলছি— এই যুবতী আমার ঈপ্সিতা। ... আমি জানতাম না কাকে বলে নারী। আমি যে পুরুষ তাও জানতাম না। সে আমাকে জানিয়েছিল।" শান্তাকে পত্নীরূপে পেয়েও তাঁর মনে রয়েছে অতৃপ্তি। এই অতৃপ্তি বুকে নিয়ে মিথ্যা ছলনা আর তাঁর ভালো লাগে না। কেন-না অন্ধকারেও লুপ্ত হয় না স্মৃতি। রাজঐশ্বর্য ফেলে স্ত্রী ও পুত্র অংশুমানকে দান করে (শান্তার কৌমার্য ফিরিয়ে দিয়ে) শেষ বিদায়ের আগে তরঙ্গিণীকে তিনি বলেছেন,— "আমার সেই দৃষ্টি যা তোমাকে স্বপ্নেও কষ্ট দিয়েছে তা আর আমার চোখে ফিরে আসবে না। কিন্তু তোমার সেই অন্যমুখ হারিয়ে যায়নি। তুমি তা ফিরে পেতে পারো ... কোথায়, আমি তা জানি না, কিন্তু একথা জানি যে কোথাও কোন অন্তরালে সেই মুখ চিরকাল ধরে আছে, চিরকাল ধরে থাকবে তা খুঁজতে হবে তোমাকেই। চিনে নিতে হবে তোমাকেই।" তরঙ্গিণী তাঁর পথের সঙ্গী হতে চাইলেও ঋষ্যশৃঙ্গ তাঁকে নিতে চাননি। বলেছেন— "আমাকে হতে হবে রিক্ত ডুবতে হবে শূন্যতায়।' এরপর ঋষ্যশৃঙ্গ জীবনের দুর্লভ 'সমাধানে' পুণ্যের পথে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

৭.৩.২ তরঙ্গিণী

যারা সমাজের চোখে সাধারণ নারী, প্রিয়কেই চূড়ান্ত বলে জানে, তারাও যে জীবন-রহস্যের দ্যোতনায় অংশ নিতে পারে, বুদ্ধদেব এই নাটকে সেটাই দেখালেন তরঙ্গিণীর চরিত্রে। অনেকেই বলেন, রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা' কবিতাটি 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' নাটকের উৎস, এমনকী তরঙ্গিণীরও উৎস স্থল এই কবিতার বারাঙ্গনা চরিত্রটি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ওই কবিতায় নারীর 'আনন্দময়ী মূরতি' স্বীকার করলেও দেহসম্ভূত কাম এবং তার উত্তরণ ক্রিয়াকে জীবনের কেন্দ্রভূমি বলে মনে করেননি। কিন্তু বুদ্ধদেবের তরঙ্গিণী তাঁরই দেহনির্ভর জীবন চেতনার প্রকাশ। তিনি প্রাচীন হিন্দু ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে দেখেছিলেন যে দেহভাণ্ডের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের আবিষ্কার একটি সর্বজাগতিক এবং সর্বমানবিক উপলব্ধি। ঋষ্যশৃঙ্গ মিথের মধ্যে তিনি পেলেন সেই উপলব্ধিরই এক পরম নির্যাস। মহাভারতীয় প্রাচীন দেহ-চেতনা ঐতিহ্যকে তাই তিনি সামনে রেখে দেহোত্তীর্ণ অনুভবে পৌঁছতে পেরেছেন।

তরঙ্গিণী বারাঙ্গনা। কাম তার জীবিকা; তার চর্চালব্ধ চরিত্র। রাষ্ট্রের প্রয়োজনে

কামের ছলাকলাকে কাজে লাগিয়ে সে অপাপবিদ্ধ ঋষ্যশৃঙ্গকে জয় করেছিল। কিন্তু তারপরই ঘটল তার জীবনে ভাবান্তর। সে কাম থেকে যাত্রা করল প্রেমের পথে। ... "আমি রিক্ত, আমি সর্বস্বান্ত। ... (দর্পণে গভীর ভাবে তাকিয়ে) এই কি সেই মুখ, যা তুমি দেখেছিলে?" প্রসঙ্গত বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা'র কথা উল্লেখ করেছেন। সেখানেও কামের প্রভাবে তপস্বীকে জয় করতে এসে বারাঙ্গনার তা- ই ঘটেছিল। কিন্তু বুদ্ধদেব ঘটনাকে দ্বিগুণ অর্থবহ করে তুললেন ঋষ্যশৃঙ্গের বিপরীত পরিবর্তন দেখিয়ে। যাইহোক, দুই নায়ক-নায়িকার বিপরীতমুখী যাত্রায় নাটকে এল এক দুর্লভ ঘনতা। ঋষ্যশৃঙ্গ অভিজ্ঞ প্রণয়ী তো তরঙ্গিণী উদ্‌ভ্রান্ত রোমান্টিক প্রেমিকা। তরঙ্গিণীর চোখে এক বছর আগের স্মৃতি উজ্জ্বল, যা তাকে রবীন্দ্রনাথের চণ্ডালিকার মতো উদ্‌ভ্রান্ত করে রেখেছে। — "আজ আমি পাদ্য অর্ঘ্য আনিনি, আনিনি কোনো ছলনা, কোনো অভিসন্ধি— আজ আমি শুধু নিজেকে নিয়ে এসেছি, শুধু আমি — সম্পূর্ণ একান্ত আমি। প্রিয় আমার, আমাকে তুমি নন্দিত করো।"

মর্যাদা এবং বৃত্তির দিক দিয়ে তরঙ্গিণীর স্থান শেষ পর্যন্ত হয়ত কোনো নামহীন পতিতা চরিত্রের মতোই— সমাজ, রাষ্ট্র, রাজা, মন্ত্রী — সবাই তাকে প্রয়োজনে ব্যবহার করে এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলে ভুলে যায়। সেখানে ব্যক্তিরূপে তরঙ্গিণী অনুপস্থিত। সে ব্যক্তি হয়ে উঠেছে ঋষ্যশৃঙ্গর কাছে। আর চন্দ্রকেতুর কাছে সে ব্যবহারের বস্তু মাত্র। তাই তরঙ্গিণীকে না পেয়ে চন্দ্রকেতু বিস্মিত হয়।

যাইহোক, বুদ্ধদেব বসুর প্রথম উপন্যাস 'সাড়া'তেও গণিকা চরিত্র আছে। সে নির্মলা। কিন্তু নির্মলা শরৎচন্দ্রের সৃষ্টি রাজলক্ষ্মীর উত্তরসাধিকা — একনিষ্ঠ প্রেমের প্রতিমূর্তি। তরঙ্গিণীর ভাবান্তরের পর তাকেও আমাদের এই ধরনের মূর্তিমতী বলে মনে হতে পারে। তবে একটু লক্ষ করলে দেখা যাবে নির্মলা, রাজলক্ষ্মী ও তরঙ্গিণীর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হল, প্রথম দুজন পরিবেশ বিচ্ছিন্ন, জীবিকার প্রভাবশূন্য আর অন্যজন তার স্বধর্ম গণিকা বৃত্তিতে পটু। তবু মোহ থেকে মুক্তিতে পৌঁছনোই তো এই নাটকের লক্ষ্য। তাই তরঙ্গিণীর সঙ্গে দ্বিতীয় সাক্ষাতে (চতুর্থ অঙ্ক) এবং তারই প্রভাবে ঋষ্যশৃঙ্গর মনে জাগল আত্ম-অন্বেষার বোধ। তিনি বুঝতে পারলেন তাঁর কাঙ্ক্ষিত মুক্তির পথ আত্মনিগ্রহ নয়, কাম নয়, সন্ন্যাস। আশ্রম-জীবন নয়, নিঃসঙ্গ-নিরলম্ব-নিরন্তর তপস্যা। তরঙ্গিণীকেও সেই তপস্যার পথ দেখালেন তিনি তবে সঙ্গে নিলেন না— "... তোমার পথ তোমাকেই খুঁজে নিতে হবে, তরঙ্গিণী।" ঋষ্যশৃঙ্গের গৃহত্যাগে তরঙ্গিণী তার পথ খুঁজে পেল। সেও গৃহত্যাগ করল, —সেই আর এক 'আমি'র অপেক্ষায়— একা। তপস্বিনী—" আমার কী হবে তা জানি। শুধু জানি, আমাকে যেতে হবে।"

৭.৩.৩ বিভাণ্ডক

ঋষ্যশৃঙ্গের পিতা বিভাণ্ডকের চরিত্র এবং তাঁর জীবন-কাহিনির সংযোগে বুদ্ধদেব নাটকের দ্বন্দ্ব সম্পর্কে পাঠককে প্রথম সচেতন করে তোলেন। জীবনের একটি মৌল শক্তিকে 'কাম' নাম দিয়ে সাধারণত নিন্দা করা হয়। সেজন্যই মানবজীবনে সৃষ্টি হয়

দ্বন্দ্ব, অসঙ্গতি ও স্ববিরোধের। নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে ঋষ্যশৃঙ্গকে মোহিত করে তরঙ্গিণীর চলে যাবার পরই বিভাণ্ডকের প্রবেশ এবং তাঁর বিতৃষ্ণাময় উক্তির মাধ্যমে মানবজীবনের সেই স্ববিরোধী রূপ এবং নাটকের বিরোধী শক্তির প্রকাশ দেখানো হয়েছে। কামের বিরুদ্ধে বিভাণ্ডকের অভিযানের চিত্রের মধ্যে তাঁরই অতীত-জীবনের কাম-কাহিনির উপস্থাপন করে মানবজীবনের এই আদি শক্তির লীলাকে বুদ্ধদেব প্রকাশ করেছেন। বিভাণ্ডক যে তপস্যার কালে মোহিনী মূর্তিকে দেখে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন, তার বর্ণনায় তিনি নিজেই বলেন, "হয়তো বা উর্বশী নয়, মেঘ ও রৌদ্রালোকে রচিত কোনো দৃষ্টিভ্রান্তি। হয়তো আমারই গুপ্ত কামনার প্রতিচ্ছায়া।" তাঁর সেই চিত্তবিকার দুঃসহ হয়ে ওঠায় তিনি ধ্যানাসন থেকে উঠে এক কিরাত যুবতীকে গ্রহণ করেছিলেন। সেই মিলনেরই ফল 'অপাপবিদ্ধ' ঋষ্যশৃঙ্গ। আবার এই বিভাণ্ডকই বলছেন যে, ঋষ্যশৃঙ্গের জন্মের পরই সেই কিরাত রমণীকে ত্যাগ করে তিনি তাকে নিয়ে চলে এসেছেন নদীতীরবর্তী নির্জন আশ্রমে এবং কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করে স্খলন দোষ থেকে মুক্ত হয়েছেন। তাই পরবর্তীতে পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকেও তিনি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান তথাকথিত শান্তির আশ্রমে।

এইভাবে বুদ্ধদেব রুদ্ধরতি-পীড়িত আধুনিক মানব-জীবনের মূলীভূত সমস্যার রূপ ও তার সমাধানের কথা বলতে চেয়েছেন। তিনি দেখাতে চেয়েছেন আদি শক্তিকে অস্বীকার করা তপস্বীরও সাধ্য নয়। কিন্তু তাকে স্বীকার করেই জীবনে মোহমুক্তির পথে এগিয়ে যেতে হয়। ব্যক্তি বিশেষে সেই জীবন সাধনার স্বরূপ ভিন্ন। বিভাণ্ডকের কাছে তা নারী-সান্নিধ্য বিবিক্ত আশ্রম পরিবেশে মুক্তির তপস্যা ছাড়া অন্য কিছু নয়।

৭.৩.৪ লোলাপাঙ্গী

লোলাপাঙ্গী 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' নাটকটির প্রস্তুতিপর্বের অন্যতম অংশীদার। বুদ্ধদেব জানিয়েছেন, রাজমন্ত্রীদের আজ্ঞায় এক বৃদ্ধা গণিকা ঋষ্যশৃঙ্গকে নগরে নিয়ে আসার ভার নিয়েছিল। এই গণিকাই লোলাপাঙ্গী। কাঞ্চনমূল্যের প্রতি লোভ তার সীমাহীন। লোভের বশবর্তী হয়েই সে স্বৈরিণী কন্যা তরঙ্গিণীকে কঠিন অভিযানে পাঠিয়েছিল। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, মহাভারতের বনপর্বে ঋষ্যশৃঙ্গকে ছলনা করে নগরে নিয়ে আসার জন্য একজন বিশেষ চতুরা ও প্রবীণা বারাঙ্গনা প্রচুর উপভোগ্য বস্তু এবং রূপযৌবন সম্পন্ন কামিনীদের নিয়ে ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রমে গিয়েছিলেন। আবার 'নলিনিকা জাতকে' রাজপুত্রী নলিনিকা গিয়েছেলেন ঋষ্যশৃঙ্গকে ভুলিয়ে রাজ্যে নিয়ে আসতে। আর জে. সি. এল. ওয়েস্টন তাঁর 'From Ritual to Romance'-গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে লিখেছেন, যে বৃদ্ধা কার্যসিদ্ধি ঘটালেন, তিনি কয়েকজন বারাঙ্গনার সাহায্যে নয়, তাঁরই সুন্দরী ও স্বৈরিণী কন্যার সাহায্য নিয়েছিলেন।

যাইহোক, 'দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা'— আর যান, শয্যা, আসন, বসন, স্বর্ণলঙ্কার আর সিংহলের মুক্তা, বিন্ধ্যাচলের মরকতমণি পেয়ে লোলাপাঙ্গী তরঙ্গিণীকে ঋষ্যশৃঙ্গের কৌমার্য হরণে উৎসাহ দেয়। কিন্তু যাকে সে ঐ দুঃসাহসিক কাজে পাঠায় তাকে আর ফিরে পায় না। তরঙ্গিণীর ভাবান্তরের কথা — কাম থেকে প্রেমে রূপান্তরের কথা সে কিছুই বুঝতে

পারে না। তরঙ্গিণীকে যারা মনে-প্রাণে চাইত, সেই ঋভু দেবল অধিকর্ণদের দল লোলাপাঙ্গীকে একদণ্ড শান্তি দেয় না আর তরঙ্গিণী ভরা যৌবনে ক্লান্ত? — এটা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। তরঙ্গিণীকে সে বোঝাতে চেষ্টা করে, — "ব্রাহ্মণের যেমন বেদপাঠ, তেমনি আমাদের ধর্ম পরিচর্যা। আমরা বারাঙ্গনা — বর্বর বনচর নই।... যেমন শরণাগতকে ত্যাগ করলে ক্ষত্রিয়ের ধর্মনাশ হয়, তেমনি প্রার্থীকে ফিরিয়ে দিলে আমাদের।" নানাভাবে সে তরঙ্গিণীকে উজ্জীবিত করতে চেষ্টা করে। অপত্য স্নেহ দেখিয়ে, অন্যান্য বারাঙ্গনাদের সঙ্গে তুলনা করে, ঋষ্যশৃঙ্গকে জয় করার গর্বের কথা উল্লেখ করে। কিন্তু কিছুতেই তরঙ্গিণী তার স্বধর্মে ফিরতে চায় না। চন্দ্রকেতুকে সে ত্যাগ করে। মেয়ের এই আচরণকে লোলাপাঙ্গী মনে করে ব্যাধি, হয়তো বা রতিমঞ্জরীরা তান্ত্রিক দিয়ে জাদু করেছে তরঙ্গিণীকে। পরে চন্দ্রকেতুর কথাই তার বিশ্বাস হয়— মুনিই বোধহয় তরঙ্গিণীকে শাপ দিয়েছেন। শাপমোচনের জন্য সে রাজপ্রসাদে যুবরাজ ঋষ্যশৃঙ্গের কাছে যায়। কিন্তু ঋষ্যশৃঙ্গ যখন তাকে বলেন যে সে অচিরেই কন্যাকে ভুলে যাবে, তখন সে ভয় পায়। বলে "আমি সন্তানকে হারাতে চাই না, আমাকে আপনি দয়া করুন।" তরঙ্গিণী গৃহত্যাগ করতে চাইলে সে সন্তান স্নেহে কাতর হয় "তোর মা-র মুখের দিকে একবার তাকাবি না? তরু আমি কী নিয়ে বাঁচবো?" তরঙ্গিণী চলে গেলে তার মনে হয় 'বুকের পাঁজর খসে গেল।' কন্যা-বিচ্ছেদের জ্বালায় সে অধীর হয়। এ-পর্যন্ত এসে আমরা চরিত্রটির বৃত্ত সম্পূর্ণ করি বলে মনে হয়— একদিকে সে কঠোর বৃত্তিজীবী— বারাঙ্গনা বৃত্তিই তার স্বধর্ম, অন্যদিকে সে মা— সন্তান হারানোর যন্ত্রণা তার চোখেমুখে। কিন্তু স্বধর্মকে সে ত্যাগ করতে পারে না— কন্যা স্মৃতিচিহ্ন বিজড়িত দ্যূতালয়ে আবার সে চন্দ্রকেতুর পরিচর্যা করতে চায়। বুদ্ধদেব লোলাপাঙ্গীর দুটি রূপ দেখিয়েই ক্ষান্ত হননি, তাকে একটা সম্পূর্ণতা দিয়েছেন। লোলাপাঙ্গী সযত্নে স্বধর্মকে পালন করেছে, আবার তরঙ্গিণীকেও সে ভুলতে পারে না, — চন্দ্রকেতুকে সে মনের দুঃখ নিয়েই বলে, — "শূন্য ঘর, তরঙ্গিণী নেই। আমরা সমদুঃখী, চলো। আমি তোমাকে সান্ত্বনা দেবো। তুমি আমাকে সান্ত্বনা দেবো।"

তরঙ্গিণীর প্রতি মমত্ববোধ, তার অনুপস্থিতিতে বেদনাবোধ করা কি লোলাপাঙ্গীর ছালনা মাত্র? বা তার দুঃখ কি এজন্য যে তরঙ্গিণীর মাধ্যমে যে উপার্জন তার হচ্ছিল তা তরঙ্গিণী চলে যাওয়ায় বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে? প্রশ্নগুলো উঠেছে এ-জন্য যে বুদ্ধদেব তাকে যে পরিণতি দিয়েছেন সেখানে তরঙ্গিণীকে হারানোর বেদনার চেয়ে স্বধর্ম প্রীতিই প্রধান। বুদ্ধদেব যেন পাঠককে বলে দেন মা হলেও লোলাপাঙ্গী শেষ পর্যন্ত গণিকা বৃত্তিজীবীই। নাটকের শেষ উক্তি লোলাপাঙ্গীরই — "আমি এখনো বৃদ্ধা হইনি, চলো।" এবং এরপর নাট্যনির্দেশনা — "লোলাপাঙ্গী ও চন্দ্রকেতুর দৃষ্টি বিনিময়। ঘনিষ্ঠ ভঙ্গিতে বাইরের দিকে দ্রুত প্রস্থান।" এই শেষের অংশটি লোলাপাঙ্গী সম্পর্কে আমাদের ক্রমশ গড়তে থাকা ধারণাকে আঘাত করে। তার মাতৃত্ববোধকে অনেকটাই গুরুত্বহীন করে দেয়। তাই আমাদের মনে হয়, বুদ্ধদেব নাটকের একেবারে শেষে এসে লোলাপাঙ্গীর প্রতি একটু নির্দয় হয়েছেন যদিও অনুকম্পা এঁর প্রাপ্য বলে নাট্যকার মত পোষণ করেছেন।

অবশ্য অনেক সমালোচক বলেছেন যে ঋষ্যশৃঙ্গ-তরঙ্গিণীর অন্বেষণই নাটকের

শেষ কথা নয়। "সংসার চক্র থেকে নিষ্ক্রান্ত হলো দুজনে অলক্ষ্য পথে"— কিন্তু সংসার চক্র তো চলতে থাকল। সেখানে চন্দ্রকেতু, রাজপুরোহিতের ভাষায় এরা সবাই সংসার মঞ্চে অবতীর্ণ অভিনয়ের জন্য —

"তোমরা অবতীর্ণ মঞ্চে — প্রার্থী, মাতা, অমাত্য;
কেউ কামার্ত, কেউ সহৃদয়, কেউ রাষ্ট্রপাল;
চক্রনেমির মুহূর্ত-বিন্দুতে ঘূর্ণিত হবে তোমরা
বহু মঞ্চে, বহু ভূমিকায়, যতদিন আয়ু না হয় নিঃশেষ।"

লোলাপাঙ্গীর পরিণতিতে হয়তো বুদ্ধদেব এ-কথাই বোঝাতে চেয়েছেন। সুতরাং আধুনিক মানুষের ব্যক্তিস্বার্থই এখানে প্রধান হয়ে উঠেছে। সেখানে মাতা ও কন্যার অপত্য সম্পর্ক গুরুত্বহীন। আর সেজন্যই আমাদের লোলাপাঙ্গীর অন্তিম পরিণতিকে বুদ্ধদেবের নির্দয় রূপাঙ্কণ বলে মনে হয়।

৭.৩.৫ শান্তা-অংশুমান-চন্দ্রকেতু

বুদ্ধদেবের নাট্য পরিকল্পনায় শান্তা, অংশুমান ও চন্দ্রকেতুর স্থানিক গুরুত্ব যদি বিচার করতে চাই তাহলে আমরা দেখব যে এঁরা কখনোই বিশিষ্ট হয়ে উঠতে পারেননি। শান্তাকে আমরা তরঙ্গিণীর বিপরীতে বা অংশুমান-চন্দ্রকেতুকে ঋষ্যশৃঙ্গের বিপরীতে ভাবতে পারি না। কাম থেকে প্রেমের পথে উত্তরণের যাত্রায় ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণীকে এঁরা কোনোভাবেই প্রভাবিত করতে পারেননি। সেটা বরং ঋষ্যশৃঙ্গেরই উপলব্ধি যা তরঙ্গিণীর মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। এঁরা বরং ভোগবাদী আধুনিক সমাজের ছবিটিকে (আখ্যানে অবশ্যই প্রাচীন সমাজকে) স্পষ্ট করে তোলেন। শান্তা যাকে মনে মনে পতিরূপে বরণ করেছেন, সেই অংশুমানকে না পেয়ে ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গে বিবাহিত জীবনকে নিতান্ত মেকি করে তুলেছেন। এক বছরের বিবাহিত জীবন শুধু অভ্যাসের বসে দিনযাপনে পরিণত হয়েছে। ঋষ্যশৃঙ্গ শান্তাকে কৌমার্য আর অংশুমানকে রাজত্ব প্রত্যর্পণ করলে দুজনেই তা হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করেছেন। অংশুমান প্রথম অবস্থায় রাষ্ট্রযন্ত্রের চক্রান্তের বলি হয়েও পরে রাজত্ব ও রাজকন্যা সবই পেয়েছেন। অন্যদিকে চন্দ্রকেতু দেহবাদী জীবনযাত্রার অন্যতম পথিক। সে চায় তরঙ্গিণীকে। তরঙ্গিণীর আসঙ্গ লিপ্সায় সে কামাতুর। তার দৃষ্টিতে তরঙ্গিণী বারাঙ্গনা মাত্র — তাই ভোগ্য। ভোগের সামগ্রীকে নানা প্রলোভনে না পেয়ে সে বিস্মিত। সে মনে করে ঋষ্যশৃঙ্গ তরঙ্গিণীকে অভিশাপ দিয়েছেন। তাই প্রিয়কে, কামনার ধনকে ফিরে পেতে সে ঋষ্যশৃঙ্গর কাছে লোলাপাঙ্গীকে নিয়ে যায়। কিন্তু বিফল মনোরথ হয়ে সে লোলাপাঙ্গী সাহচর্যকেই কাঙ্ক্ষিত মনে করে। এই সব গৌণ চরিত্রের সাধারণ জৈব অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করেই ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণীর প্রেমের বিস্তার ও আত্মোপলব্ধিজাত অনাসক্ত নিষ্ক্রমণের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। বুদ্ধদেব এই চরিত্রগুলোর উপস্থাপনা করে বিবাহ, সমাজ, সন্তানকে অস্বীকার করেননি, বরং বিবাহ, সন্তান-সমাজচক্রের অবিরাম ঘূর্ণনও তাঁর উদ্ভাসে ধরা পড়েছে। নাটকে একদিকে বিবাহ-সন্তান-সমাজ, অংশুমান-

শান্তা-চন্দ্রকেতু-লোলাপাঙ্গী অর্থাৎ সাধারণ কামনাবাসনাপূর্ণ জীবন আর তার সঙ্গে সমতালে কিন্তু উঁচু সুরে বাঁধা ঋষ্যশৃঙ্গ তরঙ্গিণীর দেহাতীত প্রেমের রূপ বিধৃত হয়েছে।

৭.৪ নাটকের ভাষা নির্মাণ

'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' নাটকটি বিশেষভাবে ভাষানির্ভর। নাটকের কাহিনিতে বৃষ্টির সাহায্যে খরা বা বন্ধ্যাত্ব দূর করার প্রত্ন (archetypal) অনুষঙ্গ আছে। বুদ্ধদেব এই প্রত্ন-অনুষঙ্গের সাহায্যে তাঁর নাট্যকাহিনিকে 'myth' থেকে 'modernity'- র দিকে নিয়ে গিয়েছেন। ঋষ্যশৃঙ্গের চারিত্রিক তাৎপর্যকে আধুনিক মর্যাদা দেওয়ার ফলেই 'myth' টি 'modernity' হয়ে উঠেছে। কিন্তু এর মূল উপাদান হল ভাষা। আর বুদ্ধদেবের ভাষা সচেতনতা প্রকাশ পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের প্রতীকধর্মী নাটকগুলোতে সংলাপের অন্তর্বর্তী দ্বিমাত্রিকতাকে অনুবর্তন করেই। একান্ত কাব্যভাষা বা পদ্যছন্দ ব্যবহারের এলিয়টীয় আদর্শকে তিনি গ্রহণ করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ 'শারদোৎসব' থেকে শুরু করে 'কালের যাত্রা' পর্যন্ত রচিত নাটকগুলোতে 'poetic prose' -র যে সার্থক ব্যবহার করেছিলেন, বুদ্ধদেব বসু সেই নাট্যভাষার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সুতরাং প্রকরণের দিক থেকে, নাট্যভাষার ছন্দ-স্পন্দন রক্ষার দিক থেকে বা চরিত্র পরিকল্পনার দিক থেকেও তিনি রবীন্দ্র-অনুগামী— একথা আমরা বলতে পারি। উদাহরণ হিসাবে গাঁয়ের মেয়ে ও জনতার কোরাস, লোলাপাঙ্গী-তরঙ্গিণীর চারিত্রিক সংগঠন (composition) ইত্যাদির উল্লেখ করতে পারি যার সঙ্গে 'শারদোৎসব' বা 'রাজা' নাটকের জনতা এবং 'চন্ডালিকা' নৃত্যনাট্যের মা ও মেয়ের তুলনা সহজেই করা যায়। তাছাড়া 'theme music' -এর ব্যবহারে বুদ্ধদেব বসুর রবীন্দ্রনাসুরণ লক্ষ করার মতো। রবীন্দ্রনাথের মতোই তিনি গানের ব্যবহারে মূল বিষয়ের সঙ্গে দর্শক তথা পাঠক আর নাটকের ঐক্য নির্মিতিতে মনোনিবেশ করেছেন।

'Choral Song' গ্রীক নাটকের অবদান বলে আমরা জানি। বুদ্ধদেবের বর্তমান নাটকটির প্রথমেই গাঁয়ের মেয়েদের কথোপকথনে ঐ গ্রীক নাট্যরীতির আভাস পাওয়া যায়। আমাদের মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রথের রশি' নাটিকার শূদ্রদলের সংলাপকে। রবীন্দ্রনাথ সেখানে 'Colloqual Speech' থেকে আলাদা একটি বিশেষ বাগ্‌ভঙ্গি নিয়ে এসেছেন। তেমনি বুদ্ধদেবও গাঁয়ের মেয়েদের সংলাপে দৈনন্দিনতার মাত্রাতিরেক ঘটিয়েছেন। আবৃত্তির সুরে ব্রতকথার প্রার্থনা-আঙ্গিক এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। এই ভঙ্গিমা কথোপকথনের স্বাভাবিক ভঙ্গি থেকে আলাদা। অবশ্য নাটকের আখ্যানের দিকে লক্ষ রেখে আমরা যদি পুরাণ-কল্পকালকে ভাবতে চেষ্টা করি, তবে এ-ধরনের সংলাপকে অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না। তখন, "আকাশে সূর্যের অটল আক্রোশ, জ্বলছে রুদ্রের রক্তচক্ষু" — প্রখর সূর্যালোকের এই বিবৃতি যথোপযুক্ত মনে হয়। প্রসঙ্গত বলি, উদ্ধৃতিটি কবির উত্তর-তিরিশের রচনা যা পরে নাটকটির প্রথম পংক্তি হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। আমরা বুদ্ধদেব বসুর পরবর্তী নাটক 'কালসন্ধ্যা'র একেবারে সূচনায় বৃদ্ধের সংলাপেও 'কোরাসের' সংযোজন লক্ষ করি। সেখানেও নাট্যকার জনসাধারণের দৈনন্দিন ব্যবহারিক ভাষায় (বা বাক্যালাপে) প্রাচীনতার ছাপ এনে সংলাপের মাত্রান্তর ঘটিয়েছেন, কেন-না

কাল-পটভূমি সেখানেও দূরবর্তী। এছাড়া বর্তমান নাটকটির চতুর্থ অঙ্কের শুরুতে স্ত্রী-পুরুষের সম্মেলক-স্বরের উপস্থাপনায় বুদ্ধদেব 'জনতার কলরোলের' আবহে যুবরাজ ঋষ্যশৃঙ্গের ক্লান্তিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। জনতার জয়ধ্বনি ও স্তোকবাক্যের সুর একই গৎ-এ বাঁধা। এই বাঁধা গৎ-টির ভাষা গদ্য, কিন্তু তার আভ্যন্তরীণ বয়ান কাব্যিক — যাকে 'Poetic Prose' বলা যায়। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা', 'শারদোৎসব' প্রভৃতি নাটকের সংলাপ-ভাষা এ-প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করতে পারি।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

প্রাচীন গ্রিসে কোরাস বলতে এমন একটি নাচ-গানের দলকে বোঝাতো যারা ধর্মীয় উৎসবগুলোতে দলবদ্ধভাবে নেচে গেয়ে অনুষ্ঠান করত। অ্যাসকাইলাস ও সফোক্লিসের রচিত ট্রাজেডিতে এই কোরাস নাটকের কোনো চরিত্রের চারিত্রিক গুণাবলি ব্যাখ্যা করত। এলিজাবেথীয় যুগে একক চরিত্র হিসাবে কোরাসের ব্যবহার হয়েছিল যারা সূত্রধারের কাজ করত। নাট্যঘটনার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য নাট্যকারেরা কোরাসকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতেন। আধুনিককালে 'কোরাস' একটি নাটকীয় চরিত্র হিসাবেও ব্যবহৃত হয়েছে, যাঁরা নাটকীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাতের বাইরে থেকে নাটকের এক বিশেষ দিকের প্রতি দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। যেমন, শেক্সপীয়ারের 'ফুল', এনোবারবাস, থারসাইটস ইত্যাদি চরিত্র।

নাটকে রাজপুরোহিতের সন্নিবেশ অনেকটাই গ্রীক-নাটকের সাদৃশ্যবহ। আমাদের মনে পড়তে পারে সফোক্লিসের 'ওয়েদিপাস দ্য কিং' নাটকের রাজপুরোহিত - ভবিষ্যবক্তা টাইরেসিয়াসকে। এঁর মতো বুদ্ধদেবের রাজপুরোহিত চরিত্রের সংলাপেও মন্ত্রের ভাষা উচ্চারিত হয়েছে। নাটকের অন্যান্য চরিত্রদের থেকে সম্ভ্রমপূর্ণ দূরত্ব এনে দিয়েছে রাজপুরোহিতের এ-ধরনের সংলাপ। চিত্রময়তা, রহস্য, প্রতীকায়নের চেষ্টা বা ইঙ্গিতধর্মিতা ইত্যাদি মন্ত্র-ভাষার সব গুণই এঁর সংলাপে পাওয়া যায়।

"আদি উৎস জল। একই স্রোত অন্তরিক্ষে ও ভূতলে,

ঔরসে ও বৃষ্টিতে, নির্ঝরিণী ও নারীগর্ভে;" —

এ-ধরনের সংলাপের সুর যে কাব্যভাষার উচ্চগ্রামে বাঁধা তা বলা বাহুল্য। 'আদি উৎস জল' — এই 'জল' নিঃশেষিত হলে আসে শুষ্কতা, যাকে বলে নির্বীর্য অবস্থা এবং এর অবশ্যম্ভাবী ফল বন্ধ্যাত্ব — এই কথাগুলোই রাজপুরোহিত শ্লোকের আকারে বলেছেন। অভিনয়ের সময় এই উচ্চারণকেই মন্ত্রোচ্চারণ বলে মনে হয়। তাছাড়া, রাজপুরোহিতের উচ্চারণ (১ম অঙ্ক),— "রাজ যদি রিক্ত, তবে লুণ্ঠন করো তপস্বীকে"— এর অন্তর্নিহিত ইঙ্গিতটি পাঠকের কাছে নাটকের 'থিম'কে অনেকটাই এগিয়ে দেয়। নাটকের ঘটনার সঙ্গে পাঠক শ্রোতার সংযোগ ঘটানোর বিষয়টি রবীন্দ্রনাথের ধনঞ্জয় বৈরাগী, ঠাকুরদা প্রভৃতি কোরাসকল্প চরিত্রের মধ্যেও দেখা যায়। একক ব্যক্তি হয়েও এঁরা নাটকে একটি

সম্মেলক সুরই ফুটিয়ে তোলেন সংলাপ প্রয়োগে।

প্রায় প্রতিটি চরিত্রের সংলাপেই বুদ্ধদেব তৎসম শব্দের প্রয়োগে 'archeic' বা প্রত্ন-আবহ নিয়ে এসেছেন। এমনকি নাগরিক বৈদগ্ধ্য সমন্বিত দূতের মুখেও আমরা 'কপোলকল্পনা', 'লোষ্ট্রে', 'প্রক্ষালিত', 'পরিকীর্ণ', 'কালক্ষেপ', 'মার্তণ্ড প্রতাপে' প্রভৃতি শব্দ শুনতে পাই। এ-ধরনের শব্দ-ব্যবহার, প্রবহমান অক্ষরবৃত্তে যতিপাতের বৈচিত্র্য, দীর্ঘ ও জটিল বাক্যের ব্যবহার কবিতার আকারে ইত্যাদি বিষয়গুলো যে শুধু 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' নাটকেই আছে তা নয় এবং এর প্রয়োগও লেখকের ক্রমান্বয় সাধনা ও অভ্যাসের ফসল। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্যায় তিনি শেষ করেছেন 'দ্রোপদীর শাড়ি', 'শীতের প্রার্থনা', 'মরচে ধরাপরেকের গান' প্রভৃতি রচনায়।

নাটকটির অন্যান্য চরিত্রের সংলাপ ভাষাকে মাত্রান্তরের পরিপ্রেক্ষিতে দুটি পর্যায়যুক্ত করা যায়। প্রথম পর্যায়ে ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণীর আবেগময়তা এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে অংশুমান, চন্দ্রকেতু, রাজমন্ত্রী, বিভাণ্ডক ও লোলাপাঙ্গীর বিষয়ী মনোভাব এবং বৃত্তি নির্ভরতা লক্ষণীয়। তবে ভাষা এভাবে চরিত্র নির্ভর হলেও নাটকের মূল 'থিমে'র দিক থেকে কোনো ভাবেই সামগ্রিকতা হারায়নি এবং নিতান্ত সাধারণ বাক্যবিনিময়ের ক্ষেত্রেও কাব্যময় গদ্যভাষা সংলাপকে আন্দোলিত করেছে।

ঋষ্যশৃঙ্গ চরিত্রের মূল হচ্ছে সহজাত শুদ্ধতা, যা তাঁর আশ্রম-জীবনে (২য় অঙ্ক) দেখা যায়। পরে সেটাই (৪র্থ অঙ্ক) জটিল সাংসারিকতায় রূপান্তরিত হয়েছে। অবশ্য এই জটিলতা এসেছে শান্তা, অংশুমান ও বিভাণ্ডকের সঙ্গে কথোপকথনে। কিন্তু রাজপুরীতে আবার যখন তিনি তরঙ্গিণীর মুখোমুখি হলেন, তখন তাঁর সংলাপে এক সত্যার্থীর সরলতা খুঁজে পাওয়া যায়। এখানে ৪র্থ অঙ্ক থেকে একটা উদাহরণ দিচ্ছি,—

"তরঙ্গিণী : ... আজ আমি পাদ্য অর্ঘ আনিনি, আনিনি কোন ছলনা, কোন অভিসন্ধি — আজ আমি শুধু নিজেকে নিয়ে এসেছি, শুধু আমি— সম্পূর্ণ একান্ত আমি। প্রিয় আমার, আমাকে তুমি নন্দিত করো।"

"ঋষ্যশৃঙ্গ : ... কোন অন্তরালে সেই মুখ চিরকাল ধরে আছে, চিরকাল ধরে থাকাবে। তা খুঁজতে হবে তোমাকেই, চিনে নিতে হবে তোমাকেই। ... যার সন্ধানে তুমি এখানে এসেছিলে, হয়তো তা আমারও সন্ধান।"

অন্যত্র ঋষ্যশৃঙ্গ-শান্তা তথা অংশুমানের সংলাপে একটি যান্ত্রিকতার সুর শোনা যায়। ঋষ্যশৃঙ্গ ও শান্তার সংলাপে পোশাকি মনোভাব যথেষ্ট— স্বামী-স্ত্রীর স্বাভাবিক সম্পর্ক সেখানে নেই এবং কথোপকথনও তাই হৃদ্যতাশূন্য লৌকিক শিষ্টাচারেই সীমাবদ্ধ। "তোমার পুত্রের কুশল?" ঋষ্যশৃঙ্গের এ-প্রশ্নের উত্তর শান্তা দেয় নির্লিপ্তভাবে,— "আপনার পুত্রকে পুরস্ত্রীরা প্রতি মুহূর্তে রক্ষা করছেন।" লক্ষণীয়,— পুত্র সম্বন্ধে দুজনের মনোভাব। সংসার জীবনের প্রতি আসক্তিহীন দুটি নরনারীর মানসিক বেদনা এ-ভাবেই সংলাপের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে।

সামগ্রিকভাবে লোলাপাঙ্গী, রাজমন্ত্রী, বিভাণ্ডক এবং প্রথম পর্বের (১ম ও ২য় অঙ্কে) তরঙ্গিণীর সংলাপ বৃত্তি নির্ভর। লোলাপাঙ্গীর কাঞ্চন মূল্যের প্রতি লোভজনিত অঙ্গীকার, রাজমন্ত্রীর অঙ্গরাজ্যের কল্যাণ ও ঋদ্ধিচিন্তা, বিভাণ্ডকের তপস্বী জীবনের আস্থায় প্রতিফলিত মানসের দ্বিমাত্রিকতা, তরঙ্গিণীর অহমিকা, ইত্যাদি সবই বৃত্তিগত ধারণার সফল। আমরা প্রথম অঙ্কে লোলাপাঙ্গীর একটি সংলাপ এখানে লক্ষ করতে পারি,— "... অধম আমারও কিছু সঞ্চয় ছিলো, কিন্তু আমি নিজে নিঃস্ব হয়ে তরঙ্গিণীকে লালন করেছি, শিক্ষা দিয়েছি। এখন এই কন্যাই আমার মূলধন। প্রভু, আপনার আদেশে আমরা জীবন দিতে পারি, কিন্তু দৈবক্রমে জীবন যদি দীর্ঘ হয় তবে তো জীবিকাও চাই।" বা বিভাণ্ডকের একটি উক্তি,— (দ্বিতীয় অঙ্ক) "... নারী মাতা, তাই প্রয়োজনীয়; কিন্তু প্রাণীর পক্ষে সর্পাঘাত যেমন, তপস্বীর পক্ষে নারী তেমনি মারাত্মক। আমি সাবধানে এই আশ্রমকে বিভিক্ত রেখেছিলাম— সম্পূর্ণ জনসম্পর্করহিত, পাছে দৈবক্রমে কোনো নারীর সংস্রবে আমাদের তপস্যার পরাভব ঘটে।"

বর্তমান নাটকটিতে দুটি গান সংযোজিত হয়েছে। প্রথমটিকে বলা যায় 'theme music' আর দ্বিতীয়টি শান্তার বিবাহিত জীবনের হতাশা বা নৈরাশ্যের প্রতীকী প্রকাশ। 'জাগো সৃষ্টির আদি শিহরণ' — গানটির সুস্রাব্য কাব্যরূপ রয়েছে। দ্রুতলয়ের এই গানটিতে যেন সৃষ্টির আবাহন মন্ত্র উচ্চারিত। ঋষ্যশৃঙ্গর হৃদয়ের জাগরণের সূচনাও এখানে — তাঁর মনে হয়েছে "মধুর গভীর উদার এই আবৃত্তি।" আর এর পরিণতি ঘটেছে "মধু ফুল, মধু অন্ন, ... মধু স্মৃতি" মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে জৈব বৃত্তির জান্তব শক্তির জাগরণে,— "জাগো জন্তু, জাগো জন্তু, জাগো জন্তু।"

শান্তার গানে আছে দিন যাপনের গ্লানি। তার রূপ আছে কিন্তু অন্তরে সে রিক্ত,— "পাত্র এখনো মণিময়, নিঃশেষ তার সৌরভ।" শান্তা ও ঋষ্যশৃঙ্গের সম্পর্কের অবস্থান বোঝাতে এ-গান যথেষ্ট ইঙ্গিতময়। এর ব্যঞ্জনা কাব্যনাট্যের উপযোগী।

বুদ্ধদেব তাঁর উপন্যাস, গল্প ও প্রবন্ধে যে পরিশীলিত ও শাণিত গদ্য ব্যবহার করেছেন, তাঁর নাটকগুলোতেও সেই গদ্যের ব্যবহার হয়েছে। 'কলকাতা ইলেক্‌ট্রা' বা 'পুনর্মিলন'-এ তার নিদর্শন রয়েছে। 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' নাটকেও এই গদ্যই ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এই নাটকে গাঁয়ের মেয়ে, দূত প্রভৃতির মুখে যে গদ্য সংলাপ প্রযুক্ত হয়েছে, সেই গদ্যের ব্যবহার তাদের পক্ষে সম্ভব কি না — সেটা একটা প্রশ্ন হতে পারে পাঠকের কাছে। স্বয়ং নাট্যকার এ-বিষয়ে নীরবই রয়েছেন। তবে নাট্য-পরিবেশ, কাল, আখ্যানের শিল্পভাবনা ইত্যাদির কথা ভাবলে এই সংলাপকে ত্রুটিপূর্ণ বলা যায় না। বুদ্ধদেব সচেতন-ভাবেই নাটকে গানের প্রয়োগ করেছেন। নাটকের ঘটনাতে পরিণতির রূপরেখা আঁকতে, চরিত্রের মানসিক প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট করতে এই গানগুলোর প্রয়োগ সার্থক।

আত্মসমীক্ষামূলক প্রশ্ন

কাম থেকে প্রেমের পথে যাত্রা যদি মূল নাট্য বিষয় হয় তবে সেখানে শান্তা-অংশুমান-চন্দ্রকেতু-বিভাণ্ডকদের নাট্যোপযোগিতা কোথায় তা লিখুন। (ন্যূনাধিক ১৫০ শব্দের মধ্যে লিখুন)

.....

.....

.....

.....

৭.৫ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

আমরা বুদ্ধদেব বসু রচিত 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' নাটকের আলোচনা এখানে শেষ করছি। কাহিনির বিশ্লেষণে আমরা দেখেছি কীভাবে লেখক ঋষ্যশৃঙ্গ মিথকে আধুনিকতার দিকে নিয়ে গিয়েছেন। আদিম অলৌকিকতাধর্মী মিথকথার কাম বা বৃষ্টি আর বীর্যের সমন্বয়ের কাহিনিটি এযুগের ও চিরকালের জীবন-জিজ্ঞাসায় পর্যবসিত হয়েছে। যার মর্মকথাটি হল, কামোদ্ভুত আদি মানুষের জীবন-জিজ্ঞাসা অনন্তকাল মানুষের জৈব-জীবনবৃত্তের মধ্যে এক অভিনব স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে। অন্তর্দ্বন্দ্ব মথিত প্রেম ও বিরহের জাগরণে আদিম, কালসম্ভূত কালাতীত জীবনতৃষ্ণার রূপ ফুটে উঠেছে। তবে তাঁদের অস্তিত্বের সঙ্কট সমাধানই শেষ কথা নয়, মানববিশ্বে নর-নারীর জীবনে কাম ও প্রেমকে কেন্দ্র করে জিজ্ঞাসা ও সংগ্রাম চলতেই থাকবে — এটাই নাটকের বক্তব্য, এটাই পরিণতি।

ভাষা প্রয়োগে নাট্যকার প্রাচীনতা রক্ষা করেছেন। কাব্যনাট্য হয়ে ওঠার প্রয়োজনে এবং পুরাণকালের কাহিনি বলে প্রধানত সাধু বাংলার ছাঁদ গ্রহণ করা হয়েছে। কাব্যধর্মী গদ্য সংলাপের পাশাপাশি মন্ত্রোচ্চারণের ব্যবহারও যথাযথ। ভাষা ও সংলাপ চরিত্রগুলোর আধুনিক মানসতার দ্বন্দ্ব-বেদনা প্রকাশের উপযোগী হয়ে উঠেছে।

৭.৬ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

রাজকৃষ্ণ রায় : (১৮৪৯-১৮৯৪) বিশিষ্ট নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক। ১৮৭৫-এ 'বীণা' নামে একটি মানসিক পত্রিকা প্রকাশ করেনে। স্টার থিয়েটারের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বহু বিদ্রূপাত্মক কবিতায় জাতির চেতনা সঞ্চারে সাহায্য করেছেন। 'ভারতকোষ' নামে ভারতবর্ষ সম্পর্কিত প্রথম বিশ্বকোষের সঞ্চালক ছিলেন। বহু কাব্য ও নাটক রচনা করেছেন। সম্ভবত তিনিই প্রথম সাহিত্যরচনাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

বোদলেয়ার : শার্ল পিয়ের বোদলেয়ার (১৮২১-১৮৬৭) বিখ্যাত ফরাসি আধুনিক কবি।

ফরাসি সাহিত্য আন্দোলন 'Symbolist movement'-এর অন্যতম প্রবক্তা। চিত্রকল্প ও সাংগীতিক ভাষা প্রয়োগের জন্য তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ 'লা ফ্লর'র দ্য মাল্' মানুষের প্রেম, উচ্ছাস-আবেগের এক জটিল চিত্রকে তুলে ধরেছে বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক হিসাবে তিনি এডগার অ্যালান পোর রচনাকে ইউরোপের পাঠকের কাছে তুলে ধরেন তাঁর 'এডগার অ্যালান পো— হিজ লাইফ অ্যান্ড ওয়ার্কস' প্রবন্ধে।

উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস্ : (১৮৬৫-১৯৩৯) আইরিস কবি ও নাট্যকার। ১৯৩২-এ তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। আইরিস পুরাণ কাহিনি অবলম্বনে তিনি 'দ্য কেলটিক টোয়াইলাইট' এবং 'দ্য সিক্রেট রাজ' লেখেন। পরে তিনি আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতা যুদ্ধেও যোগ দেন। বিখ্যাত 'Abbey Theatre'-এর তিনি প্রতিষ্ঠাপক সদস্য এই নাট্যালয়ের জন্য তিনি আইরিস নবজাগরণের প্রেরণামূলক বেশ কিছু নাটক লেখেন। এই সমস্ত রচনায় পূর্ববর্তী জীবনের আধ্যাত্মিকতা বা প্রতীকরচনার ছাপ ছিল না। অবশ্য পরে যখন 'এ ভিশন', 'দ্য ওয়াইল্ড সোয়ান্স্ অ্যাট স্কুল', 'দ্য টাওয়ার', 'দ্য ওয়াইন্ডিং স্টার' ইত্যাদি কবিতা লেখেন তখন তাতে পুরাণ, প্রতীকায়ন ও আধ্যাত্মিকতার সংমিশ্রণ ঘটে। জাপানি নো নাটকের মতো কিছু একাঙ্কিকাও তিনি রচনা করেছিলেন।

ধর্মবক : মহাভারতের ধর্মবকের কাহিনিতে ধর্মরূপী বকের কথা জানা যায়, যিনি জীবন বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের জন্মদাতা।

কোরাল সঙ বা বৃন্দগান : খ্রিস্টপূর্ব ৭ শতকে ডোরিয়ান (Dorian) ভাষায় সর্বপ্রথম কোরাল লিরিক বা গান রচিত হয়। পরে গ্রিসে তার প্রসার দেখা যায়। লৌকিক ধর্মাচরণ মূলক অনুষ্ঠানের জন্য স্পার্টা দেশের কবিরাই একে প্রথম ব্যবহার করেন গান হিসাবে। পরবর্তী কালে অলিম্পিকের মতো অনুষ্ঠানের জন্যও এ-ধরনের গান রচিত হয়।

৭.৭ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

১। 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' নাটকটি ভাষা নির্ভর — আলোচনা করুন।

২। "চক্রনেমির মুহূর্ত-বিন্দুতে ঘূর্ণিত হবে তোমার বহু মঞ্চে, বাহু ভূমিকায়, যতদিন আয়ু না হয় নিঃশেষ।" —রাজপুরোহিতের এই মন্তব্যের নাট্যোপযোগিতা বিশ্লেষণ করুন।

৩। 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' নাটকে বিভাণ্ডক ও লোলাপাঙ্গী চরিত্র দুটির গুরুত্ব বিচার করুন।

৪। সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন—

(ক) চন্দ্রকেতু

(খ) রাজমন্ত্রী

(গ) নাটকের গান

(ঘ) গাঁয়ের মেয়েদের সংযোজন ও তার উপযোগিতা

(ঙ) ঋষ্যশৃঙ্গ শান্তার বিবাহ — একটি রাজনীতির যূপকাষ্ঠ

(ছ) রাজপুরোহিত

৭.৮ প্রসঙ্গ পুস্তক (References/Suggested Readings)

১। এ গ্লসারি অফ লিটারারি টার্মস — এম. এইচ. আব্রাহমস্

২। নাট্যশিল্পী বুদ্ধদেব বসু — জগন্নাথ ঘোষ

৩। শার্লবোদলেয়ার : তার কবিতা — বুদ্ধদেব বসু

৪। পান্থজনের সখা : আবু সয়ীদ আইয়ুব

৫। বাংলা সাহিত্যে মিথের ব্যবহার — কমলেশ চট্টোপাধ্যায়

৬। কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক — শঙ্খ ঘোষ

৭। আধুনিক বাংলা কবিতা বিচার ও বিশ্লেষণ — জীবেন্দ্র সিংহরায়

* * *

বিভাগ-৮
আরণ্যক
আরণ্যক : প্রাসঙ্গিক পরিচিতি

বিষয় বিন্যাস

৮.০ ভূমিকা (Introduction)

৮.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

৮.২ প্রাসঙ্গিক পরিচিতি

৮.২.১ 'আরণ্যক'-এর লেখক

৮.২.২ আরণ্যক : পটভূমি ও কাহিনিবৃত্ত

৮.৩ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

৮.৪ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

৮.৫ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

৮.৬ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

৭.০ ভূমিকা (Introduction)

আমরা জানি বাংলা সাহিত্য ও বাঙালিসমাজ, দুয়ের পক্ষেই সংকটের কাল হল তিরিশের যুগ। একদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের নানা সমস্যা, আরেকদিকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের তাণ্ডব— এ দুয়ের টানাপোড়েনে ভারতের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সুখের দিনের অবসান ঘটে গেছে, নষ্ট হয়েছে সামাজিক ও আর্থিক শান্তি। এই ঔপনিবেশিক শাসন আর যুদ্ধোত্তর এক বিভ্রান্তিকর সামাজিক-রাষ্ট্রিক-অর্থনৈতিক পটভূমিতে দাঁড়িয়ে জীবন সম্পর্কে এক ধরনের অবিশ্বাস ও সংশয়ের প্রচ্ছন্ন আর প্রকাশ্য সুর ধ্বনিত হয়ে উঠছিল 'কল্লোল গোষ্ঠী'-র নতুন লেখকদের হাতে রচিত কথাসাহিত্যে। এছাড়াও পশ্চিমের এঙ্গেলস্-মার্ক্স-এর দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের প্রয়োগ-সাফল্য আর ফ্রয়েডের অবচেতন মনের নতুন দিগন্ত আবিষ্কার প্রসারিত করছিল সমকালীন তরুণদের অন্তর্পৃথিবী ও বহির্পৃথিবীর দিগন্তকে। তিরিশের দশকের তরুণদের মনোসৈকতে এই ঢেউ লাগিয়েছিল সবুজপত্র-কল্লোল-কালিকলম-পরিচয়-ভারতী-প্রবাসী-বিচিত্রা ইত্যাদি পত্রিকাগুলো। ফলে নতুন সমাজের চিন্তায়-চেতনায় ঘনিয়ে এল একরকম অনাস্থার ভাব। পরিবর্তিত হল জীবন সম্পর্কে তাঁদের চিন্তাধারা; স্বদেশের ও প্রচলিত সমাজের পুরোনো ঐতিহ্যকে ভেঙে তরুণরা যে জীবনের রসঘন

রহস্যময় ছবি আঁকলেন, তা অনেকাংশেই হয়তো যৌবনের আবেগতপ্ত রোমান্টিক স্বপ্নরাগের রঙে অতিরঞ্জিত , নয়তো মনোজগতের জটিল গ্রন্থিজাল ও অসুস্থতার রহস্য-বিশ্লেষণের প্রেরণায় তির্যক।

বস্তুত 'কল্লোল-গোষ্ঠী'-র (১৯২৩) কথাকারবৃন্দের এই নবতর আকর্ষণের ব্যর্থতায় পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায় ১৯২৯ সালে। আর এই বছরই প্রকাশ পায় রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' ও 'যোগাযোগ'। 'শেষের কবিতা'-র আধুনিকতা সাহিত্য-জগতে বহু সংবর্ধিত, ভাষা আর স্টাইলও যথেষ্ট আধুনিক। দ্বিতীয়টি অর্থাৎ 'যোগাযোগ'-এর আধুনিকতাও সর্বজন স্বীকৃত। 'যোগাযোগ'-এ রবীন্দ্রনাথ দাম্পত্য সমস্যা নিয়ে, পরিবার নিয়ে, নারী ও তার সন্তান নিয়ে নারীমুক্তির এক মৌল সমস্যার নির্দেশ করেছেন। এর ঠিক দুবছর পর প্রকাশিত হয় শরৎচন্দ্রের বিতর্কিত উপন্যাস 'শেষপ্রশ্ন'। বিতর্কের কারণ এর আধুনিকতা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে তিরিশের যুগে বাংলা কথাকারবৃন্দ আধুনিকতা বা অতিআধুনিকতার দৌড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছিলেন, আর ঠিক এই আবহাওয়ার মধ্যে আত্মপ্রকাশ ঘটে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। অর্থাৎ ১৯২৯ সালে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'পথের পাঁচালী' প্রকাশের মাধ্যমে রবীন্দ্র-শরৎ-শাসিত বাংলা সাহিত্যে নিজের অস্তিত্ব ছড়িয়ে দিলেন।

এই অস্তিত্বের লড়ায়ে বিভূতিভূষণের বড়ো সঙ্গী ছিল অতীত ঐতিহ্যের প্রতি তীব্র আকর্ষণ। তাই লক্ষ করি 'পথের পাঁচালী'-র সমস্ত অবয়ব তিনি মুড়ে দেন অতীত ঐতিহ্যের নামাবলি দিয়ে। এখানেই সমকালীনদের বিভূতিভূষণের অস্তিত্বের একাকীত্ব। উল্লেখ্য যে, 'পথের পাঁচালী'-র সমকালীন সময়ে আধুনিকতা বা অতিআধুনিকতার মুখ্য ফসল নগ্ন-বাস্তবতা আর বে-আব্রু যৌনতা তরুণ কথাকারদের রচনায় যেমন ভিড় করে এসেছিল, বিভূতি-সাহিত্যে তেমনটি নেই। তুলনামূলকভাবে তাঁর কণ্ঠস্বরের কোমলতা আর স্নিগ্ধতা আকর্ষণীয়। দারিদ্র্যের মধ্যে বিভূতিভূষণ খুঁজে পেয়েছিলেন এই কোমল-স্নিগ্ধ রূপ। তাই বিভূতি-সাহিত্যে প্রায়ই উচ্চারিত হয় দারিদ্র্য— দরিদ্র জীবনের অনাবরণ চিত্র। এই দারিদ্র্য জ্বালারহিত প্রাকৃতিক ব্যাপার। অবশ্য এই দারিদ্র্যের সঙ্গে তিনি যোগ করেছিলেন প্রকৃতিপ্রেম ও ঈশ্বরপ্রেম।

আধুনিক মানুষের জীবনের মতো আধুনিক সাহিত্যের শর্ত হচ্ছে জটিলতা আর বুদ্ধি-যুক্তির ঘনঘটা, যা বিভূতি-সাহিত্যে অপ্রতুল। এই অপ্রতুলতার নিদর্শন রয়েছে আমাদের আলোচ্য 'আরণ্যক' উপন্যাসে, যার প্রকাশকাল ১৯৩৯ সাল। সময়ের দিক থেকে বিচার করলে এই উপন্যাস উল্লেখযোগ্য, কেননা এর রচনাকাল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভের প্রাক্-মুহূর্ত হলেও ভাবের বা বিষয়বস্তুর দিক থেকে উপন্যাসটি প্রচলিত অর্থে সময়চিহ্নবর্জিত। কেননা আশা আর আশাভঙ্গে ভারতবর্ষ দোদুল্যমান, নানা সমস্যায় সংকটে বিপর্যস্ত দেশ নানা আন্দোলনে আলোড়িত— এই ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে বিভূতিভূষণ অবলীলায় তা এড়িয়ে গেলেন।

'আরণ্যক'-এর পটভূমি বর্তমান বিহারের একটি অরণ্য। পটভূমি অরণ্য

হলেও— 'অরণ্যপট যত আমাদের অভিভূত করুক লেখকের লক্ষ্য ছিল পটবিধৃত মানুষ'— সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমরা একমত হতে পারি। কোমল-স্নিগ্ধ জীবনই তাঁর একান্ত কাম্য। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন জটিলতার দুর্ভেদ্য গ্রন্থিজালই জীবনকে ব্যাপ্ত করে রাখেনি। বস্তুত কোমল মায়া-মোহ-প্রীতি-ভালোবাসার সরলতার মধ্যেও ব্যাপ্ত হয়ে আছে জীবন, আবার পল্লির শ্যামল-স্নিগ্ধ ভূমিও মানুষের কাঙ্ক্ষিত। এই অভিব্যক্তির নিরিখে বোধহয় বিভূতিভূষণকে বলা হয় পল্লি-প্রকৃতির কথাকার, অরণ্যের কথাকার। সেদিক থেকে বলা যায় 'আরণ্যক'-এর লেখক বিভূতিভূষণের আবির্ভাবে বাংলা সাহিত্যের পালাবদল না ঘটলেও মূলত তাঁর হাত ধরেই নতুন পথের অন্বেষণে চলতে শুরু করল বাংলা সাহিত্য। এই নতুন পথের কাণ্ডারী বিভূতিভূষণ কীভাবে 'আরণ্যক'-এর লেখক হয়ে উঠলেন সেটা আমাদের আগামী বিচার্য বিষয়।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

"বিশ শতকের বাংলা দেশ। তৃতীয় দশক। জীবনের সমুদ্র তখন তরঙ্গের আঘাতে ক্ষুব্ধ ফেনিল। পুরনো পৃথিবীর প্রচলিত ঐতিহ্য আর বিশ্বাস, মনন আর মূল্যবান একটা প্রচণ্ড ভাঙন আর রূপান্তরের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

পশ্চিমের সভ্যতায় তখন নতুন প্রাণ-কল্লোল। বিপরীতমুখী চিন্তা আর তত্ত্বের সংঘাতে উদ্বেল উত্তাল ভাববন্যা। সবে একটি বিশ্বযুদ্ধের অবসান হয়েছে, এরি সঙ্গে এসে মিশেছে মার্ক্সের বৈপ্লবিক সাম্যনীতি আর ফ্রয়েডের যুগান্তকারী যৌনতত্ত্ব। পুরনো পৃথিবী সম্পর্কে মানুষের স্বপ্ন আর স্থির-নিশ্চিন্ত আদর্শের সৌধটিতে ফাটলের চিহ্ন দেখা দিয়েছে। একদিকে মানুষের ভাব-জীবনের এই বিক্ষোভের ছবি, আর একদিকে অর্থাৎ বহির্জীবনে, শিল্পবিপ্লবের ফলে যন্ত্রযুগের ক্রম-প্রসারের চিত্র। আর তারি ফলে সভ্যতার ভারকেন্দ্র সহজ গ্রাম-জীবন থেকে ক্রমশ সরে এসেছে নাগরিক জীবনে, যন্ত্রবদ্ধ কৃত্রিম নাগরিক পরিবেশে।

পাশ্চাত্ত্য জীবন ও সভ্যতার এই ঝড়ো বাতাসের ঝাপটা এসে লেগেছে আমাদের আকাশে। আমরাও চঞ্চল বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছি। ক্রমশ আমরা জীবনের পূর্বতন প্রচলিত মূল্য সম্পর্কে সংশয়ান্বিত হয়েছি, পুরনো ধর্মবিশ্বাস, সংস্কার আর নীতিবোধ— সবকিছুকেই যুক্তির মর্মভেদী আলোয় নূতন করে যাচাই করে নিতে শুরু করেছি। দারিদ্র্যের মধ্যে আর ত্যাগের মহিমা চোখে পড়ে না, প্রেমের নামেই কোন অলৌকিক চেতনায় বিহ্বল হয়ে উঠিনে। সমস্ত কিছুকেই সাদা চোখে দেখবার, যাচাই করে নেবার এক নূতন নেশায় আমরা তখন মেতে উঠেছি।"

বিভূতিভূষণ : মন ও শিল্প : গোপিকানাথ রায়চৌধুরী

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

১। সমকালীনদের সঙ্গে তুলনায় বিভূতিভূষণের অস্তিত্বের একাকীত্ব কোথায়? (৭০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

২। বাংলা সাহিত্যজগতে বিভূতিভূষণের আবির্ভাবের সমকালীন পটভূমি কেমন ছিল? (১২০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

৩। ভাবের ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে 'আরণ্যক' উপন্যাসটি প্রচলিত অর্থে সময়চিহ্নবর্জিত কেন? (৫০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

৮.১ উদ্দেশ্য

বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' উপন্যাসের প্রাসঙ্গিক পরিচিতিমূলক বর্তমান আলোচনাকে আমরা অষ্টম বিভাগে অন্তর্ভুক্ত করেছি। বক্ষ্যমাণ আলোচনার মূল বিষয়কে আমরা এমনভাবে বিন্যস্ত করেছি যাতে উপন্যাসটির একটি প্রাথমিক পরিচয় আপনারা লাভ করতে পারেন। যেমন—

- এই আলোচনায় আপনারা উপন্যাসটির একটি সামগ্রিক পরিচয় পাবেন।
- 'আরণ্যক'-এর লেখক বিভূতিভূষণের মনোজগৎ সম্পর্কে আপনারা একটি ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- উপন্যাসটির পটভূমি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান আহরণ করতে পারবেন।
- উপন্যাসের কাহিনিবৃত্ত কীভাবে বিন্যস্ত হয়েছে সেটিও জানতে পারবেন।

৮.২ প্রাসঙ্গিক পরিচিতি

বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' উপন্যাসের 'আরণ্যক : প্রাসঙ্গিক পরিচিতি' নামক প্রথম অধ্যায়ের উদ্দেশ্য এবং ভূমিকার আলোচনা আমরা শেষ করেছি। এবারে আসুন 'আরণ্যক'-এর লেখক এবং 'আরণ্যক'-এর পটভূমি ও কাহিনিবৃত্ত নিয়ে আলোচনা করা যাক।

৮.২.১ 'আরণ্যক'-এর লেখক

বিভূতিভূষণের জন্ম হয় ১৮৯৪ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর। বাবা মহানন্দ এবং মা মৃণালিনী দেবী। লেখকের জন্ম হয় মামার বাড়ি, নদীয়া জেলার কাঁচড়াপাড়ার কাছে ঘোষপাড়া মুরাতিপুর গ্রামে। পূর্বপুরুষের আদি নিবাস, চব্বিশ পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার পানিতর গ্রামে। পৈত্রিক বাসস্থান ছিল এই জেলার বনগাঁ মহকুমার অন্তর্গত ব্যারাকপুর গ্রামে। পিতা মহানন্দ ব্যারাকপুর এবং তার আশেপাশের অঞ্চলগুলির মধ্যে ছিলেন একজন খ্যাতনামা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, কথক এবং কবিতা-নাটক রচয়িতা রূপে সুপরিচিত। উল্লেখ্য যে বিভূতিভূষণ এই পৈত্রিক-সূত্রেই কথকতা, সাহিত্যরচনা ও দেশভ্রমণের নেশা অর্জন করেছিলেন। বিভূতিভূষণ ছিলেন মহানন্দের দ্বিতীয় স্ত্রী মৃণালিনীর পাঁচ সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। তাঁর শিক্ষার সূচনা প্রথমে বাবার কাছে, তারপর বিভিন্ন পাঠশালায়, শেষে কলকাতায় আপার-প্রাইমারি পাঠশালায়। ১৯১৪ সালে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে রিপন কলেজে ভর্তি হন। এরপর ১৯১৬ সালে আই.এ. এবং ১৯১৮ সালে ডিস্টিংসন নিয়ে বি.এ. পাশ করেন। পরে দর্শন শাস্ত্রে এম.এ. ও ল-ক্লাসে ভর্তি হন, কিন্তু প্রথমা স্ত্রী গৌরীদেবীর মৃত্যুতে এবং শেষপর্যন্ত কর্মসূত্রে জড়িয়ে পড়ায় সেটা সম্ভব হয় নি।

তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় স্কুলে শিক্ষকতা দিয়ে। পরে কলকাতার কেশোরাম পোদ্দারের গোরক্ষিণী সভার ভ্রাম্যমান প্রচারকের চাকরি, তারপর পাথুরিয়াঘাটার খেলাৎচন্দ্র ঘোষ এস্টেটের সহকারী ম্যানেজার ইত্যাদি নানা পদে চাকরি সূত্রে বাংলাদেশ, ভাগলপুর প্রভৃতি স্থানের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে ঘোরাঘুরি করেন তিনি। এই ভ্রমণ সূত্রেই গ্রামবাংলার প্রকৃতি ও মানবচরিত্র সম্পর্কে সম্যক অবিজ্ঞতা তাঁর হয়েছিল আর এই অভিজ্ঞতাই তাঁর সাহিত্যকে করেছিল সমৃদ্ধ। বস্তুত মাটি এবং মাটির কাছের মানুষকে, জীবনকে নিবিড়ভাবে স্পর্শ করার শৈল্পিক ক্ষমতা বিভূতিভূষণের শক্তির উৎস। 'আরণ্যক'-এ এই অভিজ্ঞান রক্ষিত হয়েছে। তবে এই ক্ষমতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন হয়েছিল দীর্ঘদিনের নেপথ্য-সাধনার। ১৩২৮ সালের মাঘ মাসের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত ছোটোগল্প 'উপেক্ষিতা'-র লেখকের মধ্যে যে সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল তা 'আরণ্যক'-এর লেখকে এসে বিকশিত হল। এই সম্ভাবনার নেপথ্যভূমি 'স্মৃতির রেখা'। 'আরণ্যক' উপন্যাস লেখার কথা বিভূতিভূষণ ভেবেছিলেন ভাগলপুর থাকাকালীন। ওই সময় বছর চারেক, ১৯২৪ থেকে ১৯২৮ পর্যন্ত পাথুরিয়াঘাটা

এস্টেটের অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার হয়ে বিহারের ভাগলপুর ও পূর্ণিয়া জেলার জঙ্গল-মহাল বিলিব্যবস্থার দায়িত্ব নিয়ে বিহারের জঙ্গলে বাস করেন বিভূতিভূষণ। কলকাতার ব্যস্তজীবন ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের বাইরে এসে তরুণ লেখক বিভূতিভূষণ স্বাভাবিক কারণেই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছিলেন না নির্জন জঙ্গল-মহালের সঙ্গে। 'স্মৃতির রেখা' দিনলিপিতে সে সময়ের অনুভূতি ধরা পড়েছে। 'আরণ্যক' উপন্যাসের সূচনায় কাহিনির কথক সত্যচরণ চাকরি পাবার পর পৌষ মাসের এক শীতের সন্ধ্যায় বিহারের এক ছোটো রেলস্টেশনে নেমেছিল। সেদিন তার যে নির্জনতাবোধ, তা 'স্মৃতির রেখা'-য় লভ্য। এই নির্জনতাবোধকে কাটিয়ে ওঠার জন্য লেখক খুঁজেছিলেন অরণ্যময় নির্জনতার মধ্যে কিছু মানুষের সংস্রব। লেখক সত্যচরণের জবানিতে বলেন— 'শুধু বনপ্রান্তর নয়, কত ধরণের মানুষ দেখিয়াছিলাম'। আমরা দেখতে পাই 'আরণ্যক'-এ শুধু অরণ্যের কথা নেই, আছে অরণ্য ধ্বংস করে গড়ে ওঠা মানব বসতির কথাও। বিহারের জঙ্গলে থাকাকালীন লেখা 'স্মৃতির রেখা'-য় উল্লিখিত অনেক চরিত্র সারাসরি উপস্থাপিত হয়েছে 'আরণ্যক'-এ। যদিও লেখক 'আরণ্যক'-এর ভূমিকায় জানান 'আরণ্যক' কল্পনালোকের বিবরণ। কিন্তু রাসবিহারী সিং, মটুকনাথ, রামচন্দ্র আমীন কিংবা রাখাল ডাক্তারের স্ত্রীকে কাল্পনিক বলা যায় না। অবশ্য দিনলিপিতে নামমাত্র উল্লিখিত মানুষগুলো পুরো অবয়ব নিয়ে এসেছে 'আরণ্যক'-এ।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

বিভূতিভূষণ 'আরণ্যক' লেখার কথা ভাগলপুরস্থিত জঙ্গল-মহালে কাজ করার সময় ভেবেছিলেন। একাধিক দিনলিপিতে বিভূতিভূষণ তাঁর এই পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন। যেমন 'স্মৃতির রেখা'-য় তিনি বলেন এই জঙ্গলের জীবন নিয়ে একটা কিছু লিখবো, লিখলেনও বটে। তাই অনেক ক্ষেত্রে এটি হয়ে উঠল অরণ্যবাসের পুনরাবৃত্তি। সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বিভূতিভূষণ : জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থে জানাচ্ছেন— "অপুর মত, 'আরণ্যক'-এর সত্যচরণের সঙ্গে বিভূতিভূষণের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। অরণ্য কালে বিভূতিভূষণের ব্যক্তিগত বহু অনুভূতি এবং ঘটনা সত্যচরণ চরিত্রকে অবলম্বন করে গ্রন্থের মধ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। আসলে, বিভূতিভূষণ অরণ্যবাসকালীন দিনলিপিতে তাঁর বহু অনুভূতি ও ঘটনার নোট রেখেছিলেন। গ্রন্থে তিনি সেগুলিই কাজে লাগান। অনেক ক্ষেত্রে যে ভাষায় তিনি নোট নেন সেই ভাষাও গ্রন্থে চলে এসেছে।" এই গ্রন্থেরই অন্যত্র সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় জানান— "আরণ্যক" লেখার পর বিভূতিভূষণ এমন কিছু কিছু উপলব্ধির কথা দিনলিপিতে লিখে রেখেছেন যার সঙ্গে সত্যচরণের অনুভূতির খুব মিল আছে। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই লিখেছেন, 'আর একটা বন্যগ্রাম ও পথের পাশে তাদের মৃতদেহের উদ্দেশ্যে প্রোথিত প্রস্তররাজি। এই গুলো যেখানেই দেখি, সেখানে প্রায়ই থাকে একটা প্রাচীন বট ও মহুয়া গাছ। এমনি এক সমাধিস্থানের বর্ণনা

করেছি আমার লেখা 'আরণ্যক'-এ।"

দিগন্তহারা ফুলকিয়া বইহারের মুক্ত প্রান্তরে সত্যচরণ যে দেবতার স্বপ্ন দেখেছিল বিভূতিভূষণ তাঁরই কথায় উপন্যাসটির উত্তরকালের এক দিনলিপিতে লিখেছিলেন, "এই আকাশ, রঙীন মেঘরাজি, সবুজ বাঁশবন— এদের সবটা জড়িয়ে যে বিরাট বিচিত্র বিশ্বপ্রকৃতি, তা হৃদয়হীন নয়। তা ভালবাসে, দয়া করে। দুঃখে সহানুভূতি দেখায়।... ভগবান যে Romance ও Poetry-র উৎসমূল, তাঁর মধ্যে যে শুধুই Poetry ও Romance–এ আমি বেশ অনুভব করলুম। কোথায় বিরাট দ্যুতিলোকের সৃষ্টি, আর কোথায় এই কাঁদি কাঁদি খেজুর, ঐ বেগুনী রঙের জলকচুরির ফুল, সুগন্ধ বেলফুল সবই তাঁর মধ্যে কল্পনা রূপে একদিন নিহিত ছিল।"

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

'আরণ্যক' অনেক ক্ষেত্রে হঠে উঠেছে বিভূতিভূষণের অরণ্যবাসের পুনরাবৃত্তি— আলোচনা করুন। (১৫০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

বস্তুত এই মানুষগুলোকে নিয়েই 'আরণ্যক'। 'পথের কবি' গ্রন্থে কিশলয় ঠাকুর জানাচ্ছেন 'দিক-দিশেহারা অরণ্য-প্রান্তর, দূর-বিসর্পী শৈলশ্রেণী, জনাই ক্ষেত, মকাই ক্ষেত, চিনাঘাসের দানাভোজী সাঁওতাল আর নানা দেহাতী মানুষ। সভ্য সমাজ থেকে অনেক দূরে' এই পরিবেশে শহুরেদের বেশিদিন ভালোলাগার কথা নয়, 'কিন্তু বিভূতিভূষণকে নেশায় পেয়ে বসল।'

উপন্যাসেও আমরা দেখতে পাই কলকাতার যুবক সত্যচরণ বেকারিত্বের জ্বালায় বাধ্য হয়ে জঙ্গলে আসে জমি-বিলি ব্যবস্থার দায়িত্ব নিয়ে এবং এই প্রবাসী জীবনে ঘরের জন্য সে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। আবার এই উপন্যাসেই আমরা দেখতে পাই অরণ্য-প্রকৃতি সত্যচরণকে একটু একটু করে গ্রাস করছে। প্রকৃতির জ্যোৎস্না, অন্ধকার, নির্জনতা, অলৌকিকতা, ঋতু পরিবর্তন— সবই সত্যচরণকে টানে। ধীরে ধীরে সত্যচরণ অরণ্যের মধ্যে তন্ময় হয়ে যায়। সে অরণ্যে শুধু গাছপালা নেই, আছে মানুষ— গিরিধারীলাল, ধাতুরিয়া, রাজু পাঁড়ে, রাসবিহারী, যুগলপ্রসাদ, মটুকনাথ, ভানুমতী, মঞ্চীর মতো একঝাঁক সরল মানুষ। আসলে সত্যচরণ যে প্রকৃতি

দেখেছে, অরণ্য দেখেছে, জ্যোৎস্নামাখা নিবিড় রাত দেখেছে, মানুষ দেখেছে তা বিভূতিভূষণের দৃষ্টিরই রূপান্তর। শিশুর সারল্য, পরিচ্ছন্ন অন্তর আর ভাবুক মন দিয়ে পথের কবি বিভূতিভূষণের যে অরণ্যদর্শন সেটাই 'আরণ্যক'-এ কল্পনার রসে জারিত হয়ে পরিবেশিত হয়েছে।

বস্তুত বিভূতিভূষণের যে অসাধারণ শৈল্পিক ক্ষমতাকে নিসর্গপ্রেম ভেবে মুগ্ধ হতে হয়, সেই প্রেমের আড়ালে শুধু নিসর্গ দেখেননি লেখক, দেখেছেন মানুষ; অরণ্য-ভূমির একঝাঁক সরল মানুষ। নিরীক্ষণের এই একনিষ্ঠতায় বিভূতিভূষণ হয়তো অনুভব করেন তাঁর চারদিকের অসংগতিকে। এই অসংগতি কাটিয়ে ওঠার চিত্র রয়েছে সমগ্র 'আরণ্যক' জুড়ে। সত্যচরণের চোখে আমরা দেখতে পাই বিশেষ বিশেষ চরিত্রের প্রতি নির্বিশেষ মায়া-মমতা। 'আরণ্যক'-এর ম্যানেজার সত্যচরণের এই দৃষ্টি আসলে বিভূতিভূষণেরই মরমি দৃষ্টি। 'আরণ্যক'-এর লেখকের মনোভূমিতে এই উৎকর্ষ দানা বেঁধেছিল কোনো এক অসংগত পরবাসের অব্যক্ত অন্তর্বেদনায়। বাংলা সাহিত্যের কীর্তিমান সাহিত্যিকের ভিড়ে প্রতিষ্ঠিত হতে ব্যারাকপুর গ্রামের মহানন্দ শাস্ত্রীর পুত্র বিভূতিভূষণকে বহু ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করতে হয়েছিল। পথের বাঁকে বহু পারা না-পারার দ্বন্দ্ব, বহু অনিশ্চয়তা ক্ষত-বিক্ষত করেছিল বিভূতিভূষণকে। এছাড়াও পরবাসের জ্বালাতো রয়েইছে। বনগাঁর হাইস্কুলে গ্রামের গরিব ছেলে প্রবাসী ছাত্র হিসাবেই ঢুকেছিলেন। তারপর যত বড়ো হয়েছেন ততই জাগ্রত হয়েছে বোধ। বুঝতে পেরেছেন জ্ঞান-বিজ্ঞান-যুক্তি-প্রগতির ব্রিটিশ-শাসিত বাংলায় তাঁর আগমন সুখের নয়। তবুও মহানন্দ শাস্ত্রীর পুথি-জ্ঞানের পৃথিবী থেকে বেরিয়ে এসে তিনি পেলেন নতুন জগৎ, যেখানে আছেন শেক্সপিয়র-টলস্টয়, আছে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো। এই আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো থেকে বহুদূরে যে তাঁর গ্রাম্য জীবনধারা, তার দর্শন-শ্রবণজাত নাড়ির টানও বিভূতিভূষণের চিরন্তন অভিজ্ঞতা। বস্তুত নিজের জীবন দিয়ে বিভূতিভূষণ পরবাসের বেদনাকে বুঝেছিলেন এবং নির্মাণ করেছিলেন উপশমের উপায়।

পরবাসের আরেক অভিজ্ঞান বিহারের জঙ্গল-মহালে চাকরি। কলকাতার যুবক যখন বিহারের জঙ্গলে এলেন তখন ভেবেছিলেন নির্জনতাই তাঁর একমাত্র সঙ্গী। কর্মজীবনের শুরুতে তিনি ভেবেছিলেন জঙ্গলের শীত-সন্ধ্যা যেমন নির্জন, উদাস প্রান্তর যেমন নির্জন, দূরের বনশ্রেণি যেমন নির্জন তেমনি নির্জন হয়ে যাবে তাঁর কর্মজীবন। চিনাঘাসের দানাভোজী সাঁওতাল, আর নানা দেহাতি বর্বর মানুষের ভিড়ে সময় কাটানোই সমস্যা। এদের ভাষা-ভাবনার সঙ্গেও যোগ নেই বিভূতিভূষণের। দিনলিপির মাধ্যমে তিনি জানাচ্ছেন— "অভিজ্ঞতায় এটা বুঝলাম, আজ যে স্থানটা নতুন, ভাল লাগে না, মন বসে না, যত দিন যায় তার সঙ্গে স্মৃতির যোগ হতে থাকে, ততই সেটা মধুর হয়ে ওঠে।" 'আরণ্যক' উপন্যাসেও এরকমই একটা ঘটনা দেখতে পাই।— "এই তিন বছরে আমার অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। লবটুলিয়া ও আজমাবাদের জন্য প্রকৃতি কি মায়া-কাজল লাগাইয়া দিয়াছে আমার চোখে—

শহরকে এক রকম ভুলিয়া গিয়াছি। নির্জনতার মোহ, নক্ষত্রভরা উদার আকাশের মোহ আমাকে এমন পাইয়া বসিয়াছে যে, মধ্যে একবার কয়েকদিনের জন্য পাটনায় গিয়া ছট্‌ফট করিতে লাগিলাম কবে পিচ-ঢালা বাঁধা-ধরা রাস্তার গণ্ডি এড়াইয়া চলিয়া যাইব লবটুলিয়া বইহারে,— পেয়ালার মত উপুড়-করা নীল আকাশের তলে মাঠের পর মাঠ, অরণ্যের পর অরণ্য, যেখানে তৈরী রাজপথ নাই, ইটের ঘরবাড়ী নাই, মোটরহর্নের আওয়াজ নাই, ঘন ঘুমের ফাঁকে যেখানে কেবল দূর অন্ধকার বনে শেয়ালের দলের প্রহর ঘোষণা শোনা যায়, নয়তো ধাবমান নীল গাইয়ের দলের সম্মিলিত পদধ্বনি, নয়তো বন্য মহিষের গম্ভীর আওয়াজ।" ক্রমাগত সত্যচরণ এই উপলব্ধিতে পৌঁছল, যা মূলত বিভূতিভূষণের উপলব্ধি। আমরা জানি তাঁর মনোজগতকে আকর্ষণ করেছিল ব্যারাকপুর ও ঘাটশিলার শান্ত-শ্যামল প্রকৃতি। বস্তুত 'ঘাটশিলা থেকে দূরে সুবর্ণরেখা নদী, তার ওপারে গালুডির উপত্যকা এবং বহু দূরে কালাঝোর পাহাড়। সিংভূমের জঙ্গলে পাহাড়ের মাথায় শাল-পিয়ালি-আমলকি বনের ঘন সমাবেশ' বিভূতিভূষণের বনবিলাসী সত্তাকে জাগ্রত করে রাখত। এজন্যই বোধকরি সুনীতিকুমার তাঁকে 'বনোন্মাদ' বলেছিলেন। তাঁর বনবিলাসী সত্তার চরম উৎকর্ষ সত্যচরণের দৃষ্টিতে।

কিশলয় ঠাকুর বিভূতিভূষণকে এক বড়ো অভিধায় ভূষিত করেছিলেন, সেটি হল 'পথের কবি'। অনন্ত পৃথিবীর বিচিত্র জীবনের চলার পথে বিভূতিভূষণ সে পথের বাঁকে বাঁকে যে রাগিনী শুনেছিলেন, তা দিয়েই বেঁধেছেন গান। বিভূতিভূষণ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন— "বাংলাদেশের সাহিত্যের উপাদান বাংলার নরনারী, তাদের দুঃখদারিদ্র্যময় জীবন, তাদের আশা-নিরাশা, হাসি-কান্না-পুলক— বহির্জগতের সঙ্গে তাদের ক্ষুদ্র জগতগুলির ঘাত-প্রতিঘাত, বাংলার ঋতুচক্র, বাংলার সন্ধ্যা-সকাল, আকাশ-বাতাস, ফুলফল-বাঁশবনের আমবাগানের নিভৃত ছায়ায় ঝরা সজ্‌নেফুল বিছানো পথের ধারে যেসব জীবন, অখ্যাতির আড়ালে আত্মগোপন করে আছে— তাদের বলতে হবে, তাদের সে গোপন সুখ-দুঃখকে রূপ দিতে হবে।" 'তাদের সে গোপন সুখ-দুঃখকে রূপ দিতে' গিয়ে বিভূতিভূষণের বড়ো অবলম্বন ছিল প্রকৃতিচেতনা ও ঈশ্বরচেতনা। বস্তুত মানুষ, প্রাকৃতি আর ঈশ্বরপ্রেম— এই তিনে মিলেই বিভূতিভূষণের সাহিত্যের জগৎ। আমরা 'আরণ্যক'-এ দেখতে পাই একদিকে 'অখ্যাতির আড়ালে আত্মগোপন' করে থাকা একঝাঁক মানুষের 'আশা-নিরাশা, হাসি-কান্না-পুলক', অন্যদিকে দেখতে পাই প্রকৃতির বিচিত্র লীলামাহাত্ম্য। এ দুয়ের মাঝে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে বিভূতিভূষণের আধ্যাত্মভাবনা।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

"বিভূতিভূষণের সাহিত্যে নিশ্চিন্দিপুরের পল্লিপ্রকৃতির সঙ্গে অপুর নিবিড় সম্পর্কের মধ্যে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির আত্মীয়তার কথা রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মত বিভূতিভূষণের প্রকৃতি মানুষের সঙ্গে এক অচ্ছেদ্য আত্মীয়তা বন্ধনে বাঁধা পড়েছে।

কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে বিভূতিভূষণের সাহিত্যে 'অপরাজিত-আরণ্যক-বনে-পাহাড়ে' প্রভৃতি গ্রন্থে প্রকৃতির আর একটি রূপও প্রকাশিত হয়েছে। সে রূপ ঋতুতে ঋতুতে রং বদলান, অরণ্য-পশু-পক্ষী নিয়ে এক স্বয়ংসম্পূর্ণ মনুষ্যসম্পর্কনিরপেক্ষ সজীব প্রকৃতির রূপ। বিভূতিভূষণের এই মনুষ্যসম্পর্কনিরপেক্ষ ও খুঁটিনাটি বর্ণনায় বিশদ প্রকৃতি রবীন্দ্রনাথে অনুপস্থিত। দ্বিতীয়তঃ, প্রকৃতির প্রতি উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি রোম্যান্টিক হয়েও 'ছিন্নপত্র', 'বসুন্ধরা', 'মাটির ডাক' প্রভৃতি রচনায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রকৃতিভাবনায় যত দার্শনিক ও তত্ত্বাশ্রয়ী এবং রূপরচনায় চিন্তাশীল ও পরিমার্জিত, বিভূতিভূষণ তা নন। প্রকৃতির ব্যাপারে তাঁর বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি। তাঁর মতে বিস্ময়কে যাঁরা Mother of Philosophy বলেছেন, তাঁরা কম বলেছেন। বিস্ময়ই Philosophy, বাকীটা তার অর্থসঙ্গতিমাত্র। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথে প্রকৃতি সম্বন্ধে বিস্ময় থেকে যেখানে দার্শনিক তত্ত্বের সৃষ্টি হয়েছে সেখানে বিভূতিভূষণে বিস্ময়ই দার্শনিক তত্ত্ব থেকে গিয়েছে। প্রকৃতিভাবনায় বিভূতিভূষণ বিস্মিত ও মুগ্ধমতি এক চিরকিশোর। ফলে রূপরচনায়ও তিনি একান্তই অকৃত্রিম ও একটু অগোছাল।"

[বিভূতিভূষণ : জীবন ও সাহিত্য, সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়]

বক্ষ্যমাণ আলোচনার শেষ পর্বে এসে শিল্পী বিভূতিভূষণ সম্পর্কে একটি কথা অবশ্যই বলতে হয়। সাম্রাজ্যবাদের সংজ্ঞায় অথবা বিশ্লেষণে ব্যুৎপত্তি ছিল না বিভূতিভূষণের। রাজু-মটুকনাথ-কুন্তা-ধাতুরীয়া-মঞ্চী-ভানুমতীদের সামাজিক অবস্থানকে বা সত্যচরণের জীবন-জীবিকার বিরোধকে বিশ্লেষণ করতে পারে, এমন কোনো সমাজবিজ্ঞানের নিয়ম-প্রয়োগ 'আরণ্যক'-এর লেখকের অভিপ্রায় ছিল না। কিন্তু বিভূতিভূষণ সমস্ত 'আরণ্যক' জুড়ে এক ভারতবর্ষকে দেখতে পান আর দেখাতে পারেন। বস্তুত, 'আরণ্যক' শুধু গভীর বনভূমি আর অরণ্যপ্রান্তরের কিছু অজ্ঞান আরণ্যক ও গ্রামীণ মানুষের ছবিই নয়, এখানে একটা বড়ো তাৎপর্যপূর্ণ সত্য বিরাজ করছে। সে হল বঞ্চনার সত্য, ক্ষুধার সত্য। আধুনিক কাল এ বিষয়ে আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে। 'আরণ্যক' খানিকটা সজ্ঞানে, খানিকটা আত্মবিস্মৃতভাবে এই অপরিসীম রিক্ততার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে সত্যচরণের উক্তি— 'ভাত এখানকার লোক কি খেতে পায় না?' উল্লেখ্য যে 'আরণ্যক'-এর শিল্পী পরাধীনতা-উপনিবেশ-সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাননি, চাননি এসব বিষয়ে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করতেও, সৃষ্টিক্ষেত্রে তাঁর একমাত্র অবলম্বন ছিল দৃষ্টি-শ্রবণ-অনুভব- মমতাজাত আশ্চর্য ক্ষমতা ও অপার বৈভব।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

"দেখা যাক বিভূতিবাবু কী কী পরিহার করেছেন। প্রথম, জমিবিলির ফলে আরণ্যক জীবনের পটে যে অর্থনৈতিক সূত্র-সম্বন্ধ-সমাজ-জীবনের প্রাথমিক আবির্ভাব ঘটল তার কোনো পরিচয় লেখক দেননি। দ্বিতীয়, তিনি জীবন ও জীবিকার মৃত্তিকাবদ্ধ কোনো স্বরূপ সন্ধানের প্রসায়ী হননি। তৃতীয়, অরণ্য মণ্ডলের রূপ নির্মাণে বর্ষা ঝড়কে আদপেই ব্যবহার করেননি। উপরে কথিত এই তিনিটি সূত্র থেকে একটা কথা স্পষ্ট যে, বিভূতিবাবু জীবনের সংঘাত দ্বন্দ্বের ব্যাপারটিকে প্রশ্রয় দিতে চান না। যেখানেই জীবনের নিষ্ঠুর নখরদন্তকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, সেখানেই ডেকে এনেছেন অনন্ত জীবন-রহস্যকে, বিস্মৃতি সৃজনের জন্য ততটা নয়, যতটা জীবনের ছোট বড় ভাল-মন্দ প্রভৃতির অতীত একটা রূপকসৃজনের জন্য। 'আরণ্যক' উপন্যাসে ঘন ঘন ব্যবহৃত জ্যোৎস্না রাত্রির প্রসঙ্গ এই তাৎপর্যেই বুঝতে হবে। যা আছে, বা যা বিভূতিবাবু ব্যবহার করেছেন তাও এ-প্রসঙ্গে গণনীয়। এই পরিহার ও ব্যবহারের মধ্যেই তাঁর জীবনদৃষ্টির কথঞ্চিৎ পরিচয় মিলবে। বিষয়বস্তুর ব্যবহারের প্রসঙ্গে 'আরণ্যকে'-র এই তিনটি বিশিষ্টতা স্মরণীয়। প্রথম যার অভিভূত করার ক্ষমতা বেশি, প্রকৃতির ভেতর থেকে তাকেই নির্বাচিত করা হয়েছে ঘন ঘন। ছায়াহীন জ্যোৎস্না রাতে এবং ছায়াহীন নির্জন দুপুরের পৌনঃপুনিক ব্যবহার এপ্রসঙ্গে স্মরণীয়। দাবানলে যতটা আকস্মিকতা, বর্ণনা ক্ষেত্রে ততটা দ্রুততা দাবানলের ইপ্সিত ফলশ্রুতি আনয়ন করেনি। দ্বিতীয় অতিপ্রাকৃতের ব্যবহার। অতিপ্রাকৃতের দিকে ঝোঁক 'পথের পাঁচালী'-তে অস্পষ্ট, 'দৃষ্টি-প্রদীপে' সুস্পষ্ট। 'আরণ্যকে'-র আরণ্য-আদিম পরিবেশে এর সুসার্থক প্রয়োগ লক্ষণীয়। বোমাই বুরুর জঙ্গল কাহিনী এবং মহিষের দেবতা টাঁড়বারোর গল্প উপন্যাসের সমগ্রতার সঙ্গে অভেদ সম্পর্কে গ্রথিত। তৃতীয়, এই উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের অধিকাংশই জীবিকা-সংলগ্ন-মানুষ নয়। কুন্তা এবং নাকছেদীর পরিবার ব্যতীত প্রায় সকলের সম্বন্ধেই একথা প্রযোজ্য।

[বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়]

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

১। 'আরণ্যক' কল্পনালোকের বিবরণ হলেও এর পটভূমি কাল্পনিক নয়— আলোচনা করুন। (১৫০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

২। 'আরণ্যক'-এর লেখকের মনোভূমিতে যে উৎকর্ষ দানা বেঁধেছিল, তা আসলে কোনো এক অসংগত পরবাসের অন্তর্বেদনার ফল— আলোকপাত করুন। (১০০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

৩। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বিভূতিভূষণকে 'বনোন্মাদ' বলেছেন কেন? (৮০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

৪। বিভূতিভূষণের সাহিত্যের জগৎ কেমন? (৭০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

৮.২.২ আরণ্যক ঃ পটভূমি ও কাহিনিবৃত্ত

আমরা জানি 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত'-এর নেপথ্যভূতি যেমন 'তৃণাঙ্কুর', ঠিক তেমনি 'আরণ্যক'-এর নেপথ্যভূমি 'স্মৃতির রেখা'। উক্ত উপন্যাসত্রয়ীর সঙ্গে বিভূতিভূষণের দিনলিপির বহুস্থানে চিন্তাসাদৃশ্য, বর্ণনাসাদৃশ্য লক্ষ করা যায় বলেই নেপথ্যভূমি বলার উদ্দেশ্য। বক্ষ্যমাণ আলোচনায় 'আরণ্যক'-এর পটভূমি সম্পর্কে আমরা আমাদের বক্তব্য তুলে ধরব।

বিভূতিভূষণ তাঁর চতুর্থ উপন্যাস 'আরণ্যক' রচনার কথা ভেবেছিলেন ভাগলপুরে থাকাকালীন। এর পেছনে একটু ইতিহাস আছে। বি.এ. পাস বেকার তরুণ সত্যচরণ উপন্যাসের কথক। কলকাতায় থাকাকালীন মেস ভাড়া দেওয়ার টাকাটুকুও তার নেই। সত্যচরণের কলেজের বন্ধু অবিনাশের বাবা ময়মনসিংহের জমিদার। পূর্ণিয়ায় তাদের জঙ্গল-মহাল আছে, বিশ-ত্রিশ হাজার বিঘা জমি বন্দোবস্ত করতে হবে। একজন বিশ্বাসী আর বুদ্ধিমান ম্যানেজারের দরকার। কাজ জুটে গেল সত্যচরণের; জঙ্গল-মহালের ম্যানেজার। 'আরণ্যক' উপন্যাসের কথক এই ম্যানেজার

সত্যচরণ। এ তো গেল বিভূতিভূষণের গল্পের কথক সত্যচরণের কথা, যার সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় হয়েছিল ১৯৩৭ সালের 'প্রবাসী'-র পাতায়।

যে ইতিহাসের উল্লেখ করেছিলাম তার সূচনা ১৯৩৭ সালের 'প্রসাবী'-রও আগে। এক দশকের বেশি আগে অর্থাৎ ১৯২৪ সালের জানুয়ারির শেষে পুথুরিয়াঘাটার ঘোষবাড়ির সফল গৃহশিক্ষককে যেতে হয়েছিল ভাগলপুরে। উদ্দেশ্য, খেলাৎচন্দ্র ঘোষ এস্টেটের জলঙ্গ-মহালের অ্যাসিস্‌টেন্ট ম্যানেজার হয়ে জমি বিলি করতে হবে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে অরণ্যের জমি বিলি করে বসতি গড়ার দায়িত্ব নিয়ে 'উপেক্ষিতা'-র লেখক এলেন বিহারের জঙ্গলে। উল্লেখ্য যে ওই সময় বছর চারেক (১৯২৪-১৯২৮) পাথুরিয়াঘাটা এস্টেটের অ্যাসিস্‌টেন্ট ম্যানেজার হিসাবে বিহার রাজ্যের ভাগলপুর ও পূর্ণিয়া জেলার জঙ্গল-মহাল বিলিব্যবস্থার দায়িত্ব পেয়ে ওই সব অঞ্চল ঘুরে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন বিভূতিভূষণ। দৃষ্টি-শ্রবণ-অনুভব-মমতার আশ্চর্য ক্ষমতা আর আপার বৈভব ছিল বলেই বিভূতিভূষণের মতো শিল্পী পেরেছিলেন সেখান থেকে মঞ্চী-ভানুমতীর আখ্যান তুলে আনতে। মূলত ম্যানেজারের দায়িত্ব পালনের জন্যই তাঁকে প্রায়ই থাকতে হয়েছিল ইসমাইলপুর কিংবা আজমাবাদের অরণ্যের গভীর নির্জনতায়। এই সময়ে লেখা তাঁর 'স্মৃতির রেখা' দিনলিপিতে উল্লিখিত অনেক চরিত্র সরাসরি এসেছে 'আরণ্যক' উপন্যাসে। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায় রাসবিহারী সিং, মটুকনাম, রামচন্দ্র আমীন কিংবা রাখাল ডাক্তরের স্ত্রীকে।

কলকাতার ব্যস্ত জীবন ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ ছেড়ে তরুণ লেখক বিভূতিভূষণ যখন বিহারের নির্জন জঙ্গল-মহালে এলেন, সে সময়কার অভিজ্ঞতা 'স্মৃতির রেখা' দিনলিপির ১৯২৮ সালের ৩১ জানুয়ারির পাতায় অমর হয়ে আছে— "অভিজ্ঞতায় এটা বুঝলাম, আজ যে স্থানটা নতুন, ভাল লাগে না, মন বসে না, যত দিন যায় তার সঙ্গে স্মৃতির যোগ হ'তে থাকে, ততই সেটা মধুর হয়ে ওঠে। এই ইসমাইলপুর ১৯২৪ সালে আন্দামান দ্বীপের মত ঠেকতো। আজমাবাদকে তো মনে হোত (১৯২৫ সালেও) সভ্য জগতের প্রান্তভাগ—জঙ্গলে ভরা বেলজিয়াম কঙ্গোর কোন নির্জন উপনিবেশ— আজকাল সেই আজমাবাদ, এই ইসমাইলপুর ছেড়ে যেতে হবে ভেবে কষ্ট হচ্ছে।" এই কষ্টের উপশমের জন্যই বোধকরি দক্ষিণ বিহারের বিস্তৃত অরণ্যভূমির ভৌগোলিক পটভূমিকে 'আরণ্যক'-এর ফ্রেমে বাঁধতে চাইলেন। 'স্মৃতির রেখা'-য় এর উল্লেখও আছে— "এই জঙ্গলের জীবন নিয়ে একটা কিছু লিখবো— একটা কঠিন শৌর্যপূর্ণ গতিশীল, ব্রাত্যজীবনের ছবি।" 'আরণ্যক'-এর ফ্রেমে এই জীবনের ছবিই তিনি বাঁধলেন। অবশ্য 'স্মৃতির রেখা'তে শুধু উল্লেখ করেছেন বিভূতিভূষণ। পুরো জীবন পাওয়া যায় 'আরণ্যক' উপন্যাসে, মানুষগুলো এসেছে পুরো বাস্তবতা নিয়ে। উপন্যাসের চরিত্রগুলো বিহারের স্থানীয় চরিত্র অথবা নানা উদ্দেশ্য নিয়ে নিকটবর্তী বা দূরবর্তী এলাকা থেকে অরণ্যভূমিতে আসা বিভিন্ন মানুষ। নানা জাতের মানুষ— গঙ্গোতা, দোসাদ, রাজপুত, ভূমিহার ব্রাহ্মণ ইত্যাদি চলাফেরা করেছে 'আরণ্যক' উপন্যাসে। একদিকে প্রকৃতির বিচিত্র লীলাবৈচিত্র্য অন্যদিকে বিভিন্ন মানুষের চলাফেরা— এই নিয়েই বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক'-এর পটভূমি।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

'আরণ্যক'-এ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অন্তিম প্রহরের ছবি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। চিরস্থায়ী নীতি জমিদার পক্ষের সুবিধার দিকে তাকিয়ে রচিত হয়। এই নীতির শর্ত— নদীগর্ভ থেকে নতুন চরজমির যাবতীয় লভ্যাংশ জমিদারের অবাধে ভোগ করার অধিকার ছিল। জমিদারের চিরন্তন প্রজার রক্তশোষণের সকরুণ চিত্রটি বিভূতিভূষণ এঁকেছেন। কিন্তু নেই সেখানে ক্রোধের আগুনের আভাস, আছে শুধু কিছু কিছু ছবি। এই উপন্যাসে লক্ষ করি, জঙ্গলে মোষ চরানোর জন্য কর দিতে হয়, লাক্ষা সংগ্রহের জন্য ইজারাদার নিয়োগ করা হয়েছে, গাছের কুল পাড়তে দেওয়া হয় না গরিব মানুষদের। বস্তুত 'আরণ্যক'-এ নিঃস্ব, সরল অপাপবিদ্ধ মানুষের চিত্র পাই। ভাত যাদের কাছে স্বপ্ন। যাদের খাদ্য কলাইয়ের ছাতু, মকাইয়ের ছাতু, বেথো শাক, চিনাঘাসের দানা সেদ্ধ। নয়-দশ মাইল রাস্তা হেঁটে বিনা নিমন্ত্রণে দু-মুঠো ভাতের জন্য তারা ছুটে আসে। এদের শীতবস্ত্র নেই। কেউ আগুনের ধারে বসে শীত কাটায়, আবার কেউ কলাইয়ের ভূষির মধ্যে সমস্ত শরীর ঢুকিয়ে শীতের রাত কাটায়। এসবের বাস্তব পটভূমি বিভূতিভূষণের ম্যানেজারের দায়িত্ব গ্রহণ। উল্লেখ্য যে রাসবিহারী সিং বা নন্দলাল ওঝার মতো মহাজনের চিত্রও এ উপন্যাসে পাই। 'এ অঞ্চলের যত গরীব গঙ্গোতা জাতীয় প্রজার মহাজন হইল সে (রাসবিহারী সিং)। গরীবকে মারিয়া তাহাদের রক্ত চুষিয়া নিজে বড়লোক হইয়াছে। তাহার অত্যাচারে কাহারও টু শব্দটি করিবার জো নাই।' আবার অন্যত্র দেখা যায়— 'এদেশের এই নিয়ম হুজুর। লাঠি যার, ফসল তার।' কিন্তু বিভূতিভূষণের ভাষায় কোনো আগুন ঝরে না। তিনি সুধু ছবি আঁকেন।

একটি প্রস্তাবনা সহ ১৮ টি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত দক্ষিণ বিহারের অরণ্যভূমির অত্যাচারী রাজপুত রাসবিহারী সিং কিংবা ছুট্টু সিং-এর অত্যাচারের বর্ণনা বা দরিদ্র প্রজার প্রতিদিনের সুখ-দুঃখের বর্ণনা 'আরণ্যক'-এর কাহিনিবৃত্তেকে সমৃদ্ধ করলেও এই উপন্যাসের মূল বিষয় হল শেষ পর্যন্ত 'স্বপ্নের জগৎটা হারিয়ে গেল।' জগৎকে বিভূতিভূষণ খুব বেশি বিশ্বাস করতেন এবং সেজন্যই তার সঙ্গে এত তদ্‌গত থাকতেন। সুতরাং জগৎটা ভেঙে যাওয়ার ফলে বিচ্ছেদের বেদনাটাই বড়ো হয়ে ওঠে। আর এটাকেই তিনি সমগ্র উপন্যাসের কাহিনিবৃত্তের মধ্যে প্রক্ষেপ করেছেন। এই কাহিনিবৃত্তের কাহিনি বলার ধরনটা আলাদা। সরাসরি উপন্যাসে চরিত্র আসেনি, ঘটনাও দেখানো হচ্ছে না। ঘটনা বলা হচ্ছে, বলা হচ্ছে অনেক দূরে বসে। অর্থৎ দক্ষিণ বিহারের অভিজ্ঞতার গল্প বলছে সত্যচরণ কলকাতায় বসে, অভিজ্ঞতা ঘটে যাওয়ার প্রায় পনেরো-ষোলো বছর পর। সত্যচরণ, উপন্যাসের কথক ঘটনাগুলো বলছে উত্তমপুরুষের জবানিতে অর্থাৎ তারই চেতনায় প্রতিফলিত হচ্ছে উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্র ও ঘটনাবলি। এই ঘটনাবলি বা কাহিনিবৃত্তই আমাদের বর্তমান আলোচনার বিষয়।

উপন্যাসের প্রস্তাবনা অংশে দেখা যায়, সমস্ত দিন খাটুনির পর গড়ের মাঠে কোর্টের কাছ ঘেঁষে বসার সঙ্গে সঙ্গে পুরোনো স্মৃতি ভেসে উঠল সত্যচরণের মানসপটে। লবটুলিয়াব, সরস্বতী, কুন্ডীর সন্ধেবেলা, লবটুলিয়া-বইহার-আজমাবাদের অরণ্যভূমি, সেখানকার জ্যোৎস্না, ধূসর শৈলশ্রেণি, নীল গাইয়ের পদধ্বনি, বন্য মহিষের উপস্থিতি, রঙিন ফুলের শোভা ইত্যাদি অনেক স্মৃতি। শুধু বনপ্রান্তর নয়, বিচিত্র ধরনের মানুষের কথাও মনে পড়ল। কুন্তা, নাটুয়া বালক ধাতুরীয়া, মহাজন ধাওতাল সাহু, রাজু পাঁড়ে কিংবা বন্যমহিষের দেবতার কথা সত্যচরণের মনে পড়ে। উপন্যাসে এদের কথাই বলেছে সত্যচরণ। তবু এ স্মৃতি সুখের নয়, দুঃখেরও। কারণ, এই সুন্দর প্রকৃতির লীলাভূমি তার হাতেই নষ্ট হয়েছে, সে অপরাধ বনের দেবতারা ক্ষমা করবে না। তবু তার বিশ্বাস নিজের মুখে অপরাধ স্বীকার করলে দুঃখ লঘু হয়। ১৮ টি পরিচ্ছেদজুড়ে সত্যচরণ সে কথাগুলো বলবে।

পনেরো-ষোলো বৎসর আগে বি.এ. পাশ বেকার সত্যচরণ টাকার অভাবে কলকাতার এক মেস থেকে চলে আসে সরস্বতী পুজোর দিন। ঘটনাচক্রে দেখা হয় জমিদারপুত্র অবিনাশের সঙ্গে এবং তার অনুরোধে জমিবিলির কাজে লেগে যায় সত্যচরণ। কিছুদিন পরে বেলা দশটায় কাছারিতে পৌঁছয় সত্যচরণ এবং জঙ্গল দেখে প্রবাসজীবন তার অসহনীয় ঠেকে। এরই মধ্যে দেখা হয় বর্ধমানবাসী বৃদ্ধ মুহুরি গোষ্টবাবুর সঙ্গে, দেখা হয় দরিদ্র সিপাই মুনেশ্বর সিং-এর সঙ্গে। হঠাৎ তার স্থানীয় মানুষদের ভালো লেগে যায়। অরণ্যভূমি তার অসহ্য ঠেকলে সে একেকদিন বিকেলে অনেক দূরে চলে যায় ঘুরতে। গাছ বা ঝোপের মাথায় অস্তোন্মুখ সূর্য দেখে তার ভলো লাগে; চোখে পড়ে মুক্ত দূরপ্রসারী তৃণাবৃত প্রান্তর আর শ্যামল বনভূমির মেলা। দেখতে পায় পাহাড়ি ঝরনা। কতবার সত্যচরণ এখানে এসে চুপ করে বসে আকাশ, সন্ধ্যা ও নির্জনতার উপলব্ধি করেছে। ইতিমধ্যে সত্যচরণ নিজের কাজে মন দেয়। জানতে পারে ভূমি সংক্রান্ত বহু গোপন কথা। জানতে পারে দরিদ্র প্রজাদের কথা, জানতে পারে 'ওরা খাবার লোভে এসেছে', পাটোয়ারীর মুখে শোনে 'এরা বড় গরিব; ভাত জিনিসটা খেতে পায় না।' দোল উৎসবের কথাও সত্যচরণের স্মৃতিতে ভেসে উঠেছিল। পরিচয় হয় গাঙ্গোতা জাতি গনু মাহাতোর সঙ্গে, জীবিকা চাষবাস ও পশুপালন। এরপর দেখা যায় সত্যচরণের কাছারিতে গ্রীষ্মকাল এসে পড়েছে। মধ্যে একদিন মৈথিল ব্রাহ্মণ নন্দলাল ওঝা সত্যচরণকে নিমন্ত্রণ করল। নিমন্ত্রণের উদ্দেশ্য একটাই 'আমার ছেলেকে তহশীলদারি দিতে হবেই হুজুরের।' এই কাজের জন্য পাঁচ-শো টাকা ঘুষ দিতেও রাজি নন্দলাল। সত্যচরণের উপেক্ষায় সেটা বারোশোতে ঠেকে, কিন্তু সত্যচরণ রাজি হয়নি।

এরপর দেখা যায় 'অসহ্য গ্রীষ্ম, তেমনি নিদারুণ জলকষ্ট।' সত্যচরণ আরও জানাচ্ছে 'এদিকে বৈশাখও কাটিয়া গেল। কোথাও একফোটা জল নাই।' এই পরিচ্ছেদেই একদিনের দাবানলের কথা আছে 'দাবানল তো আসিয়া পড়িল।' সে যাত্রায় কোনো ক্রমে সত্যচরণের কাছারি রক্ষা পেল। 'বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ কাটিয়া গিয়া

আষাঢ় পড়িল।' আষাঢ় মাসের প্রথমেই প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে কাছারির পুণ্যাহ উৎসব হয়ে গেল। বৃষ্টিতে ভিজে বহু প্রজা সেদিন ভোজ খেয়ে গেল। ভোজের খাদ্য চিনাঘাসের দানা, টক দৈ, ভেলি গুড় ও লাড্ডু। এরপর একদিন বনের মধ্যে ধাওতাল সাহুর সঙ্গে সত্যচরণের প্রথম পরিচয় হয়। সে মস্ত বড়ো মহাজন, সে টাকা সুদে দেয়, এটাই তার ব্যবসা। তবে বড়ো সৎলোক ধাওতাল সাহু। সত্যচরণ বলে— 'তোমার মত ভালমানুষ লোকের টাকা শোধ করবে না কেউ।' আর একদিন জয়পাল কুমারের সঙ্গে দেখা হয় সত্যচরণের। সত্যচরণ জানায়— 'জয়পালকে দেখিয়া বড় বিস্ময় ও কৌতূহল বোধ করিতাম।' কারণ হল সে একা থাকে, কারো সঙ্গে কথা বলে না, কোথাও যায় না, কিছু করেও না; অথচ বলে 'কেন খারাপ লাগবে হুজুর? বেশ থাকি।' এই জয়পালের প্রভাব সত্যচরণ উপলব্ধি করে— 'জয়পালের জীবনযাত্রার প্রভাব ও কিছু চারিধারের বাধা-বন্ধনশূন্য প্রকৃতি আমাকেও ক্রমে ক্রমে যে ঐ জয়পাল কুমারের মত নির্বিকার, উদাসীন ও নিস্পৃহ করিয়া তুলিতেছে।' পৌষ মাসের এক জ্যোৎস্না রাতে কুন্তা নামে এক রমণী এসেছে, উদ্দেশ্য ম্যানেজারের পাতের ভাত নিয়ে যাবে ছেলেপুলের জন্য। সত্যচরণ তখন সদর কাছারি থেকে লবটুলিয়ার ডিহি কাছারিতে গেছে হাড়-কাঁপানো শীতে। পাটোয়ারীর মুখে কুন্তার করুণ কাহিনি শুনে সত্যচরণ। কুন্তা আসলে বাইজির কন্যা, রাজপুত দেবী সিং কাশীতে বাইজির বাড়িতে গান শুনতে গিয়ে কুন্তার সঙ্গে ভাব হয় এবং তাকে বিয়ে করে। কিন্তু জাতভাইরা এই সম্পর্ক না মেনে তাকে একঘরে করে। দেবী সিং পয়সার জোরে এসব গ্রাহ্য করেনি। চার বছর আগে দেবী সিং মারা যায়, কুন্তা এখন বিধবা, বহু কষ্টে ছেলেমেয়েদের খাদ্যের সংস্থান করতে পারে না।

শীতের শেষে বসন্ত পড়ল। ফাল্গুন মাসে কাছারির থেকে চোদ্দ-পনরো মাইল দূরে হোলি উপলক্ষে এক মেলা হয়, সত্যচরণ সে মেলা দেখতে যায়। সত্যচরণ বলেছে— 'পাহাড়ের ঢালুতে শাল-পলাশের বনের মধ্যে এই মেলা বসিয়াছে।' মেলায় তরুণী বন্যমেয়েরা এসেছে, বহু লোক এসেছে। এখানে দেখা হয় ব্রহ্মা মাহাতোর সঙ্গে, গিরিধারিলালের সঙ্গে। মেলা ঘুরতে ঘুরতে বেলা পড়ে এল, এবার ফেরার পালা। সকলের অনুরোধ উপেক্ষা করে বাসন্তী পূর্ণিমার পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নারাতে জনহীন পাহাড়িয়া জঙ্গলে একা চলার প্রলোভন সত্যচরণের কাছে দুর্দমনীয় হয়ে উঠল। নির্জন অরণ্য প্রান্তরের জ্যোৎস্না-শুভ্র প্রকৃতির রূপ দেখতে দেখতে সত্যচরণ কাছারিতে ফিরল রাত্রি নটায়। কাছারিতে ফিরে দেখল দক্ষিণ দেশের একদল গরিব নাচের দল এসেছে, এদের মধ্যে ধাতুরীয়া নামে এক ছেলেকে সত্যচরণের খুব ভালো লাগল এবং ওকে কাছারিতে রেখে দিতে চেয়েছিল। এরপর আমরা দেখতে পাই বোমাইবুরুর জঙ্গল। এই বোমাইবুরুর জঙ্গলের দুর্নাম আছে। এই জঙ্গলের আমীন রামচন্দ্র সিং পাগল হয়েছে। রামচন্দ্র সিং প্রতি রাতে সাদা কুকুর দেখে, আসরফি দেখে মেয়ে মানুষ। একবার পূর্ণিয়া থেকে ফেরার সময় আসরফি দেখেছিল একদল অল্পবয়সী সুন্দরী মেয়ে হাত-ধরাধরি করে জ্যোৎস্নার মধ্যে নাচছে। এদেশে এদের 'ডামাবানু' বলে— এক ধরনের জীনপরী। এরা নির্জন জঙ্গলে থাকে, মানুষকে

বেঘোরে পেলে মেরেও ফেলে। রামচন্দ্র সিং-এর পাগল হবার ছমাস পর এক বৃদ্ধ এবং তার ছেলে এল এই জঙ্গলে, গরু-মহিষ চরাবে। এই ছেলেটির সঙ্গেও রামচন্দ্র সিং-এর মতো ঘটনা ঘটল এবং শেষে ছেলেটি মারা গেল। মৃতদেহ পড়ে ছিল বনঝাউ জঙ্গলে। মারা গেল রহস্যজনকভাবে। এ ঘটনার পর সত্যচরণ জানাচ্ছে— 'যেন এ-সব স্থান মানুষের বাসভূমি নয় বটে, কিন্তু ভিন্ন লোকের রহস্যময়, অশরীরী প্রাণীদের রাজ্য।' উল্লেখ্য যে, আমীন রামচন্দ্র সিং-এর পাগল হয়ে যাওয়া আর যুবকটির অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনার মধ্য দিয়ে লেখক স্থানীয় কুসংস্কারের একটি আভাস দিয়েছেন।

রাজু পাঁড়ের সঙ্গে দেখা হবার দিনটি স্পষ্ট মনে পড়ে সত্যচরণের। একজন গৌরবর্ণ সুপুরুষ ব্রাহ্মণ, কপালে তিলক, গায়ে একখানি সাদা চাদর, হাতে ছোটো পুঁটলি, সত্যিই খুব দুঃখী। তার দার্শনিকতা, সেবাব্রতের ভূমিকা, বৈরাগীর আসক্তিহীনতা, হিন্দি-সংস্কৃতজ্ঞান, চিকিৎসাজ্ঞান— সবই সত্যচরণকে প্রভাবিত করেছিল। ইতিমধ্যে অনেক দিন হয়েছে সত্যচরণ এই জঙ্গল-মহালে এসেছে, স্বাভাবিক কারণেই তার মন বাড়ির জন্য উতলা হয়। শীত গিয়ে আবার বসন্ত এল, সত্যচরণের মন আরো উতলা হল। সেই অবস্থায় ঘোড়ায় চড়ে সরস্বতী কুন্ডীর দিকে বেড়াতে গেল সত্যচরণ এবং সেখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। এই বনের মধ্যে হঠাৎ ঘোড়ায় চড়ে পূরণচাঁদ এল। তার কাছে জানতে পারল জায়গাটা ভালো নয়। এরই মধ্যে মন কেমন করা দিনে রাসবিহারী সিং-এর বাড়ি থেকে হোলির নিমন্ত্রণ এল। রাসবিহারী এ অঞ্চলের দুর্দান্ত মহাজন। 'তাহার কড়া শাসন ও অত্যাচারে কাহারও টু শব্দটি করিবার জো নাই।' অনিচ্ছা সত্ত্বেও সত্যচরণকে তার বাড়ি যেতে হয়। আর তাছাড়াও গত বৎসর রাসবিহারীর লাঠিয়ালদের সঙ্গে সত্যচরণের কাছারির লোকের সামান্য মারামারি হয়, অনিচ্ছার কারণ সেটাও। যাই হোক রাসবিহারী হোলির দিন সত্যচরণকে 'যথেষ্ট খাতির যত্ন করিল'। অনেকদিন পরে এখানে বালক-নর্তক ধাতুরীয়ার নাচ দেখল সত্যচরণ। ভোজ খেয়ে সত্যচরণ জ্যোৎস্না রাতে ফিরে এল। এরপর একদিন পূর্ণিয়ার উকিলের কাছ থেকে তার পেয়ে সত্যচরণ ও সুজন সিং সেখানে গেল। চৈত্রের মাঝামাঝি খবর এল সীতাপুর গ্রামের ডাক্তার মারা গেছেন, খবর পেয়ে সত্যচরণের দুঃখ হল। একদিন আমীন রঘুবর প্রসাদ বলল সরস্বতী কুন্ডী মায়ার কুন্ডী, ওখানে রাতে হুরী-পরীরা আসে। সার্ভে ক্যাম্প থেকে ফেরার পথে একজন অদ্ভুত লোকের সন্ধান পেল সত্যচরণ, লোকটি লবটুলিয়ার পাটোয়ারী বনোয়ারীলালের কাকাতো ভাই। নাম যুগলপ্রসাদ। এর সঙ্গে সত্যচরণের কথা হল, ভালো লাগল লোকটিকে এবং সত্যচরণ দশটাকা বেতনের মুহুরির চাকরি দিল যুগলপ্রসাদকে।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

'আরণ্যক' প্রকৃতির ভিন্ন এক রূপে ভিন্ন এক সাজে বাংলা উপন্যাসকে সমৃদ্ধ করল। এই উপন্যাসের মাধ্যমেই বাংলা উপন্যাসের ভূগোলটি বিস্তৃত হল। আমের, জামের, কাঁঠালের, হিজলের, তমালের যে বাংলা দেশ ও তার শ্যামল-কোমল প্রকৃতি 'আরণ্যক'-এ এসে বিহারের নাড়া বইহার লবটুলিয়ার শুকনো ভয়াল গম্ভীর অরণ্যে মিলিত হল— বৃদ্ধি পেল বাংলা উপন্যাসের কলেবর। শুধু অরণ্যের ভয়াল-ভয়ঙ্কর ট্র্যাজিক চিত্র নয়, অরণ্যপৃক্ত মানুষও মিছিল করে এল 'আরণ্যক'-এর কাহিনিবৃত্তে। এইসব মানুষ অরণ্যের দ্বারা লালিত আবার অরণ্যের দ্বারা লাঞ্ছিত। অরণ্য এদের গ্রাহ্য করে না। উপন্যাসের কাহিনিবৃত্তে দেখি অরণ্য ধ্বংস করে মানব সমাজের ভিত্তি সবে শুরু হচ্ছে, তাই সেখানে সংগঠিত সমাজ নয়, ব্যক্তি মানুষের মিছিল। কত বিচিত্র মানুষের সমারোহ ভেসে উঠেছে সত্যচরণের স্মৃতিতে— কুন্তা, মঞ্চী, ভানুমতী, ধাওতাল সাহু, যুগলপ্রসাদ, রাজু পাঁড়ে, রাসবিহারী সিং, ধাতুরীয়া— এদের সমারোহেই 'আরণ্যক'-এর কাহিনিবৃত্ত সমৃদ্ধ।

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

১। বেকার যুবক সত্যচরণের ম্যানেজার হবার বৃত্তান্ত উল্লেখ করুন। (১৫০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

২। মহাজন ধাওতাল সাহু ও রাসবিহারী সিং-এর সংক্ষিপ্ত চরিত্র আলোচনা করুন। (১০০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

৩। পুণ্যাহ ও হোলি উৎসবের বর্ণনা দিন। (৮০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

৩। বোমাইবুরুর জঙ্গলের দুর্নাম আছে— আলোচনা করুন। (৮০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

৫। কুন্তার কাহিনি সম্বন্ধে যা জানুন লিখুন। (৮০ টি শব্দের মধ্যে।)

.....

.....

.....

.....

তিন বছর কেটে গেল সত্যচরণের, ইতিমধ্যে সে জঙ্গলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। মাঝে একবার পাটনা গিয়ে ফেরার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এদিকে জমিবিলির কাজ শেষ হয় না, ওপর থেকে তাগাদা আসে। আসলে সত্যচরণ চাইছে না প্রজাবিলি করে এমন প্রকৃতির সৌন্দর্যলোক ধ্বংস করতে। সেজন্যই পাটনা থেকে ছটু সিং নামে এক রাজপুত এসে হাজার বিঘা জমি চাইলে সে চিন্তিত হয়। একদিন লবুটলিয়ার জঙ্গলের উত্তরে নাঢ়া বইহারে মটুকনাথ পাঁড়ের সঙ্গে দেখা সত্যচরণের। সে একজন দরিদ্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, কাছারির পাশে একটি টোল খুলতে চায়। সত্যচরণের সহায়তায় টোল হল, ছাত্রও এল বরোজনের মতো, এর মধ্যে একজন নায়েবের ক্যাশবাক্স' থেকে টাকা এবং আংটি চুরি করল, হৈ-চৈ হল, কয়েকজনকে তাড়াতে হল বুদ্ধি করে, রইল চারজন। এদিকে ছটু সিং-এর কাছেও জমি বিলি হয়ে গেল। কার্তিক মাসে দেখা গেল সরষে বপন হয়েছে, মাঝে মাঝে লোকজন ঘর বেঁধেছে। ফসল পেকে গেল, নতুন প্রজারা ভয়ানক গোলমাল সৃষ্টি করল। একদিন খবর এল 'ভীমদাস টোলার উত্তরসীমায় ভয়ানক দাঙ্গা বাঁধিয়াছে।' দাঙ্গা বেঁধেছে গাঙ্গোতা ও ছটু সিং-এর দলের সঙ্গে। সত্যচরণ গিয়ে কোনো ক্রমে দাঙ্গা বন্ধ করল। কিন্তু নাঢ়া বইহারের শান্তি চিরদিনের জন্য শেষ হল। ক্ষেতের ফসল পেকে যাওয়ায় কাটুনী মজুরেরা নানাদিক থেকে আসতে শুরু করল। অদ্ভুত এদের জীবন, তরাই, জয়ন্তীর পাহাড় অঞ্চল ও উত্তর ভাগলপুর থেকে স্ত্রী-পুত্রসহ এখানে আসে, ছোটো ছোটো কুঁড়ে নির্মাণ করে বাস করে, ফসল কাটে, মুজুরি পায় ফসলের একটা অংশ। এদের

নিয়ম, ফসল কাটার সময় খাজনা আদায় করতে হয়। তাই সত্যচরণকে শস্য খেতে খুপরীতে তীব্র শীতের মধ্যে থাকতে হল। এর মধ্যে একদিন গনোরী তেওয়ারী ও আরো অনেকে এসে সত্যচরণকে টাঁড়বারো দেখার অলৌকিক কাহিনি শোনায়। টাঁড়বারো হল বুনো মোষের দেবতা। প্রায় পনেরো দিন হল সত্যচরণ ভাত, বন-ধুঁধুলের তরকারি, বনের কাঁকরোল, মিষ্টি আলু ভাজা বা সিদ্ধ খেয়ে বন্য-জীবন যাপন করল। এর মধ্যে একদিন খবর এল এক খুপরী থেকে ছ-মাসের এক শিশুকে নিয়ে গেছে বাঘে। অনেক চেষ্টা করেও বাঁচানো যায়নি। বাঘের হাত থেকে রক্ষার জন্য সদর থেকে শিকারি বাঁকে সিংকে আনা হল। তিনদিন পরে আবার একটি রাখালকে নিয়ে গেল বাঘে। বাঘের অত্যাচার যেতে না যেতেই বন্য মহিষের অত্যাচার। এসময়ই বৃদ্ধ নক্‌ছেদী ভকতের সঙ্গে সত্যচরণের আলাপ হয়, সত্যচরণ জানতে পারে ওরা কম্বলের বদলে কলাইয়ের ভূষির মধ্যে ঢুকে শীত নিবারণ করে। সত্যচরণ ঘাটো রান্না দেখল। এই গাঙ্গোতাদের দুঃখ-দুর্দশা দেখে বুঝতে পারে— 'আজ যেন সত্যিকার ভারতবর্ষকে চিনিতেছি।' কিছুদিন পরে দেখা যায় 'সমস্ত ফুলকিয়ার বিরাট প্রান্তর জুড়িয়া যেন একটা বিশাল মেলা বসিয়া গিয়াছে।' কারণ রোজগারের জন্য মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী, মিঠাইয়ের দোকান, ফেরিওয়ালা, রং-তামাশাওয়ালারা এল। তহশীলদার বইহারের এই নতুন লোকদের কাছ থেকে জমিদারের খাজনা আদায়ের ঘোষণা করল। একদিন গরিব মুনেশ্বর খাজনা ফাঁকি দিয়ে পালাচ্ছিল, ধরে আনা হল, ওর সব কথা শুনে সত্যচরণ খাজনা মুকুব করে দিল। এবং ওর নাচ দেখে দুটাকা বকশিশ দিল। এরমধ্যে সবাই চলে গেল, ফুলকিয়া পূর্বের নির্জনতায় ফিরে এল। একদিন সত্যচরণ নক্‌ছেদী ভকতের কাছে গেল এবং আলোচনা সূত্রে জানতে পারল মঞ্চী তার দ্বিতীয় স্ত্রী। মঞ্চীকে সত্যচরণের ভালো লেগেছিল, তাই তারা চলে গেলে সে দুঃখিত হয়।

এবার সত্যচরণের একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতা হল। মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের দক্ষিণে মাইল পানেরো-কুড়ি দূরে একটি বিস্তৃত শাল ও বিড়ির জঙ্গল নিলামে ডাক হবার খবর পেয়ে সত্যচরণ কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হল সেই জঙ্গলের উদ্দেশ্যে। যেদিকে চোখ যায়, সেদিকেই গাছের মাথা, ঝোপের মাথা, ঈষৎ নীলাভ সাদা বুনো তেউড়ির ফুলের মনোরম দৃশ্য দেখে দেখে সত্যচরণ পৌঁছে গেল জঙ্গলে। দেখা হল বর্তমান মালিকের কর্মচারী বুদ্ধু সিং-এর সঙ্গে। বুদ্ধু সিং বেশ বুদ্ধিমান, 'এই সব বন-পাহাড়ি অঞ্চলের অনেক ইতিহাস সে জানে'। তার কাছে এদেশের 'অসভ্য বুনো জাতির' বংশধরের কথা জানে সত্যচরণ। সে জানায়— 'মোগল-বাদশাহের আমলে এরা মোগল সৈন্যের সঙ্গে লড়েছে তির-ধনুক দিয়ে, বীরের বংশ এরা, এখন আর কিছু নেই। যা বাকি ছিল ১৮৬২ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের পরে সব শেষ।' এই বিদ্রোহের নেতা বেঁচে আছে শুনে সত্যচরণের কৌতূহল হল তাকে দেখার। বুদ্ধু সিং নিয়ে গেল। সে ষোলো-সতে রো বছরের ভানুমতী নামের এক মেয়েকে ডেকে রাজার কথা জিজ্ঞেস করল। এরপর বৃদ্ধ দোবরু পান্নার সঙ্গে পরিচয় হল, সেখানে সত্যচরণ আতিথ্য গ্রহণ করল, সজারুর মাংস খাওয়া হল। খাওয়া-

দাওয়ার পর তারা পূর্বপুরুষের দুর্গে প্রবেশ করল এবং নামার সময় জাগ্রত দেবতা, বন্য মহিষের রক্ষাকর্তা টাঁড়বারো দর্শন করল। এতসব ঘোরাঘুরির পর সত্যচরণ কাছারিতে ফিরে এল।

বহুদিন যাবৎ রাজু পাঁড়ে কাছারিতে আসে না। রাজুর কুটির ও জমি নাঢ়া বইহারের ঘন জঙ্গলের মধ্যে। সে একদিন কাছারিতে খবর পাঠালো যে, বুনো শুয়োরের দল তার চিনা ফসলের খেতে প্রতি রাতে উপদ্রব করছে। সত্যচরণ বন্দুক নিয়ে সেখানে গেল, কথা প্রসঙ্গে রাজু বলে, সতেরো-আঠারো বৎসর হল তার স্ত্রী মারা গেছে, সেই থেকে বাড়িতে মন বসে না। সত্যচরণ জনায়— 'রাজুর জীবনে রোমান্স ঘটিয়াছিল'। রাজুর আঠারো বৎসর বয়সের সময় উত্তম-ধরমপুর শ্যামলাল টোলাতে এক টোলে রাজু ব্যাকরণ পড়তে যায়। টোলের অধ্যাপকের চোদ্দো বছরের মেয়ে সর্জুর সঙ্গে প্রেম হয় এবং বিয়ে করে। এসব গল্পের পর সত্যচরণ খেত দেখতে গেল, জ্যোৎস্না ফুটলে দেখতে পেল একটা কালো জানোয়ার— তবে সেটা শুয়োর নয়, নীলগাই। সেদিন আর শুয়োর এল না। রাত যখন দশটা বাজে তখন সত্যচরণ গভীর জ্যোৎস্নায় একা চলে এল, কারণ মিছি নদীর উত্তর পাড়ে জঙ্গলের ও পাহাড়ের মধ্যে সার্ভে হচ্ছিল। সেখানে পৌঁছে আট-দশ দিন হয়ে গেছে, আরও দশ-বারো দিন থাকতে হবে। জায়গাটা বড়ো চমৎকার, রাজা দোবরু পান্নার আবাস স্থলের খনিকটা নিকটে। জায়গাটা অশ্বক্ষুরাকৃতি উপত্যকা— বন্ধুর ও জঙ্গলাকীর্ণ, বড়ো পাথর ছড়ানো, কাঁটা বাঁশের বন, পাহাড়ি অরণ্য, পাহাড়ের গায়ে একটা প্রকাণ্ড গুহা— সব মিলে সুন্দর জায়গাটা। এখানে একটি গোঁড় পরিবারের সন্ধান পেল সত্যচরণ। ওই পরিবারে দুটি কালো সুন্দর মেয়ে আছে। একদিন সত্যচরণ এদের বাড়ি গিয়ে দেখল নুন দিয়ে ওরা ঘাটো সিদ্ধ খাচ্ছে। এখানেই সত্যচরণ দেখতে পেল এক জটাজুটধারী সাধুকে। এরপর একদিন কবি বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ এল সত্যচরণের সঙ্গে দেখা করতে। বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ সত্যচরণকে কবিতা শোনাল, সত্যচরণ ভাষা ভালো না বুঝলেও উৎসাহজনক শব্দ উচ্চারণ করল। একদিন সত্যচরণ কবির বাড়ি গেল, কবিগৃহিনী তাকে দৈবড়া ও মকাইভাজা খাওয়ালেও অবগুণ্ঠনবতী কথা বলল না। কবি একটি গ্রাম্য প্রেমকাহিনি শোনাল সত্যচরণকে।

তিনমাস সার্ভের কাজের পর সত্যচরণ মহালে ফিরে আসে। ফেরার পথে একটি খেত থেকে বাপুজি বাপুজি বলে মঞ্চী ছুটে আসে এবং সেদিন বেলা হয়ে যাওয়ায় নক্‌ছেদীর খুপরীতে যেতে হয় সত্যচরণকে। সেখানে রান্না হল রুটি, ধুঁধুলের তরকারি। নক্‌ছেদী কোথা থেকে এক ভাঁড় মোষের দুধ আনল, তারপর খাওয়া হল গল্প হল। বিদায় নেবার সময় সত্যচরণ তাদের বৈশাখ মাসে লবটুলিয়া যাবার কথা বলল। মঞ্চীকে দেখে সত্যচরণের মনে হল এ যেন কোনো বনলক্ষ্মী— পরিপূর্ণ যৌবনা, প্রাণময়ী, তেজস্বিনী, মুগ্ধা ও বালিকাস্বভাবা।

এরমধ্যে শ্রাবণ মাস এল, চারদিকে নবীন ঢল নেমেছে, অরণ্যপ্রান্তর বর্ষায় অপূর্বসুন্দর দেখাল। একদিন রাজা দোবরু পান্নার চিঠি পেয়ে শ্রাবণ-পূর্ণিমায়

ঝুলনোৎসবে সত্যচরণ নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেল। সন্ধ্যার আগেই তারা পৌঁছে গেল সেখানে, একটু পরে ভানুমতী এল ফলমূল ও দুধ নিয়ে, আরেকটি মেয়ে এল পান সুপারি নিয়ে। ভানুমতীর সংকোচহীন সরল ব্যবহার সত্যচরণের ভালো লাগল। কাজের ফাঁকে দোবরু পান্না দেখা দিয়ে গেল। গভীর রাতে চতুর্দশীর জ্যোৎস্নায় বনের বড়ো বড়ো গাছপালার আড়ালে নরনারী কণ্ঠের অদ্ভুত ধরনের গান শুরু হল, শুনতে শুনতে সত্যচরণ ঘুমিয়ে পড়ল। পরের দিন সবাই পাহাড়ের দিকে গেল। জায়গাটির মাঝে একটি প্রাচীন পিয়াল গাছ— গাছের গুঁড়ি ফুল ও লতায় সাজানো। রাজা দোবরু জানালেন তিনি ছেলেবেলা থেকে মেয়েদের ঝুলন নৃত্য দেখে আসছেন। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত বনস্থলীতে প্রায় ত্রিশটি কিশোর-কিশোরী গাছটাকে প্রদক্ষিণ করে নাচতে লাগল, আগে ছিল ভানুমতী। অনেক রাত পর্যন্ত এই নাচ চলল। পরের দিন সত্যচরণ ফিরে আসার আগে ভানুমতী তাকে একটা আয়না এনে দেবার অনুরোধ করল। এক সপ্তাহের মধ্যেই পূর্ণিয়া থেকে একটা আয়না এনে তার কাছে পৌঁছে দিল সত্যচরণ।

কয়েকমাস পরে ফাল্গুনের দিকে সত্যচরণ লবটুলিয়া থেকে কাছারিতে ফিরছিল, পথে কয়েকটি মেয়ের শব্দ শুনে অবাক হল। কাছে গিয়ে দেখে বন ঝাউয়ের ঝোপের ধারে আট-দশ জন বাঙালি গল্প করছে। ক্রমে এদের সঙ্গে আলাপ জমে গেল। আলাস সূত্রে জানা যায় দলের প্রৌঢ় ভদ্রলোক একজন রিটায়ার্ড ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, ভাইপো, ভাইঝি, মেয়ে, নাতনী জামাইয়ের সঙ্গে পিনকিন করতে এসেছেন।

এবার বসন্তের শেষেই লবটুলিয়া বইহারের গম পেকে গেল। গতবার ছিল সরষে, এবার গম, তাই কাটুনি মেলার সময় পড়ল বৈশাখের প্রথমেই। দু-তিন হাজার বিঘা গম কাটা হবে, সুতরাং মজুর সংখ্যা প্রায় তিন-চার হাজার। এদের মধ্যে এবার মঞ্চীকে না দেখে উদ্বেগ ও বিস্ময় দুই-ই অনুভব করল সত্যচরণ। এরপর একদিন নক্‌ছেদীর মেয়ে সুরতিয়া সত্যচরণকে আমন্ত্রণ জানায় ফাঁদ পেতে পাখি ধরা দেখাবার জন্যে।

আশ্বিন মাসে খবর এল দোবরু পান্না মারা গেছে। সত্যচরণ গিয়ে শুনল গরু চড়াতে গিয়ে হঠাৎ হাঁটুতে আঘাত পায়, সেই চোটই তার মৃত্যুর কারণ। রাজার মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে মহাজনেরা গরু-মোষ বেঁধে ফেলল, ফলে রাজপরিবার খুবই বিপন্ন হয়ে পড়ে। সত্যচরণ মহাজন বীরবল সিং-এর সঙ্গে কথা বলে গরু-মোষ রাখার ব্যবস্থা করল। ভানুমতীর কথায় সত্যচরণ পর্বতের ওপর গিয়ে বটগাছের কাছে দাঁড়িয়ে সমাধিতে ফুল দিল।

ধাওতাল সাহুর মহাজনের কাছে একবার সত্যচরণকে হাত পাততে হল। কারণ দশ হাজার টাকার রেভিনিউ দাখিল করতে হবে, কিন্তু আদায় কম হওয়ায় বনোয়ারীলালের পরামর্শে ধাওতাল সাহুর কাছে তিন হাজার টাকা ধার করল সত্যচরণ। এ ব্যাপারে ধাওতালের বাড়ি গেলে রীতিমতো আপ্যায়ন করে খাওয়ালো

সত্যচরণকে। তারপর সে একদিনও সত্যচরণের কাছে টাকার জন্য তাগাদা করেনি। ফসলের মেলার পর সত্যচরণ রাখালবাবুর বাড়ি গেল, প্রায় একবছর যাওয়া হয়নি। রাখালবাবুর স্ত্রীর দুঃখ-দুর্দশা দেখে সত্যচরণের কষ্ট হল। এসময় সত্যচরণের আরেকটি বাঙালি পরিবারের কথা মনে পড়ে। রেলস্টেশন থেকে বহুদূরে অজ পাড়াগ্রামের এই বাঙালি পরিবারে তিনটি বিবাহযোগ্য কন্যা আছে। বড়ো মেয়ের নাম ধ্রুবা, পুরোদস্তুর বিহারি নাম। তার বাবা হোমিওপ্যাথি করতেন, চাষও করতেন। পণ দেবার ক্ষমতা না থাকায় মেয়েদের বিবাহও দিতে পারেননি।

এরপর সত্যচরণের মনে পড়ে এক শ্রাবণ মাসের বর্ষামুখর দিনের কথা। সে ভানুমতীর ওখান থেকে ফেরার পথে ঘোর বর্ষা নামল, মাইলের পর মাইল কাশ ও ঝাউবন বর্ষায় ভিজছে। এমনি আর এক বর্ষার শ্রাবণ দিনে ধাতুরীয়া ইসমাইলপুর কাছারিতে এসে হাজির হল। কাছারিতে সে দুধ চিঁড়ে খেল, সন্ধ্যার আগে নাচ দেখাল, এবং পরদিন সে বিদায় নিল। তার সঙ্গে সত্যচরণের এই শেষ কথা। মাস দুই পরে শোনা গেল ডি. এন. ডব্লিউ. রেল লাইনের কাটারিয়া স্টেশনের কাছে লাইনের ওপর এক বালকের মৃতদেহ পাওয়া গেছে, সবাই তাকে নাটুয়াবালক ধাতুরীয়া বলে চিনেছে। সত্যচরণ জানাচ্ছে— 'ইহা আত্মহত্যা কি দুর্ঘটনা তাহা বলিতে পারিব না।'

আরো তিন বৎসর কেটে গেল। নাঢ়া বইহার ও লবটুলিয়ার সমস্ত জঙ্গল-মহাল বন্দোবস্ত হয়ে গেছে। নাঢ়া বইহার নাম ঘুচে গেছে, লবটুলিয়া এখন বস্তি মাত্র। ধরণির মুক্ত রূপ এরা কেটে টুকরো টুকরো করে নষ্ট করে দিয়েছে। সত্যচরণ অনেক কষ্টে যুগলপ্রসাদের হাতে সাজানো বনপুঞ্জ অর্থাৎ সরস্বতী কুণ্ডীর তীরবর্তী বনভূমি নষ্ট হতে দেয়নি। এদিকে সদর অফিস থেকে মধ্যে মধ্যে পত্র আসছে সরস্বতী কুণ্ডী বিলি হতে এত দেরি হচ্ছে কেন।

ফেরার পথে সত্যচরণের সঙ্গে নয়া লবটুলিয়াতে দেখা হল রাজু পাঁড়ের। সে ওখানে এক গৃহস্থবাড়িতে বসে ধর্মতত্ত্ব আলোচনা করছে। সত্যচরণকে দেখে যত্ন করে বসাল এবং নানা প্রসঙ্গে আলোচনা হল। যেমন রাজু জানতে চাইল আকাশের যেমন শেষ নেই পৃথিবীরও তেমনি শেষ নেই। রাজুর এক পরিচিত সাধু বলল যে উদয় পাহাড়ের গুহা থেকে যে সূর্য ওঠে অভ্রের রথে, তা সে দেখেছে এবং সূর্যের রথের অভ্রের একটা কুচিও সে নিয়ে এসেছে। এই চাক্ষুষ প্রমাণের কথা শুনে সত্যচরণ সেদিন আর কিছু বলতে পারল না।

পরে একদিন সত্যচরণ চীহড় ফলের সন্ধানে যুগলপ্রসাদকে নিয়ে বেরোল, সঙ্গে দুজন সিপাই। নাঢ়া বইহারের নতুন বস্তিগুলির মধ্য দিয়ে পথ। এর মধ্যে সর্দারের নামানুসারে ঝল্লুটোলা, রূপদাসটোলা, বেগমটোলা ইত্যাদি টোলাগুলির নাম হয়ে গেছে। লবটুলিয়ার বনের শোভা আর নেই, এতে যুগলপ্রসাদ খুব দুঃখিত। সত্যচরণকে অনুরোধ করে সরস্বতী কুণ্ডীর জমিবিলি না করতে। নীল রঙের রোদ্দুর, মাদকতায় আচ্ছন্ন আকাশ, ঝরনার কলকল ধ্বনি, হরীতকী গাছ, কেলিকদম্ব গাছের

সেগুনপাতার মতো বড়ো বড়ো পাতার শন্‌শন্‌ শব্দের মধ্য দিয়ে তাদের মহালিখারূপের পাহাড়ে ওঠা আরম্ভ হল। অনেক ওপরে উঠে চীহড় গাছ পাওয়া গেল। স্থলপদ্মের মতো পাতা, ফলগুলি সীমজাতীয়, ভেতরে গোল বিচি। অন্ধকারের জন্য প্রাগৈতিহাসিক যুগের গুহাঙ্কিত ছবি দেখা হল না। শেষে বাঘের ভয় ও শঙ্খচূড় সাপের ভয়ে তারা নামতে শুরু করল।

তারপর একদিন গনোরী তেওয়ারীর সঙ্গে দেখা হল সত্যচরণের। গনোরী খাঁটি ভবঘুরে। বিয়ে না হওয়ায় সে দুঃখিত, পেটের ভাতের জন্যে গাঙ্গোতাদের দুয়ারে ঘুরে অর্ধেক জীবন কাটিয়ে দিল। সত্যচরণ সংকল্প করল এখানে একটা পাঠশালা করে গনোরীকে শিক্ষক হিসাবে রেখে দেবে।

এক অপূর্ব জ্যোৎস্নারাতে যুগলপ্রসাদ ও রাজু গল্প করতে এল। কাছারির দূরে গড়ে ওঠা বস্তি থেকে বলভদ্র সেঙ্গাই নামের একটি লোকও এল। লোকটি তার নানা অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করল। রাজু বলে, এখানে আসার আগে তার দুটি মোষ ছিল এখন দশটি হয়েছে। বলভদ্র রাজুকে একজোড়া মোষ কিনে দিতে বলে। গনোরীরও ইচ্ছে হল কোথাও বসতে পারলেই মোষ কিনবে।

মাস তিন চারের মধ্যে মহালিখারূপের পাহাড়ের কোল থেকে লবটুলিয়া ও নাঢ়া বইহারের উত্তর সীমা পর্যন্ত প্রজা বসে গেল। মৈথিল ব্রাহ্মণ, গাঙ্গোতা ও দোসাদ, —সর্বস্তরের মানুষের ভিড় জমল। এরমাঝে একদিন গ্র্যান্ট সাহেবের বটগাছের নিচে জমি মাপতে গিয়ে কুন্তাকে দেখল সত্যচরণ। আসরফি জানাল রাসবিহারী সিং কুন্তাকে নিয়ে যায়, তার ওপর অত্যাচার করে, মাসখানেক হল সে এখানে পালিয়ে এসেছে। ভিক্ষে করে, খেতের ফসল কুড়োয়। কুন্তাকে দেখে সত্যচরণ ভাবল নিঃস্বদের জন্য সে কিছু একটা করবে। তাই সে কুন্তাকে বিনা সেলামিতে দশ বিঘে জমি দিল।

সন্ধ্যার পর লবটুলিয়ার নতুন বস্তিগুলি বেশ দেখায়। কত লোক, কত পরিবার অন্নের সংস্থান করতে এসেছে মহালে, বন কেটে গ্রাম বসিয়েছে, চাষ আরম্ভ করেছে। সত্যচরণ সব বস্তির নামও জানে না, সকলকে চেনেও না। তাদের মহালে তিনটি খাদ্যশস্য হয়— ভাদ্র মাসে মকাই, পৌষে কড়াই এবং বৈশাখে গম। ধান এখানে একেবারেই হয় না। সুতরাং ভাত জিনিসটা এখানকার লোকে কালেভদ্রে খেতে পায়। প্রত্যেক বস্তির সবাই হনুমানজির পুজো করে। এদের মধ্যে একজন শিবভক্তকে দেখেছে সত্যচরণ, নাম দ্রোণ মাহাতো, জাতিতে গাঙ্গোতা।

কার্তিক মাসে ছট্‌ পরব এদেশের বড়ো উৎসব। বিভিন্ন টোলা থেকে মেয়েরা হলুদ ছাপানো শাড়ি পরে দলে দলে গান করতে করতে কলবলিয়া নদীতে ছট্‌ ভাসিয়ে দেয়। সারাদিন উৎসবের ধুম। সন্ধ্যায় বস্তির চারদিকে পিঠে ভাজার গন্ধ। সেদিন সন্ধ্যায় বিভিন্ন টোলায় সত্যচরণ নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেল। ঝল্লুটোলার মোড়ল ঝল্লু মাহাতোর বাড়ি গেল, নাঢ়া বইহারে ছনিয়া ও সুরতিয়াদের বাড়ি গেল

সত্যচরণ। পরদিন কুন্তা একটি পাত্রে সত্যচরণকে কিছু পিঠে দিয়ে চলে গেল।

বনের মধ্যে একদিন গাছের নিচে একটা লোক ছেঁড়া কাপড় পেতে শুয়ে আছে— মুনেশ্বর সিং-এর কাছে খবর পেয়ে সত্যচরণ ছুটে গিয়ে দেখে লোকটি গিরিধারীলাল। সেবার পৌষ মাসের মেলায় ইজারাদার ব্রহ্মা মাহাতোর তাঁবুতে দেখেছিল। গিরিধারীলাল জানায় তার একবার কেটে গিয়ে ঘা হয়, কিছুতেই সারে না, বস্তিবাসী সেটাকে কুষ্ঠ ভেবে বস্তিতে ঢুকতে দেয় না। তাই সত্যচরণ ওকে নিয়ে গেল কাছারিতে। রাজু পাঁড়ের ঔষধে এবং কুন্তার সেবাযত্নে মাসখানেকের মধ্যে গিরিধারীলাল সুস্থ হয়ে উঠল। তারপর গিরিধারীকে বিনা সেলামিতে লবটুলিয়াতে কিছু জমি দিয়ে বাস করার সুযোগ দেয় সত্যচরণ।

সত্যচরণের এখান থেকে চলে যাবার সময় হয়েছে। একবার ভানুমতীর সঙ্গে দেখা করার প্রবল ইচ্ছা হল সত্যচরণের। তাই যুগলপ্রসাদকে সঙ্গে নিয়ে চলল, পথে ইজারাদার আবদুল ওয়াহেবের জঙ্গলের এলাকা পড়ল, সেখানে রাত কাটিয়ে পরদিন ভোরবেলা দোবরু পান্নার রাজধানী চক্‌মকিটোলায় পৌঁছনো গেল। সত্যচরণকে দেখে ভানুমতী ভীষণ খুশি হল। খাওয়া দাওয়ার পর সবাই মিলে প্রাচীন রাজ-সমাধির কাছে গেল, রাজা দেবরু পান্নার কবরের ওপর ভানুমতী, তার বোন নিছনী, যুগল ও সত্যচরণ ফুল ছড়াল। রাতে জগরু পান্না ও তার দাদার মুখে অনেক কথা শুনল সত্যচরণ। মহাজনের দেনা এখনো শোধ হয়নি, গয়ার এক মাড়ওয়ারি ঘি কিনে নিয়ে যেত, আজ তিন-চার মাস আসে না। প্রায় আধমন ঘি জমে গেছে, খরিদ্দার নেই। পরের দিন দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর ভানুমতীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসে সত্যচরণ। তারপর আসে সেই দিনটি, যেদিন সত্যচরণের দীর্ঘ প্রবাসজীবন শেষ হয়। সকলের কাছে বিদায় নিয়ে সত্যচরণ চলে আসে শহরে। শহরের কোলাহলের মধ্যে আজও সত্যচরণের মনে পড়ে নাঢ়া বইহার লবটুলিয়ার অরণ্যপ্রান্তর, সরস্বতী হ্রদের অপরূপ বনানী, সঙ্গে সেখানকার মানুষজনের কথা, যারা তার প্রবাসজীবনকে আনন্দ-বেদনায় ভারিয়ে তুলেছিল।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

'আরণ্যক' (এপ্রিল,১৯৩৯) উপন্যাসটির পরিকল্পনার অভিনবত্ব বিস্ময়কর— ইহা সাধারণ উপন্যাস হইতে সম্পূর্ণ নূতন প্রকৃতির। প্রকৃতির যে সূক্ষ্ম, কবিত্বপূর্ণ অনুভূতি বিভূতিভূষণের উপন্যাসের গৌরব তাহা এই উপন্যাসে চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। প্রকৃতি এখানে মুখ্য, মানুষ গৌণ। সীমাহীন আরণ্য প্রকৃতি লেখকের মন ও কল্পনাকে পূর্ণভাবে অধিকার করিয়াছে। ইহার প্রতি ঋতুতে, বিদা-রাত্রির প্রহরে প্রহরে, জ্যোৎস্না-অন্ধকারের বিভিন্ন পটভূমিকায়, পরিবর্তনশীল রূপ ও সূক্ষ্ম আবেদন আশ্চর্যরূপ বস্তুনিষ্ঠা ও কাব্যব্যঞ্জনার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। সর্বোপরি ইহার সমস্ত পরিবর্তনশীলতার মধ্যে এক সুগভীর, অপরিমেয় রহস্যবোধ অবিচল

কেন্দ্রবিন্দুর ন্যায় স্থির হইয়া আছে। প্রকৃতির এই ইন্দ্রজাল লেখক কত নিবিড় ও বিচিত্রভাবে অনুভব করিয়াছেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। জনহীন, বিশাল আরণ্যপ্রান্তরের জ্যোৎস্নারাত্রি তাঁহার কল্পনাকে বিভিন্নভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে— ইহা কখনও পরীরাজ্যের মায়াময়, অপার্থিব স্বপ্নসৌন্দর্য কখনও বা প্রেতলোকের বিভীষিকা জাগাইয়াছে। তেমনি নিস্তব্ধ অন্ধকার নিশীথিনী এক গভীরতর রোমাঞ্চকর অনুভূতিকে— যাহাকে বলে Cosmic imagination তাহাকেই— স্ফুরিত করিয়াছে; কল্পনাকে সৃষ্টিরহস্যের মর্মস্থলে লইয়া গিয়া সৃষ্টিক্রিয়ার নিগূঢ় আনন্দ-শিহরণ, ও সৃষ্টিকর্তার প্রকৃতিপরিচয়কে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। আবার আদিম আরণ্য জাতির সহিত সংস্পর্শ বন্য মহিষের রক্ষাকর্তা ট্যাঁড়বারো দেবের কল্পনাকে রূপ দিয়াছে; অন্যদিকে কেবলমাত্র শিক্ষিত মনের পক্ষেই যাহার ধারণা করা সম্ভব সেই যুগযুগান্তপ্রসারিত ঐতিহাসিক কল্পনাকে প্রবুদ্ধ করিয়াছে। দৃশ্যের পর দৃশ্য একদিকে বর্ণপ্লাবনের বিচিত্র সৌন্দর্যে চক্ষু ও মনকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে, অপরদিকে অতীন্দ্রিয় অনুভূতির নিবিড়তায় রূপাতীত ধ্যানতন্ময়তায় মগ্ন করিয়াছে। প্রকৃতির সহিত মানবমনের এমন অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কাহিনী বাঙলা উপন্যাসে ত নাই-ই ; ইউরোপীয় উপন্যাসেও এরূপ দৃষ্টান্ত সুলভ নহে।"

[বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা ঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়]

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

১। রাজপুত ছটু সিং হাজার বিঘা জমি চাইলে সত্যচরণ চিন্তিত হয় কেন? (৭০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

২। মটুকনাথ পাঁড়ের বর্ণনা দিন। (৫০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

৩। 'ভীমদাসটোলার উত্তর সীমায় ভয়ানক দাঙ্গা বাঁধিয়াছে' —কারণ উল্লেখ করে ঘটনাটি লিখুন। (১০০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

৪। কাটুনী মজুরের জীবনযাত্রা কেমন? (৮০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

৫। সত্যচরণের খুপরীতে থাকার অভিজ্ঞতা কেমন? (৭০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

৬। 'আজ যেন সত্যিকার ভারতবর্ষকে চিনিতেছি' —তাৎপর্য কী? (৭০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

৭। 'সমস্ত ফুলকিয়ার বিরাট প্রান্তর জুড়িয়া যেন একটা বিশাল মেলা বসিয়া গিয়াছে'— এই মেলার তাৎপর্য কী? (১০০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

৮। রাজা দোবরু পান্নার সঙ্গে সত্যচরণের সাক্ষাতের ঘটনাটি লিখুন। (৮০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

৯। 'রাজুর জীবনে রোমান্স ঘটিয়াছিল' —কীভাবে? (৭০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

১০। শ্রাবণ-পূর্ণিমায় ঝুলনোৎসবের বর্ণনা দিন। (৭০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

১১। সত্যচরণ ধাওতাল সাহুর কাছ থেকে কত টাকা ধার নেয় এবং কেন? (৫০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

১২। উপন্যাসে বর্ণিত ছট্ পরবের বর্ণনা দিন। (৭০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

নিজের ক্রমোন্নতি বিচার করুন

বিভূতিভূষণের ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে 'আরণ্যক' উপন্যাসের পটভূমির কী বাস্তব সম্পর্ক রয়েছে বুঝিয়ে লিখুন।

[সংকেতসূত্র : প্রাসঙ্গিক আলোচনা দ্রষ্টব্য]

৮.৩ আলোচিত বিষয়ের সারাসংক্ষেপ

বিশ বা তিরিশের দশক বাংলা সাহিত্য বা বাঙালিসমাজের সংকটের কাল হলেও রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের জন্য ঐশ্বর্যের কাল। যদিও নতুনরা পশ্চিমের অনুসরণে জীবনের রসঘন রহস্য প্রকাশ করতে চাইলেন, তা অনেক ক্ষেত্রেই যৌবনের আবেগতপ্ত রোমান্টিক স্বপ্নরাগের রঙে অতিরঞ্জিত বা মনোজগতের জটিল বিকৃতি ও অসুস্থতার রহস্য-বিশ্লেষণের প্রেরণায় তির্যক। তাঁদের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' ও 'যোগাযোগ' এবং শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্ন'-এর আধুনিকতা অনস্বীকার্য। একদিকে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের সাফল্য, আর অন্যদিকে নতুনদের অধিকাংশের বিফলতা, যার ফলে 'কল্লোল' বন্ধ হয়ে যায় ১৯২৯ সালে, এই আবহাওয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে আত্মপ্রকাশ করেছেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯২৯ শের 'পথের পাঁচালী' অতি সাধারণ ভাবে লেখা। চমক নেই ভাষায়, চমক নেই স্টাইলেও। শুধু অতীত ঐতিহ্যের নামাবলি দিয়ে মুড়ে দিয়েছেন গোটা উপন্যাস। তিরিশের দশকে তরুণরা পশ্চিমের যে সম্ভাবনার দিকে হাত বাড়িয়েছিলেন পঁয়ত্রিশ বৎসরের বিভূতিভুষণ সেই আধুনিকতা বা অতিআধুনিকতার দিকে ভিড়লেন না। বস্তুত এই সময়কার নগ্ন বাস্তবতা আর বে-আব্রু যৌনতা শুধু 'পথের পাঁচালী' নয় বিভূতিসাহিত্যে অনুচ্চারিত।

বিভূতিসাহিত্যে যা উচ্চারিত হয়, তা দারিদ্র্য, দারিদ্র্যের সঙ্গে আছে প্রকৃতিপ্রেম ও ঈশ্বরপ্রেম। এসবের মিশ্রণে তথাকথিত আধুনিকতাকে অস্বীকার করে ১৯৩৯ সালে প্রকাশ পায় বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক'। 'আরণ্যক' সম্পর্কে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন— "... অরণ্যপট যত আমাদের অভিভূত করুক লেখকের লক্ষ্য ছিল পটবিধৃত মানুষ।" জীবনই তাঁর একান্ত কাম্য; কিন্তু এই জীবনে জটিলতা নেই, আছে সরলতা।

চাকরিসূত্রে বাংলাদেশ, ভাগলপুর প্রভৃতি স্থানের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। এই ভ্রমণ সূত্রেই তিনি গ্রামবাংলার প্রকৃতি ও সরল মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক অবিজ্ঞতা অর্জন করেন। তাঁর সব শ্রেষ্ঠ রচনাতেই দেখা যায় তিনি মাটিকে ছুঁয়ে আছেন, নিবিড়ভাবে স্পর্শ করে আছেন মাটির কাছের মানুষদের। 'আরণ্যক'-এ এই লক্ষণগুলোই স্পষ্ট।

'আরণ্যক'-এর পটভূমির কথা এলে প্রথমেই মনে পড়ে 'স্মৃতির রেখা'-র প্রসঙ্গ। কেন না, না ভাগলপুর থাকাকালী তিনি ভেবেছিলেন 'আরণ্যক'-এর কথা। ১৯২৮ সালের ১২ ফেব্রুয়ারির দিনলিপিতে তিনি লিখলেন— 'এই জঙ্গলের জীবন নিয়ে একটা কিছু লিখবো'। বস্তুত ১৯২৪-১৯২৮, এই চার বছর বিভূতিভূষণকে পাথুরিয়াঘাটা এস্টেটের 'অ্যাসিসটেন্ট ম্যানেজার' হিসাবে বিহার রাজ্যের ভাগলপুর ও পূর্ণিয়া জেলার জঙ্গল-মহাল বিলিব্যবস্থার দায়িত্ব নিয়ে ওই সব বনভূমি অঞ্চল ঘুরতে হয়েছিল। দৃষ্টি-শ্রবণ-অনুভব-মমতার আশ্চর্য ক্ষমতা আর অপার বৈভব ছিল বলেই বিভূতিভূষণের মতো শিল্পী পেরেছিলেন সেখান থেকে মঞ্চী-ভানুমতী-ধাতুরীয়ার আখ্যান তুলে আনতে, যার কথক সত্যচরণ। উপন্যাসের চরিত্রগুলো বিহারের স্থানীয় চরিত্র অথবা নানা উদ্দেশ্য নিয়ে নিকটবর্তী বা দূরবর্তী এলাকা থেকে অরণ্যভূমিতে আসা বিভিন্ন মানুষ। নানা জাতের মানুষ— গাঙ্গোতা, দোসাদ, রাজপুত, ভূমিহার, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি। একদিকে প্রকৃতির বিচিত্র লীলাবৈচিত্র্য, অন্যদিকে বিভিন্ন মানুষের চলাফেরা— এর মধ্যে একটু একটু করে প্রকৃতিমুগ্ধ সত্যচরণের হরিয়ে যাওয়া— এই নিয়েই 'আরণ্যক'-এর পটভূমি। 'আরণ্যক'-এ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অন্তিম প্রহরের ছবি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এই নীতির শর্ত— নদীগর্ভ থেকে নতুন চরজমির যাবতীয় লভ্যাংশ জমিদারের অবাধে ভোগ করার অধিকার। দক্ষিণ বিহারের অরণ্যভূমির ছবি ও এখানকার বিচিত্র মানুষের ছবিকে পটভূমি হিসাবে নিয়ে সত্যচরণের স্বপ্নের জগতটা হারিয়ে যাওয়ার কাহিনিবৃত্ত এই উপন্যাসকে উজ্জীবিত করেছে। অবশ্যে কাহিনি বলার ধরনটা আলাদা, সরাসরি কোনো চরিত্র আসে নি, ঘটনাও দেখানো হচ্ছে না। ঘটনা বলা হচ্ছে অনেক দূরে বসে। অর্থাৎ জঙ্গল-মহালে কাজ করার অভিজ্ঞতার গল্প বলছে সত্যচরণ কলকাতায় বসে, ঘটনা ঘটে যাওয়ার প্রায় ১৫-১৬ বছর পর। সুতরাং তারই চেতনায় প্রতিফলিত হচ্ছে উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্র ও ঘটনাবলি। আসলে সত্যচরণ যে প্রকৃতি দেখেছে, জ্যোৎস্নামাখা নিবিড় রাত দেখেছে, মানুষ দেখেছে তা বিভূতিভূষণের দৃষ্টিরই

রূপান্তর। শিশুর সারল্য, পরিচ্ছন্ন অন্তর আর ভাবুক মন দিয়ে পথের কবি বিভূতিভূষণের যে অরণ্যদর্শন, সেটাই 'আরণ্যক'-এ কল্পনারসে জারিত হয়ে পরিবেশিত হয়েছে।

আমরা জানি বিভূতিভূষণের মনোজগতকে আকর্ষণ করেছিল ব্যারাকপুর ও ঘাটাশিলার শান্ত-শ্যামল প্রকৃতি। কিন্তু তাঁর বনবিলাসী সত্তা চরম উৎকর্ষতা লাভ করে বিহারের জঙ্গলে গিয়ে। এজন্যই বোধকরি সুনীতিকুমার তাঁকে 'বনোন্মাদ' বলেছেন। কিশলয় ঠাকুরও তাঁকে যে বড়ো আভিধায় ভূষিত করেন— সেটি হল পথের কবি।

বস্তুত মানুষ, প্রকৃতি আর ঈশ্বরপ্রেম— এই তিনে মিলেই বিভূতিভূষণের সাহিত্যের জগৎ। আমরা 'আরণ্যক'-এ দেখতে পাই, একদিকে 'অখ্যাতির আড়ালে আত্মগোপন' করে থাকা একঝাঁক মানুষের 'আশা-নিরাশা, হাসি-কান্না-পুলক', অন্যদিকে দেখতে পাই, প্রকৃতির বিচিত্র লীলামাহাত্ম্য। এ দুয়ের মাঝে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে বিভূতিভূষণের অধ্যাত্মভাবনা।

'আরণ্যক'-এর পটভূমির আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি বিভূতিভূষণ এই উপন্যাস রচনার কথা ভেবেছিলেন ভাগলপুরে থাকাকালীন। ১৯২৪ সালের জানুয়ারির শেষে ভাগলপুরের অরণ্যের জমিবিলি করে বসতি গড়ার দায়িত্ব নিয়ে বিভূতিভূষণ এলেন ভাগলপুরের জঙ্গলে। এই সময় চার বছর ভাগলপুর ও পূর্ণিয়া জেলার জঙ্গল-মহাল ঘুরে দেখার সুযোগ হয় লেখকের। দৃষ্টি-শ্রবণ-অনুভব-মমতার আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী বিভূতিভূষণ সেখান থেকেই তুলে আনেন মঞ্চী-ভানুমতীর কাহিনি, সত্যচরণের জীবন-জীবিকার কাহিনি। বিভূতিভূষণ তাঁর দিনলিপিতে এমনই একটি তথ্য দিয়েছেন— 'এই জঙ্গলের জীবন নিয়ে একটা কিছু লিখবো।' এই তথ্যেরই প্রতিফলন দেখতে পাই 'আরণ্যক'-এর কাহিনিবৃত্তে।

একটি প্রস্তাবনাসহ আঠারোটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত হয়েছে 'আরণ্যক'-এর কাহিনিবৃত্ত। এই কাহিনিবৃত্তের কথক সত্যচরণ। অর্থাৎ জঙ্গল-মহালে কাজ করতে গিয়ে সত্যচরণের যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল সেই অভিজ্ঞতারই বর্ণনা 'আরণ্যক'-এর আখ্যানে স্থান পেয়েছে। উপন্যাসের প্রস্তাবনা অংশে আমরা দেখি, সারাদিন খাটুনির পর গড়ের মাঠে ফোর্টের কাছ ঘেঁষে বসার সঙ্গে সঙ্গে পুরোনো স্মৃতি ভেসে উঠল সত্যচরণের মনে। লবটুলিয়ার স্বরস্বতী কুণ্ডীর সন্ধেবেলা, লবটুলিয়া-বইহার-আজমাবাদের অরণ্যভূমি, সেখানকার জ্যোৎস্না, ধূসর শৈলশ্রেণি, নীলগাই, বন্য মহিষ, নানা অরণ্যজাত ফুলের শোভা, ঝরনা ইত্যাদি অনেক কিছুই সত্যচরণের মনে পড়ে। অনেক মানুষের কথাও সত্যচরণের স্মৃতিপটে ভেসে উঠে— কুন্তা, নাটুয়াবালক ধাতুরীয়া, মহাজন ধাওতাল সাহু, রাজু পাঁড়ে, যুগলপ্রসাদ, মটুকনাথ, রাসবিহারী সিং, ছটু সিং, নন্দলাল ওঝা, কবি বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ, দ্রোণ মাহাতো, নক্‌ছেদী ভকত, গানোরী তেওয়ারী, দোবরু পান্না, ভানুমতী ইত্যাদি বহু মানুষের কথা বলেছে সত্যচরণ।

উপন্যাসের কাহিনিতে আমরা দেখতে পাই সত্যচরণের প্রকৃতিবিলাস। সে প্রকৃতির অপরূপ রূপ দেখার জন্য জ্যোৎস্নার আলোঝলমল উন্মুক্ত আকাশের নীচে ঘোড়া নিয়ে ছুটেছে মাইলের পর মাইল। ছুটতে ছুটতে দেখেছে অরণ্যের বহু সরল মানুষ, অরণ্যের বহু ঋতুপরিবর্তন, অরণ্যের জ্যোৎস্না, অরণ্যের মানুষের বিভিন্ন উৎসব। পূণ্যাহ উৎসব, হোলি উৎসবের সুন্দর বর্ণনা আমরা দেখতে পাই 'আরণ্যক'-এ। এই অরণ্যের বিচিত্র লীলার মধ্যে সত্যচরণ ধীরে ধীরে ডুবে যায়। নির্জন অরণ্যই সত্যচরণের ভালো লেগে গেল। মাঝে একবার পাটনা গিয়ে তার মন ছুটে যায় অরণ্যের জন্য।

এমন পরিবেশ পেয়ে সত্যচরণ ভুলে যায় তার উদ্দেশ্য বা কর্তব্য। সে এখানে এসেছে প্রজাবিলির জন্য। ধীরে ধীরে সমস্ত অরণ্য জুড়ে প্রজাবিলি হতে থাকে আর জঙ্গল পরিষ্কার হতে থাকে। নতুন লোকজন এল জঙ্গলে, ঘর বাঁধল, শস্য রোপণ করল এবং নতুন প্রজারা ভয়ানক গোলমাল তৈরি করল। একদিন খবর এল সত্যচরণের কাছে— 'ভীমদাস টোলার উত্তর সীমায় ভয়ানক দাঙ্গা বাঁধিয়াছে।' পরে দাঙ্গা বন্ধ হলেও নাঢ়া বইহারের শান্তি চিরদিনের জন্য নষ্ট হল। সত্যচরণের অনিচ্ছা সত্ত্বেও জমিবিলির কাজ শেষ করে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে চলে আসে শহরে। শহরের কোলাহলের মধ্যে বসে সত্যচরণের আজও মনে পড়ে নাঢ়া বইহার, লবটুলিয়ার অরণ্যপ্রান্তর, সরস্বতী কুণ্ডী এবং সেখানকার মানুষজনের কথা, যারা তার প্রবাসজীবন আনন্দ-বেদনায় ভরিয়ে তুলেছিল।

৮.৪ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

কল্লোল (১৯২৩-১৯২৯) : একটি মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক গোকুলচন্দ্র নাগ ও দীনেশরঞ্জন দাশ। এই পত্রিকা আধুনিক সাহিত্য আন্দোলনের অন্যতম মুখপত্র। উদ্ধত যৌবনের ফেনিল উচ্ছলতা আর সমস্ত বাধাবন্ধনের বিরুদ্ধে নির্ধারিত বিদ্রোহই ছিল কল্লোলের অন্যতম উদ্দেশ্য। এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে একটি সাহিত্যগোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল যাকে 'কল্লোল গোষ্ঠী' নামে চিহ্নিত করা হয়। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র এই গোষ্ঠীর লেখক।

কালিকলম (১৯২৬) : একটি মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। কল্লোল পত্রিকার আদর্শের সঙ্গে এই পত্রিকার আদর্শের একটা মিল আছে। এটি আধুনিক সাহিত্যান্দোলনের ইতিহাসে স্মরণীয় পত্রিকা।

পরিচয় (১৯৩১) : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা। এটি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পত্রিকা। 'সবুজপত্র'-এর পর এরকম উচ্চমানের বাংলা পত্রিকা দুটি নেই বললেই চলে। সুধীন্দ্রনাথের পর পত্রিকার ভার নেন গোপাল হালদার। উল্লেখ্য যে, আধুনিক কালের বহু বিশিষ্ট কবি, ঔপন্যাসিক ও মনীষীবর্গ এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

প্রবাসী (১৯০১) : রমানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত মাসিক বাংলা পত্রিকা। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণ, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ এই পত্রিকার নিয়মিত লেখক। চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের সুন্দর প্রতিলিপি এখানে নিয়মিত প্রকাশিত হত। এই পত্রিকার অন্যতম আকর্ষণ ছিল দেশের রাজনীতি ও সমাজ সম্পর্কিত সমস্যা বিষয়ে রমানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের রচনাগুলি।

বিচিত্রা (১৯২৭-১৯৩৭) : বাংলা মাসিক সাহিত্য পত্রিকা। সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্রা' নামক কবিতাটি দিয়ে এই পত্রিকাটির যাত্রা শুরু হয়। পত্রিকাটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে রবীন্দ্রনাথ জড়িয়ে ছিলেন। তাঁর 'যোগাযোগ' এখানেই প্রকাশিত হয়।

উইলিয়াম শেক্সপিয়র (১৫৬৪-১৬১৬) : ইংল্যান্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার। তাঁর জন্ম হয় অ্যাভন নদীর তীরে স্ট্র্যাটফোর্ড গ্রামে। প্রথম জীবনে তিনি লন্ডনের এক নাট্যশালায় কাজ করেন এবং পরে নাটক লেখা শুরু করেন। তিনি ৩৮টি নাটক রচনা করেন। এর মধ্যে ঐতিহাসিক, মিলনান্ত, বিয়োগান্ত সব ধরনের নাটকই আছে। তাঁর শেষ নাটক 'টেম্পেস্ট'। এছাড়াও তাঁর লিখিত কতগুলি চতুর্দশপদী কবিতাও আছে।

টলস্টয় (১৮২৮-১৯১০) ঃ রাশিয়ার খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও রাজনীতিক। তিনি প্রথমে কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল শিক্ষালাভ করেন এবং পরে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যান। এরপর তিনি গ্রন্থ রচনায় মন দেন। ভগবানে বিশ্বাস ও মানবপ্রেম তাঁর রচনার মূলসূত্র। তাঁর রচিত পুস্তকগুলির মধ্যে 'War and Peace', 'Anna Karenina' ; 'The Cossacks' ; 'The End of the Age' ; 'The Power of Darkness' প্রভৃতি অতি জনপ্রিয়।

কার্ল মার্ক্স (১৮১৮-১৮৮৩) : কমিউনিজ্‌ম্ বা সাম্যবাদের জনক। জার্মানির ট্রেভ্‌স্-এ ইহুদি বংশে তাঁর জন্ম। বন ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ইতিহাস ও দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ১৮৪২ সালে 'The Rhenish Gazette' নামে একটি উদার মতবাদের পত্রিকার সম্পাদক হন। এঙ্গেলসের সহযোগে তিনি 'Manifesto of the Communist Party' খসড়া করেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Critique of Political Economy', 'Das Capital'।

এঙ্গেলস্ (১৮২০-১৮৯৫) : জন্মস্থান জার্মানির বার্মেন শহর। তিনি প্রথমাবধি বৈপ্লবিক মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন এবং জার্মানি-ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে শ্রমিক সংগঠনে নিযুক্ত থাকেন। তিনি প্রসিদ্ধ দার্শনিক কার্লমার্ক্সের সঙ্গে যুগ্মভাবে সমাজতান্ত্রিক মতবাদের প্রতিষ্ঠা করেন।

সিগমু' ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯) : প্রখ্যাত অস্ট্রিয়াবাসী মনস্তত্ত্ববিদ। মানবের স্নায়বিক ও মানবিক ব্যাধি সম্বন্ধে গবেষণা করে বহু নতুন তথ্য আবিষ্কার করেন। মনঃসমীক্ষণ-বিজ্ঞানের তিনি প্রবর্তক। তাঁর অনেক পুস্তকের মধ্যে 'Interpretation of

Dreeams' উল্লেখ্য। ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ১৯০২ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত অধ্যাপক ছিলেন।

ভারতী (১৮৭৭) : একটি মাসিক পত্রিকা, ঠাকুরবাড়ির উদ্যোগে দীর্ঘকাল প্রকাশিত হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন এই পত্রিকার প্রথম সম্পাদক। এই দীর্ঘজীবী পত্রিকায় অনেকে সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেছিলেন— দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্ণকুমারী দেবী, হিরন্ময়ী দেবী, সরলা দেবী, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। এক বছর (১৯০৫) রবীন্দ্রনাথও এর সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। এই পত্রিকার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার আত্মপ্রকাশ ঘটে। তাঁর 'মেঘনাদবধকাব্য'-এর সমালোচনা এই পত্রিকায় প্রকাশ পায়। এছাড়াও তাঁর 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী', 'ভারতী'-র পাতায় প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য যে পরে 'ভারতী'-র সঙ্গে 'বালক' পত্রিকা মিশে গিয়ে নাম হয় 'ভারতী ও বালক' (১৮৮৬)।

সবুজপত্র (১৯১৪) : একটি মাসিক পত্রিকা। রবীন্দ্রনাথের ভাইঝি জামাই প্রমথ চৌধুরী এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। 'সবুজপত্র' ছিল সম্পূর্ণ নিরাভরণ— চিত্র, বিজ্ঞাপন, পাঁচ মিশালি সংবাদ আলোচনা বিসর্জিত পত্রিকা। দেশের অতীত ও বিদেশের বর্তমান— এই দুটি প্রাণশক্তির মিলনের উপর জোর ছিল 'সবুজপত্র'-এর। চিরনবীনতাকে বরণ করে প্রথম সংখ্যাতেই প্রকাশিত হল রবীন্দ্রনাথের 'সবুজের অভিযান' কবিতাটি।

৮.৫ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি

দ্বাদশ বিভাগে দ্রষ্টব্য

৮.৬ প্রসঙ্গ-পুস্তক

দ্বাদশ বিভাগে দ্রষ্টব্য

* * *

বিভাগ-৯
আরণ্যক
আরণ্যক : নিসর্গ-প্রকৃতি

বিষয় বিন্যাস

৯.০ ভূমিকা (Introduction)
৯.১ উদ্দেশ্য (Objectives)
৯.২ আরণ্যক : নিসর্গভাবনা
৯.২.১ বিভূতিভূষণের নিসর্গভাবনা
৯.২.২ আরণ্যক-এর নিসর্গ
৯.৩ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ
৯.৪ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)
৯.৫ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)
৯.৬ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

৭.০ ভূমিকা (Introduction)

সাহিত্যে প্রকৃতির একটি বড়ো ভূমিকা আছে, বিশেষত কবিতায়। রোমান্টিক কবিতায় প্রকৃতির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। রোমান্টিক কবিরা অনেক সময় প্রকৃতিকে মূল 'থিম' বা মূল ভাববস্তু হিসাবে ব্যবহার করেন। কিন্তু উপন্যাসে সেরকম ব্যবহার দেখা যায় না। বস্তুত প্রকৃতিকে কবিতায় যেভাবে ব্যবহার করা হয় উপন্যাসে তেমন হয় না। প্রকৃতি সম্পর্কে কবির নিরীক্ষণ-অনুভব উপন্যাসের ক্ষেত্রে আরোপিত হয় না। উপন্যাসে কাহিনির প্রেক্ষাপট প্রকৃতি হতে পারে; তবে প্রকৃতি যদি পটভূমিতে থাকে, তাকে উপন্যাসটির সমগ্রতার দিক থেকে অপরিহার্য-অবিচ্ছেদ্য হতে হবে। নিছক কোনো স্থানবিশেষের প্রাকৃতিক শিল্পিত বর্ণনা বিচ্ছিন্নভাবে উপন্যাসে কখনো তাৎপর্যপূর্ণ হয় না। উল্লেখ্য যে, উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু মানবজীবন তথা মানবপ্রকৃতি। তাই উপন্যাসে বিশ্বপ্রকৃতিকে মানবজীবন বা মানবপ্রকৃতির সঙ্গে অখণ্ড সম্পর্কসূত্রের নিরিখেই বিচার করতে হবে। এ প্রসঙ্গে প্রকৃতিচেতনার প্রথম বিশিষ্ট রূপকার বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্ধৃতি স্মরণযোগ্য— "কাব্যে অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে যথার্থ সম্বন্ধ এই যে, উভয়ে উভয়ের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, অর্থাৎ বহিঃপ্রকৃতির গুণে হৃদয়ের ভাবান্তর ঘটে এবং মনের অবস্থানবিশেষ বাহ্যদৃশ্য সুখকর বা দুঃখকর বোধ হয়— উভয়ে উভয়ের ছায়া পড়ে। যখন বহিঃপ্রকৃতি বর্ণনীয়, তখন বহিঃপ্রকৃতির

ছায়া-সমেত বর্ণনা তাহার উদ্দেশ্য। যিনি ইহা পারেন, তিনি সুকবি।" (বিদ্যাপতি ও জয়দেব, বিবিধ প্রবন্ধ)। কাব্যসম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তি উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য।

ঔপন্যাসিকের মূল বর্ণনার বিষয় হচ্ছে মানুষ, মানুষের জটিল জীবন। এই জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি লেখকের অভিজ্ঞতা প্রসূত দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভরশীল। জীবনকে বিশ্লেষণের এবং ব্যাখ্যার এই দৃষ্টিভঙ্গি ঔপন্যাসিকের বিশেষ সম্বল। বস্তুত মানুষই ঔপন্যাসিকের বর্ণিতব্য বিষয় হলেও প্রায় সকলেরই পশ্চাদপটে থাকে প্রকৃতি, একটুকরো মাটি ও তার চতুষ্পার্শ্ব। কোনো মানুষের সামগ্রিক চিত্রকে পরিস্ফুট করতে হলে তাকে আবিষ্কার করতে হয় তার পারিপার্শ্ব দিয়ে। এই পারিপার্শ্বের মধ্যে অবলীলায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় প্রকৃতি। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতার নিরিখে কারো সামনে থাকে মানুষ, পশ্চাদপটে প্রকৃতি, আবার অনেক সময় প্রকৃতির অকৃপণ দানের উৎস হয়ে দাঁড়ায় মনুষ্যজাতি।

বস্তুত মানুষ আর প্রকৃতি কেউ কারো থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। মানব জীবনের সৃষ্টির মুহূর্ত থেকে প্রকৃতি ও মানুষ সমান্তরালভাবে দণ্ডায়মান। তবু বলতে হয় পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী, এই পরিবর্তনও ঘটে চলে সূক্ষ্মভাবে। এক সময় প্রকৃতির সান্নিধ্যে ছিল মানুষ, উভয়ের ভেদও ছিল অল্প। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের মধ্যে দূরত্ব সূচিত হয় ফল্গুধারার মতো। কতিপয় সৃষ্টিশীল সৌন্দর্যসন্ধানী এবং প্রকৃতিপ্রেমী ঔপন্যাসিক প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের দূরত্বের বাতাবরণ মোচনের জন্য নিজের সাহিত্যাঙ্গনে প্রকৃতিকে নিয়ে এসেছেন। আকাশের নীলিমা, সবুজ বনজগন্ধসুষমা তাঁদের চিত্তের আকাশকে প্রাণবন্ত করে তোলে। তাঁদের চেতনায় প্রতিফলিত হয় মানুষ আর মানুষের সঙ্গে প্রকৃতি। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসের শিল্পগত প্রয়োজন ও প্রত্যাশা অনুভব করেই প্রকৃতির ভূমিকা যথার্থভাবে নির্ণয় করেছিলেন। সেজন্যই তাঁর উপন্যাসের মানব চরিত্রের স্বরূপ ও পরিণামের সঙ্গে নিসর্গের একটা অঙ্গাঙ্গিভাব লক্ষ করা যায়। বস্তুত তিনি বিশ্বাস করতেন প্রকৃতি ও মানবমনের অপরিহার্য অন্তর্গূঢ় সম্পর্কের রূপটি। এই বিশ্বাসেরই পরিপূর্ণ প্রকাশ 'কপালকুণ্ডলা'-য়। মূলত 'কপালকুণ্ডলা'-তেই বঙ্কিমচন্দ্রের নিসর্গভাবনার সুস্পষ্ট তত্ত্বরূপ বা একধরনের Nature-cult খুঁজে পাওয়া যায়। বলা প্রয়োজন বঙ্কিমচন্দ্রের এই তত্ত্বরূপটি সমুদ্র আর অরণ্যের সমন্বয়ে ঘণীভূত হয়ে শিল্পিতমূর্তি ধারণ করেছে। এই অরণ্য আর সমুদ্রের সমন্বয়ে ঘণীভূত বিশ্বপ্রকৃতির মাঝে যখন কপালকুণ্ডলা নামের মেয়েটি এসে উপস্থিত হল তখন ওই সমুদ্র-অরণ্যের ঘণীভূত রূপের অন্তরাত্মারই বহিঃপ্রকাশ সূচিত হল। সুতরাং বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন সংযোগেই মানবমনের চূড়ান্ত চরিতার্থতা। এই ধরনের ভাবনা বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা চরিত্রকে আশ্রয় করে আশ্চর্য শিল্পমহিমায় অভিব্যক্ত হয়েছে। বোধহয় সেজন্যই প্রমথনাথ বিশী কপালকুণ্ডলা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন— 'কপালকুণ্ডলা নিসর্গ-কন্যা নয়, মূর্তিমতী নিসর্গ Spirit of Nature।

অন্যদিকে প্রকৃতির তেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রবীন্দ্র-উপন্যাসে চোখে পড়ে না। বস্তুত তাঁর উপন্যাসে প্রকৃতির লাবণ্যময় চিত্র থাকলেও প্রকৃতির আত্মিক সত্তার সেরকম স্বকীয় ভূমিকা ফুটে ওঠেনি। রবীন্দ্রনাথের কোনো উপন্যাসের মূল থিমের সঙ্গে প্রকৃতির কোনো গূঢ় যোগ নেই। অন্যদিকে শরৎচন্দ্র ছিলেন মূলত সমাজকেন্দ্রিক মানব-চেতনার রূপকার। সুতরাং তাঁর লেখায় নিসর্গ কোথাও কোথাও ফুটে উঠলেও তেমন কোনো সুসংবদ্ধ নিসর্গ চেতনার প্রকাশ লক্ষ করা যায় না। উল্লেখ্য যে সমালোচকরা এই সময়টাকে বলে থাকেন রবীন্দ্র-শরৎ-শাসিত যুগ, এই সময়ই বাংলা সাহিত্যে আবির্ভাব ঘটে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বস্তুত প্রকৃতিকে উপন্যাসের মূল বিষয়ের অঙ্গিভূত করেই বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণের আগমন। তাঁর মধ্যেই প্রকৃতি-চেতনার এক বিশিষ্ট সুসংবদ্ধ তাৎপর্যপূর্ণ রূপ দেখা গেল। সংশয়-হতাশা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে বিশ শতকের তিনের দশকের জীবনযাত্রা যখন বারুদের ঘ্রাণে আতুর, তখন সেই খণ্ডদৃষ্টি খণ্ডবিশ্বাসের ভয়ঙ্কর মুহূর্তে বিভূতিভূষণ তাঁর সাহিত্যের মাধ্যমে এক শান্ত নির্লিপ্ত নিসর্গভাবনার বিশাল অবকাশ নিয়ে এলেন। সমকালীন তথাকথিত আধুনিক গল্পে-উপন্যাসে যে বাস্তব জীবনকে ধরে রাখার চেষ্টা চলছিল তা বহু পরিমাণে নগরকেন্দ্রিক এবং পাশ্চাত্যের অনুকরণজাত। গ্রামবাংলার রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে বিপুলায়ত মৃত্তিকাস্পর্শী জীবনের স্বাদ রয়েছে তাঁর খোঁজ পেয়েছিলেন বিভূতিভূষণ। এই মাটিঘেঁষা জীবনকে সাহিত্যের পাতায় বাস্তবের রঙে রঙিন করতে গিয়ে তাঁর সৌন্দর্যদৃষ্টিতে ধরা পড়ে অপরূপ নিসর্গচেতনার স্বতন্ত্র অনুভূতি।

'এত পাখী, গাছপালা, নীল আকাশ— এই অপূর্ব সৌন্দর্য এসব যেন আমারই জন্য সৃষ্টি হয়েছে'— 'তৃণাঙ্কুর'-এর পাতায় বিভূতিভূষণের এই উক্তিটির মধ্যে তাঁর নিসর্গভাবনার এক গূঢ় উপলব্ধি ধরা পড়ে। প্রকৃতিকে এত আপন ভাবতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর হাতে প্রকৃতির রূপচিত্র এত দুর্লভ সৌন্দর্যময় উজ্জ্বলতা লাভ করেছে। তবে তা কেবল লেখকের অবজেকটিভ দৃষ্টিভঙ্গি নয়, বিভূতিভূষণের ব্যক্তিমনের অন্তহীন বিস্ময়বোধ মিশে আছে এই দৃষ্টিতে।

আত্ম-সমীক্ষা মূলক প্রশ্ন

উপন্যাসে প্রকৃতি ব্যবহারের তাৎপর্য কী? (৭০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

৯.১ উদ্দেশ্য

বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' উপন্যাসের বর্তমান আলোচনাকে আমরা নবম বিভাগে অন্তর্ভুক্ত করেছি। বক্ষ্যমাণ আলোচনার মূল বিষয়কে আমরা এভাবে বিন্যস্ত করেছি, যাতে—

- উপন্যাসে নিসর্গ ব্যবহারের তাৎপর্য কী, সে বিষয়ে সম্যক ধারণা অর্জন করতে পারবেন।
- বিভূতিভূষণের মনোজগতে নিসর্গভাবনা কীভাবে সঞ্চিত হয়েছিল তা জানতে পারবেন।
- জানতে পারবেন 'আরণ্যক'-এ বিন্যস্ত নিসর্গ সম্পর্কে।

৯.২ আরণ্যক ঃ বিভূতিভূষণের নিসর্গভাবনার আলোকে

বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' উপন্যাসের 'আরণ্যক ঃ নিসর্গ-প্রকৃতি' শীর্ষক দ্বিতীয় অধ্যায়ের উদ্দেশ্য এবং ভূমিকা আলোচনা শেষ করেছি। এবারে আসুন বিভূতিভূষণের নিসর্গভাবনা এবং 'আরণ্যক'-এর নিসর্গ এই দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাক।

৯.২.১ বিভূতিভূষণের নিসর্গভাবনা

প্রকৃতির প্রাণচঞ্চল সত্তা ও সৌন্দর্যের প্রভাব প্রায়ই লক্ষ করা যায় সাহিত্যে। বস্তুত সাহিত্য ও প্রকৃতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। পাশ্চাত্য সাহিত্যের মতো সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যেও প্রকৃতির বৈচিত্র্যময় প্রভাব লক্ষণীয়। যদিও এই প্রকৃতি কাব্যের ক্ষেত্রেই বেশি ব্যবহৃত। কী Wordsworth-Keats, কী সংস্কৃত সাহিত্যের কালিদাস, কী বাংলা সাহিত্যের রবীন্দ্রনাথ— এঁদের কাব্যে আমরা প্রত্যক্ষ করি নিসর্গচেতনার বিচিত্র লীলা। তবু রবীন্দ্রনাথকে একটু ব্যতিক্রম মনে হয়। তাঁর মধ্যে লক্ষ করি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নিসর্গভাবনার সমন্বয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সারা জীবনের কাব্যসাধনার সঙ্গী করেছিলেন এই বৈচিত্র্যপূর্ণ নিসর্গকে; কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে তাঁর উপন্যাসে নিসর্গভাবনা তেমন বিশেষ ভূমিকা পালন করেনি। তাঁর তুলনায় বাংলা উপন্যাসে নিসর্গ প্রেমের এক প্রত্যয় নিয়ে হাজির হলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভূতিভূষণই এমন ব্যক্তিত্ব যিনি বাংলা উপন্যাসে প্রকৃতি চেতনার ঘনরসোপলব্ধিকে সঞ্চারিত করে বাংলা উপন্যাসের সম্ভাবনার জগৎকে করে দিলেন প্রসারিত। দিনের পর দিন এই সম্ভাবনার বীজ বেড়ে চলেছিল তাঁর মানসপটে। বাল্যাবধি অভিযানের আনন্দ রয়েছে বিভূতিভূষণের প্রকৃতিজগতের রহস্যময় পথ-পরিভ্রমণে। এই পরিভ্রমণের ব্যাপারে বিভূতিভূষণের বিস্ময়কর দৃষ্টি আসলে কবির দৃষ্টি। তিনি পথের কবি। অনন্ত পৃথিবীর বিচিত্র জীবনচলার পথে বিভূতিভূষণ পথের বাঁকে বাঁকে যে রাগিণী

শুনেছিলেন, তা দিয়েই বেঁধেছেন গান। বস্তুত একদিকে তিনি কবির গভীর অনুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে অনুভব করেছেন প্রকৃতির বিচিত্র লীলাকে, অন্যদিকে অসাধারণ কথাশিল্পীর দৃষ্টি নিয়ে নিরীক্ষণ করেছেন নরনারীর প্রাত্যহিক জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আনন্দের বিভিন্ন কাহিনি। এই দুয়ের সমন্বয়ে বিভূতিভূষণের মধ্যে বেড়ে উঠেছে এক অসামান্য কথাকার। তাই বিভূতিভূষণের মধ্যে আমরা লক্ষ করি এক দ্বৈতসত্তার অনুরণন। একদিকে তিনি ঔপন্যাসিকের দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন গ্রামবাংলার মাটি ঘেঁষা জীবন, আবার অন্যদিকে বিস্ময়াবিষ্ট কবিমন দিয়ে অনুভব করেছেন প্রকৃতির অনন্ত শিহরণ। বস্তুত এই দুয়ের সমন্বয়েই তাঁর নিসর্গভাবনা বিচার্য। এ প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণ নিজেই লিখেছেন— "বাংলাদেশের সাহিত্যের উপাদান বাংলার নরনারী, তাদের দুঃখদারিদ্র্যময় জীবন, ...।" আবার অন্যত্র বলেছেন "যে কথাটা বারবার নানাভাবে বলিবার চেষ্টা করিতেছি কিন্তু কোন বারই ঠিকমত বুঝাইতে পারিতেছি না, সেটা হইতেছে এই প্রকৃতির একটা রহস্যময় অসীমতার, দুরধিগম্যতার, বিরাটত্বের ও ভয়াল গা-ছম্-ছম্-করানো সৌন্দর্যের দিকটা।" এই দুটি উদ্ধৃতিতে তাঁর দ্বৈতসত্তার পরিচয় মেলে।

বস্তুত বিভূতিভূষণের উপন্যাসে, এমনকি সমগ্র বিভূতিসাহিত্যে প্রকৃতির ভূমিকা খুব বড়ো হয়ে উঠেছে বলেই তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ— তিনি নাকি যুগ সচেতন নন। বাস্তব জীবনের প্রতি নিষ্ঠা তাঁর উপন্যাসে তেমনভাবে দেখা যায় না। আমরা জানি উপন্যাসের মূল ভিত হচ্ছে মানুষ— মানুষের জীবন আর জীবনের জটিল আবর্ত। কিন্তু তিনি নাকি মানুষকে প্রাধান্য না দিয়ে প্রকৃতির আশ্চর্য রূপ এবং প্রকৃতির প্রাণ-সত্তাকে স্পর্শ করতে চেয়েছেন। এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য, সব ঔপন্যাসিককেই এক ছাঁচের নিরিখে বিচার করা যায় না। প্রত্যেক কথাকারের-ই কতগুলো সহজাত প্রবণতা বা প্রবৃত্তি লক্ষ করা যায় শৈশব থেকেই; যা তাঁদের মধ্যে শিকড় গেড়ে বসে বিভিন্ন পারিপার্শ্বের প্রভাবে। তারপর যত দিন যায় বাড়তে থাকে সেই প্রবণতা, আর এই ব্যাপারটি বিভূতিভূষণের ক্ষেত্রে ঘটেছিল মন্ত্রের মতো। সুতরাং আশৈশব এই প্রকৃতিবিলাসীর রচনায় প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্য লক্ষ করা যেতেই পারে।

প্রকৃতির বিচিত্র রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-অনুভূতির আনন্দে বিভূতিভূষণ সর্বদাই আত্মহারা। তাঁর উপন্যাস, ছোটোগল্প, দিনলিপি, ভ্রমণকাহিনি—সর্বত্রই প্রকৃতির অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের ছোঁয়া, শিহরণ। এ ব্যাপারে তাঁর ব্যক্তিজীবনই সমধিক দায়ী। পল্লিবাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে, হুগলির কাছে শাগঞ্জে-কেওটায়, মামারবাড়ি মুরাতিপুরে এবং যশোহর জেলার ব্যারাকপুর গ্রামে বালক বিভূতিভূষণের শৈশব-কৈশোরের দিনগুলি কেটেছে প্রকৃতির সংস্পর্শে। এইসব অনন্ত পথ হাঁটতে হাঁটতে তিনি দেখেছেন বাংলার নরনারী, তাদের দুঃখময় জীবন; বাংলাদেশের ঋতুচক্র, সন্ধ্যা-সকাল, আকাশ-বাতাস, বাঁশবনের আমবনের ফুলবনের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম শিহরণ।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

"তাঁর বিশ্বাস, প্রকৃতিকে, মানুষকে ভালবাসলেই সেই অনন্তে পৌঁছন যায়। অপু বলেছে, 'সে অমর ও অনন্ত জীবনের বাণী, বনলতার রৌদ্রদগ্ধ শাখাপত্রের তিক্ত গন্ধ আনে— নীল শূন্যে বালিহাঁসের সাঁই সাঁই রবে শোনায়।'

প্রকৃতি যে মানুষের মনে অনন্তেরই অনুভূতি আনে সে কথা তিনি দিনলিপিতেও লিখেছেন। 'প্রকৃতির নিরাবরণ মুক্ত রূপের স্পর্শে এই অনুভূতি খোলে। সুপ্ত আত্মা জাগ্রত হয় চৈত্র-দুপুরের অলস নিমফুলের গন্ধে, জ্যোৎস্নাভরা মাঠে, আকন্দ ফুলের বনে, পাখীর বেলা-যাওয়া উদাস গানে, মাঠের দূর পারে সূর্যাস্তের ছবিতে, ঝরা পাতার রাশির সোঁদা সোঁদা শুকনা শুকনা সুবাসে। প্রকৃতি তাই আমার বড় বিশল্যকরণী— মৃত, মূর্ছিত চেতনাকে জাগ্রত করতে অত বড় ঔষধ আর নাই।'

মহাকাল আর প্রকৃতিকে নিয়ে শুধু উপন্যাস নয়, বিভূতিভূষণ 'কুশল পাহাড়ী-কনে দেখা'র মত ছোটগল্পও লিখেছেন। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন, জীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার মধ্যেই তার পরম সার্থকতা। 'জীবনের সার্থকতা অর্থ উপার্জনে নয়, খ্যাতি প্রতিপত্তিতে নয়, লোকের মুখের সাধুবাদে নয়, ভোগে নয়,— সে সার্থকতা শুধু আছে জীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার ভেতরে, বিশ্বের রহস্যকে উপলব্ধি করার আনন্দের মধ্যে।' এই সার্থকতার কথা নিয়েই 'পথের পাঁচালী-অপরাজিত-আরণ্যক'-এর মত উপন্যাস, 'মেঘমল্লার-দ্রবময়ীর কাশীবাস'-এর মত ছোটগল্প। বিভূতিভূষণের কাছে অনন্তের কথা ভাবনাতেই আনন্দ, সব সময় ভেবে যে একটা কিছু সিদ্ধান্ত করতে হবে— তা নাও হতে পারে। ভাবনার এক নিবিড় মুহূর্তে তাঁর মনে হয়, 'আমি অমর আত্মা, আমি দেশকালের অতীত, সকলকেই ভালবাসতে চাই স্বদেশ বিদেশ নির্বিশেষে . . . এই দেশে জন্মেচি, মানুষ হয়েচি— কিন্তু এদেশের সঙ্গে নিজেকে অনেকটা মিশিয়ে দিলেও যেন খানিকটা আছি কৌতূহলী দর্শকের মত...।'

বিভূতিভূষণের সাহিত্যের শান্তরসাশ্রিত স্বভাবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তার অনিবার্য রূপ বা টেকনিক। সে রূপ কালে কোথাও অপরাহ্ন-জ্যোৎস্নারাত্রির রূপ, স্থানে কোথাও পথপ্রান্তর-নদীর রূপ। তাঁর স্বভাবের মধ্যে যে ছায়াচ্ছন্ন উদাসীনতার ভাব আছে তা অপরাহ্নের আলোতে যতখানি ফোটে দিনের আর কোন সময়েই তাকে এত সুন্দর করে আভাসিত করা যায় না।"

[বিভূতিভূষণ : জীবন ও সাহিত্য : সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়]

নির্জন আকাশ, উধাও মাঠ আর নদী তীরের নিঃসঙ্গ নির্জন সাহচর্যে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে ঘটেছিল তাঁর প্রথম অন্তরঙ্গ পরিচয়। এটাই কবি চেতনার প্রথম ঊষালগ্ন। বালক বিভূতিভূষণের শৈশবের সেই বিস্ময়াবিষ্ট মুহূর্তগুলির সূক্ষ্ম অনুভূতি পরবর্তি রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে। বস্তুত বিচিত্র নিসর্গের বৈচিত্র্যময় রহস্যালোকেই

পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়। প্রকৃতির প্রতিটি স্পন্দনকে, প্রতিটি ঋতুবদলকে তিনি ধারণ করেছিলেন তাঁর সূক্ষ্ম অনুভূতিপ্রবণ মনের মাঝে। আর তারই প্রভাবে জীবন সম্পর্কেও তাঁর ধারণা লাভ করেছিল এক বিচিত্র মহিমা।

পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে প্রকৃতির একটি বড়ো ভূমিকা রয়েছে। বস্তুত পৃথিবীর সঙ্গে প্রকৃতির বন্ধন অচ্ছেদ্য। তাই সাহিত্যিকের কলমে অনায়াসেই ধরা দেয় লীলাময়ী প্রকৃতি। যখন পৃথিবীর বুকে ছিল না নগর— নাগরিক জীবনের বিভিন্ন জটিল আবর্ত, তখন শুধু ছিল আকাশ, অরণ্য, পাহাড় আর ধু-ধু প্রান্তর। এই সবই ছিল শিল্পপ্রেরণার প্রধান অবলম্বন। তারপর সময় অনেক গড়িয়েছে, মানুষ হয়েছে সভ্য সমাজবদ্ধ। ফলে সাহিত্যে প্রকৃতির স্থান দখল করল নগর, নাগরিক সভ্যতা, সৃষ্টি হল আধুনিক সাহিত্য। কিন্তু এই পরিবেশে দাঁড়িয়েও বিভূতিভূষণের একমাত্র পরিচয় তিনি মানুষের কথাকার হয়েও হয়ে উঠেছেন প্রকৃতির কথাকার। তাঁর এক গুণগ্রাহী বন্ধু তাঁর কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, ছোটোবেলা থেকেই বিভূতিভূষণ মানুষের চেয়ে প্রকৃতির সঙ্গ অনেক বেশি ভালোবাসতেন। বালকবয়সে তিনি দিনের পর দিন লোকালয় থেকে বহুদূরে নির্জন ইছামতীর তীরে দাঁড়িয়ে আপন মনে গল্প বলে যেতেন। এই সামান্য ঘটনা আমাদের অনায়াসে বুঝিয়ে দেয় প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্কের কথা। বাল্যাবধি প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক সারা জীবনব্যাপী সাহিত্যে ছড়িয়ে রয়েছে। তিনি আজীবন বনে-পাহাড়ে যাযাবর পথিকের মতো ঘুরেছেন এবং প্রকৃতির অমৃত-স্পর্শ নিরন্তর লাভ করেছেন। এরই চিহ্ন আমরা খুঁজে পাই 'হে অরণ্য কথা কও'; 'বনে পাহাড়ে', 'অভিযাত্রিক', 'ঊর্মিমুখর' প্রভৃতি গ্রন্থে। এ প্রসঙ্গে 'তৃণাঙ্কুর'-এর একটি উদ্ধৃতি উল্লেখযোগ্য— "মাথার ওপর কেমন পাখীরা ডাকচে— ফিঙে, দোয়েল, চোখ-গেল— আর একটা কি পাখী— পিড়িং পিড়িং করে ডাকচে, কত কি অস্ফুট কলকাকলী— কি ভালই লাগে এদের বুলি... !"

আজ বৈকালে হাট থেকে এসে কুঠির মাঠে অনেকক্ষণ বসলুম। শিমূল-গাছের এত অপরূপ শোভা তা তো জানতাম না। ঝোপের মাথায় মাথায় কি নতুন কচি লতা সাপের মত খাড়া হয়ে আছে। মন পরিপূর্ণ হয়ে গেল সৌন্দর্যের ভারে— চারিধারে চেয়ে— এই প্রকৃতির সঙ্গে, পাখীর গানের সঙ্গে মানুষের সুখ-দুঃখের যোগ আছে বলেই এত ভাল লাগে। গ্রাম-প্রান্তরে সন্ধ্যাছায়াচ্ছন্ন বেণুবনশীর্ষের দিকে চেয়ে মনে হল ওদের সঙ্গে কতদিনের কতস্মৃতি যে জড়িত— সেই বর্ষার রাতে দিদির কথা, মায়ের কত দুঃখ, আতুরী ডাইনীর ব্যর্থতা, পিসিমা ইন্দির ঠাকরুণের, —কত সমুদ্রে যাওয়ার স্মৃতি (লক্ষণীয় : মাথার... কখনী—) সেই পিটুলিগোলাপানকারী দরিদ্র বালকের, পল্লীবালা জোয়ানের, কতকাল আগের সে-সব ইংরাজ বালক-বালিকার, গাং-চিল পাখীর ডিম সংগ্রহ করতে গিয়ে যারা বিপন্ন হয়েছিল— Cape Wan-এর ওদিকে গিয়ে যারা আর ফেরেনি- কত কি, কত কি।

নদীজলও আজ লাগল অদ্ভুত— শান্ত সন্ধ্যা— কেউ নেই ঘাটে, ওপারের

গাছপালায় ধূসর সন্ধ্যা নেমেচ— একটি নক্ষত্র উঠেচে মাথার ওপর— কোনো অনন্ত দেশের বাণীর মত এই শত দৈন্যসংকীর্ণতাময় সংসারের ঊর্ধ্বে জ্বল জ্বল করে জ্বলচে।

এখানকার বৈকালগুলো কি অপূর্ব! এত জায়গায় তো বেড়িয়েচি, ইসমাইলপুর, ভাগলপুর, আজমাবাদ— কিন্তু এখানকার মত বৈকাল আমি কোথাও দেখেচি বলে মনে হয় না— বিশেষ করে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের মেঘহীন বৈকালগুলি— যেদিন সূর্য অস্ত যাবার পথে মেঘাবৃত না হয়, শেষ রাঙা আলোকটুকু পর্যন্ত বড় গাছের মগ্‌ডালে হালকা সিঁদুরের পোঁচের মত দেখা যায়— সেদিনের বৈকাল। গাছের ও বাঁশবনের ঘন ছায়ায় চাপা আলো, ভাঁশা খেজুর ও বিল্বপুষ্পের অপূর্ব সুরভি মাখানো, নানা ধরনের পাখী-ডাকা, মিষ্ট সে বৈকালগুলিতে এমন সব আদ্ভুত ভাব মনে এনে দেয়, দু-একটা পাখী ধাপে ধাপে সুর উঠিয়ে কোথায় নিয়ে তোলে— কি উদাস, করুণ হয়ে ওঠে তখন চারিদিকের ছবিটা, বিশেষ করে আমি যখন আমাদের ভিটে ও ঠাকুরমাদের বেলতলাটায় গিয়ে খানিকক্ষণ বসেছিলাম, তখন— তার আর বর্ণনা দেওয়া যায় না। আজ জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ, কিন্তু এখনও বিল্বপুষ্পের গন্ধ সর্বত্র, পাখীর ডাকের তো কথাই নেই— সোঁদালিফুল এখনও আছে, তবে পূর্বাপেক্ষা যেন কিছু কম। আমাদের বাগানে এখনও আম আছে, আজ সকালে নদী থেকে আসবার পথে লক্ষ্য করে দেখলাম, এখনও লোক তলায় তলায় আম কুড়ুচ্চে।

এ সৌন্দর্য ছেড়ে কোথাও নড়তে ইচ্ছে করে না। তা ছাড়া ভেবে দেখলাম, যত স্থানে বেড়িয়েচি, আনন্দ সব চেয়ে বেশী গাঢ় ও উদাস ভাবে পাচ্চি শুধু এই এখানে— কোনো Cosmic thoughts আটকায় না, বরং স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হয়— খুব ভাল করে ফোটে। তবে এই অপূর্ব সৌন্দর্যের মধ্যে দিনরাত ডুবে থাকা যায় বলেই এখানে কোনো শ্রমজনক কাজ করা সম্ভব হয় না দেখলুম। বিকেল হতে না হতে কেবল মন আন্‌চান্ করে— রাত্রিতে কাজে মন বসে না— এ যেন Land of Lotus-eaters. কোনো শ্রমসাধ্য কাজ এখানে সম্ভবপর নয়, সেই জন্যই কলকাতা ফিরতে চাচ্চি দু-একদিনের মধ্যে। আজকাল দিনগুলো একেবারে মেঘমুক্ত, রাত্রি জ্যোৎস্নায় ভরা, সকালগুলি স্নিগ্ধ, পাখীর ডাকে ভরপুর আর বৈকাল তো ওইরকম স্বর্গীয়, এ পৃথিবী নয় যেন— তবে আর লিখি কখন?" —বস্তুত প্রকৃতি সম্পর্কে এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবনা বিভূতিভূষণের মনেই দোলা দিতে পারে।

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

(১) বিভূতিভূষণের মধ্যে দ্বৈতসত্তার অনুরণন লক্ষ্য করা যায় কি? (৭০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

(২) বিভূতিভূষণের বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি যুগ সচেতন নয়— কেন? (৮০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

(৩) প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-অনুভূতির আনন্দে বিভূতিভূষণ সর্বদা আত্মহারা— তাৎপর্য বিশদ করুন। (৮০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

আশৈশব বিভূতিভূষণের প্রকৃতিদর্শন শুধু দেখা নয়, তিনি প্রকৃতিকে নিয়ে ভেবেছেন, প্রকৃতিকে অনুভব করেছেন। তবেই প্রকৃতি তাঁর কাছে ধরা দিয়েছে। বিভূতিভূষণ আসলে বিশ্বাস করতেন প্রকৃতির চেতনসত্তাকে। তিনি মানুষের জীবনের সঙ্গে প্রকৃতির সত্তাকে মিলিয়ে ফেলেন না। তিনি দ্বৈতবাদীর মতো বিশ্বাস করেন প্রকৃতি আর মানুষ পৃথক, দুটোই স্বাধীন অস্তিত্বের অধিকারী। আর এই স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই বিভূতিভূষণ প্রকৃতির একটা স্বতন্ত্র রূপ-সৌন্দর্য বেশি করে ফোটাতে পেরেছিলেন। প্রকৃতির স্বতন্ত্র রূপ-সৌন্দর্যের দিকটা সন্তোষকুমার ঘোষ সুন্দর অনুভব করেছিলেন। তিনি কিশলয় ঠাকুরের 'পথের কবি' গ্রন্থের ভূমিকা করতে গিয়ে বিভূতিভূষণ সম্পর্কে লেখেন— "বিভূতিভূষণ নইলে আমরা কালকাসুন্দি, ঘেঁটু, পুঁই, মুথাঘাস, কাশ, শরবন, শালুক, শ্যাওলা, ডুমুর, চালতা, গোলঞ্চ, হেলেঞ্চা, কলমি প্রভৃতির সবুজে যে এত রঙ, এত মনোরম সুবাস, তা কোনও দিন জানতে পেতাম কি? মহাকবি তো 'নাম-না-জানা তৃণকুসুম' বলেই ক্ষান্তি দেন। তাদের নামে নামে চিহ্নিত করলেন বিভূতিবাবু। রঙ আর গন্ধকে শব্দে শব্দে, বর্ণে বর্ণে চোখের সমুখে উপস্থিত করলেন। সেই শব্দ রূপবান হল। তারা অকাতর বাসও বিলোতে থাকল। শব্দেরও যে ঘ্রাণ আছে, আমরা জানলাম, পেলাম, বুক ভরে নিলাম।

আর অরণ্য? বিভূতিভূষণের অরণ্য কোনও শৌখিন সাফারির আলতো ভালো লাগা নয়। এই নীল অরণ্য দূর হতে শিহরে না। একেবারে কাছে আসে, তার পত্রপ্রচ্ছায়, তার ভয়ংকর সত্তা দিয়ে আমাদের আবৃত করে, আমাদের মধ্যে মিশে যায়।"

রবীন্দ্রনাথের মতো বিভূতিভূষণও বিশ্বাস করতেন প্রকৃতির মধ্যে এক নিগূঢ় প্রাণসত্তা রয়েছে, কিন্তু তবু বলতে হয় প্রকৃতির ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্যও আছে। যদিও দুজনের মধ্যেই দেখা যায় প্রকৃতি আর মানুষ এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে

বাঁধা। কিন্তু সেই সঙ্গে বিভূতিসাহিত্যের একটু বেশি পাওনা প্রকৃতির অন্য একটি রূপ। সে রূপ ঋতুতে ঋতুতে রং বদলায় এবং অরণ্য-পশু-পক্ষী নিয়ে এক স্বয়ংসম্পূর্ণ মনুষ্যসম্পর্ক-নিরপেক্ষ সজীবতা সৃষ্টি করে। এছাড়াও রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিভাবনায় যতটা দার্শনিক ও তত্ত্বাশ্রয়ী, রূপরচনায় চিন্তাশীল ও পরিমার্জিত, সে তুলনায় বিভূতিভূষণ অগোছালো। প্রকৃতিভাবনায় বিভূতিভূষণ বিস্মিত ও মুগ্ধ এক চিরকিশোর। ফলে রূপরচনায়ও তিনি অগোছালো। তবু বলতে হয় বিভূতিভূষণের 'প্রকৃতিও এক পরম ঐশী চেতনায়, ভাগবতী অস্তিত্বে স্পন্দিত।' অচিন্ত্য সেনগুপ্ত বিভূতিভূষণকে কল্লোল-যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক লেখক বলেছেন, 'অন্নদাশঙ্কর যেমন একজন বিরল সাহিত্যিক যার সান্নিধ্যে গিয়ে বসলে আধ্যাত্মিকতার এক সুঘ্রাণ পাওয়া যায়, তেমনি আর একজনকে দেখেছি। সে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।' বস্তুত 'পথের পাঁচালী'র সোনাডাঙা মাঠের আর 'আরণ্যক'-এর সরস্বতী কুণ্ডীর তীরের বর্ণনায় রূপময়ী প্রকৃতির পর্যবেক্ষণ ও চিত্রাঙ্কণ থাকলেও বিভূতিভূষণ এদের ছাড়িয়ে আমাদের নিয়ে গেছেন প্রকৃতির নিগূঢ় প্রাণসত্তার খোঁজে। তাঁর দৃষ্টি শান্ত ও কোমল, ফলে তাঁর প্রকৃতিও স্নিগ্ধ ও মধুর। যদিও 'বনে-পাহাড়ে', 'হে অরণ্য কথা কও', 'আরণ্যক' ইত্যাদি গ্রন্থে প্রকৃতির রুক্ষরূপ ও নিষ্ঠুর স্বভাব কিছু কিছু জায়গায় প্রকাশ পেয়েছে, তবুও বলব তাঁর নিসর্গভাবনায় ধরা পড়েছে স্নিগ্ধতা ও মধুরতা। বস্তুত রুক্ষতা আর কোমলতা— এই দুয়ে মিলেই বিভূতিভূষণের নিসর্গভাবনা পূর্ণতায় উপনীত। কেননা 'পথের পাঁচালী'-র গ্রামবাংলার সবুজঘেরা রোমান্টিক প্রকৃতির সঙ্গে 'আরণ্যক'-এ বর্ণিত বিহারের পাহাড় ও ঘন জঙ্গলের ভয়াল-রুক্ষ প্রকৃতি সে কথাই প্রমাণ করে। নিসর্গের এই রূপের মধ্যে বিভূতিভূষণ খুঁজেছেন আধ্যাত্মিকতার শীতল স্পর্শ।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

"জীবনের মতই বিভূতিভূষণের নিসর্গপ্রকৃতিও প্রধানতঃ শান্তরসাশ্রিত। সে শান্তরস কোথাও পল্লিপ্রকৃতির ঘরোয়া স্নিগ্ধতায়, কোথাও আরণ্যপ্রকৃতির রহস্যময়তায়। শান্তরসাশ্রিত পল্লিপ্রকৃতির রূপ 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত' (১ম অংশ), 'দৃষ্টিপ্রদীপ' প্রভৃতি গ্রন্থে, আরণ্যপ্রকৃতির রূপ 'অপরাজিত', (মধ্যপ্রদেশ ভ্রমণের অংশ), 'আরণ্যক', 'হে অরণ্য কথা কও', 'বনে-পাহাড়ে' প্রভৃতি গ্রন্থে। প্রকৃতির সজীব সত্তার প্রতি পরম বিস্ময়ের ফলে শান্তরসের ভারে নম্র বিভূতিভূষণের দৃষ্টি কখনও স্নিগ্ধ, কখনও বিস্ময়-বিস্ফারিত। এই বিস্ময় প্রকৃতির ক্রূরতাকে আশ্রয় করেও আসতে পারত, কিন্তু আসেনি তার কারণ বিভূতিভূষণের স্বভাব। ক্রূরতা ও ভয়াল সৌন্দর্য দেখান যেত যে- আরণ্যপ্রকৃতিতে সেই আরণ্যপ্রকৃতিও বিভূতিভূষণের দৃষ্টিভঙ্গির ফলে আংশিক ও স্নিগ্ধ হয়ে দেখা দিয়েছে। তাই প্রথম বিশী লিখেছেন, 'পাহাড়-পর্বত, অরণ্য ও বন্ধুর ভূখণ্ড— কোনটারই ভীমকান্ত সৌন্দর্যকে কবি দেখান নাই, কারণ তিনি দেখেন নাই। তাহাদের স্নিগ্ধ ও সুন্দর

দিকটাই তিনি দেখিয়াছেন ও আঁকিয়াছেন।' তবে প্রকৃতির রুক্ষ, নির্মম রূপ তিনি যে একেবারেই দেখাননি তা নয়, 'আরণ্যক'-এর দাবাগ্নির দৃশ্যে, ডামাবাণুর ও সরস্বতী কুণ্ডীর কাহিনীতে সে রূপ রয়েছে। রোম্যান্টিকের স্বপ্ন থেকে মরমীর তত্ত্ব উপলব্ধিতে বিভূতিভূষণের জীবনবোধের উত্তরণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রকৃতি-বোধেরও উত্তরণ ঘটেছে। এদিক থেকে 'পথের পাঁচালী'-র প্রকৃতির সঙ্গে 'অপরাজিত-আরণ্যক'-এর প্রকৃতির এক সজাতীয় ভেদ আছে। 'পথের পাঁচালী'র রোম্যান্টিক প্রকৃতি 'অপরাজিত-আরণ্যক'-এ মরমীর তত্ত্বদৃষ্টিতে মিস্টিক প্রকৃতি হয়ে উঠেছে। 'পথের পাঁচালী'র সোনাডাঙা মাঠ, গৃহত্যাগী উদাসী বাউলের মত কাঁচামাটির পথ যেখানে সুদূরের আভাস আনে, 'অপরাজিত-আরণ্যক'-এর প্রকৃতি সেখানে রৌদ্রদগ্ধ শাখাপত্রের তিক্ত গন্ধে অনন্তের বাণী আনে, মেঘ-থমকান সন্ধায় মুক্তপ্রান্তরে সীমাহীনতার স্বপ্ন জাগায়। বিভূতিভূষণ বিশ্বাস করেন এই বিরাট বিশ্বপ্রকৃতি হৃদয়হীন নয়, তা মানুষকে ভালবাসে, দয়া করে, দুঃখে সহানুভূতি দেখায়। মানুষের তরফ থেকে প্রকৃতির হৃদয়ে সাড়া জাগানোর উপায় প্রকৃতির সেবা। এই সেবা প্রকৃতিকে উপভোগ করার মধ্যে। 'অনেক দিন ধরিয়া প্রকৃতির সেবা না করিলে কিন্তু সে দান মেলে না। . . . অনন্যমনা ইহয়া প্রকৃতিকে লাইয়া ডুবিয়া থাকো, তাঁর সর্ববিধ আনন্দের বর, সৌন্দর্যের বর, অপূর্ব শান্তির বর তোমার উপর অজস্রধারে এত বর্ষিত হইবে, তুমি দেখিয়া পাগল হইয়া উঠিবে, দিনরাত মোহিনী প্রকৃতিরাণী তোমাকে শতরূপে মুগ্ধ করিবেন, নূতন দৃষ্টি জাগ্রত করিয়া তুলিবেন, মনের আয়ু বাড়াইয়া দিবেন, অমরলোকের আভাসে অমরত্বের প্রান্তে উপনীত করাইবেন।' কিন্তু মানুষ যে প্রকৃতিকে উপভোগের পরিবর্তে এর মুক্ত সৌন্দর্যকে ধ্বংস করছে, বিভূতিভূষণের বিশ্বাস তার ফলে প্রকৃতি একদিন মানুষের ওপর প্রতিশোধ নেবে, আবার আদিম অরণ্য ফিরে আসবে।"

[বিভূতিভূষণ : জীবন ও সাহিত্য; সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়]

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

১। নিসর্গভাবনায় রবীন্দ্রনাথ ও বিভূতিভূষণের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? (৮০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

১। রুক্ষতা আর কোমলতা নিয়েই বিভূতিভূষণের নিসর্গভাবনা— বিশদ করুন। (৮০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

১। বিভূতিভূষণের নিসর্গভাবনা এক ঐশী চেতনায়, ভাগবতী অস্তিত্বে স্পন্দিত— আলোচনা করুন। (৮০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

৯.২.২ 'আরণ্যক'-এর নিসর্গ

আমরা বিভূতিভূষণের নিসর্গভাবনামূলক আলোচনা শেষ করেছি। এবারে আসুন আরণ্যক-এর নিসর্গ নিয়ে বিভূতিভূষণের চিন্তাভাবনা এবং এর প্রয়োগকৌশল সম্পর্কে আমাদের বর্তমান আলোচনায় ব্রতী হই।

বিভূতিভূষণের মনোজগতে নিসর্গভাবনার শিকড় কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল আমরা মোটামুটি সে বিষয়ে একটা ধারণা করতে পেরেছি। এই নিসর্গভাবনার এক বড়ো দৃষ্টান্ত 'আরণ্যক'। সমালোচক সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় জানাচ্ছেন— "বাংলা সাহিত্যে 'আরণ্যক'-ই অরণ্যকে নিয়ে লেখা প্রথম উপন্যাস। 'আরণ্যক' শুধু অরণ্যবর্ণনা নয়, তার সত্তারও পরিচয়।" সমালোচক এখানে বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' সম্পর্কে একটি খাঁটি কথা বলেছেন— 'সত্তারও পরিচয়'। এই অরণ্যের সত্তাকে ধরার জন্য বিভূতিভূষণের কত অস্থিরতা। —'আরণ্যক'-এর একখানে তিনি জানাচ্ছেন— "যে কথাটা নানাভাবে বলিবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু কোন বারই ঠিক মত বুঝাইতে পরিতেছিনা, সেটা হইতেছে এই প্রকৃতির একটা রহস্যময় অসীমতার, দুরধিগম্যতার, বিরাটত্বের ও ভয়াল গা ছম-ছম করানো সৌন্দর্যের দিকটা।" বস্তুত 'আরণ্যক' উপন্যাসে আমরা প্রকৃতির এই রূপই দেখতে পাই।

বিভূতিভূষণ তাঁর প্রথম গল্প 'উপেক্ষিতা'-য় প্রকৃতিপ্রেমের পরিচয় দিয়েছেন। 'উপেক্ষিতা' সম্পর্কে সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন— "মুখ্যতঃ যে তিনটি উপাদানে বিভূতিভূষণের সাহিত্যিকমানস গড়ে উঠেছে সে তিনটি উপাদান— সাধারণ মানুষ, প্রকৃতি ও অধ্যাত্ম। এই তিনটি উপাদান বীজাকারে তাঁর প্রথম রচনা 'উপেক্ষিতা'তেই প্রকাশিত হয়।" এই তিনটি উপাদানের মধ্যে প্রকৃতি প্রধান হয়ে উঠেছে 'আরণ্যক' উপন্যাসে। 'উপেক্ষিতা'-র ছ-বছর পর বিভূতিভূষণ বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী উপন্যাস 'পথের পাঁচালী' রচনা করে সকলকে বিস্ময়াবিষ্ট করে দিলেন। বড়ো একটা বই, অথচ আকর্ষণীয় কাহিনি নেই; অত্যন্ত সাদামাটা একটা গ্রাম্যপরিবেশে বড়ো হওয়া একটা বালকের গল্প, তার চারদিকের পরিবেশ। —এই তো 'পথের পাঁচালী'। তাছাড়াও বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ের যে আভাস বিভূতিভূষণ

'পথের পাঁচালী'তে দিলেন সেটা বাংলা সাহিত্যে নতুন নয়। কিন্তু বিভূতিভূষণের জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিটাই আলাদা। এখানে রবীন্দ্রনাথের উক্তি স্মরণযোগ্য— "পথের পাঁচালীর আখ্যানটা অত্যন্ত দেশী। কিন্তু কাছের জিনিসেরও অনেক পরিচয় বাকি থাকে। . . . পথের পাঁচালী যে বাংলা পাড়াগাঁয়ের কথা, সেও অজানা রাস্তায় নতুন করে দেখতে হয়।" এই 'অজানা রাস্তায় নতুন করে' দেখার মধ্যেই বিভূতিভূষণের কৃতিত্ব। তাই 'পথের পাঁচালী' কালজয়ী। বস্তুত 'পথের পাঁচালী'-র গল্প বলতে বলতে বিভূতিভূষণ যে কখন আমাদের আমের আর কাঁঠালের গন্ধে ম-ম করা বাংলাদেশের পড়াগাঁয়ে ঢুকিয়ে ফেলেন তা আমরা বুঝতেও পারি না। হঠাৎ চমক ভেঙে দেখতে পাই এত আমাদেরই অতি পরিচিত পাড়াগাঁয়ের ছবি। অনেক ঔপন্যাসিকই এ ছবি তুলে ধরেছেন, তবু বিভূতিভূষণ যেন একটু আলাদা। কারণ বাংলার ঋতুচক্র, বাংলার সন্ধ্যাসকাল, আকাশ-বাতাস, ফল-ফুল, বাঁশবনের আমবাগানের নিভৃত ছায়ায় যেরা বাংলার নরনারীর দুঃখদারিদ্র্যময় জীবনকে এক স্বতন্ত্র ভাবধারায় পরিবেশন করেছেন বিভূতিভূষণ। 'তৃণাঙ্কুর' গ্রন্থে বিভূতিভূষণের এই স্বতন্ত্র ভাবধারার একটা আভাস পাওয়া যাবে— 'আমরা জীবনে এমন একটা জিনিস পেয়েচি, যা আমাদের এক মুহূর্তে সাংসারিক শান্তিদ্বন্দ্বের ওপরে এক শাশ্বত, আনন্দ-জীবনের স্তরে উঠিয়ে দিতে পারে।' সেজন্যই মনে হয় বিভূতিভূষণের সাহিত্যে দারিদ্র্যের জীবনচিত্র আছে, কিন্তু সে দারিদ্র্য জ্বালারহিত। কারণ সেই দারিদ্র্যের মধ্যেও বিভূতিভূষণ দেখেছেন আনন্দ— শাশ্বত আনন্দ। এই আনন্দ তাঁর জীবনে, সাহিত্যে স্বতোৎসারিত— 'আসল আনন্দ জোর করে মনকে বুঝিয়ে, তর্ক করে আনতে হয় না— সে সহজ অর্থাৎ spontaneous।' এই আনন্দের কথা তিনি দিনলিপিতেও বলেছেন— "জগতে অসংখ্য আনন্দের ভাণ্ডার উন্মুক্ত আছে। গাছপালা, ফুল, পাখী, উদার মাঠঘাট, সময়, নক্ষত্র, সন্ধ্যা, জ্যোৎস্নারাত্রি, অস্তসূর্যের আলোয় রাঙা অনন্তের মহিমা, আলোকময়ী উদার শূন্য— এসব থেকে এমন সব বিপুল, অব্যক্ত আনন্দ, অনন্তের মহিমা প্রাণে আসতে পারে— সহস্র বৎসর ধরে তুচ্ছ জাগতিক বস্তু নিয়ে মত্ত থাকলেও সে বিরাট অসীম, শান্ত উল্লাসের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই কোনো জ্ঞান পৌঁছয় না। . . . সাহিত্যকারের কাজ হচ্ছে এই আনন্দের বার্তা সর্বসাধারণের প্রাণে পৌঁছে দেওয়া।" —সর্বসাধারণের প্রাণে এই আনন্দের বার্তা পৌঁছে দেবার জন্যই তাঁর সাহিত্যে প্রকৃতির এত বড়ো ভূমিকা। তাই তাঁর 'পথের পাঁচালী' বা 'অপরাজিত'-এ, 'আরণ্যক' বা 'ইছামতী'-তে সমকালীন সমাজ-রাষ্ট্রের ভাঙাগড়ার কোলাহলের পরিবর্তে শোনা যায় প্রকৃতির নিভৃত ছায়ার মৃদু শিহরণ। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে— 'পথের পাঁচালী'-র নিসর্গ গ্রাম-প্রকৃতি, তা রোমান্টিক, তা শিশু-কিশোরের মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখা। 'আরণ্যক'-এর প্রকৃতি বস্তুনিষ্ঠ, মানবিক আবেদন-মুক্ত, রুক্ষ, ভয়াল, নির্মম প্রকৃতি, তা মানুষের সুখ-দুঃখে উদাসীন— ... দুয়ে মিলে বিভূতিভূষণের প্রকৃতি-দৃষ্টি পূর্ণতায় উপনীত। বিভূতিভূষণের প্রকৃতিচেতনার কথা বলতে গেলে 'পথের পাঁচালী'-র গ্রামবাংলার সবুজ ঘরোয়া রোমান্টিক প্রকৃতির সঙ্গে বিহারের পাহাড় ও ঘন জঙ্গলের ভয়াল প্রকৃতির কথাও

বলতে হবে। দুয়ে মিলে বিভূতিভূষণের প্রকৃতি-চেতনা সম্পূর্ণতায় উপনীত।"

বস্তুত ব্যক্তিগত অনুভূতি ও উপন্যাসের প্রকৃতিভাবনার নিরিখে বিচার করলে দেখা যাবে ব্যক্তি বিভূতিভূষণ ও ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণের মধ্যে তেমন ভিন্নতা নেই। সারল্য ও সততাকে মূলধন হিসাবে ব্যবহার করে দুজনেই শিশুর সরল বিস্ময়াবিষ্ট দৃষ্টি নিয়ে উপভোগ করেছেন প্রকৃতির শাশ্বত আনন্দ। আনন্দের সন্ধান পিয়াসী বিভূতিভূষণের মনের সৌন্দর্যরসে জারত হয়ে 'আরণ্যক'-এর রুক্ষ-ভয়াল প্রকৃতিও শাশ্বত আনন্দের প্রতিমূর্তি। প্রকৃতির বিচিত্ররূপ আর মানুষের বিচিত্রভাব মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় বিভূতিভূষণের দৃষ্টিতে। 'আরণ্যক'-এর প্রকৃতিও সেভাবেই বিচার্য।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

"উপনিষদের আর এক নাম 'আরণ্যক'। উপনিষদের অর্থ 'রহস্যগ্রন্থ', বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' গ্রন্থেও দেখি, অরণ্যের গহন গভীর সৌন্দর্যরহস্য ধীরে ধীরে পাঠক চিত্তকে বিহ্বল করে তুলেছে। এই কাহিনীর যিনি সূত্রধার, তিনি নাগরিক পরিবেশে লালিত উচ্চশিক্ষিত যুবক। সুতরাং তার চোখে ওই বন্য আদিম অসম্বৃত প্রকৃতি প্রথমে বিতৃষ্ণা ও ভয়, তারপর ক্রমশ বিস্ময়-বিহ্বল রোম্যান্টিক পিপাসা জাগিয়েছে। সবশেষে এই প্রকৃতির অন্তর্লীন অতীন্দ্রিয় রহস্যচেতনা ওই মানুষটির মনকে আধ্যাত্মিক ও 'মিষ্টিক' বোধের আলোয় উদ্ভাসিত করে তুলেছে। সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির মর্মাশ্রয়ী এক নিবিড় অখণ্ড চৈতন্যশক্তির অনুভবে তাঁর হৃদয় শান্ত হয়েছে। ওই নিবিড় অরণ্য-প্রকৃতিকে তাঁর মনে হয়েছে যেন কোন এক মহান কবির আশ্চর্য শিল্প-রচনা। উপনিষদের ঋষির মতো তিনিও যেন সমস্ত পাঠককে আহবান করেছেন সেই নিবিড় শাশ্বত সৌন্দর্যের রহস্য-রসে অবগাহন করার জন্যঃ 'পশ্য দেবস্য কাব্যম্ ; ন মমার ন জীর্যতি।'

শুধু প্রকৃতি নয়, 'আরণ্যকে' ওই আরণ্য প্রকৃতির কোলে লালিত মানুষের কাহিনীও আছে। অরণ্যের জটিল অন্ধকারের মধ্যেও লেখক আলোর রেখা দেখতে পেয়েছেন। সে আলো প্রাণের। মানবপ্রাণের, মনুষ্যত্বের। অসংখ্য বিচিত্র নরনারী 'আরণ্যকে'র বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের মধ্যে যথাযোগ্য স্থান পেয়েছে, অন্ধসংস্কারাচ্ছন্ন সরলবিশ্বাসী গণু মাহাতো, উদাসীন ধার্মিক প্রকৃতির রাজুপাঁড়ে, টোলের পণ্ডিত মটুকনাথ, গ্রাম্যকবি বেঙ্কটেশ্বর, সৌন্দর্যরসিক পাগল প্রকৃতির যুগল প্রসাদ, নাটুয়া বালক ধাতুরিয়া, অর্থ ও ক্ষমতালোলুপ রাসবিহারী সিং, বাইজীর মেয়ে দুঃখিনী কুন্তা মঞ্চী ও অনার্য রাজকন্যা ভানুমতী— সকলে মিলে অরণ্য-জীবনের কাহিনীকে সজীব ও বাস্তব করে তুলেছে। অরণ্য যে কেবল রহস্যগম্ভীর নয়, তারও মধ্যে মানব-জীবনের সুখদুঃখ হাসি-কান্নায় ভরা প্রতিদিনের একটি বাস্তব সচল প্রবাহ আছে, এই সত্যের দিকে বিভূতিভূষণই প্রথম বাঙালী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

প্রকৃতি ও মানুষের এই মিলিত কাহিনীর মধ্য দিয়ে 'আরণ্যক' গ্রন্থে লেখকের রোম্যান্টিক ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর এক সার্থক সমন্বয় হয়েছে। 'আরণ্যকে'-র কাহিনী যে পটভূমি আশ্রয় করে রচিত হয়েছে, সে সম্পর্কে আমাদের মনে একটি রোম্যান্টিক বিস্ময় ও দূরত্ববোধ আছে। তাই সে-জীবনের কাহিনীকে লেখক ঠিক সেইভাবেই রচনা করে পাঠকের মনোরঞ্জনের দ্বারা সুলভ প্রশংসা হয়ত' পেতে পারতেন। কিন্তু প্রতিভাশালী মৌলিক দৃষ্টিসম্পন্ন লেখক সম্পূর্ণ অভিনব এক পথ অবলম্বন করলেন। তিনি অরণ্যের রহস্য-বিস্ময় ও গভীর গম্ভীর রূপটিকে অক্ষুণ্ণ রেখেও তার বাস্তব জীবনচিত্রটি, সেখানকার মানুষের প্রাত্যহিক রূপটিকে আমাদের সামনে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ফুটিয়ে তুললেন। বাস্তবতা ও রোম্যান্টিক বিস্ময়ের এমন সহজ সমন্বয়— লেখকের প্রতিভার অসামান্যতার পরিচায়ক। পাশ্চাত্ত্য সমালোচক J. W. Beach ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্রকৃতি-চেতনার মধ্যে এই দ্বিমুখী সত্তা অনুভব করে তাকে 'Janus-thinker' আখ্যা দিয়েছিলেন।

'আরণ্যক'-স্রষ্টা বিভূতিভূষণকেও আমরা ওই অভিধায় অলংকৃত করতে পারি। সরস্বতী কুণ্ডীর পরিবেশ-বর্ণনা কিংবা মেলায় যাওয়ার সময় পথের বর্ণনার মধ্যে দেখি, সেখানে বর্ণনার প্রতিটি রেখা অত্যন্ত স্পষ্ট ও বাস্তব। অথচ সব মিলিয়ে সে ছবির স্বপ্নময় রোম্যান্টিক অনুভূতি আমাদের মনকে মুগ্ধ করে।

অরণ্যের মধ্যে খর নিদাঘের চিত্র, ভয়াবহ জলকষ্ট, দাবানল, কলেরা মহামারীর বর্ণনা ও ফসল কাটার পর ফুলকিয়া বইহারের মেলার ছবি অরণ্যের বাস্তব মূর্তিটিকে যেন আরও জীবন্ত করে তুলেছে।"

[বিভূতিভূষণ : মন ও শিল্প : গোপীকানাথ রায়চৌধুরী]

'পথের পাঁচালী'র সঙ্গে 'আরণ্যক'-এর তুলনা করলে দেখা যায় 'পথের পাঁচালী' থেকে 'আরণ্যক' অনেক দূরের পথ। বিভূতিভূষণের প্রথম উপন্যাসে বাঙালিজীবনের একটা মধুর ছবি মিলে। যে ছবিতে আছে বাঙালির ঘরোয়া পারিবারিক জীবন। এবং আছে বাঙালি সমাজের রূপরেখা। কিন্তু 'আরণ্যক'-এ বাংলা দেশ নেই; নেই বাংলার সমাজ, বাংলার পারিবারিক জীবন। 'দিগ্‌দিগন্তব্যাপী নির্জন অরণ্যসমাবৃত এ এক সম্পূর্ণ অপরিচিত রহস্য-নিবিড় যাযাবর জীবন-পরিবেশ', — গোপীকানাথ রায়চৌধুরীর সঙ্গে আমরা সহমত পোষণ করতে পারি। তবু বলতে হয় বাংলার বাইরের এক অপরিচিত 'দিগ্‌দিগন্তব্যাপী নির্জন অরণ্যসমাবৃত রহস্য-নিবিড় যাযাবর জীবন-পরিবেশ'এর চিত্র অংকন করেও বিভূতিভূষণ সার্থক। বাংলা দেশ থেকে কয়েকশ মাইল দূরে বিহারের ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত বিশাল ঘন অরণ্যের অভিজ্ঞতা-প্রসূত কাহিনির অবতারণা করে বাঙালির চোখে নতুন স্বাদ এনে দিলেন তিনি। 'আরণ্যক'-এর মায়ারাজ্যের রাস্তা আমাদের পরিচিত পৃথিবী থেকে অনেক দূরের হলেও তা আমাদের কাছে উপভোগ্য হয়েছে বিভূতিভূষণের নিসর্গভাবনার চরমরূপ প্রকাশের জন্য। এই উপন্যাসে গিরিধারীলাল, ধাতুরিয়া, রাজু পাঁড়ে,

রাসবিহারী, নন্দলাল, যুগলপ্রসাদ, ভানুমতী, মঞ্চীর মতো চরিত্রের ভিড় থাকলেও লেখকের উদ্দেশ্য ছিল প্রকৃতি। এই প্রকৃতির লীলামাহাত্ম্য বর্ণনার জন্যই সত্যচরণ-যুগলপ্রসাদের মতো চরিত্রের জন্ম। বস্তুত সত্যচরণের মাধ্যমেই বিভূতিভূষণ দেখাবেন, কী করে প্রকৃতি একটি মানুষের মন ও জীবনকে পরিবর্তন করে দিতে পারে। বিভূতিভূষণ তাঁর বন্ধুকে একসময় লিখেছিলেন— "আমি বোধ হয় পূর্বে জন্মেছিলান উষ্ণ কটিবন্ধের অরণ্যপ্রদেশে একটি ম্যাকাও পাখি হয়ে। মানুষের বাস যেখানে ঘিঞ্জি সেখানে আদৌ মন টেকে না কেন কি জানি। I am most happy when I am in a lonely primeval forest।" উপন্যাস যত পরিণতির দিকে গেছে সত্যচরণের মধ্যেও আমরা দেখতে পেয়েছি এধরনের পরিবর্তন।

ভাগলপুরের কোনো এক জঙ্গল-মহাল বিলিব্যবস্থার দায়িত্ব নিয়ে সত্যচরণ ম্যানেজারপদে নিযুক্ত হয়ে বিহারের জঙ্গলে আসে। এবং এখান থেকেই শহুরে যুবক সত্যচরণের প্রকৃতি দর্শন শুরু। শীতের বিকেলে তাজা মটরশাকের হাল্কা গন্ধে বি.এন. ডব্লু. বেলওয়ের এক ছোটো স্টেশনে সত্যচরণ প্রথম এসে নামে। সে মনে মনে ভাবে, 'যে জীবন আরম্ভ করিতে যাইতেছি তাহা বড় নির্জন হইবে। এই শীতের সন্ধ্যা যেমন নির্জন, যেমন নির্জন এই উদাস প্রান্তর আর ঐ দূরের নীলবর্ণ বনশ্রেণী, তেমনি।' এই আশঙ্কা নিয়েই সত্যচরণ ম্যানেজারের কাজ শুরু করে। এই অরণ্যে'ই দিনের পর দিন কেটে যায় কলকাতার যুবক সত্যচরণের। দূর পাহাড়ের মাথায় সূর্য ওঠে আবার ডুবে যায়। সত্যচরণের শহুরে চোখ কখনো বনপ্রকৃতির এসব দৃশ্য দেখেনি, দেখার মানসিকতাও নেই। সত্যচরণের মুখেই শোনা যাক— "ইহার মধ্যে শীতকালের যে এগার-ঘণ্টা ব্যাপী দিন তা যেন খাঁ খাঁ করে শূন্য, কি করিয়া তাহা পুরাইব, প্রথম প্রথম সেইটা আমার পক্ষে হইল মহাসমস্যা। . . . কতবার মনে হইল চাকুরীতে দরকার নেই, এখানে হাঁপাইয়া মরার চেয়ে আধপেটা খাইয়া কলিকাতায় থাকা ভাল। অবিনাশের অনুরোধে কি ভুলই করিয়াছি এই জনহীন জঙ্গলে আসিয়া, এ জীবন আমার জন্য নয়।" জঙ্গল সম্পর্কে সত্যচরণের এই মনোভাব পরিবর্তিত হতে সময় লাগেনি। বৃদ্ধ মুহুরী গোষ্ঠ চক্রবর্তী একদিন সত্যচরণকে বলে— "কিছুদিন এখানে থাকুন— তারপর দেখবেন। . . . জঙ্গল আপনাকে পেয়ে বসবে। কোন গোলমাল কি লোকের ভীড় আর ভাল লাগবে না।" এরপর সত্যি সত্যি অরণ্য তাঁর মোহিনী শক্তির জাল সত্যচরণের উপর বিস্তার করতে শুরু করে।— "গোষ্ঠবাবু চলিয়া গেলে একবার ঘরের জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম। দূরে জঙ্গলের মাথায় চাঁদ উঠিতেছে, —আর সেই উদীয়মান চন্দ্রের পটভূমিতে আঁকাবাঁকা একটি বনঝাউয়ের ডাল দুর্ভাবনা সত্ত্বেও উদীয়মান চন্দ্রের সৌন্দর্য আমাকে বড় মুগ্ধ করিল।" এই দৃশ্য দেখার পর থেকেই সত্যচরণ ধীরে ধীরে বিস্ময়াবিষ্ট দৃষ্টিতে দেখেছে এবং অনুভব করেছে নিসর্গের প্রতিটি হৃদস্পন্দন। দেখতে দেখতে সত্যচরণকে প্রকৃতি পেয়ে বসে— "দিন যত যাইতে লাগিল জঙ্গলের মোহ ততই আমাকে ক্রমে পাইয়া বসিল।" এর নির্জনতা ও অপরাহ্নের সিঁদুর-ছড়ানো বনঝাউয়ের জঙ্গলের আকর্ষণ দিগন্তব্যাপী বিশাল বনপ্রান্তর, রোদপোড়া মাটির তাজা সুগন্ধ বনপুষ্পের সুগন্ধ, এই

স্বাধীনতা, এই মুক্তি ছেড়ে কলিকাতায় গোলমালের মধ্যে ফেরা সত্যচরণের পক্ষে সম্ভব নয়। এ মনের ভাব একদিনে হয় নি। কত রূপে কত সাজেই যে বনপ্রকৃতি সত্যচরণের মুগ্ধ অনভ্যস্ত দৃষ্টির সম্মুখে এসে তাকে ভুলিয়েছে— ". . . কত সন্ধ্যা আসিল অপূর্ব রক্তমেঘের মুকুট মাথায়, দুপুরের খরতর রৌদ্র আসিল উন্মাদিনী ভৈরবীর ভেশে, গভীর নিশীথে জ্যোৎস্নাবরণী সুর-সুন্দরীর সাজে হিমস্নিগ্ধ বনকুসুমের সুবাস মাখিয়া, আকাশ ভরা তারার মালা গলায়— অন্ধকার রজনীতে কালপুরুষের আগুনের খড়্গ হাতে দিগ্বিদিক ব্যাপিয়া বিরাট কালীমূর্তিতে।"

বস্তুত, এই প্রকৃতি বিভূতিভূষণের চিরপরিচিত গ্রামবাংলার প্রকৃতি থেকে আলাদা। শ্যামলস্নিগ্ধ ইছামতীর জলের গন্ধমাখা নরম প্রকৃতির লেশমাত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না বিহারের জঙ্গলে। শীত-গ্রীষ্ম-বসন্ত সব ঋতুই এখানে রুক্ষ, ভয়াল, রহস্যাবৃত— "চারিধারে দূরপ্রসারী অন্ধকার আকাশ, আমার বড় অদ্ভুত লাগিল, যেন চিরপরিচিত পৃথিবী হইতে নির্বাসিত হইয়া মহাশূন্যে, এক গ্রহে অন্য এক অজ্ঞাত রহস্যময় জীবনধারার সহিত জড়িত হইয়া পড়িয়াছি।" বলা বাহুল্য রুক্ষ-ভয়াল-রহস্যাবৃত প্রকৃতি সত্যচরণের কাছে বারবার এসেছে। ঋতুচক্রের নিয়ম মতো এই প্রকৃতি রূপ পরিবর্তন করলেও, এর ভয়াবহতার পরিবর্তন ঘটেনি। বিহারের জঙ্গলে প্রথম যেদিন সত্যচরণ এল সেদিনই প্রকৃতিদেবী তাকে শীতের তীব্রতা দিয়ে স্বাগত জানালো। আবার যখন গ্রীষ্ম এল, সেটাও তীব্রতর দহন নিয়ে, জলকষ্ট নিয়ে। সত্যচরণ জানাচ্ছে— 'সাদা কথায় গ্রীষ্ম ও জলকষ্ট বলিলে এ বিভীষিকাময় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের স্বরূপ কিছুই বোঝানো যাইবে না। . . . যেখানে যত খাল, ডোবা কুণ্ডী অর্থাৎ বড় জলাশয় ছিল— সব শুকাইয়া গেল।" প্রকৃতির এই ভয়াল-রূপের আর একটি বর্ণনা না দিলেই নয়— "দুপুরে বাহিরে দাঁড়াইয়া তাম্রাভ অগ্নিবর্ষী আকাশ ও অর্দ্ধশুষ্ক বনঝাউ ও লম্বা ঘাসের বন দেখিতে ভয় করে— চারি ধার যেন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, মাঝে মাঝে আগুনের হল্কার মত তপ্ত বাতাস সর্ব্বাঙ্গ ঝলসাইয়া বহিতেছে— সূর্যের এ রূপ, দ্বিপ্রহরে রৌদ্রের এ ভয়ানক রুদ্র রূপ কখনও দেখি নাই, কল্পনাও করি নাই।" আবার এই প্রকৃতিতেই নির্জন জঙ্গলের জীনপরী 'ভামাবাণু' মানুষকে বেঘোরে পেলে মেরে ফেলে, দেবতা 'টাঁড়বারো' বুনো মহিষের দলের রক্ষাকর্তা।

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

১। 'আরণ্যক' শুধু অরণ্যবর্ণনা নয়, তার সত্তারও পরিচায়ক— বক্তব্যটি পরিস্ফুট করুন। (৭০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

২। সাহিত্যকারের কাজ হচ্ছে এই আনন্দের বার্তা সর্বসাধারণের প্রাণে পৌঁছে দেওয়া— বিভূতিভূষণ কীভাবে পৌঁছে দিয়েছেন? (৭০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

৩। 'পথের পাঁচালী'র প্রকৃতির সঙ্গে 'আরণ্যক'-এর প্রকৃতির তফাৎ কোথায়? (৮০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

বস্তুত 'আরণ্যক' উপন্যাসে বর্ণিত প্রকৃতির এই রুক্ষ-ভয়ঙ্কর রূপ কখনো হিংস্র হয়ে ওঠে না। জ্যোৎস্নারাত্রি বিভূতিভূষণের মনকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। তাই আলোচ্য উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে এই জ্যোৎস্নামাখা রজনীর বর্ণনা। জ্যোৎস্নামাখা সরস্বতী কুণ্ডীর স্নিগ্ধ পরিবেশ, পাখির কলরব-মুখর নির্জন বিকেলবেলার অনির্বচনীয় সংগীত একটু একটু করে সত্যচরণকে আকৃষ্ট করেছে। এই উপন্যাসেই আমরা দেখতে পারি 'মানবচরিত্রের ওপর প্রকৃতির প্রভাব, প্রকৃতির সঙ্গে মানবের একাত্ম হয়ে যাওয়া, প্রকৃতির ব্যক্তিস্বরূপে ধরা পড়া— কোনটিই এখানে বাদ পড়েনি।' একদিনের জ্যোৎস্না দেখে সত্যচরণ বলেছে— 'জ্যোৎস্না আরও ফুটিয়াছে— সে কি জ্যোৎস্না! কি রূপ রাত্রির। নির্জন বালুচরে, দীর্ঘ বনঝাউয়ের জঙ্গলের পাশের পথে জ্যোৎস্না যাহারা কখনও দেখে নাই, তাহারা বুঝিবে না জ্যোৎস্নার কি চেহারা। এমন উন্মুক্ত আকাশতলে— ছায়াহীন উদারগভীর জ্যোৎস্নাভরা রাত্রিতে, বন-পাহাড়-প্রান্তরের পথে জ্যোৎস্না, বালুচরের জ্যোৎস্না-ক'জন দেখিয়াছে।' এই জ্যোৎস্না-রাতের মতো সরস্বতী কুণ্ডীর সৌন্দর্যেও সত্যচরণ বিস্ময়াবিষ্ট। —'পূর্ব্বেই বলিয়াছি সরস্বতী কুণ্ডীর বন পাখীর আড্ডা। এত পাখীও এখানে আছে এখানকার বনে। কত ধরনের কত রং-বেরঙের পাখী— শ্যামা, শালিক, হরটিট্, বনটিয়া, ফেজান্টক্রো, চড়াই, ছাতারে, ঘুঘু, হরিয়াল।' প্রকৃতির এই বিচিত্র লীলা দেখে সত্যচরণের মধ্যে অধ্যাত্মভাবের সঞ্চার হয়। শুভ্রজ্যোৎস্নায় হাঁটতে হাঁটতে সত্যচরণের মনে হয় এ এক অন্য জগৎ। যারা ঘরে থাকতে ভালোবাসে না, সংসার যাদের ভাল লাগে না, সেই সব মুক্ত মানুষদের আমন্ত্রণ জানায় এই জগৎ। এই জগৎ অসীমলোকে উধাও, সীমারেখাবর্জিত মুক্ত জীবন, অনন্ত চলা, শুধু চলা। কখনো কখনো সত্যচরণের মনে হয়েছে এই বন্যজীবন তাকে দিয়েছে স্বাধীনতা ও মুক্তি। এই স্বাধীনতা আর মুক্তিতেই লুকিয়ে রয়েছে বিভূতিভূষণের শাশ্বত আনন্দ।

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

১। প্রকৃতির কোন রূপ সত্যচরণকে পেয়ে বসে? (৭০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

২। সত্যচরণের অভিজ্ঞতাপ্রসূত প্রকৃতির রুদ্ররূপের বণচ্ছ্রনা দিন। (৭৫টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

নিজের ক্রমোন্নতি বিচার করুণ

দৃষ্টান্তসহ বিভূতিভূষণের নিসর্গভাবনার পরিচয় দিন।

[সংকেতসূত্র : প্রাসঙ্গিক আলোচনা দ্রষ্টব্য]

খ) "বাস্তবতা ও রোম্যান্টিক বিস্ময়ের এমন সহজ সমন্বয়-লেখকের প্রতিভার অসামান্যতার পরিচায়ক।" —মন্তব্যটির আলোকে বিভূতিভূষণের প্রকৃতিপ্রেমের পরিচয় দিন।

[সংকেতসূত্র : প্রাসঙ্গিক আলোচনা দ্রষ্টব্য]

৯.৩ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচনা আমরা শেষ করেছি। প্রসঙ্গক্রমে সাহিত্যে প্রকৃতির একটি বড়ো ভূমিকা আছে, বিশেষ করে কবিতায়। উপন্যাসেও প্রকৃতি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কবিতায় যেভাবে প্রকৃতি ব্যবহৃত হয় উপন্যাসে তেমন হয় না। রোমান্টিক কবিদের মতো প্রকৃতিকে মূল ভাববস্তু হিসাবে উপন্যাসে ব্যবহার করা যায় না। বস্তুত উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু মানবজীবন তথা মানবপ্রকৃতি। তাই উপন্যাসে বিশ্বপ্রকৃতিকে মানবজীবন বা মানবপ্রকৃতির সঙ্গে অখণ্ড সম্পর্কসূত্রের নিরিখেই বিচার করতে হবে। মূলত মানুষই ঔপন্যাসিকের বর্ণিতব্য বিষয় হলেও প্রায় সকলেরই পশ্চাদ্‌পটে থাকে প্রকৃতি, এক টুকরো মাটি ও তার চতুষ্পার্শ্ব।

বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসের শিল্পগত প্রয়োজন ও প্রত্যাশা

অনুভব করেই প্রকৃতির ভূমিকা যথার্থভাবে নির্ণয় করেছিলেন। বস্তুত তিনি বিশ্বাস করতেন প্রকৃতি ও মানবমনের অপরিহার্য অন্তর্গূঢ় সম্পর্কের রূপটি। এই বিশ্বাসেরই পরিপূর্ণ প্রকাশ 'কপালকুণ্ডলা'-য়। বঙ্কিমচন্দ্রের পরে বাংলা সাহিত্যে নিসর্গভাবনার এক বড়ো প্রত্যয় নিয়ে আবির্ভূত হলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রামবাংলার রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে বিপুলায়ত মৃত্তিকাস্পর্শী জীবনের স্বাদ রয়েছে তার খোঁজ পেয়েছিলেন তিনি। এই মাটিঘেঁষা জীবনকে সাহিত্যের পাতায় বাস্তবের রঙে রঙিন করতে গিয়ে তাঁর সৌন্দর্যদৃষ্টিতে ধরা পড়ে অপরূপ নিসর্গচেতনার স্বতন্ত্র অনুভূতি। বিভূতিভূষণই এমন ব্যক্তিত্ব যিনি বাংলা উপন্যাসে প্রকৃতি-চেতনার ঘনরসোপলব্ধিকে সঞ্চারিত করে বাংলা উপন্যাসের সম্ভাবনার জগৎকে করে দিলেন প্রসারিত। বাল্যাবধি অভিযানের আনন্দ রয়েছে তাঁর প্রকৃতিজগতের রহস্যময় পথ-পরিভ্রমণে। পরিভ্রমণের ব্যাপারে বিভূতিভূষণের দৃষ্টি আসলে কবির দৃষ্টি। তিনি পথের কবি। বস্তুত একদিকে তিনি কবির গভীর অনুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে অনুভব করেছেন প্রকৃতির বিচিত্র লীলাকে, অন্যদিকে অসাধারণ কথাশিল্পীর দৃষ্টি নিয়ে নিরীক্ষণ করেছেন নরনারীর প্রাত্যহিক জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আনন্দের বিভিন্ন কাহিনি। এই দুয়ের সমন্বয়ে তিনি এক অসামান্য কথাকার। তাই তাঁর মধ্যে আমরা লক্ষ করি এক দ্বৈতসত্তার অনুরণন। একদিকে তিনি মরমি ঔপন্যাসিকের দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন গ্রামবাংলার মাটিঘেঁষা জীবন, আবার অন্যদিকে বিস্ময়াবিষ্ট কবিমন দিয়ে অনুভব করেছেন প্রকৃতির অনন্ত শিহরণ। এই দুয়ের সমন্বয়েই তাঁর নিসর্গভাবনা বিচার্য।

বিভূতিভূষণ সর্বদাই আত্মহারা প্রকৃতির বিচিত্র রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-অনুভূতির আনন্দে। তাঁর উপন্যাস, ছোটোগল্প, দিনলিপি, ভ্রমণকাহিনি— সর্বত্রই প্রকৃতির অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের ছোঁয়া, শিহরণ। এই ব্যাপারে তাঁর ব্যক্তিজীবনই সমধিক দায়ী। কেননা তাঁর শৈশব-কৈশোরের দিনগুলি কেটেছে প্রকৃতির সংস্পর্শে। নির্জন আকাশ, উধাও মাঠ আর নদীতীরের নিঃসঙ্গ নির্জন সাহচর্যে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে ঘটেছিল তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয়। বালক বিভূতিভূষণের শৈশবের সেই বিস্ময়াবিষ্ট মুহূর্তগুলির সূক্ষ্ম অনুভূতি পরবর্তি রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে। বস্তুত বিচিত্র নিসর্গলোকের বৈচিত্র্যময় রহস্যালোকেই পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়। প্রকৃতির প্রতিটি স্পন্দনকে, প্রতিটি ঋতুবদলকে তিনি ধারণ করেছিলেন তাঁর সূক্ষ্ম অনুভূতিপ্রবণ মনের মাঝে। সেইজন্যই জীবনসম্পর্কেও তাঁর ধারণা লাভ করেছিল এক বিচিত্র মহিমা। তিনি মানুষের জীবনের সঙ্গে প্রকৃতির সত্তাকে মিলিয়ে ফেলেন না। বিভূতিভূষণ আসলে বিশ্বাস করতেন প্রকৃতির চেতন সত্তাকে। 'একটি নক্ষত্র উঠেচে মাথার ওপর— কোনো অনন্ত দেশের বাণীর মত এই শত দৈন্যসংকীর্ণতাময় সংসারের ঊর্ধ্বে জ্বল জ্বল করে জ্বলচে।' বস্তুত প্রকৃতির এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবনা একমাত্র বিভূতিভূষণের মনেই দোলা দিতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের মতো বিভূতিভূষণও বিশ্বাস করতেন প্রকৃতির মধ্যে এক নিগূঢ় প্রাণসত্তা রয়েছে, কিন্তু তবু বলতে হয় প্রকৃতিভাবনার ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে কিছু

পার্থক্যও আছে। বিভূতিভূষণের প্রকৃতি ঋতুতে ঋতুতে রং বদলায় এবং অরণ্য-পশু-পক্ষী নিয়ে এক স্বয়ংসম্পূর্ণ মনুষ্য-সম্পর্ক-নিরপেক্ষ সজীবতা সৃষ্টি করে। এছাড়াও রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিভাবনায় যতটা দার্শনিক ও তত্ত্বাশ্রয়ী, রূপরচনায় চিন্তাশীল ও পরিমার্জিত; সে তুলনায় বিভূতিভূষণ অগোছালো চিরকিশোর। তাঁর দৃষ্টি শান্ত ও কোমল, ফলে তাঁর প্রকৃতিও স্নিগ্ধ ও মধুর। মূলত তাঁর 'প্রকৃতিও এক পরম ঐশী চেতনায়, ভাগবতী অস্তিত্বে স্পন্দিত।' তবু বলতে হয়, রুক্ষতা ও কোমলতা— দুয়ে মিলেই বিভূতিভূষণের নিসর্গভাবনা পূর্ণতায় উপনীত। কেননা 'পথের পাঁচালী'-র গ্রামবাংলার সবুজঘেরা রোমান্টিক প্রকৃতির সঙ্গে 'আরণ্যক'-এর পাহাড় ও ঘনজঙ্গলের ভয়ালরুক্ষ প্রকৃতি সে কথাই প্রমাণ করে। নিসর্গের এই দ্বৈতরূপের মধ্যেই বিভূতিভূষণ খুঁজেছেন আধ্যাত্মিকতার শীতল স্পর্শ।

বিভূতিভূষণের নিসর্গভাবনার বড়ো দৃষ্টান্ত 'আরণ্যক'। এই উপন্যাসে শুধু অরণ্য-বর্ণনা নেই, আছে অরণ্যের সত্তারও পরিচয়। 'এই প্রকৃতির একটা রহস্যময় অসীমতার, দুরধিগম্যতার, বিরাটত্বের ও ভয়াল গা ছম-ছম করানো সৌন্দর্যের দিকটা'— প্রকাশ করার জন্য বিভূতিভূষণের কত অস্থিরতা— যে কথাটা নানাভাবে বলিবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু কোন বারই ঠিক মত বুঝাইতে পরিতেছি না।' বস্তুত 'আরণ্যক' উপন্যাসে প্রকৃতির এই রূপই দেখতে পাই। মানুষ, প্রকৃতি ও অধ্যাত্মভাবনা— এই তিনে মিলেই বিভূতিভূষণের সাহিত্যের জগৎ। তবু বলতে হয় প্রকৃতিকেই তিনি বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন তাঁর সাহিত্যে। বাংলার ঋতুচক্র, বাংলার সকালসন্ধ্যা, আকাশ-বাতাস, ফল-ফুল, বাঁশবনের আমবাগানের নিভৃত ছায়ায় ঘেরা বাংলার নরনারীর দুঃখদারিদ্র্যময় জীবনকে এক স্বতন্ত্র ভাবধারায় পরিবেশন করেছেন বিভূতিভূষণ। এই জীবনে বিভূতিভূষণ দেখেছেন আনন্দ, শাশ্বত আনন্দ। এই আনন্দ তাঁর জীবনে, সাহিত্যে স্বতোৎসারিত— 'আসল আনন্দ জোর করে মনকে বুঝিয়ে, তর্ক করে আনতে হয় না— সে সহজ অর্থাৎ spontaneous।' দিনলিপিতেও লিখেছেন— 'জগতে অসংখ্য আনন্দের ভাণ্ডার উন্মুক্ত আছে।' সাহিত্যকারের কাজ সেই আনন্দের বার্তা সর্বসাধারণের প্রাণে পৌঁছে দেওয়া। বিভূতিভূষণের বিশ্বাস সেই আনন্দের বার্তা প্রকৃতির মধ্যে বেশি কয়ে লুকিয়ে আছে। তাই প্রকৃতিকে নিয়ে তাঁর আজীবন আগ্রহ। 'আরণ্যক' উপন্যাসের প্রকৃতি মূলত বস্তুনিষ্ঠ। এই প্রকৃতি মানবিক আবেদনমুক্ত, রুক্ষ, ভয়াল। তা মানুষের সুখ-দুঃখে শিহরে না। বস্তুত এই অরণ্য উদাসীন রুক্ষ ভয়াল হয়েও সৌন্দর্যপিয়াসী বিভূতিভূষণের মনের সৌন্দর্যরসে জারিত হয়ে শাশ্বত আনন্দের প্রতিমূর্তি।

'পথের পাঁচালী'-র সঙ্গে আলোচনাসূত্রে আমরা 'আরণ্যক'-এর তুলনা করে দেখিয়েছি। বাংলার ঘরোয়া পরিবেশে বাঙালি জীবনের মধুর ছবির পাশে বিহারের রুক্ষ-ভয়াল ছবি ফুটে উঠেছে। বস্তুত দিগ্‌দিগন্তব্যাপী নির্জন অরণ্যসমাবৃত এ এক সম্পূর্ণ অপরিচিত রহস্য-নিবিড় যাযাবর জীবন-পরিবেশ। এই মায়ারাজ্যের ছবি আমাদের পরিচিত পৃথিবী থেকে অনেক দূরের হলেও তা আমাদের কাছে উপভোগ্য

হয়েছে বিভূতিভূষণের নিসর্গভাবনার চরম রূপ প্রকাশের জন্য। এই নিসর্গভাবনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য সত্যচরণ-যুগলপ্রসাদের মতো চরিত্রের জন্ম।

সত্যচরণ জঙ্গল-মহাল বিলি ব্যবস্থার দায়িত্ব নিয়ে ম্যানেজার পদে নিযুক্ত হয়ে বিহারের জঙ্গলে আসে। প্রথম এসেই সে ভাবে 'যে জীবন আরম্ভ করিতে যাইতেছি তাহা বড় নির্জন হইবে।' প্রকৃতির বিচিত্র রূপ দেখে ধীরে ধীরে সেই নির্জনতাই সত্যচরণের ভালো লাগতে থাকে। সে বলে— "দূরে জঙ্গলের মাথায় চাঁদ উঠিতেছে, — আর সেই উদীয়মান চন্দ্রের পটভূমিতে আঁকাবাঁকা একটি বনঝাউয়ের ডাল দুর্ভাবনা সত্ত্বেও উদীয়মান চন্দ্রের সৌন্দর্য আমাকে বড় মুগ্ধ করিল।" এইভাবেই সত্যচরণ ধীরে ধীরে বিস্ময়াবিষ্ট দৃষ্টিতে দেখেছে প্রকৃতিকে এবং অনুভব করেছে নিসর্গের প্রতিটি হৃদস্পন্দন। কিছু দিনের মধ্যেই সত্যচরণ বলেছে— "দিন যত যাইতে লাগিল জঙ্গলের মোহ ততই আমাকে ক্রমে পাইয়া বসিল।" এই প্রকৃতি বিভূতিসাহিত্যের পরিচিত শ্যামলস্নিগ্ধ ইছামতীর জলের গন্ধমাখা নরম প্রকৃতি নয়। শীত-গ্রীষ্ম-বসন্ত সব ঋতুই এখানে রুক্ষ-ভয়াল-রহস্যাবৃত। ঋতুচক্রের নিয়মানুসারে প্রকৃতি রূপ পরিবর্তন করলেও, এর ভয়াবহতার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। শীতের তীব্র ঠাণ্ডা, গ্রীষ্মের ভয়াবহ দহন, জলকষ্ট, জীনপরী 'ডামাবাণু', মহিষের দেবতা 'টাঁড়বারো'— সব মিলেই 'আরণ্যক'এর ভয়াবহতা।

বস্তুত 'আরণ্যক'-এর এই রুক্ষ-ভয়ঙ্কর রূপ কখনো হিংস্র হয়ে ওঠে না। ভাগলপুরের অরণ্যের স্বাভাবিক প্রবণতা নিয়েই প্রকৃতি এখানে মূর্ত হয়ে উঠেছে। এই প্রকৃতির মধ্যে জ্যোৎস্না এবং সরস্বতী কুণ্ডীর স্নিগ্ধ পরিবেশ এক বড়ো মাত্রা পেয়েছে। জ্যোৎস্নারাত্রির প্রতি দুর্বলতা বিভূতিভূষণের আজীবন। প্রকৃতির এই শাশ্বত আনন্দের মধ্যে লুকিয়ে আছে বিভূতিভূষণের অধ্যাত্মভাবনা। অধ্যাত্মভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে সত্যচরণের মধ্যে। একদিন জ্যোৎস্নাঢালা শুভ্র রাতে হাঁটতে হাঁটতে সত্যচরণের মনে হয় এ এক অন্য জগৎ, যারা ঘরে থাকতে ভালোবাসে না, সংসার যাদের ভালো লাগে না; সেইসব মুক্ত মানুষদের আমন্ত্রণ জানায় এই জগৎ। এই জগৎ অসীমলোকে উধাও।

৯.৪ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

কল্লোল যুগ : প্রথম অধ্যায়ের প্রাসঙ্গিক টীকা দ্রষ্টব্য।

উইলিয়াম ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ (১৭৭০-১৮৫০) : বিখ্যাত ইংরাজ কবি। ইংল্যান্ডের ককারমাউথ নামক স্থানে তাঁর জন্ম হয়। তিনি ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে কবি কোলরিজের সঙ্গে মিলে 'Lyrical Ballads' নামে একখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে তিনি মেরি হাচিন্সনকে বিয়ে করেন এবং ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে রাজকবি (Poet Laureate) হন।

জন্ কিট্স (১৭৯৫-১৮২১) : প্রসিদ্ধ ইংরাজ কবি। তিনি ছিলেন এক আস্তাবলরক্ষকের পুত্র। কবি শেলির সঙ্গে কিট্সের খুব অন্তরঙ্গতা ছিল। কিট্সকে বলা হত সৌন্দর্যের কবি। তাঁর রচিত কয়েকটি বিখ্যাত কাব্য হচ্ছে— 'Isabilla' : 'The Eve of St. Agnes', 'Endymion', 'Hyperion' ইত্যাদি। তিনি যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে ইতালিতে মারা যান।

৯.৫ সাম্ভাব্য প্রশ্নাবলি

দ্বাদশ বিভাগে সংযোজিত হয়েছে।

৯.৬ প্রসঙ্গ-পুস্তক

দ্বাদশ বিভাগে সংযোজিত হয়েছে।

* * *

বিভাগ-১০

আরণ্যক

আরণ্যক : আঞ্চলিক ও লোকজীবন

বিষয় বিন্যাস

১০.০ ভূমিকা (Introduction)

১০.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

১০.২ আরণ্যক-এর আঞ্চলিকতা

১০.৩ আরণ্যক উপন্যাস : লোকজীবনের প্রেক্ষাপট

১০.৪ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

১০.৫ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

১০.৬ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

১০.০ ভূমিকা (Introduction)

বিভিন্ন শ্রেণিসমন্বিত উপন্যাস সাহিত্যের একটি শিল্পিত রূপ আঞ্চলিক উপন্যাস। বক্ষ্যমাণ আলোচনায় আমরা এই শিল্পিত রূপটির স্বরূপ ও সংজ্ঞা বিশ্লেষণের মাধ্যমে আঞ্চলিক উপন্যাসের একটি সাধারণ ধারণা গ্রহণ করব।

উপন্যাসের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নিবিড়তম। বস্তুত, মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নাভরা জীবনের বিশ্লেষণই উপন্যাসের মূল উপজীব্য। ঔপন্যাসিককৃত বিশিষ্ট জীবনের চারণভূমি হচ্ছে একটি অঞ্চল বা এলাকা। অর্থাৎ পটভূমি হিসাবে লেখককে একটি অঞ্চল কল্পনা করতে হয়। পটভূমি হিসাবে ব্যবহৃত অঞ্চলটি নগরও হতে পারে, আবার গ্রামাঞ্চলও হতে পারে। মূলত এই অঞ্চলই হল উপন্যাসের ভিত্তিভূমি। তবে পটভূমি হিসাবে ব্যবহৃত অঞ্চলটি লেখকের কাহিনির উপর ভিত্তি করেই রচিত হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, একটি উপন্যাস দাঁড়িয়ে থাকে লেখকের কাহিনিভিত্তিক বিশেষ অঞ্চলকে কেন্দ্র করে। তাই প্রশ্ন ওঠে, একটি বিশেষ অঞ্চলকে কেন্দ্র করেই যদি উপন্যাস দাঁড়িয়ে থাকে, তবে কেন আঞ্চলিক উপন্যাসের বিশেষ শ্রেণিবিভাগ? আলাদাভাবে আঞ্চলিক বলার যুক্তিসংগত কারণ হচ্ছে, এই ধারার উপন্যাসগুলি বিশেষভাবে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করে। নির্দিষ্ট অঞ্চলের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য এই শ্রেণির উপন্যাসের কাহিনি এবং চরিত্রের মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে নিয়ন্ত্রক শক্তির কাজ করে বলেই এর আলাদা শ্রেণিবিভাজন। আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি উক্তি স্মরণযোগ্য— "কবি বা ঔপন্যাসিকের রচনায়

যখন কোন বিশেষ দেশাঞ্চলের জীবনযাত্রা, রীতি-নীতি, সমাজ-প্রতিবেশ ও প্রাকৃতিক পটভূমিকা অখণ্ড নিবিড়তায় ও সর্বব্যাপী তাৎপর্যে রূপ পায়, তখনই আমরা সেই সাহিত্যকে 'আঞ্চলিক' আখ্যায় অভিহিত করি। ... অঞ্চলের ছাপ থাকিলেই যে সাহিত্য আঞ্চলিক পদবাচ্য হইবে এমন কোন কথা নাই। যেখানে মানবমনের মূল সুরটিই এই বহিরাবেষ্টনের প্রভাবে অনন্য রাগিনীতে ঝঙ্কৃত হইবে, কেবল সেইখানেই আঞ্চলিক সংজ্ঞাটি দেওয়া চলিবে।" বস্তুত এই শ্রেণির উপন্যাসে বিন্যস্ত জীবনের সুখ-দুঃখ, উৎসব-আনন্দ, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, ভাষা-ভঙ্গি, ধর্ম-বিশ্বাস-সংস্কার —সবই প্রভাবিত হয় নির্দিষ্ট অঞ্চলটিকে কেন্দ্র করে। আসলে অঞ্চলটির ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, পরিপার্শ্বের বৈশিষ্ট্যগুলোই উপন্যাসে চিত্রিত জীবনের চাল-চলন, কথা-বার্তা, জীবন-যাপন, জন্ম-বিবাহ-মৃত্যু, আচার-অনুষ্ঠান, খাদ্যপ্রণালি, জীবিকা, ভাব-ভালোবাসা ইত্যাদিকে গভীরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বিশেষ ভৌগোলিক পরিবেশে চিত্রিত এবং পরিবেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জীবনের কাহিনিই হচ্ছে আঞ্চলিক উপন্যাস। এ প্রসঙ্গে ড০ সমরেশ মজুমদারের উক্তি প্রণিধানযোগ্য— "আঞ্চলিক উপন্যাসের সংজ্ঞা ও স্বরূপ নির্ণয়ের প্রচেষ্টা সাহিত্যের আসরে দীর্ঘদিনের, মুখ্য একটি ভূমি, তাকে বেষ্টন করে জনজীবন, সেই জনজীবনের প্রতিটি অনুপুঙ্খ অঞ্চলেরই একজন হয়ে সাহিত্যকার যখন নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলেন তখন আঞ্চলিক সম্পূর্ণতা পরিলক্ষিত হয়। সে ভূমি বনজ হতে পারে, সাধারণ লোকালয়কে ছাড়িয়ে বহুদূরবর্তী অকর্ষিত বা অর্ধকর্ষিত ভূখণ্ড হতে পারে।"

আবার অনেক সময় দেখা যায় আঞ্চলিক পরিবেশ উপন্যাসে ফ্রেমের মতো কাজ করে। বিশেষ অঞ্চলটি উপন্যাসের চরিত্রের জীবনযাত্রা বা কাহিনিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। সাহিত্যিকের মাথায় নির্দিষ্ট শিরোপাটি তখনই উঠবে, যখন তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলো বিশেষভাবে সেই নির্দিষ্ট অঞ্চলটির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে এবং চরিত্রগুলো সেই অঞ্চলেরই সত্তার প্রতীক হয়ে পাঠকের কাছে বাস্তব হয়ে ধরা দেবে। এছাড়াও চরিত্রগুলোর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সবই নির্দিষ্ট অঞ্চলসম্পৃক্ত হলেই ঔপন্যাসিকের কার্য সিদ্ধি হয়। অর্থাৎ একটি বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলের অখণ্ড নিবিড় পটভূমিকে তখনই আঞ্চলিক অভিধায় ভূষিত করা যাবে যখন পটভূমি সম্পর্কে লেখকের গভীর জীবনবোধ কার্যকরী হবে। জীবনকে দেখার এবং বিশ্লেষণের শিল্পিত ক্ষমতা থেকেই জীবনবোধের জন্ম। কোনো বিশেষ অঞ্চলের পটভূমি, কাহিনি ও চরিত্রকে অবলম্বন করে লেখকের এই শিল্পিত জীবনবোধ প্রকাশ পেলেই সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাসের জন্ম হতে পারে। তবে এর সঙ্গে প্রয়োজন জীবনবোধকে বিশেষ পাঠকের অন্তর্লোকে পৌঁছে দেওয়া। এ সম্পর্কে ড০ মহীতোষ বিশ্বাসের উক্তি স্মরণযোগ্য—

" ... আঞ্চলিক উপন্যাসে সীমাবদ্ধ স্থানিকতার মধ্যে বিচরণ করতে হয় বলে, সেই স্থানের মানুষ এবং প্রকৃতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যগুলিকে পর্যবেক্ষণ এবং অনুধাবন করবার বিস্তৃত সুযোগ ঘটে লেখকের। ফলে তাঁর মধ্যে গভীর বাস্তবতাবোধ

সম্যকভাবে বিকশিত হয়। তাছাড়া, একটি স্বল্প-জ্ঞাত কিম্বা অপরিজ্ঞাত ভূখণ্ডের অতি-সাধারণ নগণ্য জনজীবনের সহানুভূতিশীল অভিজ্ঞ রূপকার লেখক পরম ঘনিষ্ঠতায় গণ-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবারও সুযোগ পান। খণ্ডিত জ্ঞান এবং সীমিত অভিজ্ঞতা নিয়ে চমকসৃষ্টির সস্তা বাহাদুরির পরিবর্তে বাস্তবতা এবং গণ-চেতনায় অঙ্গীকারবদ্ধ লেখক আঞ্চলিকতার পটেও প্রতিফলিত করতে পারেন বিশাল জগৎ ও জীবনের অখণ্ড শিল্পস্বরূপকে।"

বস্তুত "আঞ্চলিকতার পটে প্রতিফলিত বিশাল জগৎ ও জীবনের অখণ্ড শিল্পরূপকে" বিশ্বের অন্তর্লোকে পৌঁছে দেওয়াই হচ্ছে আঞ্চলিক সাহিত্যের বড়ো গুণ। "অঞ্চল-বিশেষে সাহিত্যের যে ফসল জন্মে আর অঞ্চল-বিশেষের মধ্যেই যার গুণাগুণ সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে, তার হয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করা চলে না। যদিও এই জাতীয় রচনাই সাহিত্যে বারো আনা। কিন্তু যাকে আমরা শ্রেষ্ঠ সাহিত্য বলি তাকে একই সঙ্গে আঞ্চলিক ও সার্বজনীন হতে হবে। এ-কথা উপন্যাস ও ছোটো গল্প সম্বন্ধে সব চেয়ে বেশি সত্য।" —প্রমথনাথ বিশীর সঙ্গে আমরা সহমত পোষণ করতে পারি।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

"Regional and local colour literature were logical outgrowths of some aspects of Romanticism. Both are concerned with an accurate depiction of the manners, morals, dialects and scenery of a particular geographical area. Generally, 'local colour' is a mildly pejorative term, describing works that, however pleasant, have little value other than the portrayal of life in a given area. 'Regional' usually implies a wider interest, and is occasionally used even for writers such as Hardy or Faulkner whose work tends to be centered in a particular geographical area but which also has a more general interest. Both movements were influenced by and contributed to realism and its demand for literal accuracy."

[A Glossary for the study of English : Lee T. Lemon]

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

আঞ্চলিক উপন্যাস সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা প্রস্তুত করুন। (১০০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

১০.১ উদ্দেশ্য

'আরণ্যক'-এর বক্ষ্যমাণ আলোচনাকে আমরা দশম বিভাগে অন্তর্ভুক্ত করেছি। বর্তমান আলোচনার মূল বিষয়কে আমরা এভারে বিন্যস্ত করেছি যাতে—

- আপনারা আঞ্চলিক উপন্যাসের স্বরূপ ও সংজ্ঞা সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা অর্জন করতে পারেন।
- আঞ্চলিক উপন্যাস হিসাবে 'আরণ্যক' কতটুকু সফল শিল্পসৃষ্টি, সে বিষয়ে সম্যক ধারণা অর্জন করতে পারবেন।
- 'আরণ্যক' উপন্যাসের লোকজীবন সম্পর্কেও একটা ধারণা লাভ করতে পারবেন।

১০.২ 'আরণ্যক'-এর আঞ্চলিকতা

আমরা বর্তমান আলোচনার ভূমিকাংশে আঞ্চলিক উপন্যাসের সংজ্ঞা ও স্বরূপ সম্পর্কে একটা সাধারণ জ্ঞান আহরণ করেছি। এবার আসুন 'আরণ্যক' উপন্যাসে আঞ্চলিকতার লক্ষণগুলো কতটুকু রক্ষিত হয়েছে সে বিষয়ে আমাদের মননশীল আলোচনা তুলে ধরি।

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে আমরা উল্লেখ করেছি যে, 'আরণ্যক' উপন্যাসটির পটভূমি বিহারের কোনো এক জঙ্গল-মহালের জমি বিলি করে বসতি স্থাপনের কাহিনির উপর নির্ভরশীল। এই কাহিনিগ্রন্থনে বিভূতিভূষণের দীর্ঘদিনের অরণ্য বাসের নিবিড় অভিজ্ঞতা কাজ করেছিল। তিনি জঙ্গল-মহালের ম্যানেজারের চাকরি নিয়ে বিহারের অরণ্যঘেরা যে প্রত্যন্ত অঞ্চলের জীবনকে অনুভব করেছিলেন তারই কাহিনি সমগ্র 'আরণ্যক' জুড়ে। অর্থাৎ 'আরণ্যক'-এর কাহিনিতে একটি বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলের অখণ্ড নিবিড় পটভূমি চিত্রিত হয়েছে লেখকের অঞ্চলসম্পৃক্ত গভীর জীবনবোধের ঘনিষ্ঠতায়। 'আরণ্যক'-এর কাহিনি ও চরিত্রের মধ্যেও আমরা আপাতদৃষ্টিতে লক্ষ করি অঞ্চল-বিশেষের প্রাকৃতিক পরিবেশের ঘনিষ্ঠ প্রভাব। আঞ্চলিকতার সাধারণ লক্ষণগুলোকে সামনে রেখেই আমরা বক্ষ্যমাণ আলোচনায় আঞ্চলিকতার প্রেক্ষিতটি বিচার করে দেখব।

'আরণ্যক' উপন্যাসে আঞ্চলিকতার শর্তসাপেক্ষ একটি অঞ্চলের সন্ধান পাই। আমরা আগেও উল্লেখ করেছি উপন্যাসের কথক সত্যচরণ যে অঞ্চলের কথা বলেছে সেটা বিহারের এক প্রত্যন্ত অঞ্চল— চারদিক গভীর অরণ্যে ঘেরা। উপন্যাসে আছে — "উত্তরে আজমাবাদ হইতে দক্ষিণে কিষণপুর— পূর্বে ফুলকিয়া বইহার ও লবটুলিয়া হইতে পশ্চিমে মুঙ্গের জেলার সীমানা" পর্যন্ত জঙ্গল-মহালের কথা। অর্থাৎ উল্লিখিত এই সীমার মধ্যেই 'আরণ্যক' উপন্যাসটি আবর্তিত হয়েছে। 'আরণ্যক'-এর অঞ্চল সম্পর্কে রুশতী সেন জানাচ্ছেন — "মানচিত্রের হিসাবে যেটুকু বুঝি

জায়গাটা কুশী নদীর দক্ষিণে আর গঙ্গার উত্তরে, ভাগলপুর জেলার উত্তরাংশে। পূর্ণিয়াতেও খুবই সম্ভব ছিল মহালের বিস্তার। কিন্তু 'আরণ্যক' উপন্যাসে সত্যচরণের বিবরণ থেকে যে নামগুলো পাওয়া যাচ্ছে, সেসব স্থান বেশির ভাগই ভাগলপুরে।" খেলাৎ ঘোষ এস্টেটের সীমানা নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি আরো বলেন— "তবু মনে হয়, ওই ৩৬০ বর্গমাইলের মধ্যে, কি তার আশপাশেই আমাদের সত্যচরণের গতিবিধি ছিল, এমন অনুমানে খুব বড় কোনো ভুল নেই।" উপর্যুক্ত তথ্য থেকে বোঝা যাচ্ছে 'আরণ্যক' উপন্যাসে যে পটভূমি পাওয়া যায় তা অঞ্চলভিত্তিক। অঞ্চলভিত্তিক ভৌগোলিক গুণাগুণ বা বৈশিষ্ট্যসমূহ অঞ্চলসম্পৃক্ত মানুষ আর কাহিনিকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে সেই মানদণ্ডের ওপর নির্ভর করবে 'আরণ্যক' উপন্যাসের আঞ্চলিকতার প্রেক্ষিত।

আমরা জানি 'আরণ্যক'-এর মাটি ও মানুষ লেখকের একান্ত মনগড়া নয়, তার শিকড় রয়েছে বাস্তবে। ভাগলপুরের অরণ্যসম্পৃক্ত জীবনের সঙ্গে লেখকের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল নিবিড়। উপন্যাসে উল্লিখিত মাটি ও মানুষের কাহিনি বৃহত্তর শিক্ষিত সমাজের কাছে অজ্ঞাত। বিভূতিভূষণ উপন্যাসে এই পরিচয় দিতে ভুলেননি— "জগতের যে পথে সভ্য মানুষের চলাচল কম, কত অদ্ভুত জীবনধারার স্রোত আপন মনে উপলবিকীর্ণ অজানা নদীখাত দিয়া ঝিরঝির করিয়া বহিয়া চলে সে পথে, তাহাদের সহিত পরিচয়ের স্মৃতি আজও ভুলিতে পারি নাই।" উল্লিখিত তথ্যটি আমাদের এই সিদ্ধান্তে উপনীত করায় যে, বিভূতিভূষণ বিহারের একটি অজ্ঞাতপূর্ব আঞ্চলিক জীবনের কাহিনি আমাদের কাছে তুলে ধরতে চেয়েছেন। বস্তুত এই উপন্যাসের মাধ্যমে বিভূতিভূষণ বাংলা সাহিত্যের ভূগোলটিকে অনেকটা প্রসারিত করে দিয়েছেন। ভূমিসংলগ্ন অন্ত্যজ জীবনযাত্রার কাহিনি এত নিবিড়ভাবে বিভূতিভূষণ আগে বলেননি।

সবমিলে বিভূতিভূষণ গভীর জীবনবোধের শিল্পী। 'আরণ্যক'-এর চরিত্র এবং আখ্যানভাগেও বারবার নির্দিষ্ট অঞ্চলসম্পৃক্ত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাপুষ্ট জীবনবোধের সন্ধান পাওয়া যায়। 'আরণ্যক' উপন্যাসজুড়ে আমরা দেখতে পাই বাংলার বাইরের এক জগৎকে। যে জগৎ আমাদের জীবন থেকে বহু দূর অবস্থিত। যে জগতের মানুষ আমাদের কাছে অপরিচিত। তাদের মানসিকতা, চাল-চলন, আচার-অনুষ্ঠান, জীবন-জীবিকা সবই অঞ্চলসম্পৃক্ত। এই অঞ্চলের অসহনীয় শৈত প্রবাহ, দাবানল সৃষ্টিকারী দাবদাহ, অরণ্যের গভীরতা, জ্যোৎস্নামাখা রাত, ধু-ধু প্রান্তর, সরস্বতী কুণ্ডী, জীনপরী, নীলগাই, বন্য মহিষের দেবতা টাঁড়বারো— এই সবকিছুকে বিভূতিভূষণ স্থাপন করেছেন একটা আঞ্চলিক জীবনের পটভূমিতে। পটভূমিটি হচ্ছে ভাগলপুরের জঙ্গল-মহালসম্পৃক্ত এলাকা, একে ঘিরে আছে নানা জাতের মানুষ। গাঙ্গোতা, দোসাদ, রাজপুত, ভুঁইহার, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি। এরা সকলেই 'আরণ্যক' উপন্যাসের নির্দিষ্ট ভূমিজাত না হলেও নানা সূত্রে উপন্যাসের কাহিনিবৃত্তে স্থান লাভ করেছে। আদিবাসী হিসাবে উপন্যাসে আছে প্রাচীনতার প্রতীক সাঁওতালরাজ দোবরু পান্না ও তার

পরিবার। এছাড়াও উপন্যাসের কাহিনিকে সমৃদ্ধ করেছে নির্দিষ্ট অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ— বন-পাহাড়-নদী-ঝরনা-জ্যোৎস্না।

বস্তুত 'আরণ্যক' উপন্যাসের এমন একটি পটভূমিতে এর লোকজীবনত আঞ্চলিকতার প্রসঙ্গটি আরো শক্তিশালী করে। লোকজীবনের অঙ্গ হিসাবে 'আরণ্যক' উপন্যাসেও চিত্রিত হয়েছে নানা রঙ-রূপ। বৃত্তি-বর্ণের বিচিত্রতায়, লৌকিক-অলৌকিক বিশ্বাসে, উৎসব-আনন্দে, অশিক্ষা-কুসংস্কারে, মেলার বর্ণনায় আঞ্চলিকতার দিকটিকে আরো গাঢ় করে তুলেছে।

সমগ্র উপন্যাসটিতে বিহারের অরণ্যের অন্ত্যজ সম্প্রদায় সম্পর্কে বিভূতিভূষণের গভীরচারী অভিজ্ঞতার প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু তা কখনো উপন্যাসে আঞ্চলিক জীবন সম্পর্কে লেখকের অহমিকা প্রকাশের অবলম্বন হয়ে ওঠেনি। লেখকের অভিজ্ঞতা উপন্যাসের চরিত্র ও ঘটনাকে কেন্দ্র করে সহজ স্বতঃস্ফূর্ত জীবনাবেগে সঞ্চারিত হয়েছে। সর্বোপরি গাঙ্গোতা বা কাটুনী মজুর বা সাঁওতালদের জীবনকে তিনি দেখেছেন তন্নিষ্ঠ দৃষ্টি দিয়ে। নির্দিষ্ট অঞ্চলসম্পৃক্ত সমাজের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বর্ণনার ন্যায় প্রকৃতির বর্ণনাতেও লেখক সমানভাবে নিমগ্নচিত্ত।

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

১। 'আরণ্যক' উপন্যাসের ভৌগোলিক পরিবেশে আঞ্চলিকতার ছাপ রয়েছে কী? (৮০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

২। 'আরণ্যক'-এ চিত্রিত লোকজীবন আঞ্চলিকতার প্রসঙ্গটি কতটুকু দৃঢ় করেছে? (৪০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

উপর্যুক্ত আলোচনার সূত্র ধরে এবারে আমরা 'আরণ্যক' উপন্যাসের কাহিনিবৃত্তে আঞ্চলিকতার প্রয়োগ-সাফল্য বিচার করে দেখতে পারি। বস্তুত বিহারের জঙ্গলের অরণ্যময় নির্জনতায় বিভূতিভূষণ যে আখ্যান রচনা করেছেন তাতে আঞ্চলিকতার প্রায় সব উপাদানই লক্ষ করার মতো। টোলের পণ্ডিত মটুকনাথ, মৈথিল ব্রাহ্মণ রাজু পাঁড়ে, গিরিধারীলাল, ধাতুরীয়া, মঞ্চী, কবি বেঙ্কটেশ্বর, অরণ্যের সাঁওতাল

রাজকুমারী ভানুমতী ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের মানুষের কথা বলে 'আরণ্যক'। এদের জাতপাতের গুরুত্ব, পোষাক-আসাকের বৈশিষ্ট্য, চেহারা, খাবার-দাবার, বাড়ি-ঘর সবই স্থানিক পরিবেশের নিরিখেই বিচার্য। গাঙ্গোতা, দোসাদ, মৈথিল ব্রাহ্মণ-রাজপুত, সাঁওতাল এদের জীবন-জীবিকার পটভূমিতে আছে অরণ্যময় নির্জনতা ও প্রকৃতির অমোঘ প্রভাব। 'আরণ্যক' উপন্যাসের লোকজীবন, ব্রাহ্মণ-রাজপুত-দোসাদ-গাঙ্গোতাদের জীবন-জীবিকা, সমাজ-কাঠামো, জাতপাত, অশিক্ষা-কুসংস্কার, উৎসব-মেলা, লৌকিক-অলৌকিক বিশ্বাস— ইত্যাদি সবকিছু মিলে উপন্যাসে আঞ্চলিকতার প্রেক্ষিতটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

'আরণ্যক'-এ একটি বিশেষ জনজাতি নেই, আছে নানা জাতপাতের জনজাতির ভিড়। এদের সবাইকে নিয়ে গড়ে উঠেছে একটি সমাজ বা গোষ্ঠী। একদিকে রাসবিহারী সিং বা ছট্টু সিং-এর মতো রাজপুত মহাজন অন্যদিকে গাঙ্গোতা-দোসাদদের মতো দরিদ্র মজুর। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'য় কাহার জনগোষ্ঠীর জীবন, 'পদ্মানদীর মাঝি'তে পদ্মাপারের জেলেদের জীবনকে, 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এ তিতাস পারের জেলেজীবন একটি নিবিড় প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, কিন্তু 'আরণ্যক'-এ এমন একটি নির্দিষ্ট জীবন নেই। একটি অঞ্চলে বহুদিন বসবাসের ফলে এদের জীবন-জীবিকার মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠতা লক্ষ করা যায়। বস্তুত এখানে নানা জাতের মানুষ, তাদের নানা বৃত্তি-প্রবৃত্তি, বিশ্বাস-অবিশ্বাস। তবু বলতে হয় বহু জনজীবনের নানা আচার-আচরণ মিলে সেই ভীষণ বন্যতার মধ্যে কোথায় যেন একটা অদৃশ্য সম্পর্কের সূত্র তৈরি করে। সেই সম্পর্ক দরিদ্রের সম্পর্ক। বিভূতিভূষণ 'আরণ্যক'-এ যে প্রজা দেখেছেন সকলেই গরিব। অধিকাংশই নিম্নবর্গীয়, জাতে না হলেও বৃত্তিতে। এদের মধ্যে প্রধান হল গাঙ্গোতা। এদের দুঃখ-বেদনা, আনন্দ-উৎসবের কথা বেশি করে ফুটে উঠেছে 'আরণ্যক'-এ। বিচিত্র এদের জীবন, এক অর্থে যাযাবর। কেন না এদের জীবনপ্রবাহ অনিশ্চিত এবং সহায়সম্বলহীন। যেখানে ফসল পেকে ওঠার খবর পায় বিভিন্ন স্থান থেকে চলে আসে সেখানে। এরা কাটুনী মজুর। এদের খাওয়া-দাওয়া, জীবন-জীবিকা, বাসস্থান সবই অদ্ভুত। উপন্যাসে পাই—"ইহাদের জীবন বড় অদ্ভুত, —পূর্ণিয়া তরাই ও জয়ন্তীর পাহাড়-অঞ্চল ও উত্তর ভাগলপুর হইতে স্ত্রী-পুত্র লইয়া ফসল পাকিবার সময় ইহারা আসিয়া ছোটো ছোটো কুঁড়েঘর নির্মাণ করিয়া বাস করে ও জমির ফসল কাটে— ফসলের একটা অংশ মজুরি-স্বরূপ পায়। আবার ফসল কাটা শেষ হইয়া গেলে কুঁড়েঘর ফেলিয়া স্ত্রী-পুত্র লইয়া চলিয়া যায়। আবার আর বছর আসিবে। ইহাদের মধ্যে নানা জাতি আছে— বেশীরভাগই গাঙ্গোতা কিছু ছত্রী। ভূমিহার ব্রাহ্মণ, মৈথিল ব্রাহ্মণ পর্যন্ত আছে।" উপন্যাসে আরো কিছু চরিত্র পাওয়া যায় যাদের উপজীবিকা মহিষ চরানো আর দুধ থেকে ঘি তৈরি করে বিক্রি করা।

বস্তুত উপন্যাসে চিত্রিত মানুষগুলো বিভিন্ন জাতের হলেও কর্মসূত্রে এরা সমগোত্রীয় এবং একই ভৌগোলিক পরিবেশের মধ্যে আবদ্ধ। বেশির ভাগই কুটুনি

মজুর। যাযাবরের মতো যে ঘর বেঁধে থাকে তাকে বলা হয় 'খুপরী' অর্থাৎ ছোটো ছোটো কুটির। চারদিকে কাশের বেড়া। দরজা-জানালার বদলে কাশের বেড়া খানিকটা দরজার মতো কাটা। শীতের দিনে হিম আসে হু-হু করে। এত নিচু যে হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকতে হয়। মেঝেতে খুব উঁচু করে শুকনো কাশ আর বনঝাউয়ের সুটি বিছানো, তার উপর শতরঞ্জি পাতা। এই 'খুপরী'তে সোজা হয়ে দাঁড়ানো যায় না, কেন না উচ্চতায় মাত্র তিন হাত। এর মধ্যেই কুটুনি মজুরেরা রাত কাটায়, সামনে আগুন জ্বালিয়ে গল্প করে, আবার শীতের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য কলাইয়ের ভূষির মধ্যে শরীর ঢুকিয়ে গরম অনুভব করে। 'ঘাটো', মকায়ের ছাতু, কলায়ের ছাতু তাদের খাদ্য। নুন আর শাক দিয়ে তারা পরম আনন্দে এই ঘাটো খেয়ে বেঁচে থাকে। উল্লিখিত এই জীবন 'আরণ্যক' উপন্যাসের স্থানিক পরিবেশে একান্তই মানানসই। উপন্যাসে সত্যচরণ গণু মাহাতোর জীবনাচরণ দেখে বলে— "তাহার অন্য কোন কারণ নাই ইহা ছাড়া যে, গণু মাহাতোর জীবনের ধারণাই এইরূপ। যখন তাহার পাঁচটি মহিষ তখন তাহাদের চরাইতে হইবে এবং যখন চরাইতে হইবে, তখন জঙ্গলে কুঁড়ে বাঁধিয়া একা থাকিতেই হইবে। এ অত্যন্ত সাধারণ কথা, ইহার মধ্যে আশ্চর্য হইবার কি আছে।" সুতরাং দেখা যায় এদের জীবন-জীবিকা একান্তই অঞ্চলসম্পৃক্ত ব্যাপার।

গণু মাহাতো জাতিতে গাঙ্গোতা। তাদের জীবিকা বস্তুত উপজীবিকা 'চাষবাস ও পশুপালন।' স্থানিক জীবনের পটে আঁকা এই গাঙ্গোতাদের জীবন-জীবিকাও স্বতন্ত্র। এদের আহার সম্পর্কে সত্যচরণ বলে "... শ্যামাঘাসের ক্ষেত, যার দানা সিদ্ধ এ-অঞ্চলের প্রায় সকল গরিব লোকেরই একটা প্রধান খাদ্য।" সত্যচরণের সঙ্গে কথোপকথনে গণুও বলেছে ওদের খাদ্যের বিষয়ে— "খেড়ীর দানা সিদ্ধ, আর জঙ্গলে বাথুয়া শাক হয়, তাই সিদ্ধ, একটু লুন, এই খাই।" উপন্যাসে গণু মাহাতোর শারীরিক গঠনও আঞ্চলিক পরিবেশের পটে বিচার্য— "বেশ চওড়া কপাল, উঁচু নাক, রং কালো— মুখশ্রী সরল, শান্ত চোখের দৃষ্টি। বয়স ষাটের উপর হইবে মাথার চুল একটিও কালো নাই। কিন্তু শরীর এমন সুগঠিত যে, এই বয়সেও প্রত্যেকটি মাংসপেশী আলাদা করিয়া গুণিয়া লওয়া যায়।" এদের চালচলনের মধ্যেও একটি অঞ্চলঘনিষ্ঠ ব্যাপার লক্ষ করার মতো— কাঁচা শালপাতার লম্বা পিক বা চুরুট খাওয়া, শীতের রাতে আগুন জ্বেলে গল্প করা, ফসল কাটার জন্য 'খুপরী' বেঁধে থাকা, ঘাটো খাওয়া, আস্ত পান, আস্ত সুপারি, একটু আতর আর কয়েকটি শুকনো খেজুর দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো, টাকা নজর দেওয়া, দুর্গাপুজোর বড়ো নৈবেদ্য সাজানো পিতলের থালায় নানা ধরনের খাবার পরিবেশন করা, অতিথির জন্য হাতি পাঠানো, অভ্যর্থনার জন্য বন্দুকে গুলি ছোড়া এগুলোর মধ্যে একটা অঞ্চলের ছবি ফুটে ওঠে।

আঞ্চলিক উপন্যাসের একটি বড়ো শর্ত হচ্ছে আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ সাফল্য। ভাষার দিক থেকেও 'আরণ্যক' উপন্যাসটি আঞ্চলিক উপন্যাসের সমগোত্রীয়। উদাহরণ স্বরূপ সত্যচরণের একটি বক্তব্য উল্লেখ করতে পারি— "এদেশের লোকে

যখন কোন মান্য ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির কথা মানিয়া লয়, তখন কেবল মাথা সামনের দিকে ঝাঁকাইয়া সসম্ভ্রমে বলে— হুজুর।" এটা অঞ্চলবিশেষের সংস্কার তথা বাচনভঙ্গির একটা দিক। এছাড়াও উপন্যাসে অঞ্চলভিত্তিক বাক্‌ভঙ্গির কিছু কিছু প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। সত্যচরণে মুখে শুনির "বড় ভাল লাগে এ অঞ্চলের মেয়েদের মুখে হিন্দীর টানটি।" কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করা যায়— 'দয়া হোইজী' (গোনের ভাষা), 'হো গৈল হুজুরকী কৃপা-সে কড়াইয়া হো গৈল', 'শের হতে পারে— নয় তো ভাল্লু' ইত্যাদি বাক্‌ভঙ্গি দেখা যায়।

লোকজীবনও একটি বড়ো জায়গা জুড়ে আছে সমস্ত উপন্যাসে। এই অঞ্চলের লোকের বিশ্বাস-অবিশ্বাস, পূজা-পার্বণ, মেলা-উৎসব ইত্যাদি লোকজীবনের প্রেক্ষিতগুলি আঞ্চলিকতার প্রসঙ্গকে দৃঢ় করে। উল্লেখ্য যে নির্দিষ্ট স্থানিক পটভূমিতে আঞ্চলিকতার বিশেষ বিশেষ উপাদানগুলো লোকজীবনের মাধ্যমেই উপন্যাসে বিকশিত হয়ে ওঠে। বস্তুত আঞ্চলিক উপন্যাসে লোকজীবনের একটি বড়ো ভূমিকা রয়েছে। পরবর্তী আলোচনায় আমরা 'আরণ্যক'-এর লোকজীবন নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা তুলে ধরব।

উপর্যুক্ত আলোচনায় আমরা দেখতে পেলাম 'আরণ্যক' উপন্যাসটিতে ছড়িয়ে আছে আঞ্চলিকতার নানা উপাদান। এবারে আমরা দেখব উপন্যাসে চিত্রিত গাঙ্গোতা-ছত্রী-দোসাদ-মৈথিল ব্রাহ্মণ-সাঁওতাল ইত্যাদি নানা জাতের আঞ্চলিক মানুষের জীবনের বৈচিত্র্যকে স্থানিক পটভূমিতে আঞ্চলিকতার শিল্পিত রূপদান করতে গিয়ে বিভূতিভূষণ কতটুকু রসোত্তীর্ণ হয়েছেন।

১০.৩ 'আরণ্যক' উপন্যাস : লোকজীবনের প্রেক্ষাপটে

আমরা বর্তমান আলোচনায় আঞ্চলিকতার প্রসঙ্গটির আলোচনা সমাপ্ত করেছি। এবারে আসুন 'আরণ্যক' উপন্যাসের লোকজীবন সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা গ্রহণ করি।

আমরা জানি বিশেষ একটি স্থানিক পটে গোষ্ঠীবদ্ধ মানবজীবনের অবিচ্ছেদ্য জীবন-চাঞ্চল্যই আঞ্চলিকতার ক্ষেত্রে অন্যতম বিবেচ্য। স্থানিক পটে আঁকা গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনকে পরিস্ফুট করতে গেলে স্বভাবতই তাদের দৈনন্দিন জীবন-যাপন 'বাক্-ভাষা-অঙ্গভাষা, কারুকলা-চারুকলা, পোশাক-পরিচ্ছদ, রান্না-বান্না, সুর-ছন্দ, ক্রীড়া-অভিনয়, ওষুধ-তুকতাক, প্রথা-উৎসব, বিশ্বাস-সংস্কার, ধর্ম-অনুষ্ঠান, মেলা-পার্বণ' ইত্যাদির অভিব্যক্তি লেখককে পরিস্ফুট করতে হয়। গোষ্ঠীবদ্ধ স্থানিক জীবনকে খুঁটিনাটি-সহ আবিষ্কার করতে গেলে লেখকের কাছে লোকজীবন একটি বড়ো মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। লোকজীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে লোক-সংস্কৃতি। আমরা শ্রেষ্ঠ আঞ্চলিক উপন্যাসগুলিতেও দেখতে পাই লোক-সংস্কৃতির একটা বড়ো অভিব্যক্তি। 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে অদ্বৈত মল্লবর্মন মালোদের সংস্কৃতির পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন— "মালোদের নিজস্ব একটা সংস্কৃতি ছিল। গানে গল্পে প্রবাদে এবং

লোকসাহিত্যের অন্যান্য মালমসলায় যে সংস্কৃতি ছিল অপূর্ব। পূজায় পার্বণে, হাসি ঠাট্টায় এবং দৈনন্দিন জীবনের আত্মপ্রকাশের ভাষাতে তাদের সংস্কৃতি ছিল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।" বস্তুত লোকজীবনের কথা বলতে গিয়ে জীবনসম্পৃক্ত অখণ্ড-নিবিড় সংস্কৃতি অবলীলায় স্থান পেয়ে যায় উপন্যাসে।

বিভূতিভূষণ সত্যচরণের জবানিতে 'আরণ্যক' উপন্যাসের প্রস্তাবনায় বলেন— "শুধু বনপ্রান্তর নয়, কতধরনের মানুষ দেখিয়াছিলাম।" এই মানুষগুলোর কথা বলতে গিয়ে লোকজীবনের বহু অনুষঙ্গ এসেছে 'আরণ্যক' উপন্যাসে। 'আরণ্যক'-এ লোকজীবনের বিচিত্র অনুষঙ্গকে পরিস্ফুট করেছে গাঙ্গোতাদের জীবনকাহিনি, ভাষা-ভঙ্গি-গান, সাঁওতালদের জীবন-জীবিকা, দক্ষিণ বিহারের শ্রেণিগত ও জাতিগত রূপ, অশিক্ষা-কুসংস্কার, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, রীতি-নীতি, উৎসব-মেলা ইত্যাদির টুকরো টুকরো চিত্র।

'আরণ্যক'-এর লোকজীবন প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে পড়ে— "রাজু কি গণু মাহাতো, কি জয়পাল— এ ধরনের মানুষ আরও অনেক আছে জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে— ইহাদের মধ্যে নূতন জগৎ দেখিলাম যে জগৎ আমার পরিচিত নয়।" — সত্যচরণের এই উক্তি। বস্তুত অপরিচিত তথা ব্রাত্য জীবনই সত্যচরণের বেশি চোখে পড়েছে। সাঁওতালরাজ দোবরু পান্না ও তার পরিবার, গাঙ্গোতা, দোসাদ, কাটুনি মজুর— এমনি বহু সম্প্রদায়, এমনি কত জাতি, কত জীবনস্রোত 'আরণ্যক'-এর পটভূমিতে এসে মিলেছে। এই জীবনস্রোত প্রবাহিত হয় শুধু দুমুঠো ভাতের জন্য, না হলে মকাই বা চীনাঘাসের দানা বা বথুয়া শাক সেদ্ধ আর নুনের জন্য প্রবাহিত হয় এ-জীবন। সত্যচরণ বলে— "বিশেষ করিয়া এখানকার মানুষে গাছপালার সৌন্দর্য বোঝে না, বন্য ভূমিশ্রীর মহিমা দেখিবার চোখ নাই, তাহারা জানে পশুর মত পেটে খাইয়া জীবন যাপন করিতে।" তবু এই মানুষগুলোর মধ্যে আমরা দেখি লোকজীবনের নানা অনুষঙ্গ। 'আরণ্যক'-এর মানুষের জীবনের ক্ষণিকতা, ভঙ্গুরতা তথা অস্থায়ীত্বকে স্বীকার করলেও এর লোকজীবন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

লোকজীবনের সঙ্গে জাতপাতের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। কেন না অশিক্ষা-কুশিক্ষায় ঘেরা সমাজে জাত-পাত তার পুরো বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রতিভাত হয়। 'আরণ্যক' উপন্যাসে রাজপুত, ভুঁইহার বা মৈথিল ব্রাহ্মণ, গাঙ্গোতা, দোসাদ ইত্যাদি নানা জাতের মানুষের সঙ্গে স্থান পেয়েছে সামাজিক বৈষম্য বা জাতিগত বৈষম্য। রাজপুত এবং মৈথিল বা ভুঁইহার ব্রাহ্মণ উচ্চবর্ণের আর গাঙ্গোতা নিম্নবর্গের জাতি। দোসাদরা হল হরিজন। উপন্যাসে জাতি-চরিত্রের সঙ্গে শ্রেণিচরিত্রের উল্লেখও আছে। সুতপা ভট্টাচার্য এ-প্রসঙ্গে লিখেছেন— "কিন্তু জাত-পাত যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক, সমাজের ক্ষমতা-কাঠামোতে শ্রেণীগত চরিত্র জাত-গত চরিত্রের থেকে বেশি স্পষ্ট।" তবু 'আরণ্যক'-এ দেখি জাত-পাতের নানা বিচার। হরিজন দোসাদরা বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে সত্যচরণের কাছারিতে ভাতের আশায় আসে, ভিজে ভিজে উঠোনে বসে খায়, তারা কাছারির বারান্দায় উঠতে পারে না। কেন না তাদের ছোঁয়া গাঙ্গোতারা, ব্রাহ্মণরা

খাবে না। অন্যদিকে গাঙ্গোতার ছোঁয়া খায় না রাজপুত বা ব্রাহ্মণ, আবার দেখা যায় গাঙ্গোতিন মঞ্চীকে ব্রাহ্মণ পাণ্ডারা গরম জলের কুণ্ডে স্নান করতে দেয় না। শুধু তাই নয়, ব্রাহ্মণ মটুকনাথের ঘোর আপত্তি গাঙ্গোতা দ্রোণ মহাতোর শিব পূজায়। ব্রাহ্মণ গনোরি তেওয়ারি, মটুকনাথ বা রাজু পাঁড়ে দরিদ্র হলেও ব্রাহ্মণত্বের গর্ব আছে, শ্রমজীবনে তাদের আগ্রহ নেই, তাই তারা লেখাপড়ার চর্চা ছাড়ে না। আবার আঁতে ঘা লাগলে সমাজের উচ্চশ্রেণিতে বসবাসকারীদের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়, তার ঢেউ এসে লাগে গাঙ্গোতাদের জীবনে, দোসাদদের জীবনে। ধনবান ও ক্ষমতাবান রাসবিহারী সিং ও দেবী সিং-এর মধ্যে লড়াই হয়, ক্ষমতার লড়াই। দেবী সিং মামলায় লড়ে সর্বস্বান্ত হয়, কাশ্মীরের এক বেজাত বাইজির মেয়েকে বিয়ে করে সমাজে প্রতিষ্ঠা পায় না এবং নানা ঘাত-প্রতিঘাতে তার মৃত্যু হয়। দেবী সিং-এর মৃত্যুর পর বিধবা স্ত্রী কুন্তা সহায় সম্বলহীন জীবনযাপন করে, স্বজাতের লোক তাকে সহায়তাও করে না, আশ্রয়ও দেয় না।

সবমিলে দেখা যায় 'আরণ্যক'-এ এধরনের নানা মানুষের ভিড়। স্থানীয় মানুষের সঙ্গে আছে বহিরাগত নানা মানুষ। "পূর্ণিয়া তরাই ও জয়ন্তীর পাহাড়-অঞ্চল ও উত্তর ভাগলপুর হইতে স্ত্রী-পুত্র লইয়া ফসল পাকিবার সময় ইহারা আসিয়া ছোট ছোট কুঁড়েঘর নির্মাণ করিয়া বাস করে ও জমির ফসল কাটে— ফসলের একটা অংশ মজুরি পায়। আবার ফসল কাটা শেষ হইয়া গেলে কুঁড়েঘর ফেলিয়া স্ত্রীপুত্র লইয়া চলিয়া যায়।"

বস্তুত 'আরণ্যক'-এর জঙ্গলভূমি নানা মানুষের পদধ্বনিতে প্রাণচঞ্চল। বিভূতিভূষণও এই মানুষের বা এই লোকজীবনের নিত্যদিনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনা, আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি, ভাব-ভঙ্গি, খাওয়া-দাওয়া, উৎসব-আনন্দ, প্রথা-পরব, লৌকিক-অলৌকিক বিশ্বাসকে অধিক গুরুত্ব দেন। মূলত 'আরণ্যক'-এ সত্যচরণের প্রকৃতিপ্রেমকে বাদ দিলে যা পাওয়া যায় তা এই লোকজীবন। 'আরণ্যক' উপন্যাসটি বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত মানুষের লীলাভূমি, এখানে একান্তভাবে একটি বিশেষ স্থানিক লোকজীবন খুঁজে পাওয়া যায় না, তথাপি বলতে হয় খণ্ড খণ্ড বৃত্তি ও বর্ণের বিচিত্রতায়, লৌকিক-অলৌকিক বিশ্বাসে, উৎসব-আনন্দের আরণ্যজীবনের মধ্যে একটি লোকজীবনের কলতান ধ্বনিত হয়ে ওঠে।

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

'আরণ্যক' উপন্যাসে জাতিভেদ প্রথার কী চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে? (৮০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

স্থানিক অশিক্ষা, কু-শিক্ষাজাত অন্ধবিশ্বাস-কুসংস্কার 'আরণ্যক'-এর লোকজীবনের প্রেক্ষিতটি বাস্তব করে তোলে। সমাজের জাতপাতের বাস্তবতার মতোই এখানকার অন্ধবিশ্বাস-কুসংস্কারের বাস্তবতা সত্যচরণকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসে বর্ণিত হয় নানা অতিপ্রাকৃত-অলৌকিক কাহিনি। বর্ণিত হয় বোমাইবুরুর জঙ্গলের দুর্নাম, বর্ণিত হয় একধরনের জীনপরী 'ডামাবাণু'-র কাহিনি। এই 'ডামাবানু'-রা জ্যোৎস্নারাতে হাত ধরাধরি করে নাচে, মানুষ বেঘোরে পড়লে মেরেও ফেলে। এরকমই অতিপ্রাকৃত কাহিনি জড়িয়ে আছে সরস্বতী কুণ্ডীর সঙ্গেও। সরস্বতী কুণ্ডী মায়ার কুণ্ডী, এখানে রাতে হুরী-পরীরা নামে, জ্যোৎস্নারাতে ডাঙার পাথরের ওপর কাপড় খুলে জলে নেমে স্নান করে। গনু মাহাতোর মুখে শোনা যায়- উডুক্কু সাপের গল্প, জীবন্ত পাথর ও আঁতুড়ে ছেলের হেঁটে বেড়াবার গল্প। অলৌকিক বিশ্বাসের আরেক নিদর্শন— বন্যমহিষের দেবতা টাঁড়বারো। টাঁড়বারো বুনো-মহিষকে শিকারির হাত থেকে রক্ষা করে। বস্তুত উপন্যাসে বর্ণিত লোকজীবনের সঙ্গে মহিষের দেবতা টাঁড়বারোর কাহিনি বা অন্যান্য অতিপ্রাকৃত কাহিনিগুলোর বর্ণনা বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। আসলে উপন্যাসে লোকজীবনের প্রেক্ষিতটিকে পরিস্ফুট করার জন্যই এই অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিক কাহিনির চিত্রায়ন। তাই রাজা দোবরু পান্না বড়ো বিশ্বাসের সঙ্গে বলে— 'টাঁড়বারো বড় জাগ্রত দেবতা।' এই লোকবিশ্বাসটিকে সত্যচরণের উক্তি আরো গভীর করে তোলে— "এই অরণ্যচারী আদিম সমাজের দেবতাকে সভ্য জগতে কেউই মানে না, জানেও না— কিন্তু ইহা যে কল্পনা নয়, এবং এই দেবতা যে সত্যই আছেন— তাহা স্বতঃই মনে উদয় হইয়াছিল সেই বিজন বন্যজন্তু-অধ্যুষিত অরণ্য ও পর্বত অঞ্চলের নিবিড় সৌন্দর্য ও রহস্যের মধ্যে বসিয়া।"

বস্তুত এই সব নানা লৌকিক-অলৌকিক, প্রাকৃত-অতিপ্রাকৃত ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে 'আরণ্যক'-এর লোকজীবনকে শিল্পিত মহিমা দান করেছে এর আনন্দ-উৎসব, প্রথা-পরব-মেলা ইত্যাদি আনন্দ-অনুষ্ঠান। এ প্রসঙ্গে ড০ সমরেশ মজুমদার বলেন— "উৎসব-ব্যসনের কথা মনে পড়ে তখনই। যে জীবন কায়িক শ্রমে ঠাসা, সেখানেও সঙ্গীত নৃত্যের জন্যে আসন পাতা থাকে, যারা সূক্ষ্মশিল্পের জাল বুনে জীবনকে মধুময় করে তুলেছেন কর্মকোলাহলের পর তাদের জন্যে অপেক্ষা করে সুরসঙ্গতি। এই বাজে খরচের জন্যেই ধন্য মানবজীবন। এর মধ্যদিয়েই পরের দিনের কর্মের উদ্দীপনার সঞ্চার হয়।" বস্তুত 'আরণ্যক' উপন্যাসের আনন্দ-উৎসব-প্রথা-পরব-মেলা ইত্যাদি অনুষ্ঠান এই পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার্য।

লোকজীবনের সঙ্গে মেলার একটি ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। 'আরণ্যক'-এও দেখি সত্যচরণের কাছারি থেকে ১৪-১৫ মাইল দূরে ফাল্গুন মাসে হোলির সময় একটি গ্রাম্য মেলা হয়। পাহাড়ের ঢালুতে চারদিকে শাল-পলাশের বনে ঘেরা ছোটো একটা গ্রামের মাঠে মেলা বসেছে। মহিষাবাড়ি, কড়ারী, তিনটাঙা, লছমিয়াটোলা, ভীমদাসটোলা, মহালিখারূপ ইত্যাদি নানা স্থান থেকে লোকজন এসেছে মেলায়,

বিশেষ করে মেয়েরা এসেছে বেশি। বন্য-মেয়েরা পিয়াল ফুল, লাল ধুতুরা ফুল খোঁপায় গুঁজে এসেছে। অনেকের মাথায় আবার কাঠের চিরুনী লাগানো রয়েছে। মেয়েরা মেলার দোকান থেকে পুঁতির মালা, সাবানের বাক্স, বাঁশি, আয়না আর ছেলেরা সিগারেট কিনছে। অনেকে আবার তিলুয়া, রেউড়ি, রামদানার লাড্ডু ও তেলে ভাজা কিনে খাচ্ছে। বস্তুত মেলায় উপকরণের অভাব নেই। বইয়ের দোকানে নানা ধরনের বই— লয়লা-মজনু, বেতাল পঁচিশী, প্রেমসাগর ইত্যাদি নানা বই। এছাড়াও আছে তরিতরকারির বাজার, — কাঁচা শালপাতার ঠোঙায় শুঁটকী, কুচোচিংড়ি, নালসে পিঁপড়ের ডিম, পেঁপে, শুকনো ফুল, কেঁদফুল, পেয়ারা, বুনো সীম ইত্যাদি বিক্রি হচ্ছে সেখানে। এই হোলির মেলা ছাড়াও ফুলকিয়া বইহারে ফসল কাটার সময় নানা মানুষের সমারোহে উৎসবের আমেজ তৈরি হয়। এই সব নানা মানুষের দৈনন্দিন জীবনজীবিকার বর্ণনার মধ্য দিয়ে আমাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে ওঠে লোকজীবনের প্রেক্ষাপটটি। লোকজীবনের সূত্র ধরেই উপন্যাসে আসে অনেক বাজিয়ে, গাইয়ে, নাচনেওয়ালি, বহুরূপী সঙ, মারোয়াড়ি ব্যবসায়ী, কুলি, গাড়োয়াল, হালুইকর, ফেরিওয়ালা এবং আরো অনেক মানুষের ভিড়। এই মানুষগুলোর আনাগোনায় ফুলকিয়ার চেহারা পাল্টে যায়। ছিটের কাপড়, সাবান, কাচেন বাসন, মনোহারী জিনিস, পুতুল, পুরী, কচৌরি, লাড্ডু, কালাকন্দ, সিগারেট ইত্যাদি নানা বস্তু বিক্রি হতে লাগল। ছেলে-মেয়েদের হাসির শব্দ, চিৎকার-চেঁচামেচি, গান-বাজনা, নাচিয়েদের ঘুঙুরের শব্দে ফুলকিয়ার চারদিকে মেলার আমেজ। এভাবেই 'আরণ্যক'-এ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে লোকজীবনের প্রেক্ষিত।

হোলির উৎসবের মতো ছট্‌পুজো এবং ঝুলন উৎসবের গুরুত্বও উপন্যাসে কম নয়। কার্তিক মাসে ছট্‌পুজো এদেশের লোকের বড়ো উৎসব। ছট্‌পুজোর সময় দেখা যায় বিভিন্ন টোলা থেকে মেয়েরা আসে, হলুদ ছাপানো শাড়ি পরে দলে দলে গান করে এবং কলবলিয়া নদীতে ছট্‌ ভাসিয়ে দেয়। উৎসবের ধুম সারাদিন চলে এবং সন্ধ্যায় সবাই ছট্‌পরবের পিঠে ভাজে, ঘিয়ে ভাজা এক ইঞ্চি পুরু ইঁটের মতো শক্ত ঠেকুয়া পিঠের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে বস্তিময়। বস্তুত ছট্‌-পরব এবং একে ঘিরে দরিদ্রমানুষের মধ্যে অভিব্যক্ত আনন্দ-উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে বিভূতিভূষণ লোকজীবনের একটি স্নিগ্ধ ছবি ফুটিয়ে তোলেন।

উপন্যাসের লোকজীবনকে আরো ঘনীভূত করে তোলে এখানকার হোলি উৎসব। হোলিতে সত্যচরণ রাসবিহারী সিং-এর কাছ থেকে নিমন্ত্রণ পায়। সত্যচরণ সেখানে যাবার পরে একটি বড়ো থালায় কিছু আবীর, কিছু ফল, কিছু টাকা, গোটাকতক মিছরিসহ এক ছড়া ফুলের মালা দিয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানানো হল। উপন্যাসে ঝুলন উৎসবের বর্ণনাও সুলভ। একবার সাঁওতাল রাজা দোবরুপান্না সত্যচরণকে ঝুলন উৎসবে নিমন্ত্রণ জানায়। রাজু ও মটুকনাথকে সঙ্গে নিয়ে শ্রাবণ পূর্ণিমায় ঝুলনোৎসবের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেল সত্যচরণ। সাঁওতালরাজের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার বর্ণনা দিতে গিয়ে উপন্যাসে লোকজীবনের দিকটি আরো

পরিষ্কার হয়ে ওঠে। বস্তুত লোকজীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে লোকসংস্কৃতি। লোকসংস্কৃতির বহু উপাদান সাঁওতালদের জীবনে লক্ষ করা যায়। এদের জীবনের দৈনন্দিন চিত্র আঁকতে গিয়ে বাক্‌ভঙ্গি, পোষাক-আসাক, রান্না-বান্না, সুর-ছন্দ, প্রথা-উৎসব, বিশ্বাস-সংস্কার, ধর্ম-অনুষ্ঠান ইত্যাদি নানা লোকসংস্কৃতির দিকগুলো বিভূতিভূষণ ক্ষুদ্র পরিসরে বলতে চেয়েছেন। বস্তুত ঝুলন উৎসব উপলক্ষে এসে সাঁওতালদের বংশগৌরব, মেয়েদের নাচ-গান, আচার-আচরণ, কথা-বার্তা, খাওয়া-দাওয়া, ঘর-বাড়ি, বিশ্বাস-সংস্কার ইত্যাদি সত্যচরণের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে, উপন্যাসে এই বর্ণনার মধ্যে লোকজীবনেরই একটা আভাস পাওয়া যায়।

পরিশেষে বলা যায় সমগ্র 'আরণ্যক' উপন্যাসজুড়ে আঞ্চলিকতা এবং লোকজীবনের বহু চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, কিন্তু এগুলো সমগ্র উপন্যাসের কাহিনি-বিন্যাসর ক্ষেত্রে অনিবার্য হয়ে উঠতে পারেনি, খণ্ড খণ্ড দৃশ্যরূপেই এগুলি চিত্রিত। মূলত রাজু পাঁড়ে, মটুকনাথ, ধাতুরীয়া, কুন্তা, মঞ্চী, ভানুমতী— এরা সকলে বুনো মহিষের দেবতা টাঁড়বারো, অলৌকিক কুকুর কাহিনি, সূর্যের আবির্ভাব ইত্যাদি নানা আঞ্চলিক বিশ্বাসের আভায় বড়ো হয়েছে এবং 'এদের চরিত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব নেই' বলেই অনেকে বলেন— " আরণ্যক' উপন্যাসে পটভূমির চাপে মানুষ সঙ্কুচিত হয়ে গেছে। লেখক প্রকৃতির অনির্বচনীয় সৌন্দর্যে এমনই তন্ময় হয়ে পড়েছেন যে তাঁর চোখে মানুষ অনেকখানি অনাদৃত অবহেলিত। 'আরণ্যক'-এর প্রকৃতি ও মানুষের এই সামঞ্জস্যের অভাব অনেকের দৃষ্টিকে পীড়িত করেছে।" এই সুত্র ধরে আমরাও বলতে পারি সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও লেখকের প্রকৃতিপ্রেম উপন্যাসের আঞ্চলিকতা তথা লোকজীবনকে ক্ষুণ্ণ করেছে।

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

১। 'আরণ্যক' উপন্যাসে কী কী আনন্দে-উৎসবের ছবি ফুটে উঠেছে? (৫০টি শব্দের মধ্যে)।

.....

.....

.....

২। 'আরণ্যক'-এ উল্লিখিত লৌকিক-অলৌকিক ঘটনাগুলো উপন্যাসের কোন দিককে উজ্জ্বল করেছে? (৬০টি শব্দের মধ্যে)।

.....

.....

.....

৩। 'আরণ্যক'-এ কী কী লোকবিশ্বাসের ছবি পাওয়া যায়? (৫০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

৪। টাঁড়বারো কী? (৩০টি শব্দের মধ্যে)।

.....

.....

১০.৪ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

'আরণ্যক' উপন্যাসের আঞ্চলিকতার প্রসঙ্গের আলোচনা আমরা শেষ করেছি। এখানে আমরা আঞ্চলিক উপন্যাসের স্বরূপ এবং সংজ্ঞা আলোচনা করে দেখিয়েছি যে, কেন উপন্যাস সাহিত্যে আঞ্চলিক উপন্যাস বলে আলাদা শ্রেণিবিভাগ করা হয়। আমরা আলোচনা করেছি কী কী বৈশিষ্ট্য থাকলে একটি উপন্যাসকে আঞ্চলিক বলা যায়, আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট করার জন্য উল্লেখ করেছি বিভিন্ন সাহিত্যসমালোচকের উক্তি।

আঞ্চলিক উপন্যাসের স্বরূপ ও সংজ্ঞা আলোচনা করার পর আমরা 'আরণ্যক' উপন্যাসের আঞ্চলিকতার প্রসঙ্গটি নিয়ে একটি মননশীল আলোচনা তুলে ধরেছি। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করেছি 'আরণ্যক' উপন্যাসে উল্লিখিত আঞ্চলিকতার বিভিন্ন দিকগুলো। কী কী বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে 'আরণ্যক' উপন্যাসে আঞ্চলিকতার প্রেক্ষিতটি দৃঢ় হয়ে ওঠে সে বিষয়গুলো আলোচনা করেছি।

আঞ্চলিকতার সঙ্গে লোকজীবনের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সুতরাং আমরা 'আরণ্যক'-এর লোকজীবনের প্রসঙ্গটি নিয়েও আলোচনা করেছি। আলোচনাসূত্রে দেখেছি উপন্যাসটিতে লোকজীবনের নানা খণ্ড খণ্ড দৃশ্য ছাড়িয়ে রয়েছে। লোকজীবনের সঙ্গে জাড়িয়ে রয়েছে বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সংস্কার-কুসংস্কার, ধর্ম-অনুষ্ঠান, মেলা-পার্বণ ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ। 'আরণ্যক'-এ লোকজীবনের বিচিত্র অনুষঙ্গকে পরিস্ফুট করেছে উল্লিখিত বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সংস্কার-কুসংস্কার, ধর্ম-অনুষ্ঠান, মেলা-পার্বন ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ। প্রয়োজন সাপেক্ষে আমরা উল্লেখ করেছি উপন্যাস থেকে বিভিন্ন উদ্ধৃতি। বক্ষ্যমাণ আলোচনায় আমরা উল্লেখ করেছি নানা লোকবিশ্বাস-অবিশ্বাসের গল্প— উড়ুক্কু সাপের গল্প, জীবন্ত পাথর ও আঁতুড়ে ছেলের হেঁটে বেড়াবার গল্প, বন্য মহিষের দেবতা টাঁড়বারোর গল্প। এই সব লোকবিশ্বাস-অবিশ্বাসের সঙ্গে আমাদের আলোচনায় স্থান পেয়েছে উপন্যাসে উল্লিখিত আনন্দ-উৎসব, প্রথা-পরব-মেলা ইত্যাদি আনন্দ-অনুষ্ঠান। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করেছি

লোকজীবনের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কসূত্রেই উপন্যাসে স্থান পেয়েছে এই আনন্দ-উৎসব, মেলা-পার্বন ইত্যাদি অনুষ্ঠানগুলো।

পরিবেশেষে আমরা উল্লেখ করেছি, আঞ্চলিক জীবনের প্রেক্ষাপটে রচিত বিভিন্ন লোকজীবনের সমন্বয়ে বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' উপন্যাসটি রসোত্তীর্ণ।

১০.৫ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি

প্রশ্নাবলির তালিকা দ্বাদশ বিভাগে সংযোজিত হয়েছে।

১০.৬ প্রসঙ্গ-পুস্তক

প্রসঙ্গ-পুস্তকাবলির তালিকা দ্বাদশ বিভাগে সংযোজিত হয়েছে।

* * *

বিভাগ-১১

আরণ্যক

আরণ্যক : চরিত্র চিত্রণ

বিষয় বিন্যাস

১১.০ ভূমিকা (Introduction)

১১.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

১১.২ চরিত্রবিচার

১১.২.১ পুরুষ চরিত্র

১১.২.১.১ সত্যচরণ

১১.২.১.২ রাসবিহারী সিং

১১.২.১.৩ যুগলপ্রসাধ

১১.২.২ নারী চরিত্র

১১.২.২.১ ভানুমতী

১১.২.২.২ কুন্তা

১১.২.২.৩ মঞ্চী

১১.৩ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

১১.৪ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

১১.৫ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

১১.০ ভূমিকা (Introduction)

'আরণ্যক' উপন্যাস অধ্যয়নকালে আমরা দেখেছি প্রকৃতির অনির্বচনীয় লীলামাহাত্ম্যের মাঝে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে বহু মানুষের জীবনযাত্রা। এ-প্রসঙ্গে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন— "এখানে অরণ্যপট যত আমাদের অভিভূত করুক লেখকের লক্ষ্য ছিল পটবিধৃত মানুষ।" উপন্যাসের প্রস্তাবনায় সত্যচরণও বলে— "শুধু বনপ্রান্তর নয়, কতধরনের মানুষ দেখিয়াছিলাম। . . . কত অতি দরিদ্র বালক-বালিকা, নরনারী, কত দুর্দান্ত প্রকৃতির মহাজন, গায়ক, কাঠুরে, ভিক্ষারির জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল।" তবে অনেকের ধারণা বিভূতিভূষণ তাঁর উপন্যাসে মানুষকে উপেক্ষা করে শুধু নিসর্গের অনির্বচনীয় রূপের স্বপ্নীল রঙে তন্ময় থেকেছেন। এই বক্তব্যকে মেনে নিলেও প্রশ্ন জাগে 'আরণ্যক' উপন্যাসে অরণ্যময় নির্জনতায়

রহস্যঘন যে অনির্বচনীয় সৌন্দর্য তার ফাঁকে ফাঁকে ফুটে ওঠা কুন্তা, মঞ্চী, ভানুমতী, মটুকনাথ, ধাতুরিয়া, গনু মাহাতোদের করুণ-মধুর জীবনচিত্র আমাদের মনে কি সংবেদন জাগায় না? বস্তুত এই সংবেদনশীলতার জন্যই 'আরণ্যক'-এর চরিত্রগুলো এত জীবন্ত।

'আরণ্যক' উপন্যাসে অজস্র চরিত্রের ভিড়। এই উপন্যাসের বিচিত্র মানুষের অদ্ভুত জীবনধারার স্রোতে এসে মিশেছে সত্যচরণ, রাজু পাঁড়ে, যুগলপ্রসাদ, মটুকনাথ, রাসবিহারী, ছট্টু সিংহ, নন্দলাল ওঝা, বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ, দ্রোণ মাহাতো, ধাওতাল সাহু, ননীচোরা নাটুয়া ধাতুরিয়া, নকছেদী ভকত, গানোরী তেওয়ারী, বলভদ্র সেঙ্গাই, দোবরু পান্না, ভানুমতী, কুন্তা, মঞ্চী, ধ্রুবা ও রাখালবাবুর স্ত্রীদের মতো বহু চরিত্র।

বিভূতিভূষণ বিজন অরণ্যের এই নানান মানুষের নানান বৃত্তি-প্রবৃত্তি, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, রাগ-অনুরাগের ছবি আঁকতে গিয়ে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। অসংখ্য চরিত্রের ভিড়ে কোলাহলমুখর এই উপন্যাসে অনিবার্য কারণে উপস্থিত হয় কবি-উদ্ভিদতত্ত্ববিদ-অধ্যাপক-ধূর্ত ব্যবসায়ী সামাজিক উৎপীড়নে জরজর মানুষ কাটুনি প্রজা। বস্তুত এই চরিত্রগুলোর সমাবেশেই উপন্যাসের কাহিনিতে সঞ্চারিত হয়েছে গতি।

আমরা বক্ষ্যমাণ আলোচনায় উপন্যাসে উল্লিখিত অত্যধিক চরিত্রের প্রতিনিধি স্থানীয় কয়েকটি চরিত্রকে বেছে নিয়ে কাহিনি বিন্যাসের দিক থেকে এদের প্রয়োজনীয়তা এবং চরিত্রগুলোর চারিত্রিক দিকগুলো বিচার করে দেখব। আমরা আমাদের বিষয়বিন্যাসে তিনটি পুরুষ চরিত্রকে এবং তিনটি নারী চরিত্রকে স্থান দিয়েছি। এই চরিত্রগুলোর বিচার-বিশ্লেষণই আমাদের বর্তমান আলোচনার মুখ্য উপজীব্য।

১১.১ উদ্দেশ্য

'আরণ্যক' উপন্যাসের চতুর্থ একাদশ বিভাগে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে উপন্যাসে বিন্যস্ত চরিত্র। এই বিভাগে আমরা উপন্যাসে বিন্যস্ত কয়েকটি মুখ্য চরিত্রের বিশ্লেষণে সীমাবদ্ধ থাকব। বক্ষ্যমাণ অধ্যায়ে আলোচিত চরিত্রের বিশ্লেষণের মাধ্যমে আপনারা—

- চরিত্রগুলোর একটি সাধারণ পরিচয় লাভ করতে পারবেন।
- চরিত্রগুলোর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটা ধারণা অর্জন করতে পারবেন।
- জানতে পারবেন উপন্যাসের কাহিনিগ্রন্থনে এদের গুরুত্বের পরিমাণ।

১১.২ চরিত্রবিচার

বক্ষ্যমাণ বিভাগের ভূমিকাংশে আমরা উল্লেখ করেছি যে আলোচ্য উপন্যাসটি বহু চরিত্রের ভিড়ে রসোজ্জ্বল। এই অসংখ্য চরিত্রগুলো থেকে আমরা কয়েকটি চরিত্রকে আমাদের সীমিত আলোচনায় স্থান দিয়েছি।

১১.২.১ পুরুষচরিত্র

পুরুষচরিত্র বিষয়ক বর্তমান আলোচনায় আমরা স্থান দিয়েছি সত্যচরণ, রাসবিহারী সিং এবং যুগলপ্রসাদকে। উপন্যাসের কথক হিসাবে সত্যচরণের চরিত্রটি উল্লেখযোগ্য। জঙ্গল-মহালের মহাজন চরিত্রের প্রতিভূ হিসাবে স্মরণীয় রাসবিহারী সিং, যুগলপ্রসাদ হচ্ছে আত্মভোলা প্রকৃতিপ্রেমিক। উপরিউক্ত দিকগুলো বিচার করে দেখলে বোঝা যাবে চরিত্রগুলো উপন্যাসে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। অবশ্য উপন্যাসে বর্ণিত প্রতিটি চরিত্রই স্বতন্ত্র আলোচনার দাবিদার, কিন্তু স্থানাভাবে আমরা এই তিনটি চরিত্রের বিচার-বিশ্লেষণে সীমাবদ্ধ থাকব।

১১.২.১.১ সত্যচরণ

সত্যচরণের পরিচয় দিতে গিয়ে রুশতী সেন বলেছেন— "বি.এ. পাশ বেকার যুবক সত্যচরণ। কলকাতায় মেস ভাড়া দেওয়ার সংস্থানটুকুও তার নেই। কলেজের বন্ধু অবিনাশের বাবা ময়মনসিংহের জমিদার। পূর্ণিয়ায় তাদের জঙ্গল-মহাল আছে, বিশ ত্রিশ হাজার বিঘা জমি বন্দোবস্ত করতে হবে। একজন বিশ্বাসী ও বুদ্ধিমান ম্যানেজার চাই। ... কাজ জুটে গেল তার; জঙ্গল-মহালের ম্যানেজার; 'আরণ্যক' উপন্যাসের কথক এই সত্যচরণ।" উপন্যাসের কথক কথাটা এজন্যই উপযোগী যে, সরাসরি উপন্যাসে ঘটনা ও চরিত্রগুলো আসছে না, ঘটনাগুলো বলা হচ্ছে অনেক দূরে বসে। এই বলার মধ্যে কালগত এবং স্থানগত দূরত্ব বর্তমান। অর্থাৎ সত্যচরণ ঘটনা ঘটে যাওয়ার ১৫-১৬ বৎসর পর কলকাতায় বসে তার জঙ্গল-মহালের কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার কথা বলছে সমস্ত উপন্যাস জুড়ে। সত্যচরণের এই স্মৃতিচারণের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে তার জীবনচরিত।

'আরণ্যক' উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই কলকাতার শহুরে বেকার যুবক সত্যচরণের মনপরিবর্তনের এক অভিনব চিত্র। এই পরিবর্তনের যাত্রা শুরু বি.এন.ডব্লু. রেলওয়ে স্টেশনে তাজা মটরশাকের গন্ধমাখা এক সন্ধায়, যখন সত্যচরণ ম্যানেজারের দায়িত্ব নিয়ে এখানে এসে নামে তখন থেকে। সত্যচরণের মনে স্বাভাবিক উৎকণ্ঠা— "যে জীবন আরম্ভ করিতে যাইতেছি তাহা বড় নির্জন হইবে। এই শীতের সন্ধ্যা যেমন নির্জন, যেমন নির্জন এই উদাস প্রান্তর আর ঐ দূরের নীলবর্ণ বনশ্রেণী, তেমনি।" কিন্তু বেকার সত্যচরণ নিরুপায়। কর্মের এবং পেটের দায়ে নিরুপায়

সত্যচরণকে এই নির্জনতার মধ্যেই যাপন করতে হবে দিনের পর দিন। অবশ্য এই আশঙ্কা ও শূন্যতা তাকে যে একেবারে প্রভাবিত করেনি তা নয়— "ইহার মধ্যে শীতকালের যে এগার-ঘণ্টা ব্যাপী দিন, তা যেন খাঁ-খাঁ করে শূন্য, কি করিয়া তাহা পুরাইব, প্রথম প্রথম সেইটা আমার পক্ষে হইল মহাসমস্যা। . . . কতবার মনে হইল চাকুরিতে দরকার নেই, এখানে হাঁপাইয়া মরার চেয়ে আধপেটা খাইয়া কলিকাতায় থাকা ভাল।" তার মনে প্রচণ্ড সংশয় 'এ জীবন আমার জন্য নয়', আবার বৃদ্ধ মুহুরীর সান্ত্বনার আশ্বাস 'কিছুদিন থাকুন— তারপর দেখবেন। . . . জঙ্গল আপনাকে পেয়ে বসবে।' দুয়ের টানাপোড়েনে শুরু হয় সত্যচরণের স্নায়ুর লড়াই। গোষ্ঠবাবু চলে গেলে সত্যচরণ জানালার কাছে দাঁড়ায়, হঠাৎ প্রকৃতির রূপমুগ্ধ অনির্বচনীয় সৌন্দর্য সত্যচরণের মনে নাড়া দেয়। বনঝাউয়ের ডালের ফাঁকে ফাঁকে উদীয়মান চাঁদের সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়। সেই থেকে শুরু, তারপর হঠাৎ একদিন সত্যচরণ আবিষ্কার করে 'দিন যতই যাইতে লাগিল, জঙ্গলের মোহ ততই আমাকে ক্রমে পাইয়া বসিল।' শুধু প্রকৃতি নয়, সেই নির্জন অরণ্যের সরল লীলাময় বিচিত্র জীবনও সত্যচরণের মুগ্ধতার আধার। বস্তুত অরণ্যের অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের মতো অরণ্যবাসী এক ঝাঁক মানুষের অনুরাগ ও সরলতাও সত্যচরণকে মুগ্ধ করে। সত্যচরণ ধীরে ধীরে অরণ্যের বিচিত্র মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে শুরু করে। লবটুলিয়া বইহারের এক শীতের রাতে আগুনের ধারে বসে গনোরী তেওয়ারীর গল্প শুনতে শুনতে সত্যচরণ উপলব্ধি করে— "যেন চিরপরিচিত পৃথিবী হইতে নির্বাসিত হইয়া মহাশূন্যে, এক গ্রহে অন্য এক অজ্ঞাত, রহস্যময় জীবন-ধারার সহিত জড়িত হইয়া পড়িয়াছি।"

পরিবর্তন মানুষের চরিত্রের ধর্ম। সেই ধর্ম ধীরে ধীরে সত্য হয়ে ওঠে সত্যচরণের জীবনে। যে শহুরে জীবন ছিল বন্ধুবান্ধবের সঙ্গ, আড্ডা থিয়েটার জলসার ঔজ্জ্বল্যে পরিপূর্ণ, নানা সংস্কৃতির সংস্পর্শে সদাচঞ্চল সেই জীবনেরই কোনো এক নিভৃত গোপন কক্ষে লুকিয়ে ছিল অরণ্যময় নির্জনতা, শূন্যতার প্রতি সহমর্মিতা। যতদিন গিয়েছে ততই আবিষ্কৃত হয়েছে সত্যচরণের ভেতরকার এই প্রকৃতি-তন্ময়-প্রাণ। সত্যচরণ নিজেও এক এক সময় বিস্মিত তার এই পরিবর্তিত মানসপটের নবমূল্যায়ন করতে গিয়ে— "আজকাল ক্রমশ মনে হয় এই দিগন্তব্যাপী বিশাল বনপ্রান্তর ছাড়িয়া, ইহার রোদপোড়া মাটির তাজা সুগন্ধ এই স্বাধীনতা, এই মুক্তি ছাড়িয়ে কলিকাতার গোলমালের মধ্যে আর ফিরিতে পরিব না। . . . কতরূপে কত সাজেই সে বন্যপ্রকৃতি আমার মুগ্ধ অনভ্যস্ত দৃষ্টির সম্মুখে আসিয়া আমাকে ভুলাইল।" ধীরে ধীরে এই প্রকৃতিমুগ্ধতা বাড়তে থাকে, সত্যচরণও আত্মস্থ হতে থাকে প্রকৃতির অনির্বচনীয় রহস্যের মধ্যে। আমাদের সামনে হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করে সত্যচরণের প্রকৃতিমুগ্ধ শান্ত বাউল মনটি।

এরপর সমগ্র উপন্যাসে আমরা দেখি কলকাতার শহুরে আধুনিক যুবক সত্যচরণের বারবার প্রকৃতির কোলে ফিরে যাওয়া, প্রকৃতির লীলায় মুগ্ধ হওয়ার নানা ছবি, শুনি তার মুখেই তার প্রকৃতিমুগ্ধতার নানা কথা। আসলে প্রকৃতি তার

কাছে বেঁচে থাকার অবলম্বন। কলকাতার মেসজীবনের দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যেও বন্ধুসান্নিধ্য, শহরমুগ্ধতা, আনন্দকোলাহলের মধ্যে সে বেঁচে ছিল একরকম। কিন্তু জীবিকার তাড়নায় তাকে যৌবনের উজ্জ্বল স্বপ্নের শহর কলকাতার মোহ ছেড়ে নির্জন অরণ্যের বান্ধবহীন, আড্ডাহীন, নতুন জগৎ, নতুন পেশা, নতুন পরীক্ষাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বাস করতে হয়। জমিদারির জমিবণ্টন, প্রজাকুলের নিত্যসমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। বস্তুত সে যে কাজে নিযুক্ত হয়ে বেকারত্বের জ্বালা থেকে মুক্তির আশ্বাস খুঁজেছে, সেখানে এসেই হয়েছে বদ্ধ। জমিদারি ব্যবস্থার নতুন কাজ নতুন পেশা, নতুন জগতের নতুন পরিবেশ, নতুন সমস্যার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সে হাঁপিয়ে উঠেছিল। ক্লান্তি শুধু নতুন পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করে নয়, ধূর্ত ব্যবসায়ীর কূটচক্র, অত্যাচার, দরিদ্র প্রজাদের দরিদ্রতা, দুঃখ-কষ্ট দেখেও সে ক্লান্ত-শ্রান্ত। এছাড়াও সত্যচরণ না বোঝে এদের ভাষা, না পরিচিত এদের জীবনযাত্রার সঙ্গে। সব মিলে বন্ধুবান্ধবহীন, শিক্ষাহীন, সংস্কৃতিহীন অরণ্যের জীবন দুর্বিষহ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি সত্যচরণের, সে হেরে যাবার পাত্র নয়। কলকাতার বেকার জীবনেই হোক বা অরণ্যের দুর্বিষহ জীবনেই হোক। জীবনের কঠিন চ্যালেঞ্জকে সবসময় সে স্বীকার করেছে। অরণ্যজীবনেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। বস্তুত অরণ্যজীবনের আপামর সরল মানুষের দুঃখ-দুর্দশা, ধূর্ত ব্যবসায়ীর অত্যাচার এবং নিঃসঙ্গতার ফলে সৃষ্ট মানসিক অবসাদ থেকে মুক্তির জন্য সে আঁকড়ে ধরেছে প্রকৃতির স্নেহময়ী আঁচল। এ যুক্তির নিরিখে বিচার করলে দেখা যাবে প্রকৃতিই বেঁচে থাকার অবলম্বন। কর্তব্যের ডাকে সাড়া দিয়ে সত্যচরণ জমি বিলি করে প্রজা বসিয়েছে; বন কেটে নষ্ট করেছে। এই অবসাদকে ভোলার জন্যই সে ঘোড়া নিয়ে প্রকৃতির জ্যোৎস্নামাখা রাতে চলেছে নিরুদ্দেশ পথের পর পথ। এখানে তার অপ্রয়োজনের আনন্দ, প্রকৃতির কোলেই তার অবসাদ ভোলার আনন্দ।

সৌন্দর্য পিপাসা বেড়ে উঠলেও সত্যচরণ ভুলে যায় না তার কর্তব্য— "যে কাজে এখানে আসা তার জন্য অনেক চেষ্টা করা যাইতেছে। এত হাজার বিঘা জমি, হঠাৎ বন্দোবস্ত হওয়াও সোজা কথা নয় অবশ্য।" বস্তুত কর্তব্যের প্রতি গভীর নিষ্ঠা আর প্রকৃতিপ্রেমী অকৃত্রিম মনের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন করতে গিয়েই সত্যচরণের মনে দানা বেঁধে ওঠে অন্তর্দ্বন্দ্ব। উপন্যাসের কাহিনির ছোটো ছোটো এপিসোডগুলোর মধ্যেও ছড়িয়ে আছে এরই নিদর্শন। বন কেটে বসতি গড়ে তোলার কাজ নিয়ে সত্যচরণের আবির্ভাব উপন্যাসের পটভূমিতে। ধীরে ধীরে প্রজা বসানোর কাজও এগিয়েছে, ফুলকিয়া বইহার, লবটুলিয়া, নাড়া বইহার ছাড়াও সরস্বতী কুণ্ডীতেও প্রায় জমিবিলির কাজ করেছে সত্যচরণ। প্রস্তাবনা অনুযায়ী এই হচ্ছে উপন্যাসের মুখ্য বিষয়। প্রজাবিলির দায়িত্ব নিয়ে জঙ্গলে এসে জঙ্গল ধ্বংস করতে গিয়ে সেই জঙ্গলের রূপমাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে সে হয়ে ওঠে ট্র্যাজেডির নায়ক। একদিকে রূপমুগ্ধতা আর একদিকে সেই রূপমুগ্ধ মনের বিরুদ্ধে গিয়ে সত্যচরণকে ধ্বংস করতে হয় অরণ্যের শোভা। অর্থাৎ ভাবের জগৎ আর বস্তুজগতের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করতে গিয়েই to be or not to be-র টানাপোড়েনে পিষ্ট হয়েছে সত্যচরণ।

তবে সত্যচরণের এই যে অন্তর্দ্বন্দ্ব সেটা উপন্যাসে পরিষ্কার ফুটে না ওঠার কারণ 'আরণ্যক'-এর গঠনভঙ্গি। উপন্যাসটি আর পাঁচটি উপন্যাসের মতো প্রচলিত ধারায় রচিত হলে সত্যচরণের অন্তর্দ্বন্দ্বের রূপটি আরও পরিষ্কার হতে পারত। উপন্যাসের ঘটনাগুলি এবং চরিত্রগুলি সরাসরি কাহিনিতে না আসার জন্যই সত্যচরণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি পরিষ্কার নয়। ঔপন্যাসিক যেখানে কাহিনি বলেন নিরপেক্ষভাবে সেখানে চরিত্র ও কাহিনির খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ আমাদের সাহায্য করে। কিন্তু এখানে কাহিনি বলছে সত্যচরণ উত্তমপুরুষের জবানিতে। সুতরাং সে নিরপেক্ষ হতে পারেনি। এজন্য বারবার তার প্রকৃতিপ্রেমীকের ইমেজ আমাদের কাছে ভেসে ওঠে। একথা স্বীকার করেও বলতে হয় তার অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা। বন কেটে বসতি স্থাপন করতে গিয়ে সে যে ধীরে ধীরে ট্র্যাজিক হিরোতে পরিণত হয়েছে তার আভাস পাওয়া যায় উপন্যাসে। সত্যচরণ নিজ সুখে স্বীকার করে— "কিন্তু আমার এ স্মৃতি আনন্দের নয় দুঃখের। এই স্বচ্ছন্দ প্রকৃতির লীলাভূমি আমার হাতেই বিনষ্ট হইয়াছিল, বনের দেবতারা সেজন্য আমায় কখনো ক্ষমা করিবেন না জানি।" এই অপরাধবোধের মধ্যেই নিহিত থাকে ট্র্যাজেডির বীজ। এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য ক্ষেত্রগুপ্তের উক্তি— "এই উপন্যাস হল সত্যর সঙ্গে বইহারের আরণ্য প্রকৃতির প্রেম। সত্য নিজে বাধ্য হয়েছে তার প্রেমকে হত্যা করতে। এটি একটি অসাধারণ থিম সন্দেহ নেই, কিন্তু মানবিক এবং ট্র্যাজিক। এই হত্যার পিছনে নিয়তির অপ্রতিরোধ্য ভূমিকা অনুভব করি।"

গ্রিক সাহিত্যের মতো নিয়তি সত্যচরণের জীবনে অনেকটা অংশ জুড়ে রয়েছে। কলকাতার মেসজীবন থেকে শুরু করে ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে বন ধ্বংস করা— এসবের মধ্যে নিয়তির একনিষ্ঠ প্রভাব লক্ষ করা যায়। বি.এ. পাশ শিক্ষিত যুবক হয়েও কলকাতার বাজারে সে বেকার-, এটা তার নিয়তি, আবার যদি বা চাকরি পেয়েও যায় সেটা তার পরিচিত জগৎ থেকে বহু দূরে নির্জনে— এটাও তার নিয়তি।

সত্যচরণ নিয়তিতাড়িত হলেও সে ব্যাপারগুলো খুবই সূক্ষ্ম। উপন্যাসে এর কোনো ঘোষণা নেই। আসলে এটাই বিভূতিভূষণের বৈশিষ্ট্য, জ্বালারহিত সরল চরিত্র রচনাতেই তিনি পারদর্শী। সত্যচরণও আগাগোড়া ভালো মানুষ, সাধারণত বিভূতিভূষণের চরিত্র যেমন হয়, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, জীবন-সংগ্রামরহিত সহজসরল জীবনের অধিকারী। জীবনে সংগ্রাম থাকলেও সেটা প্রধান হয়ে ওঠে না। তাই সত্যচরণের ইমেজটা ভালো মানুষের, চরিত্রের মধ্যে নেই কোনো বদ্‌গুণের বিভীষিকা। সত্যচরণকে বলা যায় মরমী চরিত্র। তবু যখন নানা ঘটনা ও বৃত্তির আবর্তে তার জীবনকে বিপর্যস্ত হতে দেখি তখনই চরিত্রটির বাস্তবতা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ভালোমানুষী ইমেজকে বজায় রেখেও বিভূতিভূষণ সত্যচরণের মনের জটিল মনস্তত্ত্ব, সূক্ষ্ম অন্তর্দ্বন্দ্ব, ব্যক্তিমনের কঠিন সংঘাতকে রূপায়ণ করতে ভুলেননি। নারীর প্রতি পুরুষের স্বভাবসিদ্ধ টান রয়েছে তার মধ্যে। এই টানেই সে বারবার চলে যায় কুন্তার কাছে, কখনো যায় মঞ্চীর কাছে। এদের নিয়ে সত্যচরণের ভাবনার অন্ত নেই। আর

ভানুমতীর সঙ্গে সত্যচরণের সম্পর্ক প্রেমের। কিন্তু সত্যচরণের সেই ভালোমানুষী ইমেজটা প্রেমের দ্বিধাহীন আগ্রাসনকে বারবার দিয়েছে বাধা। এছাড়া বিভূতিভূষণ নিজেও নরনারীর অর্গলমুক্ত প্রেমকে স্বীকৃতি দেন না তাঁর সাহিত্যে। সত্যচররণ তাই সংযত ভাষায় বলে 'এখানেই যদি থাকিতে পারিতাম! ভানুমতীকে বিবাহ করিতাম।' বস্তুত সত্যচরণের চরিত্রের ভালোমানুষী ইমেজের টুকরো টুকরো ছবি উপন্যাসে অনেক আছে। মটুকনাথকে টোল করে দেওয়া, কুন্তাকে সাহায্য, যুগলপ্রসাদকে চাকরি দেওয়া, কাছারির কর্মচারিকে কড়াই কিনে দেওয়া, বিনা সেলামিতে জমি দেওয়া, গরিবের জন্য মমতা, পরিত্যক্ত রোগীর চিকিৎসা— সবই তার ভালোমানুষী সত্তার পরিচায়ক।

সমস্ত উপন্যাসে দেখি সত্যচরণ যা করেছে সবই ভালো কাজ। তার মধ্যে বদ্‌গুণের লেখমাত্র নেই। ভালোমন্দ মিলেই মানুষ। শুধু ভালো গুণের অধিকারী দেবতুল্য। বস্তুত যে কারণে 'কারাগার' নাটকের নায়ক কংস, 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের নায়ক রাবণ, সেই কারণ সত্যচরণে কোথায়? তাই চরিত্রটিকে আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় flat। গোপীকানাথ রায়চৌধুরী যাকে বলেন— "বাস্তব জগতে আমরা কখনই এমন চরিত্রের সাক্ষাৎ পাইনে, যার জীবনে দ্বন্দ্ব ও বিক্ষোভ বা পরিণতি নেই। সুতরাং সেই জাতীয় চরিত্র হয় 'টাইপ' (ই.এম. ফরস্টার যাকে Flate বা Static চরিত্র বলেছেন), নয়তো নিছক রোম্যান্টিক বলে গণ্য হবে।"

আপাত দৃষ্টিতে সত্যচরণকেও রোমান্টিক বা দ্বন্দ্বরহিত টাইপ চরিত্র মনে হয়। কিন্তু আমরা আমাদের আলোচনায় লক্ষ করেছি যে, সত্যচরণ তার মনের বিরুদ্ধে গিয়েই অরণ্যজীবনের সমস্ত কাজ করেছে। ম্যানেজারের চাকরি জীবনের প্রথম দিকটায় সত্যচরণ কিন্তু মোটেই মনের দিক দিয়ে স্বচ্ছন্দ ছিল না। নানা মানসিক দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই তাকে পালন করতে হয়েছে ম্যানেজারের দায়িত্ব। কর্ম জীবনে তাকে সহ্য করতে হয়েছে নানা ঘাত-প্রতিঘাত। তবে বিভূতিভূষণের বৈশিষ্ট্যই হল তিনি জীবনের জটিল আবর্তকে ততটা গুরুত্ব দেন না। তাই সত্যচরণকে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় দ্বন্দ্বরহিত টাইপ চরিত্র। কিন্তু উপন্যাসের শেষে গিয়ে আমরা তাকে দ্বন্দ্বরহিত রোমান্টিক চরিত্র বলতে পারি না। অবশ্য রোমান্টিক কবিমন যে তার মধ্যে নেই সেটা বলা যায় না, তবু সংঘাতও তার জীবনে কম নেই।

সত্যচরণ তার হৃদয়বৃত্তির সঙ্গে সামঝোতা করলেও কর্তব্যের সঙ্গে, কর্মের সঙ্গে কখনো তা করেনি। আসলে করতে পারেনি। কেন না সে প্রচণ্ড দায়িত্বশীল ও কর্মীযুবক, তাই দায়িত্বের সঙ্গে, কর্মের সঙ্গে আপস করতে পারে না। সেজন্য ম্যানেজার পদে তার যোগ্যতার অভাব নেই। রাসবিহারী সত্যচরণের প্রজার উপর প্রভুত্ব জাহির করতে চেষ্টা করলে— "তাহাতে আমি বাধা দিই। আমি স্পষ্ট জানাইয়া দিই, তোমাদের নিজেদের এলাকার মধ্যে যা হয় করিও, কিন্তু আমার মহালের কোনো প্রজার কেশাগ্র স্পর্শ করিলে আমি তাহা সহ্য করিব না।" —এই ধরনের বলিষ্ঠ উক্তি সত্যচরণের। আবার 'ভীমদাস টোলার উত্তরসীমায় ভয়ানক দাঙ্গা বাঁধিয়াছে'

খবর পেয়ে কাছারির সিপাহিদের নিয়ে রাসবিহারী, নন্দলাল, ছট্টু সিং-এদের বিরুদ্ধে গিয়ে দাঁড়ানোর মধ্যে সত্যচরণের কর্তব্যনিষ্ঠা ও সাহসিকতার পরিচয় রয়েছে। সে প্রচণ্ড স্পর্ধায় বলে 'আমার মহালে আমি দাঙ্গা হতে দেবো না।' এসব দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায় সে ম্যানেজারের দায়িত্ব গভীর নিষ্ঠা এবং নির্ভীকতার সঙ্গে পালন করেছে। আর পাঁচটি স্বার্থপর প্রজাপীড়ক ম্যানেজারের মতো সে নয়। জমিদারের স্বার্থ ও অধিকারের বিরুদ্ধে সে কিছু করেনি। নন্দলাল তার বড়ো ছেলের চাকরির জন্য সত্যচরণকে ঘুষ দিতে এলে সে স্পষ্ট কথা বলে তাকে বিদায় করে।

বস্তুত সত্যচরণের মধ্যে দুটি সত্তার প্রকাশ— একদিকে সে প্রকৃতিপ্রেমী উদাসী কবি, অন্যদিকে জঙ্গল-মহালের ম্যানেজার। যখন প্রকৃতিপ্রেমী তখন প্রকৃতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রাণচাঞ্চল্যে সে আনন্দিত, মুখরিত। আবার যখন সে জঙ্গল-মহালের ম্যানেজার তখন প্রয়োজন মতো রক্তচক্ষু বন্দুকধারী। এই সত্যচরণের মধ্যেই ঘনিয়ে ওঠে উদার হৃদয়বত্তা, সকলকে আপন করার ক্ষমতা এবং গরিবের প্রতি সমত্ববোধ— সবমিলে সত্যচরণের মধ্যে এক ভালোমানুষী সত্তার বাস। সে গরিবের দুঃখে ব্যথিত হয়, জমিদারের স্বার্থ নষ্ট হলে ক্ষুব্ধ হয়।

জঙ্গল-মহালের দায়িত্ব নেবার পর উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত-অন্ত্যজ মানুষদের সংস্পর্শে তাকে আসতে হয়েছে। ফলে প্রজা বা খাতক বা হঠাৎ জঙ্গলে আসা মানুষের সঙ্গে হৃদ্যতার সম্পর্ক স্থাপিত হয় তার। এর মধ্যে গরিবের সঙ্গেই বেশি হৃদ্যতা। সেজন্যই গরিব সহায় সম্বলহীন মানুষ তার মধ্যে খুঁজে পায় আশ্বাসস্থল। কুন্তা, মঞ্চী, ভানুমতী, ধাতুরিয়া, বেঙ্কটেশ্বর, যুগলপ্রসাদ সবারই ভরসা ম্যানেজারবাবু। আসলে কোনো ভালো কাজে উৎসাহ দেবার সহজাত প্রবণতা সত্যচরণের স্বভাবসিদ্ধ। তাই যুগলপ্রসাদ, ধাতুরিয়া, মটুকনাথ, বেঙ্কটেশ্বর সবাই নিজের কাজে অনুপ্রাণিত হয়েছে। গরিবদের কিছু করে দেবার জন্য তার মন সবসময় ভাবত। সামাজিক প্রথার শিকার কুন্তাকে জমি দিয়েছে, যুগলপ্রসাদকে চাকরি দিয়েছে, মটুকনাথকে টোল খোলার ব্যাপারে আন্তরিক সাহায্য করেছে। বস্তুত যেটুকু সত্যচরণের সাধ্যের মধ্যে ছিল সেটুকু সে করেছে গরিব প্রজাদের জন্য। সেজন্যই গিরিধারীলালের মতো দ্ররিদ্র ভিক্ষুক, কুন্তার মতো হতভাগ্যও জমি পেয়েছে। সত্যচরণের একটাই ভাবনা— "দলে দলে অপরিচিত লোক আসিয়া জমি লইয়া ফেলিল— কিন্তু এই আরণ্যভূমিতে যাহারা চিরকাল মানুষ অথচ যাহারা নিঃস্ব, হতভাগ্য— জমি বন্দোবস্ত লইবার পয়সা নাই বলিয়াই কি তাহারা বঞ্চিত থাকিবে? যাহাদের ভালবাসি, তাহাদের অন্তত এইটুকু উপকার করিবই।"

'আরণ্যক' উপন্যাসে বহু মানুষের ভিড় হলেও যে মানুষটি একটু বেশি নড়েচড়ে বেড়ায় সে অবশ্যই সত্যচরণ। প্রচলিত উপন্যাসের কাহিনি-পরিকল্পনার সঙ্গে 'আরণ্যক'-এর বিষয়বিন্যাসের বিরাট পার্থক্য। সাধারণত একটি উপন্যাসে আদি-মধ্য-অন্ত সমন্বিত একটি দৃঢ়পিনদ্ধ কাহিনি থাকে। কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে এক বা একাধিক চরিত্র। কাহিনি ও চরিত্রের মধ্যে কোনটির গুরুত্ব অধিক এ সম্পর্কে

মতবিরোধ থাকলেও চরিত্রকে নির্ভর করেই কাহিনি বিকশিত হয়, একথা অবশ্য স্বীকার্য। বস্তুত যে চরিত্র আখ্যানের কেন্দ্রবিন্দুতে থেকে লেখকের অভিপ্রেত জীবনদর্শনের অভিব্যক্তির সহায়ক হয়ে ওঠে এবং আখ্যানভাগের ঘটনা ও চরিত্রের সঙ্গে যে চরিত্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সম্পর্ক বেশি, তাকেই নায়কের মর্যাদা দেওয়া যায়। কিন্তু 'আরণ্যক' প্রচলিত ধারার উপন্যাস নয় বলে এখানে প্রধান চরিত্র বা নায়ক চরিত্র বিচার একটু বিতর্কিত। যেমন— সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বিভূতিভূষণ : জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থে বলেন— ". . . 'আরণ্যক'-এ রাজু পাঁড়ে, যুগলপ্রসাদ, ভানুমতী, কুন্তা এমনকি এদের গ্রথিত করেছে যে সত্যচরণ এরা কেউই প্রধান নয়, অরণ্যই প্রধান— অমূর্ত অরণ্যসত্তার পরিচয় এই সব মূর্ত মানুষের স্পর্শে বোঝা যায়।" তবু বলতে হয় এই উপন্যাসে অরণ্য-প্রকৃতির যে রহস্যঘন অনির্বচনীয় সৌন্দর্য ফুটে ওঠে সেটা কি শেষ পর্যন্ত থাকে? আর থাকলেও সেই সঙ্গে সত্যচরণের বন কেটে বসতি গড়ার করুণ অভিজ্ঞতা আমাদের একটুও নাড়া দেয় না? এছাড়াও আমরা নিজেরাই শুনেছি সত্যচরণের হাহাকার— "আমি প্রজা বসাইবার ভার লইয়া এখানে আসিয়াছিলাম— এই অরণ্যপ্রকৃতিকে ধ্বংস করিতে আসিয়া এই অপূর্ব্বসুন্দরী বন্য নায়িকার প্রেমে পড়িয়া গিয়াছি। এখন আমি ক্রমশঃ সে-দিন পিছাইয়া দিতেছি। যখন ঘোড়ায় চড়িয়া ছায়াগহন বৈকালে কিংবা মুক্তাশুভ্র জ্যোৎস্নারাত্রে একা বাহির হই, তখন চারিদিকে চাহিয়া মনে মনে ভাবি, আমার হাতেই ইহা নষ্ট হইবে?" এই যে সত্যচরণের মধ্যে একটা প্রশ্নচিহ্ন এবং অপরাধবোধ, এর সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে সত্যচরণ উপন্যাসে একটি সক্রিয় ভূমিকা নেয় এবং হয়ে ওঠে ট্র্যাজেডির নায়ক।

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

১। 'আরণ্যক' অসংখ্য চরিত্রের ভিড়ে কোলাহলমুখর কেন? (৪০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

২। 'এ জীবন আমার জন্য নয়' —কে কেন এই উক্তিটি করেছে? (৫০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

৩। সত্যচরণ অরণ্য দেখে কীভাবে মুগ্ধ হয়? (৫০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

৪। সত্যচরণের জীবনে নিয়তির প্রভাব আছে কি? (৬০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

৫। সত্যচরণকে আপাতদৃষ্টিতে Flate চরিত্র মনে হয় কেন? (৬০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

৬। সত্যচরণকে কি দ্বন্দ্বরহিত টাইপ চরিত্র বলা যায়? (৫০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

৭। সত্যচরণের মধ্যে নির্ভীকতার পরিচয় পাওয়া যায়? (৫০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

১১.২.১.২ রাসবিহারী সিং

রাসবিহারী সিং 'আরণ্যক' উপন্যাসের একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র। উপন্যাসের কাহিনিগ্রন্থনের দিক থেকেও তার চরিত্র গুরুত্বপূর্ণ।

রাসবিহারী সিংহ জাতিতে রাজপুত। সে ক্ষমতাবান রাজপুত, শুধু জাতিতে নয় অস্ত্রেও। উপন্যাসে বিভূতিভূষণ রাসবিহারীর পরিচয় দেন এভাবে— "রাসবিহারী সিং এ অঞ্চলের দুর্দান্ত মহাজন, জাতিতে রাজপুত, কারো নদীর তীরবর্তী গবর্ণমেণ্ট খাসমহলের প্রজা।"

বস্তুত রাসবিহারী সিং এবং ছট্টু সিং-এর মতো রাজপুতদের অত্যাচারের কাহিনি উপন্যাসের বিষয়বস্তুকে অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করেছে। দরিদ্র গাঙ্গোতাদের জীবনে যে দুঃখ-দুর্দশার চিত্র ফুটে উঠেছে উপন্যাসে, তার জন্য দায়ী অনেক পরিমাণে এই রাসবিহারী সিং বা ছট্টু সিং-এর মতো দুর্দান্ত মহাজনরা। এদের জন্যই মূলত গাঙ্গোতা প্রজা ও মহাজনদের মধ্যে ভয়ানক দাঙ্গা বাঁধে, মানুষ জখম হয়, ধ্বংস হয় অরণ্যের শান্তি। রাসবিহারী সিং দাঙ্গায় সরাসরি অংশ না নিলেও ছট্টু সিংকে সাহায্য করে। এছাড়াও তার প্রত্যক্ষ নৃশংসতার কথাও উপন্যাসে কম নেই।

বস্তুত ঐশ্বর্য-অহংকার, শক্তি আর ধূর্ততার জোরেই সে গরিব গাঙ্গোতাদের অলিখিত রাজা। অধিকার বা সম্মান ছিনিয়ে নেবার ক্ষমতা তার আছে। এজন্যই

তার প্রয়োজন যথেষ্ট পরিমাণ লাঠিসোঁটা তথা বেতনভোগী লাঠিয়াল বা পাইকদল। এজন্যই রাসবিহারীর অস্ত্রশালার এত আড়ম্বর। সে সাত-আটটা লাঠিয়াল নিয়ে খাতকের খেতে মোতায়েন করে আসে, ফসল ক্রোক করে গরিব গাঙ্গোতাদের কাছ থেকে টাকা আর সুদ ছিনিয়ে নেয়। সব মিলে রাসবিহারী জোরের প্রতিমূর্তি। এসব কারণেই স্বার্থপর রাসবিহারীর বাড়িতে হোলির নিমন্ত্রণে যেতে অনিচ্ছুক সত্যচরণ বলে— "নিমন্ত্রণ না রাখিলেও ভাল দেখায় না, কিন্তু রাসবিহারী সিং-এর বাড়িতে যাইতে আমার নিতান্ত অনিচ্ছা। এ অঞ্চলের যত গরিব গাঙ্গোতা জাতীয় প্রজার মহাজন হইল সে। গরিবকে মারিয়া তাহাদের রক্ত চুষিয়া নিজে বড়লোক হইয়াছে। তাহার কড়া শাসন ও অত্যাচারে কাহারও টুঁ শব্দটি করিবার যো নাই। বেতন বা জমিভোগী লাঠিয়াল পাইকের দল লাঠি হাতে সর্বদা ঘুরিতেছে, ধরিয়া আনিতে বলিলে বাঁধিয়া আনিয়া হাজির করিবে।"

রাসবিহারী ক্ষমতাবান তথা বিত্তবান মহাজন হলেও রুচিহীন চাকচিক্যবিহীন তার জীবন। বস্তুত সৌন্দর্যবোধের প্রতি তার বড়ো অনীহা। সত্যচরণ বলে— "বর্বর প্রাচুর্য বলিতে যাহা বুঝায়, তাহার জাজ্বল্যমান চিত্র দেখিলাম রাসবিহারীর সংসারে।" উদ্দেশ্যবিহীনভাবে তার ঘরে সঞ্চিত আছে যথেষ্ট দুধ, যথেষ্ট গম, যথেষ্ট ভুট্টা, যথেষ্ট বিকানীর মিছরি, যথেষ্ট লাঠিসোঁটা। অথচ ঘরে ভালো ছবি নেই, ভালো বই নেই, না আছে ভালো কৌচ-কেদারা, না আছে ভালো তাকিয়া-বালিশ সাজানো বিছানা। অর্থাৎ তার কাছে অর্থের প্রাচুর্য আছে, আছে শক্তির প্রাচুর্য জোরের প্রাচুর্য আছে; নেই কোনো সৌন্দর্যদৃষ্টি, সৌন্দর্যপিপাসা। সেজন্যই "দেওয়ালে চুনের দাগ, পানের দাগ, বাড়ির পিছনের নর্দমা অতি কদর্য নোংরা জল ও আবর্জনায় বোজানো, গৃহ-স্থাপত্য অতি কুশ্রী।" হোলির উৎসবকে কেন্দ্র করে তার মধ্যে যেটুকু পরিচ্ছন্নতা, সেটা নামান্তরে তার ক্ষমতা প্রদর্শন তথা ঐশ্বর্য প্রদর্শন।

বস্তুত হোলির উৎসবে সত্যচরণকে নিমন্ত্রণ করার মধ্যে এই বাসনাই লক্ষ করা যায়। সে সত্যচরণকে দেখাতে চায় তার সঞ্চিত শক্তি। রাসবিহারীর সঙ্গে সত্যচরণের সম্পর্ক বিশেষ ভালো নয়, এধরনের আভাস উপন্যাসে আছে। এই পরিস্থিতিতে সত্যচরণের কাছে রাসবিহারীর নিমন্ত্রণবার্তা। নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েই সত্যচরণকে দেখতে হয় রাসবিহারীর সমস্ত সঞ্চিত শক্তি ও ঐশ্বর্য। গোয়ালে ৬০-৬৫টি গরু, আস্তাবলে ৭-৮টি ঘোড়া, একটা ছোটো ঘরে লাঠি, ঢাল, সড়কি, বর্শা, টাঙ্গি, তলোয়ার। হাতি না হলে সে দেশের রীতি অনুযায়ী সম্ভ্রান্ত লোক হওয়া যায় না, তাই শীঘ্র হাতি কেনার ইচ্ছা আছে রাজবিহারীর। গম, ভুট্টা, দুধ কোনো কিছুই কম নেই তার কাছে। মিছরি দিয়ে যে জলযোগ করে সে এই দেশের বড়োলোক, সে হিসাবে রাসবিহারী সিংও বড়োলোক।

সব মিলে রাসবিহারী সিং ধনগর্বিত অরসিক। সে সৌন্দর্যের মূল্য বোঝে না, শিল্পের মূল্য বোঝে না। বুঝে টাকার মূল্য। টাকা দিয়ে সে সব হাসিল করতে চায়। রাসবিহারী ধনগর্বি মানুষ; তাই গাঙ্গোতাদের চেয়ে বেশি টাকা দিয়ে হোলির

উৎসবে বায়না করে আনে ধাতুরিয়াকে। মধ্যরাত পর্যন্ত নাচলে চার আনা সঙ্গে মাঢ়া, দই, চিনির জলখাবার সঙ্গে লাড্ডু। রাসবিহারী সৌন্দর্যের পূজা করতে জানে না, জানে ভোগ করতে। বস্তুত সেজন্যই ছয় সন্তানের বাবা হয়েও দেবী সিং-এর বিধবা স্ত্রী কুন্তার শরীর কিনে নিতে চায় টাকার জোরে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় দম্ভ, ঐশ্বর্য আর শক্তির সমন্বয়ে রাসবিহারী সিং দুর্দান্ত মহাজন। সে রক্তমাংসের মানুষ, সেজন্যই তার মধ্যে আছে অহংকার, দম্ভ আর ঐশ্বর্যের নেশা। বস্তুত রাসবিহারীকে স্মরণ করা হবে তার চারিত্রিক বদ্‌গুণগুলোর জন্যই। এছাড়াও উপন্যাসের কাহিনির আপাত বৈচিত্র্যহীনতার দিক থেকে বিচার করলে রাসবিহারীর উপস্থিতি কাহিনিতে গতি সঞ্চার করেছে অনেকটা। সত্যচরণের খণ্ড খণ্ড স্মৃতিতে রাসবিহারীর উপস্থিতি ততটা না থাকলেও সে যে উপন্যাসের অনেকটা অংশ জুড়ে আছে তাতে সংশয় নেই। গাঙ্গোতাদের দুঃখ-দুর্দশা দেখাতে গিয়ে রাসবিহারীর মতো চরিত্রের গুরুত্ব অনেক। ছট্টু সিং যখন লাঠির জোরে অন্যায়ভাবে জমি দখল করতে যায় তখন তাকে সাহায্য করে রাসবিহারী সিং, গাঙ্গোতাদের স্বার্থ দেখতে গিয়ে সত্যচরণ এদের শত্রু হয়, আবার এদের মধ্যেই স্বার্থের বিরোধ দেখা দেয় যখন রাসবিহারীর সঙ্গে মামলা লড়ে সর্বস্বান্ত হয় দেবী সিং এই সব ঘটনাগুলো বিচার করে দেখলে রাসবিহারী উল্লেখযোগ্য। উপন্যাসে রাসবিহারী প্রত্যক্ষভাবে না এলেও সত্যচরণের স্মৃতিতে আমরা তাকে যেভাবে দেখেছি তা থেকে বলা যায় নানা দোষগুণের সমাহারে রাসবিহারী চরিত্রটি রক্তমাংসের মানুষ হয়ে উঠেছে তাতে সন্দেহ নেই।

১১.২.১.৩ যুগলপ্রসাদ

'আরণ্যক' উপন্যাসে নানা চরিত্রের ভিড়ে কিছু কিছু আত্মভোলা মানুষের সন্ধান পাওয়া যায়। নাটুয়া বালক ধাতুরিয়া, কবি বেঙ্কটেশ্বর, টোলের পণ্ডিত মটুকনাথ। বাস্তব জগতের সঙ্গে এদের তেমন যোগ নেই, এরা নিজের প্রাণের দাস, প্রাণ যা বলছে তাতেই তারা জীবন বিলিয়ে দিয়েছে, এজন্যই তারা আত্মভোলা। এমনই একধরনের আত্মভোলা মানুষ যুগলপ্রসাদ। অথচ তার সংসার আছে, পরিবার আছে, কিন্তু সাংসারিক ব্যাপারে সে উদাসীন প্রাণের আনন্দের জন্য সে সারাজীবন কাজ করে গেছে নিঃস্বার্থভাবে।

সংসার সম্পর্কে তার চরম উদাসীনতার জন্যই তার সংসারে ঘনিয়ে এসেছে দরিদ্রতা। সংসারের দরিদ্রতা ঘোচাবার জন্য যুগলপ্রসাদের নেই কোনো মাথাব্যথা। বস্তুত তার সৌন্দর্য-সন্ধানী মনটি সংসারের মায়াজালে আবদ্ধই হতে চায় না। তাই সংসারের গরিবি নিয়ে তার নেই কোনো দুর্ভাবনা, নেই কোনো উদ্বেগ। বনোয়ারী এই সৌন্দর্যসন্ধানী চিরমুক্ত উদাসী মানুষটির পরিচয় দিতে গিয়ে বলে— "তার নানা বাতিক হুজুর, এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ানো এক বাতিক। কিছু করে না, বিয়ে-সাদি করেছে, সংসার দেখে না, বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় অথচ সাধু-সন্নিসিও নয়,

ঐ এক ধরনের মানুষ।" এই উপন্যাসে যতক্ষণ তার উপস্থিতি, সেই সংকীর্ণ পরিধিতে আমরা খুঁজে পাই তার উদাসীনতার কারণ, ঘরে মন না বসার কারণ। আসলে যুগলপ্রসাদ প্রকৃতির যে আনন্দের বার্তা শুনেছে তা তার সংসারের সীমাবদ্ধতার মধ্যে নেই; অন্তত যুগলপ্রসাদের মনকে বিশ্লেষণ করলে এই তত্ত্বই উঠে আসবে। বস্তুত যুগলপ্রসাদ সত্যচরণের মতোই প্রকৃতিমুগ্ধ এক চিরকিশোর। না হলে কেনইবা সে সরস্বতী কুণ্ডীর ধারে ভরা দুপুরের রৌদ্রে বসে মাটি খুঁড়ে গাছের বীজ রোপণ করবে। অথচ সেখানে তার কোনো পার্থিব স্বার্থ নেই। যুগল প্রসাদকে দেখে মনে হয় সমস্ত পৃথিবীর সৌন্দর্য রক্ষার দায়িত্ব বোধহয় তার ওপর। সত্যচরণও তাকে দেখে বলেছে "আমি আশ্চর্য হইলাম। কি গাছের বীজ? ওর নিজের জমি নয়, এই ঘোর জঙ্গল, ইহার মাটিতে কী গাছের বীজ ছড়াইতেছে— তাহার সার্থকতাই বা কি?"

আসলে যুগলপ্রসাদ প্রকৃতির নিঃস্বার্থ পূজারি। জীবনভর সে প্রকৃতির সেবা করে গেছে। বস্তুত বনভূমির সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য নিজের চেয়ে প্রকৃতির মাহাত্ম্যকে গুরুত্ব দিয়ে নানা ধরনের ফুলের বীজ লাগিয়ে যাওয়ার মধ্যেই তার আনন্দ। এটাই তার সাধনা। এমনই এক আত্মভোলা বিষয় উদাসীন মানুষের সম্পর্কে সত্যচরণের ভুল ধারণা হয়েছিল প্রথম দর্শনে। সরস্বতী কুণ্ডীর ধারে যুগলপ্রসাদকে দেখে সত্যচরণ ভেবেছিল টাকার লোভে সে গোপনে চালকুমড়োর আকারের বড়ো কন্দগুলো তুলে নিচ্ছে। কিন্তু পরে সত্যচরণের এ ভুল ভাঙে, সে বলে— "কেবল যুগলপ্রসাদ এসব বৈষয়িক কথাবার্তায় থাকে না। ও আর এক ধরনের ব্রাত্য মন লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছে— জমি-জমা, গরু-মহিষের আলোচনা করিতে ভালও বাসে না, তাহাতে যোগও দেয় না।" তার একমাত্র ভালোবাসার জিনিস প্রকৃতি, যার জন্য তার মন বসে না সংসারে, মন বসে না সাংসারিক কোনো কাজে। তার এই অদ্ভুত উদাসীনতার জন্যই তার সংসারের চিন্তা করতে হয় ভাই বনোয়ারীকে। বস্তুত তারই আবেদনে সত্যচরণের কাছারিতে দশ টাকা বেতনের মুহুরির চাকরি জুটে যায় যুগলপ্রসাদের।

চাকরি সূত্রেই ঘটে সত্যচরণের সঙ্গে যুগলপ্রসাদের আত্মিক সম্পর্ক। দুজনেই প্রকৃতিপ্রেমিক, পার্থক্যটা এই, সত্যচরণ চাকরিসূত্রে এই উপত্যকায় এসেছে বন কেটে বসতি স্থাপন করতে আর যুগলপ্রসাদ তার মনের আনন্দে নিষ্কামভাবে বনকে নব নব রূপে সাজিয়ে তুলছে। সত্যচরণ প্রকৃতি প্রেমিক হলেও নিজের দায়িত্বের কাছে বাঁধা; যুগলপ্রসাদ কিন্তু কোনো বন্ধনের ধার ধারে না। তাই বিয়ে-সাদি করেও সে মুক্ত জীবনানন্দ। বস্তুত সত্যচরণের মতো সে শুধু প্রকৃতির রূপেই মুগ্ধ নয়, পুষ্পপ্রেম ও সৌন্দর্যবোধেও সে অনন্য। এই প্রকৃতিপ্রেম বা পুষ্পপ্রেম যুগলপ্রসাদের সহজাত নয়, সে সত্যচরণকে বলে— "কি করে আমার এদিকে মন গেল, তা একটু আগে হজুরকে বলি। আমার বাড়ি ধরমপুর অঞ্চলে। আমাদের দেশে বুনো ভাণ্ডরী ফুল একেবারেই ছিল না। আমি মহিষ চরিয়ে বেড়াতাম ছেলেবেলায় কুশীনদীর ধারে ধারে, আমার গাঁ থেকে দশ-পনেরো ক্রোশ দূরে। সেখানে দেখতাম বনে-জঙ্গলে,

মাঠে বুনো ভাণ্ডীর ফুলের বড় শোভা। সেখান থেকে বীজ নিয়ে গিয়ে দেশে লাগাই, . . . সেই থেকে আমার এই দিকে মাথা গেল। যেখানে যে ফুল নেই, সেখানে সেই ফুল, গাছ, লতা নিয়ে পুঁতব, এই আমার শখ। সারাজীবন ওই করে ঘুরেছি।"

শুধু এই শখ মিটিয়েই ক্ষান্ত হয় না যুগলপ্রসাদ, এদেশের বহু ফুল ও বৃক্ষলতা সম্পর্কে জ্ঞান আহরণেও তার আগ্রহ কম নেই। বস্তুত এই কারণেই অনেকে যুগলপ্রসাদকে বলেছেন উদ্ভিদতত্ত্ববিদ। সত্যচরণ একদিন তাকে 'এরিস্টেলোকিয়া' লতার কথা জিজ্ঞেস করার সঙ্গে সঙ্গে যুগলপ্রসাদ বলে— "হংসলতা? হাঁসের মত চেহারার ফুল হয় তো? ও তো এদেশের গাছ নয়। পাটনায় দেখেছি বাবুদের বাগানে।" তার এই জ্ঞানের পরিধি দেখে বিস্মিত হতে হয় সত্যচরণকে "তাহার এই জ্ঞান দেখিয়া আশ্চর্য হইতে হয়। নিছক সৌন্দর্যের এমন পূজারীই বা কটা দেখিয়াছি?" সে নিঃস্বার্থভাবে বনে বনে ভালো ফুল ও লতার বীজ ছড়ায়, ফুল ফোটায়, অথচ এক পয়সা পায় না। তার আয় নেই নিতান্ত গরিব, তবু বনের সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য তার অক্লান্ত পরিশ্রম ও উদ্বেগ।

পরিশেষে বলা যায় অরণ্যভূমিতে যুগলপ্রসাদ তার পরম প্রাপ্তি খুঁজে পেয়েছিল বলেই সংসার জীবন থেকে অনায়াসে সরে এসে সে একধরনের ব্রাত্য জীবনকে উপভোগ করেছে। পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য মানুষের প্রয়োজন হয় বাঁচার কিছু অবলম্বনের, এজন্যই মানুষ সংসার করে, ঘর বাঁধে। কিন্তু যুগলপ্রসাদ এর মধ্যে খুঁজে পায়নি প্রাণ, তাই তার চিরউদাসীনতা গৃহজীবনের প্রতি। বস্তুজগতের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের প্রতি তার চিরন্তন অহীনা। আসলে সে চোখের সামনে দেখতে পেয়েছিল প্রকৃতির বিচিত্র লীলার অফুরন্ত ভাণ্ডার এবং এটাই তার বাঁচার একমাত্র অবলম্বন হয়ে উঠেছিল, ফলে সৃষ্টি হয় সংসার জীবনের প্রতি তার উদাসীনতা।

১২.২.২ নারী চরিত্র

বর্তমান অধ্যায়ের পুরুষ চরিত্রের আলোচনা আমরা শেষ করেছি, এবারে আসুন 'আরণ্যক' উপন্যাসের প্রাসঙ্গিক নারী চরিত্রগুলোর বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখা যাক।

১২.২.২.১ ভানুমতী

'আরণ্যক' উপন্যাসের নারী চরিত্রদের মধ্যে ভানুমতী একটি স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করে আছে। আমরা জানি উপন্যাসের কাহিনি সত্যচরণের স্মৃতিচারণসূত্রে এগিয়ে গেছে, অর্থাৎ সত্যচরণের চেতনার রঙেই রঙিন হয়ে উঠেছে উপন্যাসের কাহিনি তথা চরিত্র। সুতরাং সত্যচরণের দৃষ্টি দিয়ে ভানুমতীকে আমরা যেটুকু দেখেছি, জেনেছি সেটুকুর নিরিখেই তার চরিত্র আমরা বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি।

আমরা সত্যচরণের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখেছি সত্যচরণের মানস-পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যে দুটি ব্যাপার বেশি করে তাকে প্রভাবিত করেছে তার একটি হল প্রকৃতি আর অন্যটি হল মানুষ, জঙ্গল-মহালের সরল মানুষ। সমস্ত উপন্যাসে সত্যচরণ শুধু বিস্মিত দৃষ্টি দিয়ে অরণ্যের অনির্বচনীয় লীলা দেখে গেছে আর দেখেছে একঝাঁক সরল মানুষের যাপন। তার এই বিস্ময়ের ঘোর কাটবার নয়। একাদশ পরিচ্ছেদে এসেও তার এক বিস্মিত অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচয় হয় আমাদের। মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের দক্ষিণে মাইল পনেরো-কুড়ি দূরে এক জঙ্গল নিলামের কাজে গিয়ে সত্যচরণ শুনতে পায় এক সাঁওতাল রাজপরিবারের কথা। ১৮৬২ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা রাজা দোবরু পান্না এখনো বেঁচে, খবর পেয়ে সত্যচরণের কৌতূহল তীব্র হল। রাজা দোবরু পান্নার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েই পরিচয় হয় ১৬-১৭ বৎসরের একটি মেয়ের সঙ্গে, নাম ভানুমতী।

"ভানুমতী নিটোল স্বাস্থ্যবতী, সুঠাম মেয়ে। লাবণ্যমাখা মুখশ্রী— তবে পরনের কাপড় সভ্যসমাজের শোভনতা রক্ষা করিবার উপযুক্ত প্রমাণ মাপের নয়। মাথার চুল রুক্ষ, গলায় কড়ি ও পুঁতির দানা।" সত্যচরণের এই পরিচয় থেকে ভানুমতীর রূপের বা চেহারার একটা আন্দাজ করা যেতে পারে। ভানুমতী সাঁওতাল রাজকুমারী, বুদ্ধু সিং-এর ভাষায় 'রাজার নাতির মেয়ে'। প্রথম দেখায় ভানুমতীর চেহারা সত্যচরণকে আকৃষ্ট করেছিল। দোবরু পান্নার বাড়িতে সত্যচরণ যত সময় ছিল তার বেশির ভাগ সময়ই ভানুমতীর সান্নিধ্য পেয়েছে সত্যচরণ। এই ক্ষণিক সময়ের মধ্যে সত্যচরণের দৃষ্টিতে ভানুমতীর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে— "ভানুমতী রাজকন্যা বটে, কিন্তু বেশ অমায়িক স্বভাবের রাজকন্যা। অথচ দিব্য সহজ, সরল মর্যাদাজ্ঞান।" বস্তুত এই পরিচ্ছেদে আমরা ভানুমতীকে যতটুকু দেখেছি সেই নিরিখে তার চরিত্রের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। ভানুমতী চরিত্রের একটি বড়ো গুণ সে খুব বুদ্ধিমতী এবং কর্মক্ষম। সত্যচরণ উনুন ধরাতে ব্যর্থ হলে ভানুমতী চট করে একটি শুকনো পাখির বাসা উনুনের মধ্যে পুরে দিয়ে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে। এছাড়াও ভানুমতীর মধ্যে কর্মক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে অতিথি আপ্যায়নের চমৎকার ক্ষমতা। সে আর পাঁচটি বাঙালি মেয়ের মতো নয়। বাঙালি মেয়ের মতো স্বাভাবসিদ্ধ নারীসুলভ লজ্জা তার মধ্যে না থাকার জন্য সে হয়ে উঠেছে সাঁওতাল রমণীর মতো স্বাভাবিক। তাই সে সত্যচরণের সঙ্গে সম্পূর্ণ দ্বিধাহীনভাবে ব্যবহার করেছে, সেবা করেছে। বস্তুত এই চারিত্রিক গুণাবলির জন্যই সত্যচরণের স্মৃতিচারণে ভানুমতীর গুরুত্ব আলাদা মাত্রা পেয়েছে। সাঁওতাল রাজকুমারী বন্যসুন্দরী ভানুমতী সত্যচরণের মনে একটু বেশি স্থান করে নিয়েছিল জন্যই সে বারবার ভানুমতীর কথা ভাবতে এবং বলতে ভালোবাসে। এই ভালোবাসার একমাত্র কারণ ভানুমতীর স্বভাব-ব্যবহার। ভানুমতীর চেহারা সত্যচরণকে যতটুকু না আকর্ষণ করেছে তার চেয়ে বেশি আকর্ষণ করেছে তার সরল ব্যবহার, অতিথি পরায়ণতা।

সত্যচরণ দ্বিতীয় বার যখন ঝুলনোৎসব উপলক্ষে দোবরু পান্নার রাজ্যে গেল

তখন আমরা ভানুমতীর প্রতি সত্যচরণের আকর্ষণ লক্ষ করি— "সারা সকাল ভানুমতীর দেখা পাই নাই —খাইতে বসিয়াছি, সে এক বাটি দুধ আনিয়ে আমার সামনে বসিল।' এভাবেই সত্যচরণের সঙ্গে ভানুমতীর পরিচয়ের মুহূর্তগুলি গাঢ় হয়ে ওঠে। এখন ভানুমতীর কণ্ঠে আবদারের সুর ধ্বনিত হয় "বাবুজী, কলকাতা থেকে আমার জন্যে একখানা আয়না এনে দেবেন?" এখানেও ভানুমতীর মনের একটা সরলতা প্রকাশ পায়। এসব কারণেই ভানুমতী আর পাঁচটি মেয়ের থেকে স্বতন্ত্র। এই ভানুমতীর ব্যবহারের বর্ণনা দিতে গিয়ে সত্যচরণ বলে— "আমার ভাল লাগিল ইহার নিঃসংকোচ বন্ধুত্ব। বাংলা দেশের মানুষের কাছে ইহা কি অদ্ভুত ধরনের, অপ্রত্যাশিত ধরনের নূতন, সুন্দর, মধুর।" সত্যচরণ আরও বলেছে "এদেশের প্রান্তর যেমন উদাস, অরণ্যানী, মেঘমালা, শৈলশ্রেণী যেমন মুক্ত ও দূরচ্ছন্দা— ভানুমতীর ব্যবহার তেমনি সঙ্কোচহীন, সরল, বাধাহীন।" বস্তুত ভানুমতীর সকলকে আপন করার ক্ষমতা দারুণ, তাই সত্যচরণ বলে— "এই পাহাড়ী বালিকার সরল ব্যবহার ও বন্ধুত্ব আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে।"

এই আলোচনা থেকে বোঝা যায় পাহাড়ি বালিকার সরল ব্যবহার এবং সকলকে আপন করার ক্ষমতা সত্যচরণের সঙ্গে সঙ্গে পাঠককেও আকর্ষণ করে। উল্লেখ্য যে ভানুমতী যে কারণে আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে সেটা ওর ব্যবহার। উপন্যাসের কাহিনি-বিন্যাসের দিক থেকেও ভানুমতী উপাখ্যান পাঠকের মনে রসবৈচিত্র্য আনে। কারণ হিসাবে ধরা যেতে পারে ভানুমতী সম্পর্কে সত্যচরণের রোমান্টিক ভাবনা, ফলে বার বার তার স্মৃতিতে ভানুমতীর প্রসঙ্গ ভেসে উঠেছে। আমরা অষ্টম পরিচ্ছেদে দেখি সত্যচরণ চাকরি শেষ করে চলে আসার আগে ভানুমতীর সঙ্গে দেখা করতে চায়— "এখান হইতে চলিয়া যাইবার সময় আসিয়াছে। একবার ভানুমতীর সঙ্গে দেখা করিবার ইচ্ছা প্রবল হইল।" শুধু ইচ্ছা নয় সে চলেও গেছে ভানুমতীকে দেখার জন্য। সত্যচরণকে পেয়ে ভানুমতীও আনন্দিত, "ভানুমতী কী খুশি আমার আগমনে। তার মুখে-চোখে খুশি যেন চাপিতে পারিতেছে না, উপচাইয়া পড়িতেছে।" সত্যচরণকে দেখার জন্য ভানুমতীরও উৎকণ্ঠা কম নয়, "আপনার কথা কালও ভেবেছি বাবুজী"। আবার অনেক দিন পর আসার জন্য অভিমান 'এতদিন আসেননি কেন?' যাই হোক, এরপর সারাদিন ওরা ঘুরেছে, রাজা দোবরুর কবরে ফুল দিয়েছে, আনন্দ করেছে। এই ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের ফলে সত্যচরণ অনুভব করে 'এখানেই যদি থাকিতে পারিতাম। ভানুমতীকে বিবাহ করিতাম।' এই ইচ্ছা শুধু সত্যচরণের নয়, ভানুমতীরও। কেন না পরদিন সত্যচরণ চলে আসার সময় ভানুমতী হঠাৎ সকল লজ্জাকে উপেক্ষা করে তার হাত ধরে বলে 'আজ যেতে দেব না বাবুজী—।'

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় ভানুমতীর কিছু কিছু ব্যবহার যেমন সত্যচরণকে আকর্ষণ করেছে, ঠিক তেমনি সত্যচরণের কিছু কিছু ব্যবহার ভানুমতীকে আকর্ষণ করেছে। ফলে আমরা দেখতে পাই দুজনের মধ্যে একটা সম্পর্ক দানা বেঁধেছে, যদিও সত্যচরণ সেটাকে আর বড়ো হতে দেয় না। সত্যচরণ-ভানুমতী

উপাখ্যানটি উপন্যাসের কাহিনি-বিন্যাসের দিক থেকেও উল্লেখ্য। এই দুয়ের চারদিকে যখন কাহিনি আবর্তিত হয়েছে তখন আমরা একটা উপকাহিনির আস্বাদ গ্রহণ করতে পারি। এছাড়াও এই দুজনকে নিয়ে যে লেখকের একটি রোমান্টিক ভাবনা উপন্যাসে স্থান পেয়েছে সেটা অবশ্যই উপন্যাসের ঘটনাক্রমে অন্য মাত্রা আনে।

১১.২.২.২ কুন্তা

'আরণ্যক' উপন্যাসের বহু নারী চরিত্রের মধ্যে কুন্তা একটি স্মরণীয় নাম। তার আবির্ভাব উপত্যকার জীবনধারায় কৌতূহলোদ্দীপক। এক হাড়কাঁপানো শীতের রাতে উপন্যাসে কুন্তার সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় ঘটে।

লবটুলিয়ার কাছারিতে প্রায় প্রত্যেক দিনই খাওয়া-দাওয়া হতে হতে এগারোটা। এমনই এক জ্যোৎস্নারাতে কনকনে ঠাণ্ডায় ফুটফুটে জ্যোৎস্নার তলায় কাছারির কমপাউণ্ডের সীমানায় এক রমণীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সত্যচরণের কৌতূহল জাগে তাকে নিয়ে। অবশেষে পাটোয়ারীর কাছে জানতে পারে সে কুন্তা।

কুন্তার জীবন বিশ্লেষণ করলে একটা জিনিস আমাদের নজর এড়াতে পারে না সেটা হচ্ছে তার জীবনের ঘটনা পরম্পরা পুরোটা নাটকীয়। সে প্রথমে ছিল বাইজি কন্যা, অনুমান করাই যেতে পারে তার প্রাচুর্যের অভাব ছিল না। তবু হয়তো সেই জীবন থেকে সে হাঁপিয়ে উঠেছিল ফলে রাজপুত দেবী সিং-এর সঙ্গে পালিয়ে আসে, তাকে বিয়ে করে। এবং তখন থেকেই ঘনিয়ে আসে কুন্তার জীবনে চরম বিপর্যয়।

বিপর্যয়কে সে কখনো ভয় করেনি। ঐশ্বর্যকে সে প্রেমের চেয়ে বড়ো মনে করেনি কখনো। সুতরাং বাইজি কোঠার বদ্ধ জীবনকে পদাঘাত করে দেবী সিং-এর প্রেমে সাড়া দেওয়াই কুন্তার মতো মেয়ের পক্ষে স্বাভাবিক। দেবী সিং-এর সঙ্গে এসেও কুন্তা পেয়েছিল ঐশ্বর্যের অফুরান ভাণ্ডার। কেন না দেবী সিং ছিল রাজপুত, ওর ব্যবসা ছিল চড়া সুদে ধার দেওয়া এবং পরে লাঠিবাজিকরে সুদ ও আসল আদায় করা। দেবীসিং দুর্দান্ত মহাজন, জেদ আর টাকার নেশায় সে বিভোর। বাইজি বিয়ে করার জন্য রাজপুতরা তাকে গ্রহণ করেনি, অযথা ব্যয় করে রাসবিহারী সিং-এর সঙ্গে মোকদ্দমা লড়ে সর্বস্বান্ত হয় এবং শেষে নানা চিন্তায় মারা যায়। দেবী সিং-এর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কুন্তার জীবনে ঘনিয়ে আসে চরম ট্র্যাজেডি। একদিকে সে সমাজচ্যুত অন্যদিকে ভীষণ দরিদ্রতা তাকে গ্রাস করতে চেয়েছে তিলে তিলে। যে কুন্তা একদিন লবটুলিয়া থেকে কিংখাবের ঝালর-দেওয়া পালাকি চেপে কুশী ও চলবলিয়ার জঙ্গলে স্নান করতে যেত, বিকানীর মিছরি দিয়ে জল খেত, আজ সেই কুন্তার কী দুর্দশা। ম্যানেজার সত্যচরণ লবটুলিয়ার কাছারিতে আসবে শুনে সে গভীর রাতে কনকনে ঠাণ্ডা মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কমপাউণ্ডের সীমানায়, নিজের জন্য নয় ছেলেপুলের বড়ো কষ্ট। তার একান্ত ইচ্ছা ম্যানেজার বাবুর পাতের

ডালমাখা ভাত সে নিয়ে খাবে। এ দৃশ্য একদিনের নয়, কুন্তার দুর্দশা এতই অতলে ঠেকেছে যে সত্যচরণ যে কয়দিন (৮/১০) লবটুলিয়ার কাছারিতে ছিল প্রত্যেক দিন কুন্তা প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় আঁচল গায় দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত।ইঁদারার পাড়ে দুমুঠো এঁটো ভাতের আশায়। কুন্তা এতই নিঃস্ব যে দুটো ফসল ফলাবার মতো জমি তার নেই, সমাজচ্যুত হওয়ার দরুণ কাজেরও সংস্থান নেই। তাই খেত থেকে গম কাটা হয়ে গেলে পড়ে থাকা গম কুড়িয়ে দু-এক মাসের খাদ্যের যোগার করে।

উপন্যাসে কুন্তার আবির্ভাবের সময় থেকেই দেখা যায় তার জীবনের সঙ্গে তার চরম প্রতিদ্বন্দ্বিতা, দুমুঠো অন্যের জন্য তার চরম কৃচ্ছ্র সাধনা। কঠোর জীবন সংগ্রামকে সে কখনো অস্বীকার করেনি। আধপেটা খেয়েছে তবু ভিক্ষা করেনি। ভিক্ষা করে খাওয়ার চেয়ে ম্যানেজার বাবুর এঁটো প্রসাদকে সে বড়ো চোখে দেখেছে। আবার মিছে চোর বদনাম পাওয়ায় সে মাটির সঙ্গে মিশে যায়। কুন্তার মধ্যে দেখা যায় অসম্ভব প্রাণশক্তি তথা কষ্ট সহ্য করার অসম্ভব ক্ষমতা। এসব কারণেই সে সাধারণ নারী থেকে এক বিশেষ নারীতে পরিণত হয়ে উঠে উপন্যাসের মধ্যে। সে শুধু প্রেম করেনি প্রেমকে পরিপূর্ণ মর্যাদা দিয়ে টিকিয়ে রেখেছে আজীবন।

পরিশেষে বলা যায় কুন্তা বাইজির মেয়ে, ঘটনাচক্রে রাজপুত দেবী সিং-এর সঙ্গে প্রেম, পরে বিয়ে হয়ে অরণ্যময় নির্জনতায় এসে উপস্থিত হয়েছে। বাইজি কন্যার প্রেম, দেবী সিং-এর সঙ্গে বিয়ে, কাশী ছেড়ে জঙ্গলবাস, সন্তানাদির জন্ম, বাইজিকন্যা হওয়ার দরুণ রাজপুত সমাজ থেকে বহিষ্কৃত, স্বামীর অকালমৃত্যু, চরম দুঃখকষ্টে সন্তানদের মানষ করা— সব মিলে কুন্তার জীবন কৌতূহলোদ্দীপক। তার এই সংগ্রামী মনোভঙ্গি সত্যচরণকে আকৃষ্ট করে। জীবনযুদ্ধে পরাজয়কে কুন্তা কখনো মেনে নেয়নি। সে বেঁচেছে তার প্রেমের শেষ স্মৃতি নিয়ে, কৃতজ্ঞতাবোধও তার কম নয়। সত্যচরণ তাকে দশ বিঘা জমি দেয় বিনা সেলামিতে। চিরদিনের উঞ্ছবৃত্তি থেকে মুক্তি দেবার জন্য সত্যচরণের উপত্যকা থেকে বিদায়ের দিন একটি মেয়ে তার উঠোনের কাছে দাঁড়িয়ে কাঁদে, সে কুন্তা। বস্তুত প্রথম জীবনে প্রাচুর্য তারপর দুঃখ-দারিদ্র্য উঞ্ছবৃত্তির মধ্য দিয়ে কুন্তার জীবন এগিয়ে গেছে একটা নাটকীয় তালে, শেষে সত্যর কাছ থেকে জমি পেয়ে একটা স্থিতির আভাসের মধ্য দিয়ে চিত্রিত কুন্তা চরিত্রটি সর্বাঙ্গসুন্দর।

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

১। স্বার্থপর দুর্দান্ত মহাজন চরিত্র হিসাবে রাসবিহারী সিং চরিত্রটি সার্থক হয়েছে কি? (৭০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

২। "ও আর এক ধরনের ব্রাত্য মন লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছে।" —উক্তিটির তাৎপর্য কী? (৬০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

৩। উপন্যাসের কাহিনি-বিন্যাসের নিরিখে রাসবিহারী সিং চরিত্রের গুরুত্ব কী? (৭০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

৪। সংসার সম্পর্কে যুগলপ্রসাদের উদাসীনতার কারণ কী? (৫০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

নিজের ক্রমোন্নতি বিচার করুন

(ক) 'আরণ্যক'-এর নারী চরিত্র সৃষ্টিতে বিভূতিভূষণের কৃতিত্ব বিচার করুন।

[সংকেতসূত্র : প্রাসঙ্গিক আলোচনা দ্রষ্টব্য]

(খ) 'আরণ্যক' উপন্যাসের পুরুষ চরিত্রগুলোর আলোচনা প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণের দক্ষতার পরিমাপ করুন।

[সংকেতসূত্র : প্রাসঙ্গিক আলোচনা দ্রষ্টব্য]

১২.২.২.৩ মঞ্চী

আরণ্যক উপন্যাসে আমরা যে কয়েকটি নারী চরিত্র পেয়েছি মঞ্চী তাদের অন্যতম। ভানুমতী-কুন্তার মতো সত্যচরণের পছন্দের নারীদের মধ্যে মঞ্চী একজন। সত্যচরণের কাছে মঞ্চী গুরুত্বপূর্ণ, সেজন্যই তার স্মৃতিপটে ঘুরে ফিরে আসে মঞ্চী। উপন্যাসের শেষে সত্যচরণের মনে দুশ্চিন্তা— "আর মনে হয় মাঝে মাঝে মঞ্চীর কথা। অনুতপ্তা মঞ্চী কি আবার স্বামীর কাছে ফিরিয়াছে, না আসামের চা-বাগানে চায়ের পাতা তুলিতেছে আজও।" বস্তুত এই মঞ্চীর চরিত্রই আমাদের বিশ্লিষ্ট বিষয়।

মঞ্চীর পরিচয়, সে কাটুনি প্রজা, বৃদ্ধ নকছেদী ভকতের দ্বিতীয় স্ত্রীরী।

জাতিতে গাঙ্গোতা। দক্ষিণ ভাগলপুর থেকে মঞ্চীর পরিবার এসেছে ফুলকিয়া বইহারে ফসল কাটার জন্য। এই মঞ্চীর পরিচয় দিতে গিয়ে সত্যচরণ বলে— "মেয়েটির বয়স চব্বিশ-পঁচিশ, খুব স্বাস্থ্যবতী, বার্নিস করা কালো রং, নিটোল গড়ন। কথাবার্তা বেশ বলিতে পারে, আর গলার সুরটা দক্ষিণ-বিহারের দেহাতী হিন্দীতে বড় চমৎকার শোনায়।"

মঞ্চী ২৪-২৫ বছরের মেয়ে হলেও তার সরলতা, তেজস্বিতা, ছেলেমানুষী আমাদের আকৃষ্ট করে। সত্যচরণের মতে এই মেয়ে 'আনন্দ, স্বাস্থ্য ও সারল্যের প্রতিমূর্তি'। মঞ্চীর সরলতা আর ছেলে মানুষী দেখে সত্যচরণ তাকে নকছেদীর মেয়ে বলে ভুল করেছিল। মঞ্চী আসলে বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা। সেজন্য তার কোনো দুঃখ নেই। সে প্রাণচঞ্চল বালিকা স্বভাবা। তাই তার যাযাবর জীবনের প্রতি নেই কোনো বিতৃষ্ণা। বাড়িঘরের প্রসঙ্গ উঠতেই সে সত্যচরণকে নির্দ্বিধায় বলে— "কেন থাকবে না বাবুজী? সবই আছে। কিন্তু সেখানে থাকলে আমাদের তো চলে না।" যাযাবরত্ব নিয়ে ব্যথা নেই বরং সে এই জীবনকে উপভোগ করে— বিদেশে থাকতেই তার পছন্দ— সে বলে '... বিদেশে কত কি মজা দেখা যায়"। বিদেশে থাকার মজার মধ্যে তার অন্তহীন ছেলেমানুষী ফুটে ওঠে। তার খেসারতের খবর পাওয়া যায় নকছেদীর কাছ থেকে। মঞ্চী তার সখের জিনিস কেনার জন্য ৮-১০ মন সরষের তিন মন খরচ করে ফেলেছে। নকছেদীর শত বারণ শুনেও সে সখের জিনিসপত্র কিনেছে। জিনিস কেনার এতই নেশা যে নকছেদী বেশি কিছু বললে কেঁদে ফেলে। সম্ভবত জিনিস কেনার জন্যই মেলার প্রতি তার অদম্য আকর্ষণ। মেলা থেকে সে চিরুনি, সাবান, পাথরের আঙটি, চিনা মাটির পুতুল, লাল ফিতে ইত্যাদি শৌখিন বস্তু কিনেছে, এসবের মধ্যেই তার ছেলেমানুষী পনার অভিব্যক্তি। এতো গেল মঞ্চী চরিত্রের একটি দিক মাত্র। তার চরিত্রের মধ্যে মিশেছে নির্ভীকতা ও তেজস্বীতা। সঙ্গে সঙ্গে সে বাক্‌পটু ও কর্মপটুও।

সত্যচরণ যে জন্য মঞ্চীকে পছন্দ করে তার মধ্যে বড়ো কারণ হচ্ছে মঞ্চীর কথা বলা। দক্ষিণ বিহারের 'ছিকাছিকি' বুলির টানে সে অনবরত গল্প করে যায়। কখনো হাতির গল্প শোনায়, কখনো বুনো মাহিষের গল্প শোনায়, কথা প্রসঙ্গে উঠে আসে বইহারের মেলার প্রসঙ্গ, নাচ-তামাশা আমোদের গল্প। মঞ্চীর নির্ভীকতার পরিচয় মেলে বাঘের প্রসঙ্গ এলে। জঙ্গলে বাঘের উপদ্রবের কথা শুনে সত্যচরণ নকছেদীদের সাবধান থাকতে বললে মঞ্চীর নির্ভীক গলায় ধ্বনিত হয়— 'বাবুজী ও আমাদের সয়ে গিয়েছে।' আবার তেজস্বীতাও ওর মধ্যে কম নেই। সুরজ কুণ্ডের গরম জলে নাইতে গিয়ে পাণ্ডাদের কাছ থেকে মার খেয়েও প্রতিবাদ করেছে। কলকাতার বাবু সত্যচরণকে অনুরোধ করেছে ওদের বিরুদ্ধে লেখার জন্য।

মঞ্চীর একটি বড়ো গুণ হল গৃহকর্মপটুতা। তার স্বভাবে ছেলেমানুষী থাকলেও গৃহকর্মপটুতা প্রশংসার যোগ্য। বহুদিন পরে বহরাবুরু পাহাড়ের নিচে সত্যচরণকে দেখে মঞ্চী জোর করে তাকে খুপরিতে নিয়ে যায় এবং রুটি আর বুনো ধুঁধুলের তরকারী করে অতিথি সৎকার করে। রান্না যাই হোক, এখানে স্মরণীয় মঞ্চীর

কর্মপটুতা ও অতিথি আপ্যায়নের ক্ষমতা।

এই সব নানা গুণের অধিকারী পরিপূর্ণ যৌবনা, বনলক্ষ্মী প্রাণময়ী মঞ্চীর জীবন সুখেই কাটছিল। কিন্তু হঠাৎ ঘটে গেল তার জীবনে এক মর্মান্তিক ঘটনা যা তার প্রাণচাঞ্চল্য দিয়েছিল নষ্ট করে। বসন্ত রোগে তার ছেলে মারা যায়। পুত্রশোকে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে শুধু কাঁদে, শেষে পাগলের মতো হয়ে যেদিকে দুচোখ যায় সেদিকে চলে গেছে মঞ্চী। এভাবেই মঞ্চীর জীবনে ঘনিয়ে ওঠে চরণ দুর্গতি।

বস্তুত যাযাবরত্ব, দারিদ্র্যতা এবং বৃদ্ধ স্বামী ও সতীনকে নিয়েও যে সেয়েটি প্রাণোচ্ছল আনন্দময় জীবন উপভোগ করতে চেয়েছিল— নিয়তির কড়া শামনে শেষ পর্যন্ত সেটাও তার ভাগ্যে সম্ভব হল না। নিষ্ঠুর সমাজ ব্যবস্থা তাকে রেহাই দেয়নি, জাতপাতের সমস্যা তাকে মর্মাহত করেছে, আর্থিক অনটন তাকে ঘাটো খেতে বাধ্য করেছে। তবু সে হার মানেনি। সে লড়েছে, বেঁচে থাকার জন্যই লড়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার বেঁচে থাকার মূল অবলম্বন নষ্ট হয়ে গেল— বসন্ত রোগে তার একমাত্র ছেলেটি মারা গেল আর সে ভেঙে পড়ল। সত্যচরণ বলে— 'বেচারী পুত্র শোকেই উদাসী হইয়া যেদিকে দু-চোখ যায়, চলিয়া গিয়াছে নিশ্চয়।' বস্তুত এই বাহিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়েই মঞ্চী চরিত্রের নিবিড় দুঃখের সঙ্গে আমরা ঘনিষ্ঠ হয়ে যাই।

১১.৩ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

চতুর্থ অধ্যায়ের মুখ্য আলোচনা আমরা শেষ করেছি। এই আলোচনায় আমরা 'আরণ্যক' উপন্যাসের কয়েকটি চরিত্রকে বেছে নিয়ে চরিত্রগুলোর বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিভূতিভূষণের চরিত্রচিত্রণের দক্ষতার পরিমাপ করেছি। আমরা আলোচনার সুবিধার জন্য আমাদের আলোচ্য চরিত্রগুলোকে দুটো ভাগে ভাগ করেছি— পুরুষ চরিত্র এবং নারী চরিত্র। পুরুষ চরিত্রের মধ্যে স্থান পেয়েছে সত্যচরণ, রাসবিহারী সিং ও যুগলপ্রসাদ, নারী চরিত্রে স্থান পেয়েছে ভানুমতী, কুন্তা, মঞ্চী।

বক্ষ্যমাণ আলোচনায় আমরা দেখেছি সত্যচরণ উপন্যাসের কথক 'আরণ্যক'-এর কেন্দ্রীয় চরিত্র অর্থাৎ উপন্যাসের নায়ক। কলকাতার শহুরে বেকার যুবক সত্যচরণের জীবন কীভাবে ধাপে ধাপে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে পরিণতির দিকে গিয়েছে সেই বিষয়টিই আমরা আমাদের আলোচনায় স্পর্শ করার চেষ্টা করেছি। আমরা দেখেছি বন ধ্বংস করে বসতি স্থাপন করতে এসে সত্যচরণ সেই বন্যপ্রকৃতির প্রেমে পড়ে যায়, আর এখানেই বিভূতিভূষণ সৃষ্টি করতে চান তাঁর ইপ্সীত ট্র্যাজিডির রস।

রাসবিহারী সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা বলেছি সে ধূর্ত, স্বার্থপর এবং দুর্দান্ত মহাজন। জাতিতে রাজপুত এই মানুষটি ক্ষমতাবান শুধু বিত্তে নয় অস্ত্রেও। বস্তুত ঐশ্বর্য-অহংকার আর শক্তির জোরেই সে গরিব গাঙ্গোতাদের অলিখিত রাজা। বিভূতিভূষণ রাসবিহারীকে জোরের প্রতিমূর্তি হিসাবে অঙ্কন করেছেন।

রাসবিহারী সিংহের পর আমরা উল্লেখ করেছি যুগলপ্রসাদের চরিত্রটি। যুগলপ্রসাদ আত্মভোলা প্রকৃতিপ্রেমিক। সে ফুল ভালোবাসে, গাছ ভালোবাসে, প্রকৃতির সৌন্দর্য ভালোবাসে। সংসার সম্পর্কে সে দারুণ উদাসীন, ফলে তার সংসারে দরিদ্র নিত্যদিনের সঙ্গী। বস্তুত যুগলপ্রসাদের সৌন্দর্যসন্ধানী মনটি সংসারের মায়াজালে আবদ্ধ হতে চায় না।

পুরুষ চরিত্রের আলোচনার পর আমরা তিনিটি নারী চরিত্রের আলোচনা করেছি। 'আরণ্যক' উপন্যাসের বহু চরিত্রের ভিড়ে ভানুমতী, কুন্তা, মঞ্চীকে স্বতন্ত্রভাবে চেনা যায় মূলত তাদের চরিত্রের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্যের জন্য। ভানুমতী সাঁওতাল রাজকন্যা। সাঁওতালরাজ দোবরু পান্নার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে ১৬-১৭ বৎসরের ভানুমতীর সঙ্গে সত্যচরণের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে। লাবণ্যময়ী তথা স্বাস্থ্যবতী ভানুমতীকে প্রথম দেখেই সত্যচরণের ভালো লেগেছিল, ধীরে ধীরে দুজনের মধ্যে একটি প্রেমের সম্পর্কও গড়ে ওঠে। বস্তুত ভানুমতীর চরিত্র আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি তার কর্মক্ষমতা, সরল ব্যবহার, অতিথি পরায়ণতা যা সত্যচরণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও আকর্ষণ করে।

কুন্তা চরিত্রটিও উল্লেখযোগ্য। আমরা দেখেছি সমগ্র উপন্যাসে কুন্তার দুঃখ, কুন্তার বেদনা এক রসবৈচিত্র্য এনেছে, কাহিনিকে দিয়েছে গতি। কুন্তা চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা উপলব্ধি করেছি তার জীবনের নাটকীয় মুহূর্তগুলিকে। বাইজি কন্যা থেকে রাজপুতের স্ত্রী, রাজপুতের স্ত্রী থেকে রাজপুতের বিধবা হওয়া পর্যন্ত ঘটনা পরম্পরায় তার যে দুঃখ এবং বেদনা বিভূতিভূষণ অঙ্কন করেছেন তা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

মঞ্চী চরিত্রের ক্ষেত্রেও বিভূতিভূষণের মুন্সিয়ানা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমরা মঞ্চী চরিত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছি সে প্রাণোচ্ছল ও নির্ভীক। যাযাবরত্ব এবং নক্‌ছেদীর মতো বয়স্ক স্বামী নিয়ে তার কোনো আক্ষেপ নেই, বরং যাযাবরত্বকে সে উপভোগ করে। মঞ্চী চরিত্রের আলোচনায় আমরা দেখেছি সরলতা, তেজস্বিতা, আনন্দের প্রতিমূর্তি হচ্ছে এই মেয়েটি। এই সব গুণের জন্য সত্যচরণও মঞ্চীকে ভীষণ পছন্দ করে।

এভাবে আমরা উল্লিখিত কয়েকটি চরিত্রের আলোচনা তুলে ধরে বিভূতিভূষণের কৃতিত্বের পরিমাপ করার চেষ্টা করেছি।

১১.৪ সাম্ভাব্য প্রশ্নাবলি

দ্বাদশ বিভাগে দ্রষ্টব্য।

১১.৫ প্রসঙ্গ-পুস্তক

দ্বাদশ বিভাগে দ্রষ্টব্য।

* * *

বিভাগ — ১২
আরণ্যক
আরণ্যক : শিল্পরীতি

বিষয়বিন্যাস

১২.০ ভূমিকা

১২.১ উদ্দেশ্য

১২.২ আরণ্যক : বিভিন্ন আঙ্গিকের সমন্বয়

১২.২.১ 'আরণ্যক'-এর শিল্পরীতি : আমাদের সিদ্ধান্ত

১২.৩ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

১২.৪ প্রাসঙ্গিক টীকা

১২.৫ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি

১২.৬ প্রসঙ্গ-পুস্তক

১২.০ ভূমিকা

'আরণ্যক' গ্রন্থভুক্ত বর্তমান আলোচনাকে আমরা আরণ্যকের শিল্পরীতি নামে চিহ্নিত করেছি। আধুনিক সাহিত্যে বিশেষ করে উপন্যাসে শিল্পরীতির প্রসঙ্গটি গুরুত্বপূর্ণ— "যিনি কবি কিংবা ঔপন্যাসিক, এককথায় সৃজনধর্মী সাহিত্যিক, তাঁর মন আর শিল্পবস্তুকে পৃথক করে দেখা সম্ভব নয়। মনের মধ্যে যখন নিগূঢ় অনুভূতি জাগে, শিল্পীর মনে তা একেবারে নিরবয়ব, 'নিরালম্ব' হয়ে দেখা দেয় না। কোন না কোন ভাবে একটা রূপ নিয়েই তা আসে। শিল্পীর সমস্ত চিন্তা-ভাবনা-উপলব্ধি, তাঁর সমগ্র অস্তিত্ব, এই 'রূপ'-কে আশ্রয় করেই। সাহিত্য-শিল্পে তাই রূপ বা আঙ্গিক প্রকরণের এত প্রাধান্য। এ থেকে আজকের দিনে অনেকের ধারণা হয়েছে যে, সাহিত্যে শিল্প-প্রকরণই বুঝি সর্বস্ব। বিষয়বস্তু নেহাৎ গৌণ। আধুনিক কাব্যে, ছোট গল্পে, এমনকি উপন্যাসেও তাই চোখে পড়ে শিল্প-রীতির আতিশয্য, তার বহু বিচিত্র ঐশ্বর্য। বিষয়বস্তু যতই অন্তঃসারশূন্য হ'ক, কেবল চোখ-ধাঁধানো আঙ্গিকের জোরে প্রশংসা পেয়েছে, প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, এমন বইয়ের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য নয়।" — উপন্যাসের শিল্পরীতি সম্পর্কে গোপীকানাথ রায়চৌধুরীর এ উক্তি প্রণিধানযোগ্য। 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথও বলেন— 'রসসাহিত্যে বিষয়টাই উপাদান, তার

রূপটাই চরম।' বস্তুত এজন্যই জগতের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকগণ উপন্যাসের সুষ্ঠু রূপসৃষ্টি ও সার্থক শিল্প-অবয়ব সৃষ্টি সম্পর্কে সচেতন। আর সেজন্যই আধুনিক উপন্যাসের শিল্পদেহের কাঠামো পরিবর্তিত হয় বারবার। উপন্যাসের শিল্পরীতির ক্ষেত্রে উল্লিখিত কথাগুলো চিরন্তন হলেও বিভূতিভূষণ সম্পর্কে তা খাটে না। বস্তুত গঠনকৌশলের মুন্সিয়ানা তাঁর রচনায় নেই বললেই চলে। বস্তুত তিনি কন্টেন্ট্ ও ফর্ম নিয়ে তেমনভাবে ভাবনাচিন্তাই করেননি। সেজন্যই অনেকে তাঁর 'পথের পাঁচালী' বা 'আরণ্যক'-কে কাব্যধর্মী রচনা হিসাবে গুরুত্ব দিলেও উপন্যাসের মর্যাদা দিতে চান না। আবার অনেকের ধারণা উপন্যাসের গঠন-রীতিকে লেখক নাকি সুস্থভাবে প্রয়োগই করতে পারেননি।

এই সব বিতর্কগুলো মনে রেখেই আমরা 'আরণ্যক' উপন্যাসের শিল্পরীতির বিষয়টি বিচার করে দেখব। কন্টেন্ট্ ও ফর্মকে তিনি যদি গুরুত্বই না দিয়ে থাকেন তাহলে কোন গুণে তাঁর 'আরণ্যক' কালজয়ী সে বিষয়গুলোই আমাদের বিচার্য।

১২.১ উদ্দেশ্য

'আরণ্যক' উপন্যাসের বর্তমান আলোচনাকে আমরা দ্বাদশ বিভাগে অন্তর্ভুক্ত করেছি। এই পর্যায়ে 'আরণ্যক' উপন্যাসের শিল্পরীতির প্রসঙ্গটি সাধারণভাবে আমাদের আলোচ্য। বস্তুত 'আরণ্যক' উপন্যাস বিভূতিভূষণের সচেতন চিন্তা-প্রসূত নয়। এখানে তিনি শিল্পরীতি নিয়ে কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অবতীর্ণ হননি, তৈরি করতে চাননি কোনো নতুনকিছু। আর তাই এতে বিভিন্ন রীতির উপন্যাসের লক্ষণ উঁকি দিয়েছে। আমরা এই অধ্যায়ে—

- 'আরণ্যক' উপন্যাসে ছায়াপাত করা এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন রীতি ও তাদের লক্ষণগুলিকে চিহ্নিত করব।
- এগুলির সমন্বয়ে 'আরণ্যক' কীভাবে এক প্রাকরণিক বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হয়েছে— তা অনুসন্ধান করব। এবং
- আলোচনার শেষে আপনারা 'আরণ্যক' উপন্যাসের শিল্পীরীতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করতে পারবেন।

১২.২ আরণ্যক : বিভিন্ন আঙ্গিকের সমন্বয়

এতক্ষণের আলোচনায় আমরা জেনেছি আধুনিক উপন্যাসের প্রকাশ যেমন তার কন্টেন্টে তেমনি তার ফর্মেও। উল্লেখ্য, কন্টেন্ট আর ফর্ম বা বিষয় আর আঙ্গিক অর্ধনারীশ্বরের মতো অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা। কিন্তু বিভূতিভূষণের কন্টেন্ট বা বিষয় যেমন চমকহীন, তেমনি তাঁর ফর্ম বা আঙ্গিকও। সেজন্যই তাঁর উপন্যাসের কাঠামো দৃঢ়পিনদ্ধ নয়, শ্লথবিন্যস্ত। অনেক সময়ই কাহিনির অপরিহার্য রূপ হিসাবে ঘটনাগুলি

আসেনি, আবার কোনো একটি বিশেষ পরিণতি লক্ষ করে এগিয়ে যায়নি কাহিনি। 'আরণ্যক' উপন্যাসে সত্যচরণের ইতস্তত ছড়ানো খণ্ড খণ্ড স্মৃতিচারণ সম্পর্কেও অনেকের এই ধারণা। বিভূতিভূষণের বর্ণনামূলক রচনাভঙ্গি আর ঘটনাগুলির পারস্পরিক দৃঢ়বন্ধনের অভাবের ফলেই 'আরণ্যক'-এর কাহিনি ধীরমন্থর গতিতে এগিয়ে চলেছে। বস্তুত তিনি নাটকীয় উদ্বেগহীন একটির পর একটি ঘটনা ছবির মতো বলে যান। ফলে ঘটনা বা কাহিনির মধ্যে গতি-চাঞ্চল্য লক্ষ করা যায় না। গতি-চাঞ্চল্যের অভাবহেতু 'আরণ্যক'-এর শিল্পরীতি নাট্যরস সমৃদ্ধ নয়। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের অভাবে 'আরণ্যক'-এর গতিহীন নাটকীয় মুহূর্তগুলি রসোত্তীর্ণ হতে পারেনি।

'আরণ্যক' উপন্যাসের এই অভাবগুলো স্বীকার করলেও উক্ত উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে বিভূতিভূষণ চিরাচরিত ফর্ম থেকে কিছুটা সরে এলেন। ফলে 'আরণ্যক' উপন্যাসে দেখা গেল বিভিন্ন আঙ্গিকের সমন্বয়। উপন্যাসের কাহিনি বলার মধ্যেই আছে চমক। সরাসরি উপন্যাসে চরিত্রগুলো আসছে না, আসছে না ঘটনাগুলোও। ঘটনাগুলো দেখানো হচ্ছে না, বলা হচ্ছে। অর্থাৎ সত্যচরণ উপন্যাসের কথক কলকাতায় বসে ১৫-১৬ বছর পর তার জঙ্গল-মহালের কর্মের অভিজ্ঞতার গল্প বলছে উত্তমপুরুষের জবানিতে। বস্তুত তারই চেতনায় প্রতিফলিত হচ্ছে উপন্যাসের কাহিনি এবং চরিত্র। এই অভিনব কৌশলে 'আরণ্যক'-এর কাহিনিবিন্যাস করতে গিয়ে স্রষ্টার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে এই উপন্যাসে প্রতিফলিত হয় বিভিন্ন আঙ্গিকের সমন্বয়।

'আরণ্যক'-এর রচনারীতির মধ্যে অনেকেই ভ্রমণ বৃত্তান্ত ও ডায়েরির লক্ষণ দেখতে পেয়েছেন। 'আরণ্যক' উপন্যাসে ভ্রমণকাহিনির কিছুটা আভাস অবশ্যই পাওয়া যায়। এই উপন্যাসের কাহিনিতে পরিষ্কার হয়ে ওঠে কুশী নদীর পারে দিগন্ত বিস্তীর্ণ অরণ্য প্রান্তরের ছবি। আসলে বিভূতিভূষণ ছিলেন ভ্রমণপ্রিয় লোক। মজ্জায় মজ্জায় ভ্রমণের নেশা প্রবিষ্ট হয়ে থাকার জন্যই ভাগলপুরের জঙ্গল-মহালের প্রবাসের দিনগুলিতে কখনো শীতের তীব্রতায় আবার কখনো রোদ্র ঝলকিত দিনে ঋতু পরিবর্তনের রূপ দেখবার জন্য ঘোড়ায় চড়ে একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে ছুটে বেড়িয়েছেন। জ্যোৎস্নার তারকামণ্ডিত আকাশ দেখবার জন্য তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। আমরা 'আরণ্যক'-এ নানান রূপে, নানান সমারোহে, নানান অবস্থায় বিভূতিভূষণের পথিক সত্তার সদাজাগ্রত রূপটি দেখতে পাই সত্যচরণের মধ্যে। উন্মত্ত ভ্রমণের নেশায় একের পর এক চরিত্রের সঙ্গে, প্রকৃতির নানা বৈচিত্র্যের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছে। প্রকৃতি প্রেমিক বিভূতিভূষণ খোলাৎচন্দ্র ঘোষ এস্টেটের ম্যানেজারের চাকরি নিয়ে ভাগলপুরের জঙ্গলে ছিলেন প্রায় চার বৎসর। এই সময় তিনি নানা সূত্রে প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন এবং ধীরে ধীরে প্রকৃতির প্রতিটি প্রাণস্পন্দন তাঁর কাছে উন্মোচিত হতে থাকে। সৃষ্টি হয় তাঁর উদাসীন ভবঘুরে মনের সঙ্গে অক্লান্ত পথ পরিক্রমার একটা নিগূঢ় সংগতি। তাঁর এই অক্লান্ত পথ-পরিক্রমার ইতিহাস তিনি নানা ভ্রমণকাহিনি এবং ব্যক্তিগত দিনলিপিতে লিখে

রেখেছেন। পরবর্তী সময়ে উপন্যাস রচনার সময় এগুলো থেকে সাহায্য পেয়েছেন। এর প্রমাণ রয়েছে 'অপরাজিত' বা 'আরণ্যক' উপন্যাসে। বস্তুত 'আরণ্যক'-এর বহু পংক্তি, বহু অনুভূতি 'স্মৃতির রেখা' নামক ডায়েরির সঙ্গে অভিন্ন। এ প্রসঙ্গে সুনীলকুমার বলেন— "আসলে, বিভূতিভূষণ অরণ্যবাসকালীন দিনলিপিতে তাঁর বহু অনুভূতি ও ঘটনার নোট রেখেছিলেন। গ্রন্থে তিনি সেগুলিই কাজে লাগান। অনেক ক্ষেত্রে যে ভাষায় তিনি নোট নেন সেই ভাষাও গ্রন্থে চলে এসেছে।"

'আরণ্যক'-এ ভ্রমণকাহিনির লক্ষণ তখনই গাঢ় হয় যখন দেখি বিভূতিভূষণের নানা দিনের ভ্রমণের নানা স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা খণ্ড খণ্ড রূপে ভ্রমণকাহিনির আদলে সত্যচরণের জবানিতে প্রকাশ পায়। বস্তুত ভ্রমণকাহিনির লক্ষণ 'আরণ্যক'-এর বহু জায়গায় ছাড়িয়ে আছে। 'আরণ্যক'-এর ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের— 'একদিন পাহাড় দেখিব বলিয়া বাহির হইলাম। ন' মাইল ঘোড়ায় গিয়া দুই দিকের দুই শৈলশ্রেণীর মাঝের পথ ধরিয়া চলি। দুই দিকের শৈলসানু বনে ভরা, পথের ধারে দুই দিকের বিচিত্র ঘন বনঝোপের মধ্য দিয়ে সুঁড়িপথ আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে। কখনও উঁচু-নীচ, মাঝে মাঝে ছোট ছোট পার্বত্য ঝরণা উপলাস্তৃত পথে বহিয়া চলিয়াছে, বন্য চন্দ্রমল্লিকা ফুটিতে দেখি নাই, কারণ তখন শরৎকাল, চন্দ্রমল্লিকা ফুটিবার সময়ও নয়, কিন্তু কি অজস্র বন্য শেফালিবৃক্ষ বনের সর্বত্র, ফুলের খই ছড়াইয়া রাখিয়াছে বৃক্ষতলে, শিলাখণ্ডে ঝরণার উপলাকীর্ণ তীরে।" —এই বর্ণনা নিছক ভ্রমণকারী সত্যচরণের চিত্তেরই উন্মোচন করে। এমনিভাবে তৃতীয় পরিচ্ছেদে গ্রীষ্মের বর্ণনা, দশম পরিচ্ছেদে ভয়াবহ শীতের বর্ণনা, যুগলপ্রসাদের সঙ্গে মহালিখারূপের পাহাড়ে যাওয়া ইত্যাদির মধ্যে ভ্রমণকাহিনির স্বাদ থাকলেও 'আরণ্যক' প্রকৃত পক্ষে ভ্রমণকাহিনি নয়। এখানে ভ্রমণকাহিনির কিছুটা আদল রয়েছে সত্য, কিন্তু— "ভ্রমণকাহিনিতে অনেক সময় তথ্য-সংক্রান্ত নীরস খুঁটিনাটির উপর অতিরিক্ত নজর দেওয়া হয়। এখানে লেখক ভ্রমণের খুঁটিনাটির উপর ততখানি দৃষ্টি দেননি, যতখানি দিয়েছেন সৌন্দর্যের উপর, মানুষের প্রাণ-রহস্যের উপর।" গোপীকানাথের এই উক্তিকে মেনে নিয়ে আমরাও বলতে পারি 'আরণ্যক' তথ্য-সংক্রান্ত খুঁটিনাটি বর্ণনা নয়, এটি বিভূতিভূষণ কথিত এক 'কল্পলোকের বিবরণ' যেখানে আছে একটি গল্প।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

" 'আরণ্যক'-এর উদ্দেশ্য ভ্রমণ করা নয়, এমন কি পরিণতিও নয়। উদ্দেশ্য চাকুরীর পরিণতিতে বিগত দিনের স্বপ্ন-সুন্দর স্মৃতি রোমন্থন। জগতকে ছাড়িয়ে একটি সমৃদ্ধ আকাশচারী প্রেক্ষাপট ও তার অধ্যাত্ম-বিশুদ্ধমণ্ডিত কবি জনোচিত বর্ণনা 'আরণ্যক'-এর মূল সুর। ভ্রমণকাহিনীতে মুখ্য গতির রস, ভ্রমণকাহিনীর রচয়িতা তাই 'পথের পাঁচালী'-কার। কিন্তু 'আরণ্যক' নীড়াশ্রয়ী মানুষের কল্প-বাসর। বিভূতিভূষণ যতই বিচরণ করুণ না কেন, তার চিত্তবৃত্তি যাযাবর নয়। তাই

নীড়াশ্রয়ী মানুষ সুখদুঃখপূর্ণ সংসারকে কী মমতাময় দৃষ্টির সাহায্যেই না তিনি দেখেছেন। প্রবোধকুমার সান্যাল যথার্থ যাযাবর— এই যাযাবরবৃত্তি তাঁর উপন্যাস ও ভ্রমণকাহিনীর প্রধান লক্ষণ। কিন্তু বিভূতিভূষণ নীড়াশ্রয়ী মানুষের হয়েও কল্পলোকের স্বপ্ন দেখেন— তিনি কল্পপথের যাযাবর। 'আরণ্যক'-এর মূল কাহিনীর সঙ্গে শাখা কাহিনীর যে সমন্বয় তা ভ্রমণকাহিনীতে মেলা কঠিন। মূল কাহিনীর নায়ক সীমাহীন বিশ্বপ্রকৃতি, উপকাহিনীতে অনেকগুলি ছোটগল্প— এই দুই কাহিনীরই ভাষ্যকার স্বয়ং লেখক। অরণ্য জগৎ যেন বৃহৎ বনস্পতি, উপকাহিনীর নরনারীরা যেন এক একটি শাখাবিহঙ্গ— এক একটি নীড় তাদের বিচিত্র সংসার। এই অখণ্ড জগতের ছবি এঁকেছেন নিরাসক্ত শিল্পী বিভূতিভূষণ।"

[বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরণ্যক : ড০ সমরেশ মজুমদার]

ভ্রমণ কাহিনি লক্ষণের মতো 'আরণ্যক'-এ ডায়েরি লক্ষণও পরিলক্ষিত হয়। তবে 'আরণ্যক'-এর ফর্মের সঙ্গে তা কতটুকু সম্পর্কিত সেটা আমরা বিচার করে দেখতে পারি। বিভূতিভূষণের ডায়েরির সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। এই ডায়েরিগুলোর মধ্যে 'স্মৃতির রেখা' নামক দিনলিপির সঙ্গে 'আরণ্যক' উপন্যাসের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। এ সম্পর্কে আমরা আগেও আলোচনা করেছি।

বস্তুত ডায়েরিধর্মী উপন্যাসগুলোর মধ্যে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসের মতোই উত্তমপুরুষের জবানিতে কথকের মুখে কাহিনি বর্ণিত হয়। এই জাতের উপন্যাসগুলোতে ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতির সঙ্গে প্রাধান্য পায় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। এবং কাহিনি বিন্যস্ত হয় সময়ের ক্রমপর্যায় অনুসারে। এই শর্ত অনুসারে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অনুভবের আলোকে, অনেকটা দিনলিপির ভঙ্গিতে সত্যচরণ বলেছে 'আরণ্যক'-এর কাহিনি। সত্যচরণ এই উপন্যাসের কথক তথা নায়ক, তারই চেতনায় প্রতিফলিত হয় সমগ্র উপন্যাসের কাহিনি ও চরিত্র। বস্তুত সত্যচরণ জঙ্গল-মহালে চাকরিসূত্রে যতদিন ছিল, সেই সময়কার নানা স্মৃতি খণ্ড খণ্ড এপিসোডের মতো 'আরণ্যক'-এর কাহিনিবিন্যাসে স্থান পেয়েছে। জঙ্গল-মহালের পরিমণ্ডল ছেড়ে কলকাতায় ফিরে আসার পর সেখানকার স্মৃতির সূত্র ধরে কুশী নদীর অপর পারের দিগন্ত বিস্তীর্ণ অরণ্যপ্রান্তর সত্যচরণের স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে। কাহিনির শুরুতেই তাই সত্যচরণ বলে— 'কিন্তু আমার এ স্মৃতি আনন্দের নয় দুঃখের।' সুতরাং ডায়েরির প্রেক্ষিতটি একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কেননা সত্যচরণ যেভাবে উত্তমপুরুষের জবানিতে নানান খণ্ড কাহিনি বলেছে, নিজের জঙ্গল-মহালের অভিজ্ঞতার কথা বলছে তাতে আমাদের মনে হতেই পারে এটি ডায়েরি। আবার বিভূতিভূষণের 'স্মৃতির রেখা' নামক দিনলিপির সঙ্গে 'আরণ্যক'-এর বহু জায়গায় মিল দেখেও প্রতীতিটি গাঢ় হয়। যেমন— 'আরণ্যক'-এর পুণাহ্য উৎসবের সঙ্গে 'স্মৃতির রেখা'-র সরস্বতী পুজোর ভোজের সাদৃশ্য উল্লেখযোগ্য— "ঈশ্বর ঝা ও তার ভাইকে দাঁড়িয়ে থেকে খাওয়ালাম। ওরা রসগোল্লা এদের দিতে চায়না— হুকুম দিয়ে আনালাম, এদের দিলাম, রামচন্দ্র সিং আমীনকে লোক পাঠিয়ে আনিয়ে নিয়ে প্রসাদ খাওয়ালাম।

তারপর ধাঙ্গোড়রা বাইরে বৃষ্টি মাথায় খেতে বসলো। আমি গিয়ে দাঁড়িয়ে তাদের খাওয়ালাম। প্যাঁড়া মহুয়া দই ও একটু একটু করে গুড় পেয়ে সেই টিপ টিপ বাদলের দিনে ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়ায় বর্ষণমুখর আকাশের নীচে অনাবৃত মাঠে বসে খেতে খেতে তাদের উৎসাহ লোভ আনন্দ দেখে চোখে জল এল। ...ওরা যখন ভিজছে তখন আমার ঘরে বসে আরাম করবার কোন অধিকার নেই ভেবে আমিও ভিজতে ভিজতে গিয়ে সেখানে দাঁড়ালাম ও হুকুম দিয়ে তাকে ও তাদের ছেলেদের আরও দই গুড় আনিয়ে দিলাম।" এছাড়াও অরণ্যের মধ্যেকার খর-নিদাঘের চিত্র, ভয়াবহ জলকষ্ট, দাবানলের দৃশ্য, কলেরার বর্ণনা, মেলার ছবি, হোলি উৎসবের বর্ণনা, ভানুমতী দোবরু পান্নার প্রসঙ্গ, কুন্তা-মঞ্চী জীবনবৃত্তান্ত সত্যচরণের স্মৃতিপটে একের পর এক যেভাবে ভেসে উঠে তা দেখে স্বাভাবিক কারণেই ডায়েরির প্রসঙ্গ উঠে আসে। কিন্তু ডায়েরি বা দিনলিপির প্রধান লক্ষণ হচ্ছে সেখানে সন-তারিখ সহ নানান দিনের প্রকৃত ঘটনা লিপিবদ্ধ করা। আসলে দিনলিপি হচ্ছে তথ্যবহুল একটি ব্যক্তিপরিচয়মূলক গ্রন্থ। এই লক্ষণগুলো 'আরণ্যক'-এ না থাকার জন্যই বিভূতিভূষণ স্বয়ং বলেছেন— 'ইহা ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বা ডায়েরী নহে— উপন্যাস'। সুতরাং একে নিছক ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বা ডায়েরি না বলে ডায়েরিধর্মী উপন্যাসে বলা থেতে পারে। এই ধরনের উপন্যাসের গঠনশৈলীর উদাহরণ রয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে। 'চতুরঙ্গ'-এর কথক চরিত্র শ্রীবিলাসের মতো সমগ্র কাহিনিকে সত্যচরণ ব্যক্ত করেছে 'আমি' সর্বনাম পরিচিতিতে। প্রয়োজনে উল্লেখ করেছে বিভিন্ন চরিত্রের উদ্ধৃতি, বিভিন্ন চরিত্রের কথোপকথন।

উপরিউক্ত আলোচনা এবং 'আরণ্যক' উপন্যাসের ভূমিকাংশে বিভূতিভূষণের— 'ইহা ভ্রমণ বৃত্তান্ত বা ডায়েরী নহে— উপন্যাস' —এই নির্দেশবাক্য মেনে নিলেও বলতে হয় এটি কোন শ্রেণির উপন্যাস, এর উপন্যাস লক্ষণই বা কোন শ্রেণিভুক্ত। অনেকেই বলেছেন এটি আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। এই বক্তব্যটিও বিচার করে দেখা যাক।

আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসে আমরা পাই লেখকের হারানো দিনের অভিজ্ঞতা, অতীতের স্মৃতিরোমন্থন। অর্থাৎ আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসের মূল শর্ত, লেখকের ব্যক্তিজীবনের ঘটনা এবং অভিজ্ঞতাসমূহ উপন্যাসটির কন্টেন্ট এবং ফর্মের বিন্যাসের ক্ষেত্রে বড়ো ভূমিকা গ্রহণ করবে। এই শ্রেণির উপন্যাস সম্পর্কে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন— "আত্মকাহিনীর ছলেই হোক বা কোনো নায়ককে স্থাপিত করেই হোক, সাধারণত এ-জাতীয় উপন্যাসের ভিত্তিতে লেখকের জীবন ছায়াপাত করে বলে পাঠকদের কাছে এদের একটা পৃথক মূল্য থাকে।" এই ধরনের উপন্যাসকে বিশেষ কোনো প্লটের দায়ভার বহন করতে হয় না, চরিত্রকে পরিবেশের সম্মুখীন করে নিরীক্ষা করার দায়ও এই উপন্যাসের নেই। এই ধরনের উপন্যাসে নানা ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, এই সব ব্যক্তিগুলোর সমাহারে এবং নানা ঘটনার পুঞ্জ পুঞ্জ প্রতিক্রিয়ায় গড়ে ওঠে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসের নায়কের ব্যক্তিস্বরূপ।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আত্মজৈবনিক উপন্যাসগুলোর মধ্যে এই লক্ষণগুলোরই প্রাচুর্য লক্ষ করা যায়। ইংরেজিতে রচিত ডিকেন্সের 'ডেভিড কপারফিল্ড', বাংলায় শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' এই শ্রেণির উপন্যাস। ডেভিডের জবানিতে উত্তমপুরুষ বর্ণনারীতির মাধ্যমে ডিকেন্স যে আখ্যানভাগ রচনা করেছেন তা আসলে লেখকেরই জীবনের ঘটনাক্রমের এক চমকপ্রদ উপন্যাসরূপ। চারপর্বে সম্পূর্ণ শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত'-কেও উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোর নিরিখেই আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস বলা হয়। গঠনশৈথিল্য থাকলেও এই উপন্যাসের দীর্ঘ কাহিনির কেন্দ্রীয় চরিত্র শ্রীকান্তের মধ্যে মূলত শরৎচন্দ্রের জীবনের বহু অভিজ্ঞতা আমরা লক্ষ করি। বস্তুত উল্লিখিত দুটো উপন্যাসেই শ্রীকান্ত এবং ডেভিড উত্তমপুরুষ বিবরণদাতা রূপেই কাহিনি বলেছে, যা আসলে আত্মজৈবনিক উপন্যাসের পরিচিত লক্ষণ। এই বৈশিষ্ট্যগুলোর সঙ্গে 'আরণ্যক' উপন্যাসের আপাত সাদৃশ্য আছে বলেই অনেকে একে আত্মজৈবনিক উপন্যাসের শ্রেণিতে ফেলেছেন। শ্রীকান্ত বা ডেভিডের মতো সত্যচরণও 'আরণ্যক' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র তথা কথক। অর্থাৎ তারই জবানিতে বিভূতিভূষণ ভাগলপুরের অরণ্যবাসকালীন চার বৎসরের (১৯২৪-১৯২৮) নানা অভিজ্ঞতার স্মৃতিরোমন্থন করেছেন। সত্যচরণ যখন উত্তমপুরুষ বিবরণদাতার রীতিতে কাহিনির ন্যারেটারের কাজ করে তখন আমরা এক 'আমি'-কে পাই, যে আসলে ঔপন্যাসিকেরই কণ্ঠস্বর। এই 'আমি'-র প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ অভিজ্ঞতা, ভাবনা এবং অনুভবের আলোকে আখ্যানভাগ পরিবেশিত হয়। এই ন্যারেটাররূপ 'আমি'-ই কাহিনির কেন্দ্রবিন্দু, এবং এখানেই আত্মজৈবনিক উপন্যাসের শিল্পরূপটি প্রত্যক্ষ হয়। এই প্রাথমিক শর্তগুলো মেনে নিলে 'আরণ্যক' অবশ্যই আত্মজৈবনিক উপন্যাস। সত্যচরণের আত্মকাহিনির মধ্যে লেখক বিভূতিভূষণের জীবনের ছায়াপাত সহজেই লক্ষ করা যায়। আবার লক্ষ করা যায় বিভিন্ন ব্যক্তির সমাহারে বা নানা ঘটনার পুঞ্জ পুঞ্জ প্রতিক্রিয়ায় গড়ে ওঠা নায়ক সত্যচরণের ব্যক্তিস্বরূপ। এসব সত্ত্বেও 'আরণ্যক'-এর আলোচ্য ফর্মনিয়ে সন্দেহ জাগে তখনই যখন সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন— "এ সত্যই নদীধারার মত কতকগুলি ঘাট ছুঁয়ে চলে যাওয়া নয়, অথবা পান্থধর্মী পথিকের মত কতকগুলি বিচিত্র মানুষের সঙ্গে দেখা হওয়ার বিবরণী নয়। এ-ধরনের উপন্যাসের সময়কাল সাধারণত নায়কের বা গ্রন্থের প্রৌঢ় 'আমি'-র আশৈশব-জীবনকাল। এই দীর্ঘ সময়-খণ্ডকে লেখক ব্যবহার করেন নায়কের পূর্ণ ব্যক্তি-মানসের গড়ে ওঠার প্রস্তুতি কাল হিসাবে।" আত্মজৈবনিক উপন্যাসের এই বৈশিষ্ট্যকে মেনে নিলে বলতে হয় 'আরণ্যক' উপন্যাসে কথক-নায়ক সত্যচরণের আশৈশব-জীবনকালের ব্যাপ্তিকে দেখানো হয়নি, দেখনো হয়েছে জঙ্গল-মহালে কাজ করার সময়কার কয়েক বৎসরের কাহিনি।

এতক্ষণের আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে 'আরণ্যক'-এর ফর্মের মধ্যে নানা শ্রেণির উপন্যাসের সমন্বয় ঘটেছে। সেজন্যই 'আরণ্যক'-এ অনেক সময় ডায়েরিধর্মীতা লক্ষ করা যায়, আবার অনেক সময় দেখা যায় ভ্রমণকাহিনিমূলক উপন্যাসের লক্ষণ। আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস হিসাবে 'আরণ্যক'-এর চাহিদা কম নয়। আসলে উপন্যাসের সুষ্ঠু রূপসৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি ততটা

ভাবনাচিন্তা করেননি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্য-ভাবনায় ফর্ম এবং কন্টেন্টকে গুরুত্ব দেন বলেই বার বার বদলে গেছে তাঁর উপন্যাসের শিল্পদেহের কাঠামো। কিন্তু বিভূতিভূষণ এক্ষেত্রে ছিলেন উদাসীন। এই উদাসীনতার পেছনেও আছে তাঁর নিজস্ব জীবনদর্শন— "যে জগৎকে আমরা প্রতিদিনের কাজকর্মে হাটে-ঘাটে হাতের কাছে পাইতেছি জীবন তাহা নয়, এই কর্মব্যস্ত অগভীর একঘেয়ে জীবনের পিছনে একটি সুন্দর পরিপূর্ণ, আনন্দভরা, সৌম্য জীবন লুকানো আছে— সে এক শাশ্বত রহস্যভরা গহন-গভীর জীবন-মন্দাকিনী, যাহার গতি কল্প হইতে কল্পান্তরে, দুঃখকে তাহা করিয়াছে অমৃতত্বের পাথেয়, অশ্রুকে করিয়াছে অনন্ত জীবনের উৎসধারা।" এই অভিনব জীবনদর্শনের ফলে তাঁর উপন্যাসগুলি হয়ে ওঠে পরিপূর্ণ, সৌম্য, শাশ্বত জীবন-চেতনারই বিস্তৃত ভাষ্য। ফলে তাঁর ফর্ম ও কন্টেন্টও অতি সাধারণ, চমকহীন। রবীন্দ্রনাথ বলেন— "সাহিত্যে যখন কোন জ্যোতিষ্ক দেখা দেন তখন নিজের রচনার একটি বিশেষ রূপ নিয়ে আসেন। তিনি যে ভাবকে অবলম্বন করে লেখেন তারও বিশেষত্ব থাকতে পারে, কিন্তু সে-ও গৌণ; সেই ভাবটি যে বিশেষ রূপ অবলম্বন করে প্রকাশ পায় সেটিতেই তার কৌলীন্য।" চমকহীন অতিসাধারণ রূপেই বিভূতিভূষণের কৃতিত্ব। 'আরণ্যক'-এ কয়েকটি আঙ্গিকের সমন্বয় ঘটলেও এর চমকহীন অতিসাধারণ শিল্পরীতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

" 'আরণ্যক'-এর কাহিনী উত্তমপুরুষে বিবৃত। এর ফলে বিক্ষিপ্ত এলোমেলো ঘটনার মধ্যে একটি ঐক্যবন্ধন স্থাপিত হয়েছে। আরণ্যক জীবন শেষ হঁয়ে যাওয়ার পনেরো ষোল বছর পর গড়ের মাঠের একাংশে বসে স্মৃতিমন্থনের আলোকে সমগ্র ঘটনাগুলিকে উদ্ভাসিত ক'রে তোলার ফলে ওই ঐক্যবন্ধন আরও যেন অন্তরঙ্গ ও নিবিড় হয়ে উঠেছে। বক্তার স্মৃতিভারাতুর মনের করুণ মধুর স্পর্শে মুহূর্তের মধ্যে এই কাহিনী ভ্রমণবৃত্তান্ত বা ডায়েরীর সমস্ত খণ্ড ও তুচ্ছতাকে ছাড়িয়ে উপন্যাসের রসলোকে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

তাহলে মেনে নেওয়া গেল, 'আরণ্যক'— উপন্যাস। কিন্তু কোন শ্রেণীর উপন্যাস? আগেই বলেছি, বাংলা সাহিত্যে 'আরণ্যক' অনন্য। সম্পূর্ণ মৌলিক ও অভিনব এক সৃষ্টি। সুতরাং এর গোত্র নির্ণয় করা দুরূহ। এ উপন্যাস সাধারণ প্রচলিত শ্রেণীর রচনা নয়। এর মধ্যে ভ্রমণকাহিনীর কিছু উপাদান আছে। ডায়েরীর লক্ষণও কিছু আছে। আর আছে আত্মকাহিনী বা স্মৃতিকথার উপকরণ। আমরা জানি বিভূতিভূষণ নিজে এই তিন শ্রেণীর রচনাতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 'আরণ্যক'-এ তিনি এই তিনটি আঙ্গিকের সমন্বয়ে উপন্যাস রচনার এক নতুন শিল্পপ্রকরণ তৈরী করে গেছেন। তবে মোটামুটিভাবে আঙ্গিকের দিক থেকে বিচার করলে, 'আরণ্যক'-কে আত্মস্মৃতিমূলক উপন্যাসের শ্রেণীভুক্ত করা চলে।"

[বিভূতিভূষণ : মন ও শিল্প : গোপীকানাথ রায়চৌধুরী]

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

উপন্যাসে শিল্পরীতির প্রসঙ্গটি কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ? (৫০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

'আরণ্যক' উপন্যাসে ভ্রমণকাহিনির লক্ষণ কতটুকু লক্ষ করা যায়। (৫০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

ডায়েরিধর্মী উপন্যাস হিসাবে 'আরণ্যক'-এর সার্থকতা কতটুকু? (৬০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

'আরণ্যক'কে আত্মজৈবনিক উপন্যাস বলা যাবে কি? (১০০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

১২.২.১ 'আরণ্যক'-এর শিল্পরীতি : আমাদের সিদ্ধান্ত

রবীন্দ্রনাথ রসসাহিত্যে বিষয়ের চেয়ে রূপসৃষ্টিকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। আমরাও দেখি দিনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যাচ্ছে কথাসাহিত্যের বা রসসাহিত্যের গঠনগত কৌশল বা শিল্পরীতির রূপরেখা। কিন্তু বিভূতিভূষণের কাছে এই ব্যাপারগুলো সবই প্রায় অবান্তর। উপন্যাসের গঠনগত কৌশল খুব গুরুত্বপূর্ণ হলেও তিনি উপন্যাসের ফর্ম নিয়ে কখনও ভাবেন না, সৃষ্টি করতে চান না কোনো প্রাকরণিক দৃষ্টান্ত। যেটুকু তাঁর সাহিত্যে দেখা যায় সেটুকু প্রায়ই স্বয়ংসিদ্ধ। তবু তাঁর নির্মাণশিল্পের প্রয়োগ সংক্রান্ত উপাদানগুলিকে বিচার বিশ্লেষণ করে আমরা 'আরণ্যক'-এর শিল্পরীতির প্রসঙ্গটি যাচাই করে দেখব। যদিও আমরা পূর্ববর্তী আলোচনায় বিভিন্ন আঙ্গিকের সমন্বয়ে 'আরণ্যক'-এর ফর্মের বিষয়ে আলোচনা করেছি। এখানে আমরা সেগুলোর পুনরাবৃত্তি না করে 'আরণ্যক'-এর নির্মাণশিল্পের বাকি দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করব।

আমরা জানি জীবনকে নিয়েই উপন্যাস, তবে জীবনের সকল ঘটনা উপন্যাসে স্থান পেতে পারে না। জীবনের আক্ষরিক অবিকল প্রতিলিপি একটা অসম্ভব অলীক ব্যাপার। সুতরাং লেখককে জীবনের নির্বাচিত অভিজ্ঞতাগুলিকে গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট ছক বা প্যাটার্নে বিন্যস্ত করতে হবে। 'রবীন্দ্র উপন্যাসের নির্মাণশিল্প' গ্রন্থে গোপীকানাথ রায়চৌধুরী বলেন— "সাহিত্যের অন্যান্য অনেক শাখার তুলনায় উপন্যাসের 'প্যাটার্ন' বা 'ফর্ম' অত্যন্ত জটিল। জটিল এই অর্থে যে, যেখানে নাটকে— কী ট্র্যাজেডি, কী কমেডি, সর্বত্র 'ফর্ম' অত্যন্ত স্পষ্ট ও প্রকট; সেখানে, উপন্যাসে, বিশেষতঃ বাস্তবধর্মী উপন্যাসে এই 'ফর্ম' নিজেকে অনেকটাই প্রচ্ছন্ন রেখে এক ধরনের 'illusion of formlessness' রচনা করে।"

এই কথাগুলো বলার অর্থ একটাই, বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক'-এর ফর্মও অনেকটা প্রচ্ছন্ন। সেজন্য একে প্রচলিত রীতির উপন্যাসের শ্রেণিভুক্তও অনেকে করতে চান না। আবার অনেকে বলেন এটি উপন্যাসই নয়। বস্তুত ফর্মের প্রচ্ছন্নতার জন্যই বিভূতিভূষণকেও যথারীতি ভূমিকা করে বলতে হয়— 'ইহা ভ্রমণ বৃত্তান্ত বা ডায়েরী নহে— উপন্যাস।' ক্ষেত্রগুপ্ত 'আরণ্যক-এর উপন্যাসত্বকে স্বীকার করে বলেন— "আরণ্যকে আছে ভ্রমণ, কিঞ্চিত স্মৃতিকথন— এই সব মিলে খানিকটা আত্মজৈবনিক তো বটেই— কিন্তু এটি উপন্যাস, বেশ খোলামেলা ভঙ্গীর উপন্যাস— টুকরো এপিসোডের মালা, যেমনি বিভূতির উপন্যাস হয়ে থাকে।"

বস্তুত বিভূতিভূষণ প্রচলিত রীতি অনুসারেই তাঁর অধিকাংশ উপন্যাস লিখেছেন। আবার 'আরণ্যক'-এর মতো ব্যতিক্রমী উপন্যাসও আছে। উপকরণের দিক থেকে বিচার করলে 'আরণ্যক'-এ আখ্যানভাগ, চরিত্র, সংলাপ, পটভূমি এবং শৈলী সবই আছে। এই সবকটি উপাদান থাকা সত্ত্বেও 'আরণ্যক'-এর কায়া গঠনে কিছুটা শৈথিল্য দেখা যায়। এই উপন্যাসে একটি কেন্দ্রীয় থিম আছে যাকে ঘিরে কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। ক্ষেত্রগুপ্তের মতে— "এই উপন্যাস হল সত্যর সঙ্গে বইহারের আরণ্য প্রকৃতির প্রেম। সত্য নিজে বাধ্য হয়েছে তার প্রেমকে হত্যা করতে। এটি একটি অসাধারণ থিম সন্দেহ নেই, . . . ।" তবে এর কাহিনির মধ্যে গতি নেই। এছাড়াও প্রধান কাহিনিকে ঘিরে প্রচলিত ধারার উপন্যাসের মতো শাখা-কাহিনির উপস্থিতিতে আদ্য-মধ্য-অন্ত সমন্বিত কাহিনির অভাব স্পষ্ট। 'আরণ্যক'-এর আখ্যানভাগে গতি সৃষ্টি করার মতো নাটকীয় মুহূর্তের অভাব লক্ষ করা যায়। অবশ্য সম্ভাবনা যে ছিল না তা নয়। উপন্যাসে উল্লিখিত দাঙ্গার দৃশ্যে, দাবানলের দৃশ্যে, গ্রীষ্মের জলকষ্টের দৃশ্যে, উৎসব-মেলা ইত্যাদির দৃশ্যে, কুন্তার জীবনে, সত্যচরণ-ভানুমতীর প্রণয়ের দৃশ্যে বিভূতিভূষণ মূল কাহিনিকে গতি দান করতে পারতেন।

শুধু 'আরণ্যক'-এর প্লট নয়, তাঁর প্রায় সব উপন্যাসের প্লট সম্পর্কেই শৈথিল্যের প্রসঙ্গ এসে যায়। আসলে 'আরণ্যক'-এর ক্ষেত্রে উপন্যাসের প্রচলিত পদ্ধতি তিনি প্রায়ই অনুসরণ করেননি। সেজন্যই তাঁর উপন্যাসের কাঠামো দৃঢ়পিনদ্ধ

নয়, অনেক সময়ই শ্লথবিন্যস্ত। উপন্যাসের ঘটনাগুলি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যায়নি, অপরিহার্য রূপেও আসেনি। তাই 'আরণ্যক'-এর ঘটনার পারম্পর্য Organic বা অনিবার্য নয়। সত্যচরণের ইতস্তত ছড়ানো অভিজ্ঞতা ও বিভূতিভূষণের বর্ণনামূলক বা narrative রচনাভঙ্গির জন্যই 'আরণ্যক'-এর ঘটনাপ্রবাহ ধীরমন্থর। অনেকটা ছবির মতো অভিজ্ঞতাগুলো, নেই কোনো নাটকীয় উত্তাপ, নেই কোনো গতি-চাঞ্চল্য।

এ প্রসঙ্গে গোপীকানাথ রায়চৌধুরী যথার্থ বলেন— "বিভূতিভূষণের সাহিত্যে নাটকীয় শিল্পরীতি বা নাট্যরসের সমৃদ্ধি নেই। ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত ও গতিচাঞ্চল্যের মধ্য দিয়ে জীবনের নাটকীয় মুহূর্তগুলি রসমধুর হয়ে প্রকাশ পায়। কিন্তু বিভূতিভূষণের শিল্পবোধ নাটকীয় পদ্ধতিকে আশ্রয় করেনি। তাঁর উদাসীন বাউলমনের দৃষ্টিতে জীবনের দ্বন্দ্ব-জটিল নাটকীয় মুহূর্তগুলি তেমন প্রাধান্য পায়নি। জীবনকে তিনি সহজ সরলরেখার মতো দেখেছেন, তাকে রূপ-ও দিয়েছেন জটিলতামুক্ত সরল ভঙ্গীতে।"

'আরণ্য'-এর চরিত্রগুলোর ক্ষেত্রেও এই কথাগুলি প্রযোজ্য। অনেক সময় দেখা যায় ঘটনার গতিচাঞ্চল্যের চেয়ে প্রাধান্য পায় উপন্যাসে চিত্রিত চরিত্রগুলোর নানা মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলো। বস্তুত মানবমনের অন্তর-রহস্য, চিত্তে নানা ঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা, ব্যর্থতা-বেদনা-লোভ-ঈর্ষা অনেক সময়ই কাহিনিকে গতিদান করে, সৃষ্টি করে নাটকীয় মুহূর্ত। কিন্তু বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক'-এর শিল্পসৃষ্টির মধ্যে এমন চরিত্রেরও অভাব লক্ষ করার মতো। বস্তুত গল্পলেখকের গভীর অন্তর্দৃষ্টির মুন্সিয়ানার অভাবের ফলেই মানুষের আঁতের কথাকে প্লট ও চরিত্রনির্মিতিতে প্রক্ষিপ্ত করা অসম্ভব হয়ে যায়। আসলে গঠন-বিন্যাসের পারিপাট্যের ওপরই এই ব্যাপারগুলো নির্ভরশীল।

কিন্তু বিভূতিভূষণের ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে তিনি জীবনকে এভাবে দেখননি। তাঁর মতে— "যে জগৎকে আমরা প্রতিদিনের কাজকর্মে হাটে-ঘাটে হাতের কাছে পাইতেছি জীবন তাহা নয়, এই কর্মব্যস্ত অগভীর একঘেয়ে জীবনের পিছনে একটি সুন্দর পরিপূর্ণ, আনন্দভরা, সৌম্য জীবন লুকানো আছে—।" তাই তাঁর রচিত চরিত্রে জীবনের জটিল সমস্যাগুলির এত অভাব। ফলে 'আরণ্যক'-এর চরিত্রগুলি আপাতদৃষ্টিতে জ্বালারহিত। তারা দরিদ্র হলেও দুঃখ তাদের আঙ্গিনায় আসতে পারে না। তাই ভানুমতী, মঞ্চী, যুগলপ্রসাদ, ধাতুরীয়া ইত্যাদি চরিত্রগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব নেই, নেই কোনো সংঘাত। তবে কুন্তা চরিত্রের মধ্যে সম্ভাবনা থাকলেও বিভূতিভূষণের কলমে সেটা তেমন প্রাধান্য পায় না, ইঙ্গিত দিয়েই তিনি ছেড়ে দেন। রাসবিহারী সিং, নন্দলাল ওঝা, আর ছটু সিংকে নিয়ে কাহিনির যে একটি ছোটো বলয় সৃষ্টি হয় সেখানে কিছু কিছু হৃদয়বৃত্তির স্থান লক্ষ করা যায়। অর্থপিপাসা, ক্ষমতালোলুপতা, দেহলিপ্সা সব মিলে এখানে কিছুটা বৈচিত্র্য আছে, তবু তা পুরোপুরি প্রত্যক্ষগোচর নয়, উল্লেখমাত্র সার। চতুর্থ অধ্যায়ে এ বিষয়ে আমরা অনেকটা আলোচনা করেছি, এখানে পুনরাবৃত্তি না করে উপন্যাসের সংলাপের প্রসঙ্গটি আলোচনা করা যাক।

সংলাপ প্রসঙ্গে শ্রীশচন্দ্র দাশ তাঁর 'সাহিত্য-সন্দর্শন' গ্রন্থে বলেন— "পাত্রপাত্রীগণের কথোপকথন উপন্যাসের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। সাবলীল, সহজ ও স্বাভাবিক সংলাপ উপন্যাসের চরিত্র-বিকাশের সহায়ক।" মূলত সংলাপই চরিত্রের প্রবৃত্তি, অভিপ্রায় ও অনুভূতির রূপায়ণে সার্থক ভূমিকা গ্রহণ করে। এছাড়াও চরিত্রের দ্বন্দ্ব-সংঘাত সংলাপের আশ্রয় করেই বিকশিত হয়। শুধু মাত্র বর্ণনার মাধ্যমে কোনো চরিত্রের অন্তর্জীবনের খোজ পাওয়া যায় না। বস্তুত একটি চরিত্রকে বিকশিত করার জন্য কথাকারের বড়ো সহায় সংলাপ। আবার চরিত্রাণুগ সংলাপই ঔপন্যাসিকের কৃতিত্বের পরিচায়ক।

'আরণ্যক' উপন্যাসে বহু সংলাপ আছে। তবে সংলাপগুলি অঞ্চলের মানুষের মুখের ভাষা হয়ে ওঠেনি। 'আরণ্যক'এর অধিকাংশ চরিত্রই অবাঙালি, দক্ষিণ বিহারের মানুষ বা স্থানীয় সাঁওতাল জাতি। সুজন সিং, মুনেশ্বর সিং, মঞ্চী, কবি বেঙ্কটেশ্বর, মনুকনাথ, রাসবিহারী, রাজ পাঁড়ে সবার কথোপকথনে বাংলা ভাষাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন লেখক। অবশ্য ভাঙাচোরা হিন্দি মিশ্রিত আছে এদের সংলাপের মধ্যে, আঞ্চলিক ভাষার ঠাট-টান কোনোটির সঙ্গেই পরিচিত হবার সুযোগ নেই। অবশ্য আঞ্চলিক ভাষার কিছু কিছু আভাস আছে। যেমন কড়াই পেয়ে কাছারির সিপাহী দেহাতি ভাষায় বলে— 'হো গৈল, হুজুরকী কৃপা সে— কড়াইয়া হো গৈল!' আবার কোথাও কোথা ও দক্ষিণ ভাগলপুর ও গয়া জেলার ভাষাও ব্যবহৃত হয়েছে। — 'দয়া হোই জী' (গানের ভাষা) রাসবিহারীর ভাই বলে— 'আইয়ে জনাব, গরিবখানামে তসরিফ লেতে আইয়ে—' সত্যচরণ বলে— 'বড় ভাল লাগে এ অঞ্চলের মেয়েদের মুখে এই হিন্দীর টানটি।'

'আরণ্যক' উপন্যাসে আঞ্চলিক ভাষায় সংলাপগুলো রচিত না হওয়ার কারণ হচ্ছে সব সংলাপগুলো অনূদিত হয়েছে। আমরা জানি 'আরণ্যক' উপন্যাসের কাহিনি হচ্ছে সত্যচরণের স্মৃতিচারণ, সুতরাং সংলাপগুলো নির্দিষ্ট চরিত্রের মুখের ভাষা হলেও বলছে সত্যচরণ। আবার সত্যচরণের মুখের ভাষাগুলো অনেক সময়ই দীর্ঘ এবং কাব্যময়। এই বাচনভঙ্গি সম্পর্কে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন— "ভাবোন্নীত সুগভীর ভাষাকে কোথাও কারো মুখের কথা বাস্তব করে তোলার অনুরোধেও লেখক লক্ষ্যচুত করেন নি। প্রাকৃত এবং অতি-প্রাকৃত জীবনের ভেদরেখা যে অরণ্যভূমিতে মিলে মিশে রয়েছে সেখানকার বর্ণনাভঙ্গিতে গদ্যের ঋতুতার সঙ্গে কাব্যের নমনীয়তা প্রয়োজন। বিভূতিভূষণের সমুদয় প্রধান উপন্যাসের ভাষাতেই এই গুণ বর্তমান। 'আরণ্যক'-এ তা আরো যথার্থ আধার পেয়েছে।" একটা উদাহরণ দেওয়া যাক— "দিক্‌চক্রবালে দীর্ঘ নীলরেখার মত পরিদৃশ্যমান এই পাহাড় ও বন দুপুরে, বিকালে সন্ধ্যায় কত স্বপ্ন আনে মনে। এর জ্যোৎস্না, এর বন বনানী, এর নির্জনতা, এর নীরব রহস্য, সৌন্দর্য, এর মানুষজন, পাখির ডাক, বন্য ফুলশোভা— সবই মনে হয় অদ্ভুত, মনে এমন এক গভীর শান্তি ও আনন্দ আনিয়া দেয়, জীবনে যাহা কখনো কোথাও পাই নাই। তার উপরে বেশি করিয়া অদ্ভুত লাগে ওই মহালিখারূপের

শৈলমালা ও মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের সীমারেখা। কী রূপলোক যে ইহারা ফুটাইয়া তোলে দুপুরে, বৈকালে, জ্যোৎস্নারাতে কি উদাস চিন্তার সৃষ্টি করে মনে।"

কাহিনি-চরিত্র-সংলাপের মাধ্যমে কথাকার যে আখ্যানভাগ নির্মাণ করেন তার জন্য চাই পটভূমি বা পরিবেশ। বস্তুত— "একটি নির্দিষ্ট সময়-কাঠামোয়, একটি প্রাকৃতিক-ভৌগোলিক-সামাজিক প্রেক্ষিতে কাহিনি রূপবদ্ধ হয়, পাত্র-পাত্রীরা ক্রম-বিকশিত হতে থাকে।" এই পটভূমি নাগরিক জীবনসম্পৃক্ত হতে পারে, আবার হতে পারে পল্লিজীবনসম্পৃক্ত। বিভূতিভূষণ এই পটভূমি রচনায় দক্ষতা দেখিয়েছেন। বস্তুত বিভূতিভূষণই প্রথম বাংলার উপন্যাসের পটভূমিকে নিয়ে গেলেন বিহারের কোন এক অজ্ঞাত জঙ্গল-মহালে। একটি প্রস্তাবনা সহ মোট আঠারোটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত 'আরণ্যক' উপন্যাসটি সত্যচরণের জবানিতে পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে। এই উপন্যাসে পরিবেশ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আসলে উপন্যাসে পরিবেশ কোনো বিচ্ছিন্ন উপকরণ নয়; উপন্যাসের সম্পূর্ণ অয়বের এক অচ্ছেদ্য অংশরূপেই এই পরিবেশের মূল্য বা তাৎপর্য। পরিবেশ অনেক ক্ষেত্রেই চরিত্রের বিকাশ-বিবর্তনের মূল কারণ। 'আরণ্যক' উপন্যাসে পরিবেশ বা পটভূমিই প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে। সত্যচরণ কলকাতা থেকে জঙ্গল-মহালে এসে যে স্বপ্নের জগৎ পেল, বস্তুত যে পরিবেশ পেল তাকে নিজের হাতে ধ্বংস করে ছয় বৎসর পর আবার ফিরে যায় কলকাতায়। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় যাকে বলেন— 'স্বপ্নের জগৎটা হারিয়ে গেল শেষ পর্যন্ত'। হারিয়ে যাবে বলেই বিভূতিভূষণ পরিবেশ সৃষ্টি করতে গিয়ে তন্ময় হয়ে গেছেন।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় উপকরণগত শিল্পরীতির বিচারে বিভূতিভূষণের কৃতিত্ব তেমন নেই, এ ব্যাপারে তিনি মুন্সিয়ানাও দেখাতে চাননি। কন্টেন্ট-ফর্ম নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যেমন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন বিভূতিভূষণ সে ধার মাড়াননি। সেজন্যই 'আরণ্যক'-এ কোনো উপকরণই প্রধান হয়ে ওঠে না। সুতরাং শিল্পরীতি ধরে বিচার করলে 'আরণ্যক'-এ বহু দোষ— কাহিনি গতিহীন, নাটকীয়তা হীন, চরিত্র দ্বন্দ্বহীন, প্লটে আদি-মধ্য অন্ত সমন্বিত কাহিনি নেই, ঘটনার ক্রমোন্নতি, ক্লাইমেক্স, পরিণতির অভাব— ইত্যাদি বহু ত্রুটি। তবু যে গুণে 'আরণ্যক' রসোত্তীর্ণ সেটা হচ্ছে বিভূতিভূষণের 'অপূর্ব বস্তুনির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা' বা প্রতিভা।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

"আজকের সাহিতের আঙ্গিক-প্রাধান্য নিয়ে যাঁরা মাতামাতি করছেন, তাঁরা হয়তো ভুলে গেছেন যে, সাহিত্য রূপময় বা প্রকাশধর্মী সামগ্রী বটে, কিন্তু কিসের রূপ, কিসের প্রকাশ? সমগ্র সাহিত্যই হ'ল জীবনের রূপ-শিল্প। জীবনের বিচিত্র প্রকাশ। সুতরাং কোন রচনায় যদি আঙ্গিক জীবনকে, জীবনের উপলব্ধি ও রসচেতনাকে ডিঙিয়ে নিজেই মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়, যেখানে প্রসাধন-কলাটাই চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, তার আড়ালে রক্ত-মাংসের মানুষটা নগণ্য হয়ে হারিয়ে যায়, সেখানে সার্থক

শিল্প-সৃষ্টি হয়েছে একথা বলা আদৌ সংগত হবে কি?

আঙ্গিক-সর্বস্ব অধিকাংশ আধুনিক সাহিত্যই এই দোষে দুষ্ট। সাহিত্য সৃষ্টি করতে গেলেই শিল্পকৌশলের প্রয়োজন অপরিহার্য। কোন-না-কোন form-এর আধারে হৃদয়ের অনুভূতিকে ভরে দিতে হবে। কিন্তু সেই সাহিত্যই শ্রেষ্ঠতার মর্যাদা পাবে, যেখানে রূপ ও রস, আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। কোন একটিকে যেখানে বিশেষ করে চোখে পড়ে না। সাহিত্যের তুলাদণ্ডের দু'টি পাল্লা। আঙ্গিক আর বিষয়। দুই দিকেই সমান ওজন, সম্পূর্ণ ভারসাম্য যেখানে, সেখানেই শিল্পীর রসসিদ্ধি। পৃথিবীর সমস্ত শ্রেষ্ঠ লেখকের রচনায় এই ভারসাম্য রক্ষার আশ্চর্য শক্তির পরিচয় আছে। শক্তিমান সাহিত্য-স্রষ্টা তাঁকেই বলা হয়, যাঁর রচনায় 'art lies in concealing art'। লেখক এমন সুনিপুণভাবে শিল্প সৃষ্টি করবেন, যার মধ্যে লেখকের আঙ্গিক-প্রয়োগের কোন সচেতন প্রয়াসের চিহ্নমাত্র থাকবে না। সমস্ত আড়ম্বর, ঐশ্বর্য, সমস্ত অলংকার ও আঙ্গিক-বাহুল্যকে অন্তরালে রেখে স্রষ্টার শিল্পবস্তুটি স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে যেন 'আপনাতে আপনি বিকশিত' হয়ে উঠবে।

এসব কথা বহুল-প্রচারিত। অনেকের কাছেই হয়ত নেহাৎ পুরনো, মামুলি ঠেকবে। কিন্তু তবু আরেকবার মনে করিয়ে দিতে হল। কারণ প্রয়োজনের সময় অনেক বহুশ্রুত তথ্য বা তত্ত্ব আমাদের মনে থাকে না। ফলে বিচারবুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়।

বিভূতিভূষণের শিল্পলোক পরিক্রমা ক'রে এলে উপরে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির দেখা মিলবে। তাঁর 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত', 'আরণ্যক' কিংবা 'অনুবর্তন' উপ্যাসে বিষয় ও আঙ্গিকের ভারসাম্য আশ্চর্য কৌশলে রক্ষা করা হয়েছে। নিছক নগণ্য বিষয় নিয়ে আঙ্গিকের হাস্যকর আড়ম্বর সৃষ্টি যেমন তিনি করেননি, তেমনি গুরুভার বিষয়কে সৌন্দর্যলেশশূন্য রচনারীতির মাধ্যমে প্রকাশের অপপ্রয়াসও কোথাও চোখে পড়ে না।"

[বিভূতিভূষণ : মন ও শিল্প : গোপীকানাথ রায়চৌধুরী]

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

উপন্যাসের ফর্ম নিয়ে বিভূতিভূষণের ভাবনাচিন্তা কী ছিল? (৪০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

উপন্যাসে উপকরণের ভূমিকা কী? (১০০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

'আরণ্যক'-এর কায়াগঠনের শৈথিল্যের কারণ কী? (৬০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

নিজের ক্রমোন্নতি বিচার করুন

"আরণ্যকে আছে ভ্রমণ, কিঞ্চিত স্মৃতিকথন— এই সব মিলে খানিকটা আত্মজৈবনিক তো বটেই— কিন্তু এটি উপন্যাস, বেশ খোলামেলা ভঙ্গীর উপন্যাসে" —এই বক্তব্যের আলোকে 'আরণ্যক'-এর শিল্পরূপ বিচার করুন।

[সংকেতসূত্র : প্রাসঙ্গিক আলোচনা দ্রষ্টব্য]

১২.৩ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

আমরা পঞ্চম অধ্যায়ের আলোচনা শেষ করেছি। এতক্ষণের আলোচনায় আমরা 'আরণ্যক'-এর শিল্পরীতির প্রয়োগের ব্যাপারটি বিচার-বিশ্লেষণ করে বিভূতিভূষণের কৃতিত্বের পরিমাপ করার চেষ্টা করেছি। বিভূতিভূষণ কীভাবে বিভিন্ন আঙ্গিকের সমন্বয়ে 'আরণ্যক' উপন্যাসকে এক অভিনবত্ব দান করেছেন সে ব্যাপারটিও বিভূতিভূষণের ফর্ম এবং কন্টেন্ট নিয়ে ভাবনাচিন্তার স্বরূপ। আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি উপন্যাসে প্রযুক্ত বিভিন্ন আঙ্গিকের স্বরূপ-বৈশিষ্ট্যগুলি। এছাড়াও বিভিন্ন উপকরণ এবং নানা আঙ্গিকের সমন্বয়ে 'আরণ্যক' কতটুকু সফল শিল্পসৃষ্টি সে বিষয়টিও আমাদের বর্তমান আলোচনায় স্থান পেয়েছে। আলোচনার শেষে আমরা বলেছি শিল্পরীতি ধরে বিচার করলে 'আরণ্যক'-এ বহু দোষ ধরা পড়লেও বিভূতিভূষণের 'অপূর্ব বস্তুনির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা'-র জোরেই উপন্যাসটি কালোত্তীর্ণ তথা রসোত্তীর্ণ।

১২.৪ প্রাসঙ্গিক টীকা

ডায়েরিধর্মী উপন্যাস : এ ধরনের উপন্যাস ডায়েরি বা কড়চার আকারে রচিত হয়। কথকচরিত্র উত্তমপুরুষের জবানিতে অর্থাৎ 'আমি' কণ্ঠস্বরে কাহিনি বর্ণনা করে। এই ধরনের উপন্যাসে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, আবেগ অনুভূতি প্রাধান্য পায়। কাহিনি-

বিন্যাসে থাকে সময়ের ক্রম।

ভ্রমণকাহিনি: মূলত ভ্রমণবিষয়ক রচনা। তবে সব ভ্রমণবিষয়ক রচনাই ভ্রমণ সাহিত্য নয়। পর্যটকদের জ্ঞাতার্থে নানান গাইডবুক, পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়, এগুলি মূলত তথ্যসমৃদ্ধ ও বিবরণমূলক। সাহিত্যের রস সেখানে নেই। কোনো স্থান ভ্রমণের অভিজ্ঞতা যখন তথ্য-স্থানিক বিবরণ-আবেগ-অনুভূতির স্পর্শে ভাষার ঐশ্বর্যে ব্যক্তিগত স্তর থেকে উত্তীর্ণ হয়ে সকলের আস্বাদ্য হয় তখন তাকে ভ্রমণসাহিত্য বা ভ্রমণকাহিনি বলে।

আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস : ইংরেজিতে বলা হয় Autobiographical Novel। এই ধরনের উপন্যাসে পাত্র-পাত্রীরা নিজের কথা নিজেরাই বলে; তাদের এই উক্তির সাহায্যেই চরিত্র এবং আখ্যানভাগ পরিচালিত হয়।

চার্লস ডিকেন্স (১৮১২-১৮৭০) : উনিশ শতকের এক খ্যাতনামা ঔপনাসিক। আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় বেশি দূর অগ্রসর হননি। Morning Chronicle নামক কাগজে তিনি কিছুকাল সাংবাদিকের কাজ করেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Pickwick Papers', 'A Tale of Two Cities', 'David Copperfield' ইত্যাদি।

১২.৫ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি

১। বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' উপন্যাসের শিল্পরূপ নিয়ে আলোচনা করুন।

২। " 'আরণ্যক'-এর প্রকৃতি বর্ণনার ভাষায় আছে রসবৈচিত্র্য ও বিশাল ব্যাপ্তি, কারণ প্রকৃতি বহু বিচিত্ররূপিনী ও রহস্যময়ী।" —সোদাহরণ আলোচনা করুন।

৩। " 'আরণ্যক' বিভূতিভূষণের নিসর্গভাবনার অপর দিক। সে বিচারে এ উপন্যাস 'পথের পাঁচালী'-র পরিপূরক।" —বিশদ করুন।

৪। ভানুমতী চরিত্রের শিল্প-উপযোগিতা ব্যাখ্যা করুন।

৫। 'আরণ্যক না পড়লে প্রকৃতি-প্রেমিক বিভূতিভূষণের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না।' বিশদ করুন।

৬। কুন্তা চরিত্রের শিল্পগুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

৭। 'আরণ্যক' উপন্যাসের অরণ্য বাংলা সাহিত্যের এক বিরল অথচ বিরাট চরিত্র। —আলোচনা কুরুন।

৮। 'আরণ্যক' উপন্যাসের আঙ্গিক নির্মাণে বিভূতিভূষণ-অনুসরিত পন্থার মূল্যায়ন করুন।

৯। " 'বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকৃতিভাবনাকে বুঝতে হলে 'পথের পাঁচালী'র মতো 'আরণ্যক'-ও একখানি অবশ্য পাঠ্য উপন্যাস।" —এ বিষয়ে সম্যক

আলোচনা করুন।

১০। " 'আরণ্যক' উপন্যাসের চরিত্রগুলির আবস্থানিক প্রয়োগ নিশ্চিতরূপে ভিন্নধর্মী ও গুরুত্বপূর্ণ।" —বিষয়টির উপর আলোকপাত করুন।

১১। 'আরণ্যক' উপন্যাস থেকে তিনটি অপ্রধান চরিত্র চয়ন করে উপন্যাসে তাদের ভূমিকার উপযোগিতা বিচার করুন।

১২। 'আরণ্যক' উপন্যাস প্রসঙ্গে লেখক স্বয়ং বলেছেন : 'ইহা ভ্রমণবৃত্তান্ত বা ডায়েরী নহে— উপন্যাস।' —উপন্যাসের শিল্পরূপ বিচার উপলক্ষে এই মন্তব্যের যাথার্থ প্রতিপন্ন করুন।

১২.৬ প্রসঙ্গ-পুস্তক

১। প্রবন্ধ সঞ্চয়ন : ড০ সত্যবতী গিরি, ড০ সমরেশ মজুমদার (সম্পাঃ)।

২। কথা সাহিত্যের একলা পথিক বিভূতিভূষণ : সুতপা ভট্টাচার্য।

৩। বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস : ক্ষেত্র গুপ্ত (৩য় খণ্ড)

৪। বিভূতিভূষণ : মন ও শিল্প ঃ গোপিকানাথ রায়চৌধুরী।

৫। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরণ্যক : ড০ সমরেশ মজুমদার।

৬। সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ : কুন্তল চট্টোপাধ্যায়।

৭। সাহিত্য ও সমালোচনার রূপ-রীতি : উজ্জ্বলকুমার মজুমদার।

৮। সাহিত্য-সন্দর্শন : শ্রীশচন্দ্র দাশ।

৯। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১০। বিভূতিভূষণ : জীবন ও সাহিত্য : সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়।

১১। বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা : শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

১২। বিভূতিভূষণ : দ্বন্দ্বের বিন্যাস : রুশতী সেন।

১৩। বাংলা উপন্যাস— প্রসঙ্গ : আঞ্চলিকতা : ড০ মহীতোষ বিশ্বাস।

১৪। পথের কবি : কিশলয় ঠাকুর।

১৫। মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে : বিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাস : অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়।

১৬। কালের প্রতিমা : বাংলা উপন্যাসের পঁচাত্তর বছর : অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়।

১৭। বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা : সত্যেন্দ্রনাথ রায়।

* * *